মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল :
কাহিনী গ্রন্থনা ও চরিত্র নির্মাণ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে
পিএইচ. ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত

গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মিঠুন দত্ত

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মঞ্জুলা বেরা

প্রফেসর, বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

নভেম্বর, ২০১৪

Declaration

I declare that the thesis entitled 'মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল : কাহিনী গ্রন্থনা ও চরিত্র নির্মাণ' has been prepared by me under the guidance of Dr. Manjula Bera, Professor of Bengali, Department of Bengali, University of North Bengal. No part of this thesis has formed the basis for the award of any degree or fellowship previously.

Date- 12-11-2014

Mithun Datta

Mithun Datta

Department of Bengali

University North Bengal

Raja Rammohunpur

Darjeeling - 734013

বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

nbubangla@gmail.com
telephone 0353-2776 352

রাজা রামমোহনপুর, ডাকঘর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, থানা মাটিগাড়া, মহকুমা শিলিগুড়ি, জেলা দার্জিলিং - ৭৩৪ ০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

পত্র সংখ্যা.. তারিখ............................২০..............

Certificate

I certify that Sri Mithun Datta has prepared the thesis entitled **'মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল : কাহিনী গ্রন্থনা ও চরিত্র নির্মাণ'**, for the award of Ph.D degree of the University of North Bengal, under my guidance. He has carried out the work at the Department of Bengali, University of North Bengal .

Date: 12-11-2014

Manjula Bera

Dr. Manjula Bera
Professor of Bengali
Department of Bengali
University of North Bengal

Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ
(Abstract)

ভূমিকা

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক ছিল ওতপ্রোত। প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা মানুষ তার কবল থেকে নিজেদের উদ্ধারের জন্য প্রকৃতির বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক রূপকেই দেব-দেবী হিসাবে বিশ্বাস করতে লাগল। তার ফলে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত নিম্নশ্রেণীর মানুষদের মধ্যে ধীরে ধীরে দেবদেবীর রূপ পেতে লাগল। সেই দিক থেকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মনসামঙ্গল কাব্যের সর্প দেবী মনসা এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেবী চণ্ডী অশুভ অসুরনাশিনী বরাভয়দাত্রী হিসেবে স্থান পেল। তবে এই দেবদেবীরা কাব্যে স্থান পাওয়ার আগে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ব্রতকথায় প্রাধান্য পেয়েছিল। মঙ্গলকাব্যগুলিতে সেই ব্রতকথার দেবদেবীর সঙ্গে পুরাণের দেবদেবী ভাবনা যুক্ত হল। মঙ্গলকাব্যগুলির দেবদেবী এই লৌকিক ও পৌরাণিক দেবীভাবনার মিশ্রিতরূপ। মধ্যযুগের এই মঙ্গলকাব্যের ধারায় প্রথম সৃষ্টি মনসামঙ্গল কাব্য। তার পাশাপাশি এল চণ্ডীমঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল ইত্যাদি। তবে ষোড়শ শতাব্দীতে সৃষ্টি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের গুরুত্ব সেক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যটিতে একই সঙ্গে 'মার্কণ্ডেয়পুরাণ'-এর চণ্ডী ও লৌকিক চণ্ডীর আচরণের সংমিশ্রণ ঘটেছে। দেবীর পূজা প্রচারে প্রকল্পেই তার আত্মপ্রতিষ্ঠার আকৃতি। সেক্ষেত্রে একদিকে যেমন তার বিশালাকৃতি স্বরূপ-মহিমা প্রকাশের প্রয়োজন হয়েছে। তেমনি তাকে ভক্তের বিপদে মাতৃসুলভ কল্যাণমূর্তিতে আবির্ভাব হতে দেখা গেছে। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর দুটি স্বরূপের মাহাত্ম্যগীত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপট

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের ধারায় এই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উদ্ভবের প্রেক্ষাপট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় কবিরা সমাজের প্রয়োজনে কাব্য লিখতেন। সেই দিক থেকে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলি সমকালীন সমাজের দর্পণ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর্য এবং তুর্কী আগমন মঙ্গলকাব্যের উপাদানগুলি ঘনীভূত হতে সাহায্য করেছিল। আর্যরা যে সমাজকে চারটি বর্ণে ভাগ করেছিল সেই বর্ণভেদ থেকে সর্বনিম্ন বর্ণটি উচ্চবর্ণের কাছ থেকে ধীরে ধীরে অবহেলায় দূরে সরে যেতে থাকে। তার ফলে মৌর্য বংশ থেকে শুরু করে সেনবংশ পর্যন্ত ভারতবর্ষে স্পষ্ট দুটি সংস্কৃতির রূপ পাওয়া গেল। এর মধ্যে উচ্চশ্রেণীর মানুষরা পৌরাণিক সংস্কৃতির এবং নিম্নশ্রেণীর মানুষরা লৌকিক সংস্কৃতির ধারক ও বাহকে পরিণত হল। উচ্চশ্রেণীর দেবতা পুরুষ প্রধান এবং

নিম্নশ্রেণীর দেবতা নারী প্রধান। তখন নিম্নশ্রেণীর মানুষ তাদের ব্রতকথা, লোকবিশ্বাস-সংস্কারগুলিতে দেবদেবী মাহাত্ম্য ও স্বরূপ মৌখিক আকারে বহন করত। আর উচ্চবর্ণের রচিত পুরাণের দেবতাদের মাহাত্ম্য-গীত নানা উপায়ে বলা হত। এমন সময় বাংলা ঘটে যার অপর একটি বহিরাগমন। সেটা হল তুর্কী অভিযান (সম্ভবত ১২০২-০৩)। এই বিভাষী, বিধর্মী, বিসংস্কৃতির মানুষের আক্রমণে উচ্চবর্ণের সংস্কৃতির সঙ্গে নিম্নবর্ণের সংস্কৃতি মিলনের প্রয়োজন দেখা গেল। তার ফলে উভয় সংস্কৃতির মিশ্রণে মঙ্গলকাব্যগুলি সমকালীন প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠল। তার মধ্যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রথম মনসামঙ্গল কাব্যের উদ্ভব হল। তবে দেবী মনসা ক্রূর ও হিংস্র হওয়ায় ষোড়শ শতাব্দীতে মানুষ নতুন এক দেবীর প্রয়োজন অনুভব করল। যে দেবী একদিকে হবে বিশাল প্রকৃতির ও অন্যদিকে হবে বরাভয়দাত্রী কল্যাণময়ী মাতৃরূপিনী। সে হল দেবী চণ্ডী। তাই ষোড়শ শতাব্দীর সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে চণ্ডীমঙ্গলকাব্য সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানিক দত্ত : কবি কথা

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম কবি বলে মনে করা হয় মানিক দত্তকে। তিনি উত্তরবঙ্গের কবি এবং তাঁর বাসস্থান গৌড়ের অদূরে উত্তরে নঘরিয়া গ্রামে। তাঁর কাব্যের বিভিন্ন স্থান নাম, গৌড়ের সংস্কৃতি, ধর্মীয় প্রভাব ও মালদহ জেলার বিভিন্ন আদমশুমারির ভিত্তিতে তা দেখাতে চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর উল্লেখ প্রথম আমরা পাই মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে। সেই দিক থেকে শুধু নয় কাব্যের বিভিন্ন তথ্য ও সমালোচকদের মন্তব্যের ভিত্তিতে তাঁর কাব্যের রচনাকাল ১৪৯৫-১৫৯৫ সালের মাঝামাঝি অনুমান করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল : কাহিনী গ্রন্থনারীতি

মধ্যযুগের কাব্যগুলি আখ্যানধর্মী। তার কাহিনী গ্রন্থনার নিজস্ব রীতি ছিল। মঙ্গলকাব্য রচনার রীতি বিষয় বিন্যাসের ক্রম হল বন্দনা, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, সৃষ্টি রহস্য, মনুর জীব সৃষ্টি, হর-গৌরীর দাম্পত্য জীবন, অভিশাপ, বারমাস্যা, চৌতিশা , নারীগণের পতিনিন্দা, বিবাহাচার ও সর্বশেষে চরিত্রদের স্বর্গে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি। কাহিনী বিন্যাসের এই রীতি কতটা প্লট গঠনের নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে তার পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে দেখা গেছে, মানিক দত্ত উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যধারার মত করে তাঁর চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের সূচনা করেছেন

সৃষ্টিতত্ত্ব দ্বারা। তাঁর কাব্যের সেই সৃষ্টিপত্তনে বৌদ্ধশূন্যবাদ এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। তিনি কাব্যটি ব্রতকথার উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করে কাহিনী বর্ণনা শুরু ও সমাপ্ত ঘটিয়েছেন। এমনকি ব্যাধ ও ধনপতি খণ্ডের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কও নিবিড়। আর দেবখণ্ড বলে আলাদা কোন খণ্ড তার কাব্যে বর্ণিত হয়নি। তাই তাঁর কাব্যটিকে অখণ্ড কাব্য বলা যেতে পারে। কাব্যের প্রথম দিকে তথা দেবখণ্ডের বর্ণনায় কবি এমন বহু পুরাণের ঘটনা সংযোগ ঘটিয়েছেন, যা কাহিনী গ্রন্থনায় সঠিক সম্ভাব্যতা ও কার্যকারণ সূত্রের সন্নিবেশ হয়নি। প্রথম কবি হওয়ায় এবং গায়েন স্বভাবের জন্য তাঁর কাব্যের লক্ষ্য ছিল দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্যকে যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠা দেওয়া। শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তির মত রসজ্ঞ পাঠকের প্রতি তাঁর নজর ছিল না। তাঁর নজর ছিল ভক্তের ভক্তির উপর। তবে উপকাহিনী বর্ণনায় কবি বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার পরিচয় রেখেছেন। ভক্তকূলের দিকে নজর রাখতে গিয়ে তাঁর বলার ভঙ্গি হয়েছে প্রায় গদ্যাকার ও গল্প বলার মত। কাব্যটি তথ্যমূলক। রামভক্তিবাদ, লোকবিশ্বাস ও অলৌকিকতা এই সকল হয়েছে কাব্যটির চালিকা শক্তি। কবি যেখানে দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য কথা বর্ণনা করেছেন সেখানে গ্রন্থনার দিকটি অনেকটাই আড়ষ্ঠ হয়ে পড়েছে। সমকালীন মানুষের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে কবি কাব্যের গ্রন্থনা করেছেন। এই সকল কারণে তাঁর কাব্যের কাহিনী গ্রন্থনা অধিকাংশ স্থলে শিথিল। পাঠক বা ভক্তের কাছে নতুন দেবীর মাহাত্ম্য-বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্যই তাঁর কাব্যটি লিখিত হয়েছে। এই কাব্যের প্রত্যেকটি চরিত্র দেবী চণ্ডীর ব্রতের দাস। তবে বাস্তব তথ্যের উদ্‌ঘাটনে তাঁর অবস্থান সর্বাগ্রে। রোমান্টিক কবি পরিচয়েও তাঁর স্বাক্ষর রয়েছে। প্লট গঠনের রীতিও তিনি সমগ্রকাব্যে লঙ্ঘন করেছেন-- তা নয়। যে সকল দিকগুলি প্লট ও মঙ্গলকাব্যের গঠন অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল ঃ চরিত্র নির্মাণ

মানিক দত্তের চরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণের আগে চরিত্রের শ্রেণী বিভাজন করা হয়েছে। সেই দিক থেকে তাঁর কাব্যের প্রথম ও প্রধান নারী দেবীর চরিত্র চণ্ডীর বিশ্লেষণে এসেছি। সেক্ষেত্রে চণ্ডীর আদি উৎস থেকে ক্রমবিবর্তনের দিকটি কীভাবে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পরিলক্ষিত হল তার পরিস্ফূট হয়েছে। সেক্ষেত্রে দেখা গেছে, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডী পৌরাণিক স্বরূপের পাশাপাশি লৌকিক স্বভাবেরও পরিচয় দিয়েছে। তাঁর কাব্যে দেবী চণ্ডীকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া অন্যান্য চরিত্রগুলি অনেকটাই নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। তবে কালকেতু চরিত্রটি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। এমনকি নারদ ও পদ্মা সহচর চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও এই কাব্যে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। মানিক দত্তের ফুল্লরা, খুল্লনা, লহনা, ধনপতি, শ্রীমন্ত এই প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে কেউ গ্রাম্য স্বভাবের, কেউবা নারী মনস্তত্ত্বে উজ্জ্বল, কেউবা নিজস্ব আভিজাত্য ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দীর্ঘ পরম্পরার ধারক।

তবে তার কাব্যে অপ্রধান চরিত্রগুলি কোন আদর্শের প্রতিনিধি নয়। তারা নিজস্ব পরিচয়ে ভাস্বর। ফুল্লরার মাসীমা, পুরাই দত্ত, দাসী দুর্বলা, বশীকরণে লীলাবতী, মাতা রম্ভাবতী ইত্যাদি চরিত্রগুলি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁর কাব্যে এমন বহু অপ্রধান চরিত্র রয়েছে যারা তাদের স্বল্প চারিত্রকগুণেই সমাজ বাস্তবতাকে ক্ষণিকের জন্য সকলের মুখোমুখি করে তুলেছে। মানিক দত্ত তাঁর অভিজ্ঞতায় কত বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন এবং তাদের ক্ষেত্রে কতটা নিজস্বতা রক্ষা করতে পেরেছেন সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মূল্যায়ন

মনসামঙ্গল কাব্য মঙ্গলকাব্যের ধারায় আদি সৃষ্টি। মনসামঙ্গলের পর একজন শক্তিদেবী বা লৌকিক দেবীকে কেন্দ্র করে অপর একটি মঙ্গলকাব্যের ধারার সূচনা হল। সেই শক্তিরূপিনী দেবী চণ্ডী এবং তাকে নিয়ে রচিত কাব্যের নাম চণ্ডীমঙ্গল। এই ধারার প্রথম কবি মনে করা হয় মানিক দত্তকে। তিনি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য নামে নতুন একটি মঙ্গলকাব্য ধারার সৃষ্টি করেছিলেন, তা বললে অত্যুক্তি হবে না। মানিক দত্তের সম্বন্ধে একথা মনে রাখা সর্বত্রই প্রয়োজন যে তিনি অল্প শিক্ষিত, এমনকি অন্যান্যদের মত রাজসভার কবি নন। তিনি একজন গায়েন কবি। তাঁর সামনে ছিল সাধারণ অল্প শিক্ষিত, লোক বিশ্বাসে আশ্রিত মাটির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত মানুষ। তাদের মানস প্রবণতা অনুযায়ী তিনি এই কাব্যটি লিখেছেন। উপরন্তু তাঁর সামনে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কোন স্ট্রাকচার ছিল না। কিন্তু তাঁর পূর্বে মনসাদেবীকে নিয়ে মনসামঙ্গল কাব্যের গঠনরীতি তৈরী হয়েছিল। তিনি মনসামঙ্গলের গঠন রীতিকে সামনে রেখে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মঙ্গলকাব্যের ধারার সৃষ্টি করেছেন। এটাই তাঁর মূল্যায়নের মূল কথা। তিনি যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের গঠন রীতির খসড়া তৈরী করেছিলেন সেখানেই তাঁর কৃতিত্ব। তাই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম কাঠামো গঠনে তাঁর স্বতন্ত্রতা নয়, বরং তাঁর কৃতিত্বের দিকটাই বড় হয়ে উঠেছে।

উপসংহার

মানিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম কবি। তাঁর কাব্যের আলোচনায় বিভিন্ন অধ্যায় বিভাজনের মধ্য দিয়ে কবি কৃতিত্বের দিকটি উঠে এসেছে। মধ্যযুগের বাংলা তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের গুরুত্ব ও স্থান কোথায় তা নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রাক্‌কথন

আধুনিক চিন্তা-চেতনার বিকাশ ও পাঠকের চাহিদার প্রবণতায় মধ্যযুগের সাহিত্য অত্যন্ত অবহেলিত। মধ্যযুগের সাহিত্য মানেই দেব-দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তনের চর্বিতচর্বণ। তবে মধ্যযুগ যেহেতু সমাজ প্রধান যেখানে সামন্ততন্ত্র সমাজ ব্যবস্থার ও ধর্মই বড় সেখানে ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া একটু কষ্টসাধ্য। মধ্যযুগের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা কবিরাও শিকার হত। তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার জ্বলন্ত বাস্তব চিত্রও তুলে ধরতেন সেই চর্বিতচর্বণ কাব্যগুলির মধ্যে। তাতে একই বিষয়ে বিভিন্ন কাব্য রচিত হলেও তার মধ্যে ব্যাপক স্বতন্ত্রতার আস্বাদ পাওয়া যায়।

সে কারণে মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করার আগ্রহ জন্মায়। প্রসঙ্গত, এম. এ. পড়াকালীন দ্বিতীয় বর্ষে বিশেষ পত্র হিসাবে মধ্যযুগের সাহিত্যকে বেছে নিয়েছিলাম। তখন মধ্যযুগের সাহিত্য সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর ধারণা ও ভালোলাগার বীজ স্থাপন করেন অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া। তারপর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় পুথির রক্ষণাবেক্ষণের কাজের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের সাহিত্যের মর্মমূলের প্রত্যক্ষ স্বাদ ও গন্ধ অনুভব করি। সেই মাদকতাই আমাকে মধ্যযুগের সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে একমুখি করে তোলে। সেই থেকে মঙ্গলকাব্যগুলি পাঠ করতে এবং নিজের অসম্পূর্ণ ধারণাকে একটু একটু করে জোড়া দিতে শুরু করি। সেই সময় একটি বিষয় লক্ষ্য করি যে, মঙ্গলকাব্যের কবিরা একই বিষয়ে কাব্য রচনা করলেও তাঁদের ভৌগোলিক পরিচয়ের ব্যবধানে রয়েছে বহু বৈচিত্র্য।

এই রকম একজন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিচয়ের কবি হলেন মানিক দত্ত। তিনি উত্তরবঙ্গের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ধারার প্রথম কবি। তিনি তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের গ্রন্থনা কীভাবে করলেন এবং তাঁর চরিত্র রূপায়ণ কীরূপ তা আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। উল্লেখ্য মঙ্গলকাব্যের প্রত্যেক ধারার প্রথম কবিদের কাব্য প্রায় মুদ্রণের পাতায় উঠে আসে নি। তাই সেই সকল কবি ও তাঁদের কাব্যের নাম ছাড়া বাকি সম্পূর্ণ কাব্যের অবয়ব অজানার মধ্যেই থেকে গেছে। সেই দিক থেকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার প্রথম কবি মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সম্পাদিত গ্রন্থ পেয়ে যাই আমাদের উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২০০৮ সালে এম. এ. পাশ করার পর অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার কাছে এম. ফিল. (২০০৮-২০১০) করি মধ্যযুগের বিষয়ের উপর। সেই কাজ করতে গিয়ে আমি মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ভালো করে পাঠ করি এবং মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল নিয়ে একটি স্বতন্ত্র কাজ করার মনস্থ করি।

এই আগ্রহকে আরো তরান্বিত করেন আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া। তিনি আমার গবেষণা কর্মের বিষয়টি ঠিক করে দেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে আমি 'মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল : কাহিনী গ্রন্থনা ও চরিত্র নির্মাণ' শীর্ষক গবেষণার কাজটি আরম্ভ করি। তিনি বিভিন্ন

বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে আমার এই বিষয় সম্পর্কে অস্পষ্টতাকে স্বচ্ছতা দান করেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। সেই সঙ্গে আমার বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকদেরও প্রণাম জানাই। তবে অধ্যাপক ড. সুবোধ কুমার যশ ও অধ্যাপক ড. দীপক কুমার রায় মহাশয়ের কথা না বললেই নয়। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে আমাকে অনুপ্রেরণা ও সঠিক উপদেশ দিয়ে যাঁরা কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ করেছেন তাঁরা হলেন অধ্যাপক ড. মানস মজুমদার (প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক ড. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (প্রাক্তন রবীন্দ্র-অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক ড. রবিন পাল (প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) ও অধ্যাপক ড. লায়েক আলি খান (নজরুল অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়) প্রমুখ। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, খ্যাতনামা কথাসাহিত্যের প্রবীণ গবেষক-অধ্যাপক ড. অলোক রায় মহাশয় ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমার দীর্ঘ দিনের ব্যক্তিগত পরিচয় সূত্রের দিকটি। তাঁরা সর্বক্ষণই আমার গবেষণার অভিসন্দর্ভের খোঁজ নিতেন এবং বিভিন্ন ভাবে উৎসাহ যোগাতেন। সেই প্রসঙ্গেই তাঁদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। এরপর আসা যাক গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে। তাতে আমার প্রথমেই স্মরণে আসে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারের কথা। এখানকার গ্রন্থাগারিক ড. বৃন্দাবন কর্মকার ও গ্রন্থাগারের কর্মীরা বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় বই-পত্রের সন্ধান দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ড. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ও কোষাধ্যক্ষ সইফুল্লা মহাশয়দ্বয়কে। তাঁরা দু'জন যেভাবে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল বিষয়ে পুরনো প্রবন্ধ দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন তাতে তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানালেও বোধহয় কম হবে। এছাড়া সাহায্য পেয়েছি কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরী, তালতলা লাইব্রেরী এবং শিলিগুড়ির বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার থেকে। এই সকল গ্রন্থাগারের কর্মীদের অতুলনীয় সাহায্যের ঋণ অস্বীকার করা ধৃষ্ঠতা হবে।

মিঠুন দত্ত

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রাজা রামমোহনপুর

১২ নভেম্বর, ২০১৪

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
ভূমিকা	:		১ - ৫
প্রথম অধ্যায়	:	**মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপট**	৬ - ২৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	**মানিক দত্ত : কবি কথা**	২৪ - ৪৪
তৃতীয় অধ্যায়	:	**মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল : কাহিনী গ্রন্থনারীতি**	৪৫ - ১৮৩
চতুর্থ অধ্যায়	:	**মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল : চরিত্র নির্মাণ**	১৮৪ - ৩০৩
পঞ্চম অধ্যায়	:	**মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মূল্যায়ন**	৩০৪ - ৩৩০
উপসংহার	:		৩৩১ - ৩৩৪
পরিশিষ্ট	:	(ক) 'Maldah Census Hand Book' (1961) থেকে প্রাপ্ত মালদহের মানচিত্র।	৩৩৫
		(খ) খান সাহেব মহম্মদ আবিদ আলি খানের 'Memoirs of Gaur and Pandua' গ্রন্থের ৪০ নং পৃষ্ঠা থেকে প্রাপ্ত প্রাচীন গৌড়ের মানচিত্র।	৩৩৬
		(গ) 'Maldah Census Hand Book' (1961) থেকে প্রাপ্ত বর্ণানুসারে গ্রাম ও শহরের প্রদত্ত তালিকা।	৩৩৭ - ৩৪০
		(ঘ) মুর্শিদাবাদের 'District Census Hand Book' (1971) থেকে প্রাপ্ত বর্ণানুসারে গ্রাম ও শহরের প্রদত্ত তালিকা।	৩৪১
গ্রন্থপঞ্জী	:		৩৪২ - ৩৫৮

ভূমিকা

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থা ছিল মাতৃতান্ত্রিক ও কৃষি নির্ভর। সেই কৃষি নির্ভর জীবন গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। এই গোষ্ঠীবদ্ধ সাধারণ মানুষের সৃষ্ট লোকসাহিত্য। সেই সঙ্গে পাশাপাশি শিক্ষিত উচ্চবর্ণের সংস্কৃত সাহিত্যের ধারা বয়ে চলছিল। সেই সকল গ্রন্থের প্রধান দেবতা হল পুরুষ। লোকসাহিত্য ছিল বস্তুধর্মী। পল্লী বাংলার আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-ভালবাসার অফুরন্ত নির্ঝর এই সাহিত্যগুলি। লোকসাহিত্য গড়ে উঠেছিল সংস্কৃত প্রভাব মুক্ত লোকমানসের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী আক্রমনের ফলে এই দুই ভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণে ও প্রয়োজনে মঙ্গলকাব্যগুলির সূচনা হয়। এই সময়ে দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে ও সমাজের কল্যাণে যে সকল দেবী মাহাত্ম্যমূলক গান গীত হত তাই মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সর্বপ্রথম সৃষ্ট দেবী মাহাত্ম্যমূলক আখ্যান কাব্য হল মনসামঙ্গল কাব্য। এই দেবদেবী মাহাত্ম্যমূলক কাব্যধারা ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বজায় ছিল। এই কাব্যগুলিতে বিভিন্ন জাতি-বর্ণ ও ধর্মের সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতিক্রিয়া এবং তাদের সংস্কৃতির দীর্ঘ সঞ্চিত অভিজ্ঞতা বহমান। এ ধরনের মঙ্গলকাব্যের শুরুতেই গণেশাদি পঞ্চদেবতার বন্দনা করার পর গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা, সৃষ্টি রহস্য বর্ণন, মনুর প্রজাসৃষ্টি, প্রজাপতির শিবহীন যজ্ঞ, সতীর দেহ ত্যাগ, উমার তপস্যা, মদনভস্ম, রতিবিলাপ, গৌরীর বিবাহ, কৈলাশে হরগৌরীর দাম্পত্য জীবন, মনসা ও চণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা প্রচারের চেষ্টা, নানাবিধ বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে শেষে পূজা প্রচার এবং স্বর্গভ্রষ্ট চরিত্রদের স্বর্গে প্রত্যাবর্তন — এই সকল বিষয় বৈচিত্র্য বর্ণন মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত রীতি। এই সকল বর্ণনার পাশাপাশি বারমাস্যা, নারীগণের পতিনিন্দা ও চৌতিশা ইত্যাদি মঙ্গলকাব্যের অপরিহার্য বিষয় হিসাবে আসে। এরই সঙ্গে বয়ে চলে সমাজ-জীবনের নানা রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও সংস্কারের বস্তুগত দিকগুলি। মঙ্গলকাব্যগুলি লৌকিক ও পৌরাণিক সংস্কারের মিশ্রণের ফসল। এর গঠন ও কাহিনীধারায় রয়েছে বিভিন্ন ধর্ম সংঘাত ও সমন্বয়ের সুর। প্রাচীন ব্রতকথাগুলির যে ধর্মীয় প্রেরণা তাও মঙ্গলকাব্যগুলি সৃষ্টিতে যুক্ত হয়েছে। এই ব্রতকথাগুলি মঙ্গলকাব্যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ পেয়েছে সমকালীন তুর্কী বিজয়ের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বাতাবরণে অসহায় অবস্থা থেকে ভক্তকে উদ্ধারের জন্য। মঙ্গলকাব্যে এর প্রথম প্রকাশ পঞ্চদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গল কাব্যে। এরপর ষোড়শ শতাব্দীতে রাজনৈতিক প্রেক্ষিত পরিবর্তনের দেবী-ভাবনা মানুষের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী পাল্টে গেল। সেই পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে মাতৃময়ী সমরস আশ্রিত দেবী চণ্ডীর আরাধনা সৃষ্টি হল।

চণ্ডীমঙ্গল প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটি বড় অংশ এবং এর অধিষ্ঠাতা হল এই দেবী

চণ্ডী। 'চণ্ডী' — হিমালয় কন্যা, পার্বতীর অপর নাম। 'চণ্ড' শব্দের অর্থ অত্যন্ত কোপন, উগ্র স্বভাব এবং তীক্ষ্ণ। অসুর বধের সময়ে পার্বতীর স্বভাব খুব উগ্র হয়েছিল বলে তার নাম চণ্ডী। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গলের পরিবর্তে যদিও অনেক স্থলে 'সারদামঙ্গল', 'অন্নদামঙ্গল', 'কালিকামঙ্গল', 'অভয়ামঙ্গল' প্রভৃতি নাম দেখতে পাওয়া যায়। এই সকল কাব্যকে একটু অন্য ভাবে চণ্ডীমঙ্গলও বলা যেতে পারে। মঙ্গল শব্দের অর্থ কল্যাণ-কুশল। যার উপাখ্যান, কথা, পালা, গান বা জীবনচরিত শুনলে শ্রোতা এবং গায়কের মঙ্গল ও কুশল হয় বা মঙ্গল হবে বলে যা গান করা বা শোনা হয়, তাই মঙ্গলকাব্য। সুতরাং মধ্যযুগে চণ্ডীমঙ্গল অর্থে আমরা হিমালয় কন্যা পার্বতীদেবীর মাহাত্ম্য বিষয়কেই বুঝব।

চণ্ডীমঙ্গলকে দুটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে — প্রথম পৌরাণিক চণ্ডীমঙ্গল, দ্বিতীয় লৌকিক চণ্ডীমঙ্গল। পৌরাণিক দেবী মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত। সেখানে সে দেবগণের দুঃখ-দৈন্য দেখে অনেক স্তব-স্তুতি করার পর অসুর বধের জন্য আবির্ভূত হয়। অসুরদের বধ করে দেবগণকে সামান্য কিছু উপদেশ দিয়ে এবং তার মাহাত্ম্য শুনলে জীবগণের দুঃখ-দৈন্য দূর হবে। এইরূপ আদেশ করে সে অন্তর্হিত হয়। মানুষ তাকে পূজা করুক, এ বিষয়ে তার কোন আগ্রহও নেই। লৌকিক চণ্ডী তার বিপরীত। তাকে নিজের পূজা প্রচারের জন্য চিন্তিত ও পরিশ্রম করতে হয়েছে। মানুষ তার পূজা করতে অসম্মত হলে সে বেশ সাধ্য-সাধনা করে ও ভয় দেখিয়ে পূজা করাতে ব্যস্ত। পৌরাণিক চণ্ডী— দেবী। লৌকিক চণ্ডী কথায় কথায় ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মানব-চরিত্রের মত আচরণ করে। তার বিবেচনা শক্তি কম। সখী পদ্মা না থাকলে সে অনেক ভুল-ভ্রান্তি করে ফেলত। পৌরাণিক চণ্ডী মানুষের হিতসাধনের জন্য আবির্ভূত, তা সত্ত্বেও সে যেন বাংলার ঘরের চণ্ডী হয়ে উঠতে পারে না। লৌকিক চণ্ডী যেন আমাদের সুখ-দুঃখ, আরাম-বিরাম সকল অবস্থার সঙ্গে বিজড়িত, পৌরাণিক চণ্ডী সেইরূপ হতে পারেন নি। এই পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করলে বোঝা যাবে যে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডী মিশ্রণে উৎপন্ন, যা বাংলাদেশের তথা বাঙালীর নিজস্ব বস্তু। পৌরাণিক চণ্ডী অবিকৃত ভাবে কাব্যে বিরাজমান থাকলে সে মার্কণ্ডেয় পুরাণের স্বরূপ অতিক্রম করে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতে এসে অধিষ্ঠিত হত না। এমন কি বিনা আহ্বানে পচা মাংসের দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ কালকেতুর গৃহে আসত না এবং ফুল্লরার সঙ্গে বনে ছাগল চরাতে যেত না। পক্ষান্তরে, পৌরাণিক চণ্ডীকে সাক্ষাৎ পেতে হয় স্তব-স্তুতির মধ্য দিয়ে। লৌকিক চণ্ডী যে খাঁটি পৌরাণিক চণ্ডী নয় তা অনুমান করা যায়। বাংলাদেশে পৌরাণিক ধর্মের অবনতির সময় লৌকিক চণ্ডী নিজ প্রসার বৃদ্ধি করে হিন্দু ধর্মের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেছিল। কিন্তু সেই পৌরাণিক ধর্মের আবার যখন সমাদর শুরু হল তখন সেই লৌকিক চণ্ডী নিজেকে দৃঢ় করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। তাই আমরা দেখি 'ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ' ও 'কালিকাপুরাণ'-এ মঙ্গলচণ্ডীর পূজা এবং

ব্রতবিধি ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণে কালকেতু ও শালবানের উল্লেখ পাই। এই মঙ্গলচণ্ডীর সমাদর বৃদ্ধি পেল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রামায়ণ ও মহাভারতের মতএকঘেয়ে অনুবাদের পাশে।

বস্তুত কোন নতুন ধর্মমত বা দেবীর প্রতিষ্ঠা পেতে গেলে তাকে লোকরঞ্জন করার প্রয়োজন হয়। অথবা এমন কোন একটা জিনিস থাকা চাই, যাতে লোকের মন আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। নয়তো তা স্থায়ী হতে পারে না। গৌড়ীও বৈষ্ণব ধর্ম প্রেমের মাধুর্যের জন্য সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করেছিল। চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণের অবতার রূপে লোকের পূজা পেয়েছিলেন। তাই মঙ্গলচণ্ডীর সেবকগণ তাকে ভক্তবৎসল করে গড়ে তুলেছেন। যেমন নিজের পূজা প্রচারের জন্য ব্যস্ত, তেমনি ভক্তকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতেও তৎপর। কালকেতু কলিঙ্গ-কারাগারে তাকে স্মরণ করলে এবং শ্রীমন্ত সিংহলের দক্ষিণ মসানে প্রণের দায়ে ডাকলে সে তৎক্ষণাৎ তাদের উদ্ধার করেছে। এমনকি ভক্তের জন্য কাক ও কোকিল রূপ ধারণ করেছে, বিভিন্ন অবতার রূপ ধারণ করেছে, গোধিকা হয়েছে, ব্রাহ্মণী ও গ্রাম্যবধূ হয়েছে। চণ্ডীর এই গুণের জন্য বঙ্গবাসী তাকে সাদরে গ্রহণ করে। তার জন্য শৈবসাহিত্য বা শৈবধর্ম ক্রম নির্লিপ্ত হতে শুরু করে। চাঁদ সদাগর, ভাঁড়ু দত্ত ও ধনপতি— এই শিব ভক্তরা বিপদে পড়লে তাকে বিচলিত হতে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, ভক্তের প্রতি চণ্ডীর ব্যকুলতা প্রশংসার যোগ্য। তবে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের জন্ম, বিকাশ ও পরিপুষ্টিও একবারে হয়নি। ব্রতকথার মধ্যেই নিহিত ছিল চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বীজ। তারপরে কবির হাতে পড়ে ক্রমে কাব্যে পরিণত হয়েছে। এই কৃতিত্বের প্রথম প্রাপ্য হলেন মানিক দত্ত। তিনি মধ্যযুগে প্রথম পূর্ণাঙ্গ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাঠামো সৃষ্টি করলেন।

চণ্ডীমঙ্গল ধারার প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী। তবে এই ধারার প্রবর্তক বলা হয়ে থাকে কবি মানিক দত্তকে। তিনি উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের গঠনরীতিকে তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন, যা পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের মঙ্গলকাব্যের গঠনরীতির থেকে স্বতন্ত্র। তাই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম রূপ ও গঠনরীতি কীরূপ ছিল, তার সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তাহলে পরবর্তী কবিদের কৃতিত্ব কতটা তা নতুন করে ও স্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

মানিক দত্তের পরবর্তী কবিদের মধ্যে দ্বিজমাধব ও মুকুন্দ চক্রবর্তীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম মুদ্রিত রূপ পাওয়া যায় জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্পাদিত গ্রন্থ যা ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মুদ্রিত। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বহু সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে এবং তাঁকে নিয়ে গবেষণার দিকটি পূর্ব থেকেই সুগম ছিল। অন্যদিকে, দ্বিজমাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫২ সালে প্রথম সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদনা করলেন। তারপর থেকে এই দুই উল্লেখযোগ্য কবিদ্বয়কে নিয়ে অনেকেই গবেষণাধর্মী কাজ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, চণ্ডীমঙ্গল

কাব্যধারার প্রথম কবি মানিক দত্তের নাম তাঁর পরবর্তী কবিদের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তার কোন সম্পূর্ণ সম্পাদিত বই প্রকাশ হয়নি। তার ফলে অনেকেই মানিক দত্তের অসম্পূর্ণ পুথি লক্ষ্য করে কিংবা তাঁর নামে আঞ্চলিক কিছু লোকপ্রচলিত চণ্ডীর গানের মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে কিছু পুরনো পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। তার মধ্যে ১৩১১ সালে 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'য় প্রকাশিত রজনীকান্ত চক্রবর্তীর 'মানিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী' প্রবন্ধটি সম্ভবত প্রথম। তিনি কবির আঞ্চলিক পরিচয় এবং ভাষাগত নিদর্শন দেখিয়েছেন। তারপর ঐ 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'য় প্রায় ছয় বছর পর হরিদাস পালিত লিখলেন 'গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী-গীতে বৌদ্ধভাব' নামে একটি প্রবন্ধ। তাতে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সৃষ্টিতত্ত্বের কথাই বেশি স্থান পেয়েছে। 'ঢাকা সাহিত্য পরিষদ' থেকে প্রকাশিত 'প্রতিভা' পত্রিকায় ভবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী 'মানিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী' নামে ১৩২০ সালে একটি বিবৃতিমূলক প্রবন্ধ লিখলেন। সর্বশেষে, ১৩৪৫ সালে 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'য় 'মানিক দত্ত ও মুকুন্দরাম' নামে তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য তুলনামূলক আলোচনার বীজ বপন করেছিলেন। এঁরা সকলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও মালদহের জাতীয় শিক্ষা সমিতিতে সংরক্ষিত পুথির ভিত্তিতে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ দ্বিজমাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীত প্রকাশিত হওয়ার প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে মানিক দত্ত নিয়ে আলোচনা শুরু হলেও তাঁর সম্পূর্ণ সম্পাদিত গ্রন্থ পাওয়া যায় প্রথম ১৯৭৭ সালে। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি সুনীলকুমার ওঝা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা, কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, মানিক দত্তের চণ্ডী, ঐতিহাসিক ও সামাজিক চিত্র, ভাষা এবং মানিক দত্ত ও কবিকঙ্কণ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেক্ষেত্রে এই সম্পাদিত গ্রন্থটিকে সামনে রেখে আমরা মানিক দত্তের সাহিত্যের দিকগুলি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গত, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের গুণাগুণ এই আলোচনায় গুরুত্ব পায়নি।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি উঠে এসেছে। সেই পটভূমিকায় কীভাবে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উৎপত্তি এবং তাতে মানিক দত্তের অবস্থান তুলে ধরতে প্রবৃত্ত হয়েছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কবি কথা। মধ্যযুগের অধিকাংশ কবিরই জীবন কথা স্বল্পজ্ঞাত। মধ্যযুগের আখ্যান কাব্যে কবিরা তবুও কিছুটা আত্ম পরিচয় দিয়ে গেছেন। কিন্তু মানিক দত্ত এ ক্ষেত্রে প্রায় নীরব। টুকরো টুকরো দু-চার কথা তাঁর কাব্যে ছড়িয়ে আছে। এছাড়া মানিক দত্তের জীবন ও কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কিত আলোচনা গ্রন্থ অবলম্বনে তাঁর জীবন কথা কিছুটা বিস্তৃত ভাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের গ্রন্থনারীতি স্থান পেয়েছে। তাঁর

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম রূপটি কেমন ছিল এবং কীভাবে তিনি পরপর ঘটনাকে কাহিনীতে যুক্ত করছেন তার কৌশল-প্রতিভা সম্বন্ধে সম্যক পরিচয় দেবার চেষ্টা রয়েছে। এই কৌশল পরিমাপের জন্য আধুনিক কথাসাহিত্যের প্লটকে মানদণ্ড হিসাবে সামনে রেখেছি। সেই প্রসঙ্গে পুরাণের কিছু সংস্কৃত উদ্ধৃতি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। সেই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে যেগুলির বঙ্গানুবাদ পেয়েছি তা হুবহু সেটাই রেখেছি। এভাবে মানিক দত্তের কাব্যে কাহিনী গ্রন্থনায় লৌকিক ও পৌরাণিক ঘটনাগুলি কতটা ক্রিয়াশীল তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়েছে। তা লক্ষ্য করতে গিয়ে নানা সূত্রে সামাজিক রীতি-নীতি ও ধর্মের দিকগুলি এসেছে। আবার, চতুর্থ অধ্যায়ে চরিত্র আলোচনার ক্ষেত্রে মানিক দত্তের কাব্যে সৃষ্ট চরিত্রের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল তা আলোকপাত করতে আগ্রহী হয়েছি। চরিত্রগুলিকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে তাদের স্বরূপ তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। সেই সঙ্গে সব ধরনের চরিত্রের অন্তর্গহনের স্বরূপটি তুলে আনা হয়েছে। তা করতে গিয়ে যে সকল উদ্ধৃতি তুলে ধরেছি তা হুবহু সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে অনুসরণ করে। মুদ্রিত মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্র আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটি চরিত্রের নামে একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করি। যেমন এ কাব্যে অধিকাংশ স্থানেই ফুলরা বা কখন ফুলুরা বা কখন ফুল্লরা, আবার খুলনা বা খুলুনা বা খুল্লনা, শ্রীমন্ত বা শ্রীপতি নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাই মূল গ্রন্থের এরূপ উচ্চারণ বিভেদ লক্ষ্য করে আমরা প্রচলিত ফুল্লরা, খুল্লনা ও শ্রীমন্ত নামগুলি চরিত্র আলোচনায় ব্যবহার করেছি। তবে উদ্ধৃতিতে নাম পরিবর্তন করা হয়নি। তাঁর কাব্যে এমন কতগুলি চরিত্র ও ঘটনা সন্নিবেশ লক্ষ্য করেছি যা অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নেই। সেই দিকটি সামনে রেখে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মূল্যায়নের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। তাতে কবির চরিত্র রচনায় এবং কাহিনী গ্রন্থনার সঙ্গে অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল ধারার কবিদের তুলনামূলক দৃষ্টিতে আলোচনা করা হয়নি। কারণ তিনি যেহেতু এই ধারার প্রথম বীজ বপন করেছিলেন সেহেতু তিনি বাংলা সাহিত্যে মনসামঙ্গল কাব্য সৃষ্টির পর একটি সম্পূর্ণ নতুন মঙ্গল কাব্যের ধারায় কি কি দিক তুলে ধরলেন সেগুলিই তাঁর কৃতিত্বের পরিচায়ক। প্রসঙ্গ ক্রমে নানা স্থানে উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের ধারার সঙ্গে তাঁর কাব্যের সম্পর্ক এবং কবির জন্মস্থান মালদহ জেলার নানা সামাজিক, ধর্মীয় ও বস্তুগত নিদর্শনের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সেক্ষেত্রে তাঁর কবিত্বের দিকটি কতটা এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের স্থান কোথায় তা তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপট

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সৃষ্ট মঙ্গলকাব্যগুলি সমাজ বিবর্তনের ধারা ও সমকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি। লোকজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ ও জগদ্দল ক্ষমতার প্রতিসরণের প্রতিবাদের মুখপত্র মধ্যযুগের এই কাব্যগুলি। প্রসঙ্গত, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য তুলে ধরতে পারি— ‘‘সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। ... তেমনি সাহিত্যও দেশ ভেদে, দেশের অবস্থা ভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। ... সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।’’[১] তাঁর মতে সাহিত্য নিয়মের সৃষ্টি। স্থান-কাল-দেশ ভেদে সাহিত্যের পরিবর্তন হচ্ছে এবং তার ফলশ্রুতি উঠে এসেছে সাহিত্যের পাতায়। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে বলা যায় যে, মধ্যযুগের কবিরাও কেউ সৃষ্টির অভিলাষি হয়ে কাব্য সৃষ্টি করতেন না। তার পিছনে থাকত সামাজিক-অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যকে তাঁরা আড়াল করে সামনে ধর্মীয় আবরণকে কাব্যে কাহিনীতে রূপদান করতেন। তাই বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও সমাজ বিশ্লেষক গোপাল হালদার মধ্যযুগের সাহিত্যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন— ‘‘ ‘সাহিত্য’ লিখব বলে তখন কেউ সাহিত্য রচনা করত না, তা রচনা করত সামাজিক কোনো উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনের তাগিদে। আর একথাও আবার স্মরণীয়— তখন পর্যন্ত ধর্মই ছিল সমাজের প্রধানতম পরিচয়। ধর্মের সেই প্রধান গুরুত্ব কিছুমাত্র খর্ব না করেও বোঝা দরকার যে, ধর্মের নানা কথা ও কাহিনী আকারে ও আবরণে প্রকাশ লাভ করেছে সেদিনের মানুষের ধ্যান-ধারণা, বেদনা-আনন্দ; আর তারও অন্তর্নিহিত সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত, বর্ণ-বৈষম্য, বর্গ-বিরোধ এবং বর্গে-বর্গে আপোষ-রফা।’’[২] তাই মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য আলোচনার আগে এর আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে সমকালীন পরিচিত জগৎ-জীবনের পরিচয় রয়েছে। সেই জীবন দ্বন্দ্বে মুখর। সেই দ্বন্দ্ব কেবল বাইরের নয়, অভ্যন্তরেও। মঙ্গলকাব্যের বিশেষ শাখা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই দ্বন্দ্ব কখনো আর্য-অনার্য ধর্ম-সংস্কৃতির, কখনো তা শিব-শক্তির সংঘর্ষ, আবার কখনো তা ব্রাহ্মণ্য-অব্রাহ্মণ্যের বা উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর বা পৌরাণিক-লৌকিক ধর্ম সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বাইরের কাঠামোতে পৌরাণিক ও লৌকিক বা দেবখণ্ড, ব্যাধখণ্ড ও বণিক খণ্ডের বিন্যাসে সংঘাতের আভাস রয়েছে। কিন্তু এর অভ্যন্তরে রয়েছে চরম সমাজ-বাস্তবতা, চিরাচরিত শ্রেণী সংঘাতের ছবি, যার মূল ভিত্তি হল অর্থনৈতিক কাঠামো। এই

সামাজিক শ্রেণী-দ্বন্দ্ব মধ্যযুগে ও বিশেষত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর লড়াইয়ের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে মতাদর্শের এই বিরোধটিকে একটি ধর্মীয় আদর্শের সঙ্গে অন্য একটি ধর্মীয় আদর্শের বিরোধ বলে মনে হলেও এর একদিকে রয়েছে আধিপত্য বিস্তারকারী বণিক শ্রেণী, বিশেষত, সমাজে প্রতিষ্ঠিত বণিকশ্রেণী। অন্যদিকে, সংগ্রামী প্রতিষ্ঠাকামী ব্রাত্যরা। তারাই সমাজের কল্যাণকারী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উচ্চশ্রেণীর ধনী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে ভাঁড়ু দত্ত, ধনপতি ও বণিকসম্প্রদায়। অন্যদিকে, কালকেতু ও অন্যান্যরা সমাজে অবহেলিত, নিপীড়িত। কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করার জন্য তারা সংগ্রাম করেছে।

প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী অরবিন্দ পোদ্দার মঙ্গলকাব্যগুলির সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন— ‘‘বাংলার সমাজ-জীবনে যে সময়টা সাধারণভাবে মধ্যযুগ বলে অখ্যাত সেই যুগের বিচিত্র আবহাওয়ায় স্নান করেই মঙ্গলকাব্যগুলির আবির্ভাব। এই সুদীর্ঘকাল রাষ্ট্রীয় ওঠা-নামা, একটানা ভাঙ্গা আর ভাঙ্গা, এবং ভাঙ্গার কলুষ-স্পর্শ থেকে বাঁচার আকুল আকূতিতে মুখর। বিভিন্ন রাজা ও ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ আশ্রয়ী রাষ্ট্রের আসা-যাওয়া এবং সামাজিক আবর্তের কম্পন লৌকিক জীবনেই অনুভূত হয় সর্বাপেক্ষা বেশী।’’[৩] সেই লোকজীবনের কথা মধ্যযুগের কাব্যগুলির উপজীব্য। মধ্যযুগের এই লৌকিক জীবন বিধৃত মঙ্গলকাব্যগুলির সমস্তটাই ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। ধর্মকে সামনে রেখে সমাজ গঠিত, আবর্তিত ও আলোড়িত। তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং মতাদর্শ। এই বিভিন্ন গোষ্ঠী ও মতাদর্শ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পিষ্ট গণমানসের দীর্ঘ পুঞ্জিভূত বিক্ষোভের ফলশ্রুতি। তারই চূড়ান্ত আত্মপ্রতিষ্ঠার উদগ্র বাসনা থেকে লৌকিক ধর্মের আধারে মঙ্গলকাব্যের কাহিনীতে তা আশ্রয় লাভ করে। তার কারণ হিসাবে দুটি যুক্তি দেওয়া যায়— (এক) মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় ধর্মই ছিল প্রধান পরিচয়, তাই ধর্মীয় আবরণের আড়ালে এইসব মঙ্গলকাব্যগুলির সৃষ্টি হয়ে থাকবে। এবং (দুই) শাসক শক্তির প্রচণ্ডতার হাত থেকে রক্ষার জন্য ধর্মাশ্রয়কে অবলম্বন করা কবিদের একমাত্র কৌশল হয়ে উঠে। লক্ষণীয়, কবিরা উদ্দেশ্যকে সফলতা দানের জন্য দেবদেবীর স্বপ্নাদেশকে কৌশল হিসাবে কাব্যে রূপদান করে থাকেন। তাই ধর্মকে ব্যবহার করা হত অমোঘ অস্ত্র হিসাবে। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ ও সমাজ বিশ্লেষক গোপাল হালদার বলেছেন — ‘‘... এই শাসক-ধর্ম ও শাসক-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শাসিত-ধর্মের ও শাসিত-সংস্কৃতির প্রতিরোধের সাহিত্য।’’[৪] মঙ্গলকাব্য বা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতে শাসক ও শাসিতের স্বার্থ-দ্বন্দ্বের কাহিনী ঐতিহ্যের মূলকথা। তাই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আর্থ-সামাজিক-ধর্মীয় কাঠামোর স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়োজন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আর্থ-সামাজিক-ধর্মীয় বা তার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সমন্বয়ের ইতিবৃত্ত। এই সংঘর্ষ ও সমন্বয় জানতে গেলে ভারতের বহিরাগমনকে কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে ধরে নিতে হয়— (এক) আর্য-আগমন

এবং (দুই) তুর্কী আগমন। আর্য আগমনে ভারতের অনার্যদের সঙ্গে যেমন সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি দুটি জাতির সমাজ-সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় ঘটেছে। এর ফলে পৌরাণিক সমাজ-সংস্কৃতির ধর্মের সঙ্গে লৌকিক সমাজের সমন্বয় ঘটেছে। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ ও সমাজ বিশ্লেষক গোপাল হালদার বলেছেন— "এই প্রতিরোধেরও তলায়-তলায় ও ভেতরে- ভেতরে আবার জড়িত হয়ে আছে সমাজের নিম্নবর্গের সঙ্গে উচ্চবর্ণের সংঘর্ষ, তাদের বিরোধ ও পরস্পরের বোঝাপড়া; আবার, অন্যদিকে লোক-সমাজে ও লোক-সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মালম্বী সাধারণ মানুষের মিলন-মিশ্রণ।"[৫] উচ্চবর্ণের শাসকরা শাসন-শোষণ কায়েম রাখতে একটি মতাদর্শকে ব্যবহার করেছিল। সেটি হল হিন্দুধর্ম বা পৌরাণিক ধর্ম। অন্যদিকে, নিম্নবর্ণের শোষিতরা শোষণের হাত থেকে রক্ষার জন্য অন্য একটি মতাদর্শকে আঁকড়ে ধরেছিল। তা হল লৌকিক ধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম। একটি আর্যদের ধর্মাদর্শ, অপরটি অনার্যদের। সর্বধর্ম সমন্বয়ের বৃহৎ দেশ ভারতবর্ষে এই দুই জাতি-সংস্কৃতির সংঘাত যেমনি হয়েছে, তেমনি সমন্বয়ও ঘটেছে। সেই সমন্বয়ের বীজ থেকে মধ্যযুগে নতুন মঙ্গলকাব্যের মহীরূহের সৃষ্টি হল। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন— "হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সংঘাতের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ যেমন সংস্কৃত পুরাণগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল, বাংলাদেশে হিন্দু সমাজের সঙ্গে মুসলমান সমাজের প্রথম সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ তেমনই মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভব হইয়াছিল।"[৬] তাই মঙ্গলকাব্যের অন্যতম শাখা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্বের প্রতি যেমন দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রয়োজন, তেমনি তুর্কী আক্রমণ ও তার প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস অনুধাবন করা প্রয়োজন।

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে আর্যরা উত্তরাপথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। সেই সময় আমাদের দেশে দ্রাবিড়, মোঙ্গল ও কোল প্রভৃতি অনার্য জাতির বসবাস ছিল। আর্যরা এসে তাদের পরাজিত করল এবং তারা সমাজ পরিচালনার জন্য সমাজকে চারটি বর্ণে ভাগ করল। তারা হল যোদ্ধশ্রেণী (ক্ষত্রিয়), পুরোহিতশ্রেণী (ব্রাহ্মণ) ও সাধারণ জনগণ (বৈশ্য-শূদ্র)। যেমন, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আর্য সংস্কৃতির এই ধারাকে বণিকশ্রেণীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তারা নিজ রাজ্যের প্রয়োজনে বার বার বিভিন্ন রাজ্যে বাণিজ্য যাত্রা করেছে। অন্যদিকে, সমগ্র সমাজকে ভিন্ন রাজ্য তথা শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবে ক্ষত্রিয়শ্রেণী আর এই সমাজকে পরিচালনা বা নানা শুভ-অশুভ আদেশ দিবে ব্রাহ্মণ। সেই দিক থেকে ব্রাহ্মণরা ছিল সমাজ প্রধান। মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে 'ব্যাধ খণ্ড'-এ কালকেতু কলিঙ্গরাজ কর্তৃক বন্দী হলে ফুল্লরা ব্রাহ্মণের কাছে স্বামীর মুক্তির জন্য কাতরোক্তি জানায়। স্বাধীন নানা বৃত্তিধারী ও কৃষিজীবী পরিবারের অন্তর্গত বৈশ্য ও শূদ্ররা। সমাজে এদের উপর ছিল খাদ্যবস্তু ইত্যাদির ভার। অন্যদিকে, শূদ্রদেরকে তখন 'অসুর', 'শত্রু', 'দাস' ও 'ব্রাত্য' বলা হত। তাদের অবস্থান ছিল পূর্ব ভারতে। উত্তর ভারতের

আর্যরা কোন কাজে পূর্ব ভারতে এলে তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। আর্যদের মধ্যে এই ব্রাত্যরা পরবর্তীকালে আর্যসংস্কৃতি থেকে আলাদা হয়ে যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার সুকুমার সেন বলেছেন— "যাহাদের মর্যাদা গ্রাম্যদের তুলনায় অনেক কম ছিল, তাহাদের নাম ছিল 'ব্রাত্য'। পরবর্তী কালে শব্দটির আসল অর্থ লোপ পাওয়ায় নিন্দার্থক অর্থ আসিয়া যায়, এবং তাহা হইতে 'ব্রতবাহ্য' অর্থাৎ আর্য-সংস্কৃতিচ্যুত এই মানে দাঁড়াইয়া যায়।"[৭] আর্য-সংস্কৃতি থেকে চ্যুত মানুষ ছাড়া আর্য নয় অর্থাৎ দ্রাবিড়, অস্টিক ও কোল গোষ্ঠীদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি কালক্রমে গড়ে উঠেছিল। তবে উভয়ের মধ্যে আপাত সাংস্কৃতিক পরিচয় থাকলেও পাশাপাশি সহাবস্থানের ফলে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে উভয়ের মধ্যে জীবনযাত্রা, আচার-বিচার ও চিন্তা-ভাবনার আদান-প্রদান হয়ে গেছে। ক্রমে ক্রমে আর্য সভ্যতার ভাষা, ধর্ম প্রণালী, স্মৃতিসংহিতা, দর্শন-মনন প্রভৃতি উত্তর ভারতীয় সংস্কার পূর্ব ভারতে বিস্তার লাভ করল। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, স্মৃতিসংহিতায় অনার্য ম্লেচ্ছভূমিতে অসংকোচে প্রবেশ করল। ফলে জাতিগত ব্যবধান অনেকটাই হ্রাস পেল। এই মিলনও ঘটেছে সংঘর্ষের ফলেই। আর্যদের সমাজ ছিল পশুচারী, আর অনার্যদের ছিল কৃষিপ্রধান সমাজ। ফলে অনার্যদের কৃষিক্ষেত্রে আর্যদের গোধন বিচরণকে কেন্দ্র করে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ বাঁধে। বিরোধ এক সময় সমাপ্ত হয়, কিন্তু সেই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে উভয়ের উভয়কে জানা হয়ে যায় অজ্ঞাতসারে। আর্যদের পুরাণ সংস্কৃতি তথা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে পুরুষ দেবতারাই সমাজে প্রধান ছিল। প্রসঙ্গত, তাদের সমাজ ছিল পুরুষ প্রধান। অন্যদিকে, আর্য নয়, তাদের সমাজ ছিল নারী প্রধান। তাই তাদের দেব-দেবীরা ছিল স্ত্রী দেবতা। অনার্যদের কৃষিজ প্রধান জীবিকায় সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। তার ফলে তারা মাতৃ পূজা বা শক্তির আরাধনাকে বিশেষ প্রাধান্য দিত। এই নারীকেই শক্তি বা সৃষ্টির উৎস বলে গণ্য করা হল। তার ফলে হিন্দু তন্ত্রে এই শক্তির দেবীকে সহজেই গ্রহণ করল। প্রসঙ্গত, আমরা বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও সমাজ বিশ্লেষক গোপাল হালদারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি— "... নারী 'শক্তি' রূপে আবিষ্কর্তা হইলেন; মনে পড়িল নারীই মানুষের জীবনধাত্রী প্রকৃতির প্রতীক। সমকালবর্তী হিন্দুরাও এই আবিষ্কারকে অঙ্গীভূত করিয়া লইতে দেরী করিল না।"[৮] তবে সমাজের এই নিম্নস্তরের মানুষদের সংস্কৃত ভাষায় লেখা গ্রন্থ পাঠের অধিকার ছিল না। সাধারণ মানুষ তথা আর্য নয় যারা, তারা পরকালের সুখ শান্তি কিংবা কোন পাপ কার্য থেকে মুক্তির জন্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা নানা রকম অর্থনৈতিক-সামাজিক শোষণ সহ্য করত। এই শোষণ অত্যাচারের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পূর্ব ৬০০ তে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব হয়। লক্ষণীয়, পূর্বভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তথা হিন্দুধর্মের প্রাবল্য ছিল যেখানে, সেখানেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের বীজ উদ্‌গম হয়। বিবর্তনের ইতিহাসে খ্রীষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক মৌর্য বংশের রাজা

অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সাধারণ মানুষের ধর্ম রাজা গ্রহণ করায় সমাজে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার মৌর্য-আমলে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। মৌর্য আমলের পর ভারতবর্ষে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৩২০ অব্দে গুপ্তরা শাসন কার্যের হাল ধরে। তারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তারা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের সর্বপ্রান্তে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। তারা একদিকে যেমন পররাজ্যগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ছিল তেমনি পূর্ব ভারতে কিরাত-নিষাদ-ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর ওপর ধীরে ধীরে পৌরাণিক ও স্মার্ত আদর্শে দীক্ষিত করতে থাকে। এই সময় সনাতন হিন্দু ধর্ম প্রতিষ্ঠা পায়। হিন্দু ধর্মের পুরুষ দেবতা বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব ধর্ম এবং শিবকে কেন্দ্র করে শৈব ধর্মের প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ ও সমাজ বিশ্লেষক গোপাল হালদার আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর অনার্য মানুষদের সামাজিক অবস্থান বোঝাতে গিয়ে বলেছেন— ‘‘এই হিন্দু-সংস্কৃতির চক্ষে সমাজের উৎপাদকশ্রেণীর স্থান কত নিম্নে। তাহারা রহিল শূদ্র ও অন্ত্যজ হইয়া; মানুষের অধিকার হইতে তাহারা সর্বভাবেই বঞ্চিত হইয়া রহিল। প্রায় তেমনি বঞ্চিত রহিল স্ত্রীজাতি।’’[৯] এমনকি, সমাজে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম নতুন করে পত্তনের জন্য তাদের রাজসভায় গড়ে উঠেছিল সংস্কৃত চর্চার নবরত্ন। জন সাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্মে প্রাবল্য লক্ষ্য করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দুরবস্থা অতিক্রম করার জন্য দক্ষিণ ভারত থেকে বেদ-পুরাণ জ্ঞান সম্পন্ন পণ্ডিতদের পূর্বভারতে নিয়ে আসা হয়। তাদের দ্বারা সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। এই আমলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বাংলায় এসে তাম্রলিপিতে দু-বছর সূত্র সমূহ নকল করতে এবং বৌদ্ধমূর্তি সমূহ অঙ্কনের জন্য যাপন করে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে হিউয়েন-সাঙ ভারতের বৌদ্ধধর্মের প্রসারের কথা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে বলে গেছে।

এরপর ৬০৬ খ্রীষ্টঅব্দের আগে বাংলার রাজা হয় শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় একশ বছর (আনুমানিক ৬৩৫-৭৫০) ধরে বাংলার বুকে সূচনা হয় ‘মাৎস্যান্যায়’-এর। বাংলার রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এরূপ চরম ভয়াবহ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সে সময় সাধারণ মানুষের থেকে প্রথম নির্বাচিত রাজা গোপাল পালকে (৭৫০-৭৭০ খ্রী:) বাংলার মসনদে বসানো হয়। পালবংশ ছিল বৌদ্ধধর্মালম্বী। এই সময় বৌদ্ধধর্মের পুনরায় বিস্তার পায়। এই ধর্ম ছিল সাধারণ মানুষের কাছে উদার। তার ফলে নিম্নশ্রেণীর বিভিন্ন ধর্ম-সংস্কার এই ধর্মের সঙ্গে মিশ্রণে বাঁধা রইল না। এই যুগে ধর্ম-সংস্কৃতির মিশ্রণ সম্বন্ধে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন— ‘‘পালরাজগণের সময় হইতেই সম্ভবত বঙ্গদেশে প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধধর্মের সহিত স্থানীয় কতকগুলি লৌকিক ধর্ম-সংস্কারের সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়। তাহারই ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মিশ্র কতকগুলি লৌকিক ধর্মমতের উদ্ভব হয়।’’[১০] অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ

পর্যন্ত পালবংশ বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। পালবংশের পতনের পর সেনবংশ বাংলায় ১২০৩ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করে। তারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। 'মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থের রচয়িতা আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন— "সেনরাজগণের সময় হইতেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি সাধারণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিতে আরম্ভ করিলেও এতকালের দেশীয় ধর্ম-সংস্কৃতির যে উপাদানসমূহ এদেশের সমাজের একাবারে মজ্জায় গিয়া স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহা একেবারে পরিত্যক্ত হইল না। সমাজে ক্রমে পুরাতন ধর্ম-বিশ্বাসের মূল শিথিল হইয়া নবাগত আদর্শের উপর আশা ও আশ্বাস স্থাপিত হইল সত্য, তথাপি রক্ষণশীল এই সমাজ পুরাতনকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিল না; তাহারা নূতনকে যে ভাবে গ্রহণ করিল, তাহা পুরাতনেরই রূপান্তর মাত্র হইল— এই প্রদেশের প্রচলিত ধর্মসংস্কারই যুগোচিত পরিমার্জনা মাত্র লাভ করিয়া সমাজের অন্তস্তলে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতে লাগিল।"[১১] হিন্দু সংস্কৃতির বিশেষত্বই তাই। প্রাচীনের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে চলা। অতীতে যা ছিল তা সরাসরি অস্বীকার না করে যথাসম্ভব তার সঙ্গে বাহ্যিক একটি সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করা। অল্প বিস্তর পরিবর্তন যুগে যুগে প্রত্যেক সমাজেই ঘটতে থাকে। তা সকলের সমর্থনের জন শাস্ত্র রচনা তথা দেশীয় সংস্কৃতির টীকা টিপ্পনী রচনা করা হত। সেগুলি অনেকাংশে লৌকিক আচরণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই জন্যই গুরুতর পরিবর্তন ঘটলেও প্রাচীন সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষা করে চলত হিন্দু সমাজ। সঙ্গে নতুন নতুন টীকা রচনা করে কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনরে সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাসের অভাব ঘটতে দেয়নি। হিন্দু সংস্কৃতির বিশেষত্বই তাই। প্রাচীনের সঙ্গে যোগ সূত্র রক্ষা করে চলা, অতীতে যা ছিল তা সরাসরি অস্বীকার না করে যথা সম্ভব তার সঙ্গে বাহ্যিক সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করা। অল্প বিস্তর পরিবর্তন প্রতি সমাজেই যুগে যুগে ঘটে থাকে। তা সকলের সমর্থনের জন্য শাস্ত্র রচনা তথা দেশীয় সংস্কৃতির টীকা-টিপ্পনী রচনা করা হত। সেগুলি অধিকাংশে লৌকিক আচরণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই জন্যই গুরুতর পরিবর্তন ঘটলেও হিন্দুরা প্রাচীন সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষা করে চলেছে। সঙ্গে নতুন নতুন টীকা রচনা করে কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাসের অভাব ঘটতে দেয়নি। এইভাবে পৌরাণিক সংস্কৃতির পাশে বৌদ্ধ ও লৌকিক ধর্ম-সংস্কৃতি বছরের পর বছর সমান গতিতে চলতে থাকে।

এরপর আসা যাক, দ্বিতীয় বহিরাগমনের কথায়। তুর্কী আক্রমণের আগে পর্যন্ত সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি দুটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহমান ছিল। একদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কৃতি, অন্যদিকে লৌকিক বা সাধারণ মানুষের ধর্ম-সংস্কৃতি পাশাপাশি সমান্তরালে এগিয়ে চলছিল। এছাড়া হিন্দু সমাজে তান্ত্রিক সাধনা প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে এই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগেই মিলিত হয়ে হিন্দুতন্ত্র এবং বৌদ্ধতন্ত্রের রূপ লাভ

করে। কেননা অনার্য সমাজে নারীকে শক্তিরূপিনী হিসাবে মানা হত। সেই শক্তির দেবীর সঙ্গে হিন্দুরা তার তন্ত্রশক্তির সাজুয্য অনুভব করল। বৌদ্ধধর্ম বৈদিক ধর্মের বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেও তান্ত্রিক সাধনার আচারের প্রতি অনীহা ছিল না বলে মনে হয়। তন্ত্রের যোগ সাধনায় মন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তি ও মুদ্রার গুহ্য শক্তিকে বৌদ্ধ ধর্মে ও হিন্দু ধর্মে গৃহীত হয়। এর পিছনে যুক্তি স্বরূপ আমরা শশিভূষণ দাশগুপ্তের দুটি মন্তব্য তুলে ধরতে পারি। তিনি বলেছেন— ''চতুর্থ-পঞ্চম শতকে অসঙ্গের সময়ে তাঁর দ্বারা বৌদ্ধধর্মে যে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করে — এই অনুমান কিয়ৎ পরিমাণে সমর্থিত হয়।''[১২] এছাড়া তিনি আরও বলেছেন— ''তান্ত্রিকতার প্রধান লক্ষণগুলি হিন্দু অথবা বৌদ্ধধর্ম-সঞ্জাত নয়। এটি ভারতের একটি সুপ্রাচীন ধর্মমত বা সাধনা-প্রণালী;— হিন্দুদর্শন ও ধর্মের সংস্পর্শে তা কোথাও হিন্দুতন্ত্র এবং বৌদ্ধদর্শন ও ধর্মভাবের সংস্পর্শে কোথাও বৌদ্ধতন্ত্রে রূপ লাভ করেছে।''[১৩] তবে কোথাও হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতার গণ্ডী অতিক্রম করে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে প্রবেশ করা বাধ্যতামূলক প্রয়োজন দেখা দেয় নি।

এই অবস্থায় উভয়কে একত্রিত করতে তুর্কী আক্রমণের মত একটি বর্হিরাক্রমণের প্রয়োজন ছিল। সুকুমার সেন বলেছেন— ''নবীন-প্রবীণের এই সংস্কৃতিগত অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাসগত, আচারব্যবহারগত ও ভাবধারাগত দুস্তর স্তরভেদ দ্রুতগতি বিলুপ্ত হইয়া একটি জমাট বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া উঠিবার অন্তরায় ছিল একটি প্রধান বস্তুর অভাব — বাহিরের আঘাত অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষের সংঘাত। যেমন দুই পরমাণু হাইড্রোজেন এবং এক পরমাণু অক্সিজেন মিলিত হইয়া জলকণা হইতে গেলে প্রচণ্ড বিদ্যুৎশক্তির মধ্যস্থতা (Catalytic agent) চাই তেমনি দুই সংস্কৃতি ও ভাবধারা মিলিয়া সহজে একটি অখণ্ড সংস্কৃতিতে ও ভাবধারায় পরিণত হইতে গেলে বাহ্য সংঘাতের বা আভ্যন্তর শক্তিস্ফুরণের অপেক্ষা রাখে।''[১৪] নবীনরা ছিল চিন্তাশীল শাস্ত্রাদর্শবাদী, যজ্ঞা বা পূজাপার্বণ, তন্ত্রানুসন্ধিৎসু ও সংযম নিষ্ঠ, আর প্রবীণ তথা সাধারণ প্রাকৃতরা ছিল দৈববাদী ব্রত পরায়ণ, সঙ্গীতসাহিত্যরস লিপ্সু ও অধ্যাত্মনিষ্ঠ। তুর্কী আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত এই দুই স্তরে ধর্ম, দেব-দেবী, সংস্কৃতি স্বতন্ত্র ছিল।

হঠাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে (সম্ভবত ১২০২ খ্রী: অব্দ) বিজাতি, বিধর্মী, বিভাষি তুর্কী আক্রমণের ঝড় বাংলার উপর বয়ে যায়। তুর্কী-নেতা মহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খিলজী মুসলমান ধর্ম প্রচারের জন্য হিন্দু ও বৌদ্ধদের দেব-দেবী, মঠ-মন্দির ও সংস্কৃতি ধ্বংস করতে শুরু করে। সাধারণ মানুষ যারা এতদিন হিন্দুধর্মের মানুষের দ্বারা অবহেলিত ছিল তাদেরকে বিজয়ীরা অত্যন্ত কৌশলে ও নিজেদের ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য শাসনকার্যে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করে। অন্যদিকে, এই 'অস্পৃশ্য' অবহেলিত মানুষগুলি হিন্দু সমাজের দণ্ড মুণ্ড কর্তাদের উপযুক্ত জবাব দিতে ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে। প্রসঙ্গত, অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন— ''হিন্দু-

সামাজিক সংস্থার নির্মম বিধানে যারা নির্যাতিত হচ্ছিল, — বর্ণ-সমাজের অন্তর্গত নিম্ন বর্ণগুলি এবং বর্ণ-সমাজের বাইরের অস্পৃশ্য জাতিগুলি— তারা ঐসলামিক সমাজ-সংস্থায় আশ্রয় গ্রহণ করে সামাজিক নির্যাতন থেকে মুক্তিলাভ করেছে। হিন্দু সমাজের বিধান-দাতাদের নিকট যারা ছিল শূদ্র এবং অস্পৃশ্য পর্যায়ের, ইসলাম তাদের দিলো মুক্ত মানুষের অধিকার, এবং তাই নয়, ব্রাহ্মণদের উপরেও প্রভুত্ব করার ক্ষমতা।''[১৫] হিন্দু সমাজের এই আত্মক্ষয় লক্ষ্য করে ব্রাহ্মণরা নিম্নশ্রেণী তথা সাধারণ মানুষদেরকে কাছে টানতে সচেষ্ট হয়। প্রসঙ্গত, গোপাল হালদার বলেছেন— ''তুর্ক আক্রমণের ফলে প্রধানত যে সামাজিক পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ল। তা সংক্ষেপে এই :

(১) উচ্চ ও নিম্নবর্গের হিন্দুদের সংযোগ নিকটতর হল।

(২) পরাজিত হিন্দু-সমাজ এক সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রচনা করে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হল; এবং

(৩) প্রথমে হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মানুষের ঐক্যও ক্রমে হিন্দু-মুসলমান উচ্চবর্গের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হলে পর মুসলমান বিজেতারা বাঙালী হয়ে উঠলেন, আর বিদেশীয় রইলেন না।''[১৬]

এরূপ সামাজিক-সংহতির কারণ ও তার ফলস্বরূপ সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার সুকুমার সেন বলেছেন— ''বাঙ্গালা দেশের দুই স্তরের মিলনের জন্য তুর্কী-অভিযানের মতো এক আকস্মিক সংঘর্ষের আবশ্যক ছিল। ইহাই বাঙ্গালা দেশে তুর্কী অভিযানের একটি ভালো ফল।''[১৭] বাংলাদেশে লৌকিক উপাদানের সঙ্গে পৌরাণিক ও শাস্ত্রীয় বোধ বুদ্ধির যে সংমিশ্রণ হয়েছিল তার ফলশ্রুতিতে মঙ্গলকাব্যগুলির সৃষ্টি হয়েছিল। নিম্নবর্গের তথা লৌকিক সমাজে এতদিন লখিন্দর-বেহুলা, কালকেতু-ফুল্লরা, ধনপতি-খুল্লনা, লাউসেন-রঞ্জাবতীর উপাখ্যান এবং কৃষ্ণ-শিবের নামে প্রচলিত কাহিনী প্রচলিত ছিল। তাদের স্ত্রী দেবতা বা বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত দেব-দেবীকে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরা অবজ্ঞার চোখে দেখত। তাদের কাছে সংস্কৃত শাস্ত্র, পুরাণ, কাব্য প্রভৃতি শ্রদ্ধার ও সমাদরের বিষয় ছিল। কিন্তু তুর্কী আক্রমণে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরা ক্ষমতাচ্যুত ও অস্তিত্ব রক্ষার আশঙ্কায় নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষের মনসা, বনচণ্ডী, চাষী-দেবতা শিব ও প্রণয়বিলাসী দেবতা শ্রীকৃষ্ণ মাহাত্ম্যকে স্বীকার করে নিল। অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন— ''বহিরাগত আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং বাংলার নিজস্ব অধিবাসীদের অনার্য সংস্কৃতির মধ্যে শতাব্দী ব্যাপী লেনদেন সংমিশ্রণ ইত্যাদি হয়ে থাকলেও তাদের সমবায়ে নবতর সংস্কৃতি ও নবতর জাতীয় জীবন গঠিত হয়েছে একথা বলা চলে না। তারা সংমিশ্রিত হয়েছিল, কিন্তু যেন রাসায়নিক অর্থ মিলিত হয়নি। এমনকি, সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য আদর্শে সমাজ সংগঠনের ব্যাপক প্রচেষ্টা হ'লেও তাতে শুধুমাত্র কাঠামো স্থাপন হয়েছিল, কাঠামোকে বাঁচিয়ে রাখে যে প্রাণ তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। এবার

মুসলমান আক্রমণের আঘাতে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির স্ব স্ব সীমা আপনা থেকেই মুছে যেতে আরম্ভ করে, এবং উভয়ের সংমিশ্রণে গড়া এক নতুন আদর্শ আত্মপ্রকাশ করে। আর্যের প্রজ্ঞাধর্মী জীবনবাদের সঙ্গে অনার্যের বস্তুনিষ্ঠ প্রাণধর্মিতা এসে মিলিত হয়; আর্যের চিন্তা ও মনন অনার্যের সজীব ক্রিয়াশীলতার সঙ্গে যুক্ত হয়। আর এই সমন্বিত রূপের উপর সামগ্রিকভাবে বর্ষিত হলো ইসলামের প্রভাব।"[১৮] অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন— "ইসলামের বিজয়ের আরও একটি অমূল্য অবদান হলো, লৌকিক ভাষা ও সাহিত্যের আবির্ভাব ও বিকাশ। আর এই সাহিত্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনের বিকাশের সূত্রপাত।"[১৯] বৌদ্ধধর্মের মানুষরাও এই সময় হিন্দু সমাজে মিশে যায়।

উচ্চবর্গের ব্রাহ্মণরা সমাজের ভাঙনকে রক্ষার জন্য দুটি কাজ করল— (১) লৌকিক, বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, দেব-দেবীকে ব্রাহ্মণরা মেনে নিল। তার ফলে সৃষ্টি হল মঙ্গলকাব্যের। একই সঙ্গে একই মঙ্গলকাব্যে নিম্নশ্রেণীর অন্ত্যজ ব্যাধদের কথা, অন্য খণ্ডে সমাজে বর্ণপ্রধান বণিকদের কথা বলা হচ্ছে। পুরাণের সূর্য, বিষ্ণু, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীর সঙ্গে মনসা, চণ্ডীর মত অপৌরাণিক দেবতা ও চৈতন্যের মত মানুষ দেবতার বন্দনা গাওয়া হল। পুরাণ দেবদেবীর সঙ্গে লৌকিক দেবদেবী সম্বন্ধ স্থাপন, পুরাণের চরিত্রে লৌকিক স্বভাব ধর্ম সঞ্চালন, এবং দেবতাদের মর্ত্য মাটিতে সাধারণ মানুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ করা তার প্রমাণ দেয়। অন্যদিকে, (২) রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত পুরাণ সংস্কৃত ভাষায় লেখা হত বলে সাধারণ মানুষের কাছে তা পাঠের অযোগ্য ছিল। তার ফলে— "তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।"[২০] সংস্কৃত পুরাণগুলিকে বাংলায় অনুবাদ করে সাধারণ মানুষের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি আস্থা ও মনোসংযোগ পোক্ত করা হল। প্রসঙ্গত, গোপাল হালদারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য— "উচ্চবর্গের ও নিম্নবর্গের এই সংযোগের ও সামাজিক আপোষ-রফার ফলে বাঙ্‌লা সাহিত্য দুইভাবে ঐশ্বর্য লাভ করল : একদিকে বাঙালীর নিজস্ব লৌকিক ধর্ম ও আখ্যায়িকাগুলি (Matter of Bengal) 'মঙ্গলকাব্য' রূপে বিকাশ লাভ করল; অন্যদিকে সর্বভারতীয় সংস্কৃতির ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতির অমর আখ্যায়িকাও (Matter of Sanskrit) বাঙ্‌লায় অনূদিত ও রচিত হতে লাগল।"[২১]

রাজনৈতিক দিক দিয়ে তুর্কী আক্রমণের পর তথা পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বাংলায় সুস্থিত অনুকূল পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, তুর্কী বিজয়ের পর দিল্লীর সুলতান কুতুব উদ্দীনের অধীনস্থ সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী সর্বপ্রথম নদীয়া বিজয়ের মাধ্যমে লক্ষ্মণ সেনের বাংলায় মুসলমান রাজত্বের সূচনা করেন। তিনি গৌড় বা লক্ষণাবতী অধিকার করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন এবং বাংলা দিল্লী সুলতানদের একটি প্রদেশে

পরিণত হয়। দিল্লীর সুলতানরা বাংলার শাসন কার্য পরিচালনার জন্য এক বা একাধিক গভর্ণর নিয়োগ করতেন। দিল্লী থেকে দূরতম স্থানে বাংলা প্রদেশে অবস্থিতি, অনুন্নত ও প্রতিকূল যাতায়াত ব্যবস্থা, জলবায়ু বিশেষ করে দীর্ঘমেয়াদী বর্ষা ঋতু প্রভৃতি কারণে বাংলায় নিয়োজিত গভর্ণররা প্রায়ই বিদ্রোহী হয়ে উঠতেন। যার ফলে নিরবিচ্ছিন্ন দিল্লীর সুলতানী শাসন বাংলায় কখনই দীর্ঘায়িত হয়নি। আবার দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা বা কেন্দ্রীয় শাসন নির্বাচনের ব্যাপারে সৃষ্ট অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং গোলযোগের সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ নিজেদেরকে স্বাধীন শাসক রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন। অবশেষে ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকালে বাংলায় ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ কর্তৃক স্বতন্ত্র স্বাধীন সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, যা সুদীর্ঘ দুই শত বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি (১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দ) শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ বাংলার সিংহাসনে আসীন হন এবং কালক্রমে ১৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলায় একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।

বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হতে থাকে। তার সময় থেকে বাংলায় জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য অনুশীলনের পুনরম্ভের সুস্পষ্ট ফল পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে লক্ষ্য করা যায়। সুকুমার সেনের কথায়— " ... এ দেশে তুর্কী আক্রমণের সময়ে চারটি প্রধান ধর্মমত প্রচলিত ছিল।"[২২] সেই ধর্মমতগুলি হল— (১) দেশীয় প্রাচীন ঐতিহ্যবাহিত গ্রামদেবদেবী পূজা (যার মধ্যে বৈদিক দেবতা আছে, পৌরাণিক দেবতা আছে, বাইরের দেবতা আছে, নতুন পরিগৃহীত দেবতাও আছে); (২) মহাযান বৌদ্ধমতের একটি বিশেষ ও স্থানীয় রূপ; (৩) যোগী মত (যার সঙ্গে শৈবমতের সংস্রব ছিল); এবং পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যমত (যার মধ্যে প্রধান হচ্ছে বিষ্ণু-শিব-চণ্ডী-উপাসনা)।

তুর্কী তথা মুসলমান অধিকারের প্রথম দুই-তিন শতাব্দীর মধ্যে এই চারটি ধর্মমর্তের ধারা মিলে মিশে সাহিত্যে দুটি প্রধান ধারায় পরিণত হয়।

(১) পৌরাণিক; যা অর্বাচীন, নবাগত, নবানীত-শাস্ত্র লব্ধ। এবং

(২) অ-পৌরাণিক; যা প্রাচীন, দেশীয় ঐতিহ্যগত। এই পৌরাণিক সংস্কৃতির ধারক ছিল ব্রাহ্মণরা। আর সাধারণ নিম্নশ্রেণীর মানুষরা ছিল অপৌরাণিক সংস্কৃতির ধারক। তুর্কী আক্রমণে নিম্নশ্রেণীর মানুষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উচ্চশ্রেণীর মানুষরা সমাজে তাদের অধিকার সুদৃঢ় করতে মঙ্গলকাব্যগুলি তাদের দ্বারা চরিত হতে থাকল। উল্লেখযোগ্য যে, এই নবাগত (খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-ত্রয়োদশ) পুরাণগুলির মধ্যে সমাজ-ধর্ম-সংস্কৃতি লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এরূপ পুরাণগুলি হল 'মার্কণ্ডেয়পুরাণ', 'অগ্নিপুরাণ', 'কালিকাপুরাণ', 'দেবীভাগবত', 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' উল্লেখযোগ্য। এই সকল পুরাণে চণ্ডী, কালী, দুর্গার উল্লেখ ছিল। অন্যদিকে, অপৌরাণিক তথা

লৌকিক জগতে মনসা, মঙ্গলচণ্ডী এদেরকে নিয়ে প্রচলিত কাহিনীর সৃষ্টি হল। মধ্যযুগে এই দুটি ধারার মিলন কেবল দেবী মাহাত্ম্য বর্ণনা করা প্রধান উদ্দেশ্য নয়। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির মেল বন্ধন। যে চণ্ডীরূপে মার্কণ্ডেয় পুরাণে পূজিতা, যে আদ্যা শক্তি সৃষ্টির মূল কারণ এবং সাংখ্যে প্রকৃতি বলে অবিহিতা, সেই দেবী আর লৌকিক দেবীরা একত্রিত হয়ে মঙ্গলকাব্যে রূপ লাভ করল। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের মঙ্গলচণ্ডী অস্পৃশ্য ব্যাধ সমাজের দেবী। সে বনে গোধিকা রূপে ব্যাধ কালকেতুকে দেখা দেয় এবং নিজেকে কালকেতু ও ফুল্লরার কাছে পুরুষ-প্রকৃতি রূপে পরিচয় দেয়। বণিক খণ্ডের খুল্লনার আরাধ্যা দেবীও এই দেবী থেকে ভিন্ন এবং সভ্য সমাজে মেয়েদের ব্রতের দেবী। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পুরাণোক্তা মহাদেবী দুর্গা ও চণ্ডীর সঙ্গে এবং মঙ্গলচণ্ডী ও ব্রতের দেবী অভিন্ন রূপে পরিগণিত হয়ে গেছে। এর সঙ্গে মিশে গেছে তন্ত্রের দেবী ভাবনা। কারণ স্বরূপ এই দুই সাংস্কৃতিক সমন্বয়ে গড়ে ওঠে মঙ্গলকাব্যগুলি। মনসামঙ্গল এই ধারার সৃষ্ট প্রথম ফসল, যা পঞ্চদশ শতাব্দীতে জীবনবাদের সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ প্রাণ ধর্মের মিলিত সত্তার বহিঃপ্রকাশ।

মনসামঙ্গল কাব্যের পাশাপাশি ষোড়শ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সৃষ্টি হল। এই কাব্যের দুটি কাহিনী রয়েছে। প্রথমত, কালকেতু ব্যাধের কাহিনী এবং দ্বিতীয়ত, ধনপতি সদাগরের কাহিনী। একটি নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ জীবন নিয়ে এবং অপরটি উচ্চশ্রেণীর বণিক জীবনকে নিয়ে রচিত। তবে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই দুই খণ্ডের একই সঙ্গে সহাবস্থান। যার প্রধান দেবী চণ্ডী। তাকে কখন কালী, কখন আদ্যা বলা হচ্ছে। শিব সেখানে নিষ্ক্রিয়। মানিক দত্ত তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে —

> ‘‘হুহুঙ্কার ছাড়ি ক্রোধে দিঞা করতালি।
> অসুর বুলিঞা শিবের বুকে চড়িলেন কালী।।
> পদ তলে শিবকে দেখি লজ্জা বড় পাল্য।
> দন্তে জিহ্বা ধরি কালী ক্রোধ নিবারিল।।’’[২৩]

কালী এখানে অসুর তথা মানব মনের অশুভ ও অন্যায়কে ধ্বংস করছে। উপরন্তু শিব তার পদতলে শবস্বরূপ তথা মৃত বা নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালী বা চণ্ডী দেবীকে স্বক্রীয়, শক্তিশালী, ক্ষমতাবতী ও অসুর নাশিনী হিসেবে দেখা হয়েছে। কিন্তু সেন যুগেই শিব স্বক্রীয় এবং রাজানুকূল্যে পূজিত। বাঙালীর ইতিহাসকার নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন— ‘‘সেন-বংশের পারিবারিক দেবতা বোধ হয় ছিলেন সদাশিব। বিজয়সেন শিবের আবাহন করিয়াছিলেন শম্ভু নামে, বল্লালসেন করিয়াছেন ধূর্জটি এবং অর্ধনারীশ্বর নামে। লক্ষ্মণসেন এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় লিপিতে নারায়ণের আবাহন করিলেও সদাশিবকে শ্রদ্ধা জানাইতে ভোলেন নাই।’’[২৪] তবে কেন

তুর্কী আক্রমণের পর রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে শিব নিষ্ক্রিয় এবং চণ্ডী সক্রিয়। তার কারণ হতে পারে তুর্কী আক্রমণের পর মানুষ বিপর্যস্ত, পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। সে সময় মানুষের মনোবাঞ্ছায় এমন এক দেবতা তথা শক্তিদেবীর আকাঙ্ক্ষা করেছিল যে কিনা সমস্ত দুরবস্থা, বিপদ দূর করে চলার সঠিক পথ নির্দেশ দিবে। 'দ্বিজমাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত' গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য বলেছেন— ''মর্ত্ত্যবাসী দেবীর কৃপাপ্রার্থী হইলে তিনি তাহাদিগকেও বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া সুখ-সম্পদ্ দান করেন, এই আশার বাণী শুনাইবার জন্য বাঙালী কবি দেবীর এই মর্ত্ত্যলীলা রচনা করিয়াছেন, ইহাই প্রচলিত বিশ্বাস।''[২৫] ব্যাধখণ্ডে অনার্য-দেবতা চণ্ডী নিজের প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতির জন্য যেকোন কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যপ্রধান রাজ্য কলিঙ্গে তার স্থান হল না। এই নিয়ে কলিঙ্গরাজ সুরথের সঙ্গে তার ভক্ত কালকেতুর লড়াই হল। তাতে তার স্থান মিলল সমাজের বাইরে গুজরাটের বনে। তবে যে দেবী নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সমাজের মধ্যে নিজের গণ্ডীকে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াস পেয়েছিল। বণিক খণ্ডে দেখতে পাই ধনপতি বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত ও তার ইষ্ট দেবতা শিব। কিন্তু তার গৃহের দুই স্ত্রী লহনা ও খুল্লনা অনার্য দেবী চণ্ডীর ব্রতদাসী। তার ফলে আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্বটি একই গৃহে বণিক খণ্ডে সুন্দর ও প্রশংসনীয়ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সেই দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পরাজয় লক্ষ্য করা যায়। বণিক খণ্ডে এসে ধনপতি অনার্য দেবীর শরণাপন্ন হল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়— ''বস্তুত সাংসারিক সুখদুঃখ, বিপৎসম্পদের দ্বারা নিজের ইষ্টদেবতার বিচার করিতে গেলে, সেই অনিশ্চয়তার কালে শিবের পূজা টিঁকিতে পারে না। অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার তরঙ্গ যখন চারি দিকে জাগিয়া উঠিয়াছে তখন যে দেবতা ইচ্ছাসংযমের আদর্শ তাঁহাকে সাংসারিক উন্নতির উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দুর্গতি হইলেই মনে হয় আমার নিশ্চেষ্ট দেবতা আমার জন্য কিছুই করিতেছেন না, ভোলানাথ সমস্ত ভুলিয়া বসিয়া আছেন। চণ্ডীর উপাসকেরাই কি সকল দুর্গতি এড়াইয়া উন্নতিলাভ করিতেছিলেন? অবশ্যই নহে। কিন্তু শক্তিকে দেবতা করিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে ভুলাইবার উপায় থাকে। শক্তিপূজক দুর্গতির মধ্যেও শক্তি অনুভব করিয়া ভীত হয়, উন্নতিতেও শক্তি অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। আমারই প্রতি বিশেষ অকৃপা ইহার ভয় যেমন আত্যন্তিক, আমারই প্রতি বিশেষ দয়া ইহার আনন্দও তেমনি অতিশয়। কিন্তু যে দেবতা বলেন 'সুখদুঃখ, দুর্গতিসদ্‌গতি— ও কিছুই নয়, ও কেবল মায়া, ও দিকে দৃক্‌পাত করিয়ো না।' সংসারে তাঁহার উপাসক অল্পই অবশিষ্ট থাকে। সংসার মুখে যাহাই বলুক, মুক্তি চায় না, ধনজনমান চায়। ধনপতির মতো ব্যবসায়ী লোক সংযমী সদাশিবকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিল না; বহুতর নৌকা ডুবিল, ধনপতিকে শেষকালে শিবের উপাসনা ছাড়িয়া শক্তি-উপাসক হইতে হইল।''[২৬] লৌকিক মানুষ তাই শিবকে ত্যাগ করে শক্তিকে গ্রহণ করে। শক্তি, ক্ষমতা যার সীমাহীন, ইচ্ছা-অনিচ্ছা যার নিয়ন্ত্রণহীন, যা মানুষকে যেমন অনায়াসেই

সর্বোচ্চ শিখরে তুলতে সক্ষম, তেমনি খুব সহজেই অতল গহ্বরেও ডুবাতে সক্ষম। যেমন, দেবী চণ্ডী ভক্ত কালকেতুকে ব্যাধ থেকে রাজায় পরিণত করেছে এবং শিবভক্ত ভাঁড়ু দত্ত চরম বিপদে চণ্ডীকে মানতে বাধ্য হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তার প্রমাণ রয়েছে। ভাঁড়ু দত্ত চণ্ডী কর্তৃক বন্যায় প্রাণ বাঁচানোর জন্য বলে —

"জেই দিগে ভাড়ু চাহে সেই দিগে বাণ।
ভাড়ু বলে মহামাএ্রা রাখহ পরাণ।।"[২৭]

এমন এক শক্তির কল্পনার মাধ্যমে তার অপ্রতিহত প্রভাবের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে মানুষ পরিবেশের বিপর্যয় এবং আঘাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে; সেই পরিবেশকে জয়ের চেষ্টা চালিয়েছে।

অন্যদিকে, মধ্যযুগের প্রারম্ভে মানুষ নানা ভাবে শোষিত, অত্যাচারিত হচ্ছিল। তার প্রমাণ পাই আমরা মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' অংশে। এবং গণেশের পুত্র যদু হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে এবং জালালুদ্দিন নাম গ্রহণ করে। সে প্রচণ্ড হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। হিন্দু বৌদ্ধদের মন্দির-মঠ ভেঙে দেওয়ার পরিচয় পাই বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যের শেষ খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে—

"যে হুসেন সাহা সর্ব উড়িয়ার দেশে
দেবমূর্তি ভাঙ্গিলেক দেউশ বিশেষে।।"[২৮]

হুসেন শাহের আমলে বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থা সুস্থির স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না বলে মনে হয়। তাই মানুষ এমন এক দেবীর আশা করেছিল যে কিনা শক্তি রূপিনী, সৃষ্টির আদি, এবং অভয়া বা মাতৃরূপা। শক্তি-কল্পনার মধ্যে মানুষের দুটি সহজাত প্রবৃত্তি কাজ করেছিল সে সময়। একদিকে তার বাঁচার আকূতি, আত্মরক্ষার এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় সংগ্রামের প্রেরণা এবং অন্যদিকে সৃষ্টি ও পালনের আকূতি। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন— "পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার ও ইহার প্রতিবিধানে আত্ম-ও রাষ্ট্র-শক্তির অপ্রাচুর্যের হেতু মানুষ নিজ-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা-ঐশ্বর্যের জন্য অতিমাত্রায় দৈব-শক্তির অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া পড়িল। বিশেষ দেবীর পূজা করিলে অভাব-অনটন, সাংসারিক আধি-ব্যাধি, শত্রুর অভিভব ও উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে এইরূপ একটি বিশ্বাস সার্বজনীন হইয়া উঠিল।"[২৯] আবার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— "বাঙ্গালীর বিশিষ্ট মানসগঠন যখনই সর্বভারতীয় আদর্শ হইতে স্বাতন্ত্র্যে তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তখনই দৈবশক্তিকে মাতৃরূপে পরিকল্পনা করা ইহার স্বভাবধর্ম হইয়া দাঁড়াইল। ... চণ্ডী এই স্বভাবধর্মের অনুকূল ও পরিপোষকরূপে শীঘ্রই বাঙালীর ধর্ম-সংস্কারের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভয়ংকর রূপকে আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার দয়াময়ী অন্নপূর্ণামূর্তি প্রবল হইয়া

উঠিল। বিশেষত ভিখারী, ছন্নছাড়া, আত্মভোলা মহেশ্বরের গৃহিণী ও কার্তিক-গণেশের জননীরূপে তিনি বাঙ্গালী পরিবারের পালনীশক্তির আধার মাতার সঙ্গে অভিন্নরূপে প্রতিভাত হইলেন।''[৩০]
মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা লক্ষ্য করি—

''ক্রোধে কালিকা জে মরায়ে দিল পাও।
বিকট দশন হৈল দশভূজা মাও।।
জিহ্বা হৈল লহ ২ মুখ ঘোরতর।
দেখিতে ২ ঐরি জায়ে যম ঘর।।''[৩১]

দেবীর এই প্রচণ্ড ধ্বংসকারিণী, সংহারকারিণী মূর্তি দেখে কালকেতু ও ফুল্লরা মূর্ছিত হলে—

''প্রাণ পুত্র বলিয়া তুলিআ লৈল কোলে।
শ্যামার কোলে কালকেতু পড়িল নিদ্রাভোলে।।''[৩২]

এরূপ স্বচ্ছন্দ, স্বস্তির আশঙ্কামুক্ত মাতৃরূপিনী দেবীর স্নেহের আশ্রয় কল্পনা করেছিল সমকালীন বঙ্গবাসী। তাই মনে হয়, সামাজিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শক্তিময়ী কালীকে বাঙালী চণ্ডী দেবীর সঙ্গে এক করে উপাসনা করতে শুরু করে। তাই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতে চণ্ডীর স্বরূপে কালীর শক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গত, নীহাররঞ্জন রায়-এর ভাষায় বলা যায়— ''শক্তিধর্মের দিকে বাঙালীর ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ। এ-তথ্য লক্ষণীয় যে, আদিপর্বের শেষের দিক্ হইতেই দুর্গা, কালী ও তারার প্রতিপত্তি বাড়িতেছিল, এবং এই তিন দেবীই যে শক্তির আধার, ঘনায়মান অন্ধকারে ইহারাই যে একমাত্র আশা ও ভরসা এ-বিশ্বাস যেন ক্রমশ বাঙালীচিত্তকে অধিকার করিতেছিল। বস্তুত, এই সময় হইতেই বাঙলায় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সাধনায় তান্ত্রিক শক্তিধর্মের প্রাধান্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ইহাও লক্ষ্য করিবার মত যে, মুসলমানাধিকারের কিছুকাল পরই শক্তিসাধক বাঙালীর অন্যতম বেদ কালিকাপুরাণ রচিত হয় এবং শক্তিময়ী কালী বাঙালীর অন্যতম প্রধান উপাস্যা দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হন। ... বাঙালী ভয়-ভাবনার কিছুটা ঊর্ধ্বে উঠিতে, চিত্তে একটু সাহস ও শক্তি সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই কালীই তাহার চণ্ডী, এবং সমস্ত মধ্যপর্বে চণ্ডীর প্রতাপ দুর্জয়!''[৩৩] তাই বলা যায়, বাঙালী সামাজিক অবস্থার সংকটে পড়ে দুটি পৌরাণিক ও লৌকিক সংস্কৃতির সমন্বয়ে এবং শক্তিরূপিনী, অভয়দাত্রী, মাতৃরূপিনী আশায় মধ্যযুগে ষোড়শ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সৃষ্টি হয়। চণ্ডীমঙ্গল কাবের ধারাটি চৈতন্যত্তোর কালে সৃষ্টি হলেও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই শাখাটি সাহিত্যের জগতে জীবিত ছিল। সেই ধারার আদি কবি মানিক দত্ত। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর কবি। তাঁর সমসাময়িক ও কালানুক্রমিক আবির্ভূত কবিগণ হলেন মুকুন্দ চক্রবর্তী, দ্বিজ কবিচন্দ্র মুকুন্দ, দ্বিজমাধব প্রমুখ। সপ্তদশ শতাব্দীতে দ্বিজরাম দেব ও দ্বিজ হরিরাম প্রভৃতি কবিরা চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এছাড়াও এই ধারা

অষ্টাদশ শতাব্দীর কয়েকজন কবির কলমে জীবিত ছিল; তাঁরা হলেন রামানন্দ যতি, মুকুন্দরাম সেন, কৃষ্ণরাম দাস, জয়নারায়ণ সেন, ভবানীশঙ্কর দাস, অকিঞ্চন চক্রবর্তী, জনার্দন প্রমুখ। মানিক দত্তের প্রায় সমসাময়িক 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী। তাঁর কাব্যের নাম 'অভয়ামঙ্গল'। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্য রচনার সমাপ্তি কাল সম্বন্ধে সুকুমার সেন তাঁর মুদ্রিত 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন— ''কাব্যরচনা-সমাপ্তিকাল ১৫৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে নয়।''[৩৪] তিনি প্রথম চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীকে অত্যন্ত সুকৌশলে, কার্যকারণ সূত্রে ও ঘটনার সংক্ষিপ্ততায় নবরূপ দান করেন। নিজস্ব জীবনাভিজ্ঞতায় চরিত্রকে গড়ে তোলেন বাস্তব সম্মত ভাবে। তিনি মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক গঠনের মধ্যেও নিজস্ব শিল্পবোধে ও কুশলী মৌলিক প্রতিভায় 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য ধারায় সর্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে আছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তী পর দ্বিজ কবিচন্দ্র মুকুন্দ নামে একজন কবির উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর গ্রন্থের নাম 'বাসুলীমঙ্গল'। দ্বিজ তাঁর উপাধি তাঁর পিতামহের নাম দেবরাজ মিশ্র, পিতার নাম বিকর্ত্তন মিশ্র, মাতার নাম হারাবতী, সহোদরের নাম গদাধর মিশ্র ও তিন পুত্র রমানাথ, চন্দ্রশেখর ও সনাতন। তাঁদের বামস্থান বর্ধমান জেলার মঙ্গলঘাট পরগণায় আমুরিয়া গ্রামে। তাঁর কাব্যের রচনা কাল সম্বন্ধে ও তার যাবতীয় তথ্য তুলে ধরেছেন মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়। তিনি তাঁর 'বাসুলীমঙ্গল' কাব্যের রচনা কাল সম্বন্ধে বলেছেন— ''কবিচন্দ্র মুকুন্দের বাসুলীমঙ্গল হইতেই আসিয়া থাকে, তবে দেখা যাইতেছে যে, বাসুলীমঙ্গলের রচনা কাল ১৪৯৯ শকাব্দ বা ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ।''[৩৫] তিনি দ্বিজ কবিচন্দ্র মুকুন্দ, কবিকঙ্কণ নন। দ্বিজ কবিচন্দ্র মুকুন্দের পর দ্বিজমাধব 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্যের নাম 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'। তাঁর কাব্যের রচনাকালজ্ঞাপক চরণটি হল—

''ইন্দু-বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবে গায়ে সারদা চরিত।।''[৩৬]

অর্থাৎ ইন্দু (১), বিন্দু (০), বাণ (৫), ধাতা (১) — 'অঙ্কস্যবামা গতিঃ' অনুসারে ১৫০১ শকাব্দ বা (১৫০১ + ৭৮) ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কাব্যটি রচনা হয়। তাঁর কাব্যটি তান্ত্রিক ধর্মের ছত্রছায়ায় লেখা। তার ফলে কাব্যের গঠন ও চরিত্রে তন্ত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দ্বিজরামদেব দ্বিজ মাধবের অনুসারী কবি। তাঁর কাব্যের নাম 'অভয়ামঙ্গল'। কাব্যটির রচনাকাল সম্বন্ধে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন — ''তবে তাঁহার 'অভয়ামঙ্গল ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত' ...।''[৩৭] তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী এবং সেই অঞ্চলে প্রচলিত চণ্ডীপূজার ঐতিহ্য অনুসরণে কাব্যটি রচনা করেছিলেন। আর দ্বিজ হরিরাম সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের কবি। তিনি মেদিনীপুর জেলার ঘাঁটালের অন্তর্গত চিতুয়া ও বরদাবাটী পরগণার অধিশ্বরের আশ্রয়দাতা ছিলেন। তাঁর কাব্যে মুকুন্দ চক্রবর্তীর

সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। একই প্রভাবে রচিত রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের কবি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে যে কালজ্ঞাপক পংক্তি পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় তাঁর কাব্যের রচনাকাল ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের রচনার (১৭৫২) পর তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তাই মনে হয়, দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারের যে সকল ব্রতকথা লোকসমাজে প্রচলিত ছিল তা কবি মানিক দত্ত সর্বপ্রথম একত্রীভূত করে কাহিনীর রূপ দেন। কাজেই 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যধারার সূচক হিসাবে মানিক দত্তের একটা আলাদা মর্যাদা রয়েছে। সেই মানিক দত্তের কবি পরিচয় পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

তথ্যসূত্র :

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; বিদ্যাপতি ও জয়দেব, বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬১, সংশোধিত দ্বাদশ মুদ্রণ, আশ্বিন, ১৪০১, পৃ. ১৬৭।

২। গোপাল হালদার; বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপ-রেখা, প্রথম খণ্ডঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগ, অরুণা প্রকাশনী, প্রথম অরুণা সংস্করণ, ১৪০১, চতুর্থ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২, পৃ. ৩৭।

৩। অরবিন্দ পোদ্দার; মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত), অক্টোবর, ১৯৫৮, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৪৯।

৪। গোপাল হালদার; বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপ-রেখা, প্রথম খণ্ডঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগ, অরুণা প্রকাশনী, প্রথম অরুণা সংস্করণ, ১৪০১, চতুর্থ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২, পৃ. ৪২।

৫। তদেব।

৬। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৫৩।

৭। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (? — ষোড়শ শতাব্দী), আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯১, অষ্টম মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৭, পৃ. ১০।

৮। গোপাল হালদার; বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপ-রেখা, প্রথম খণ্ডঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগ, অরুণা প্রকাশনী, প্রথম অরুণা সংস্করণ, ১৪০১, চতুর্থ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২, পৃ. ১৩২।

৯। তদেব; পৃ. ১৩৫।

১০। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ১০।

১১। তদেব।

১২। শশিভূষণ দাশগুপ্ত; বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা (বাঙলা-সাহিত্যে গুহ্য সাধনার

ধারা), মর্মানুবাদক, গোপীমোহন সিংহরায়, ভারবি, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪১৮, পৃ. ২২।

১৩। তদেব।

১৪। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (? — ষোড়শ শতাব্দী), আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯১, অষ্টম মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৭, পৃ. ৮০।

১৫। অরবিন্দ পোদ্দার; মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত, অক্টোবর, ১৯৫৮, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৩৮।

১৬। গোপাল হালদার; বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপ-রেখা, প্রথম খণ্ড : প্রাচীন ও মধ্যযুগ, অরুণা প্রকাশনী, প্রথম অরুণা সংস্করণ, ১৪০১, চতুর্থ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২, পৃ. ৪৩।

১৭। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (? — ষোড়শ শতাব্দী), আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯১, অষ্টম মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৭, পৃ. ৮০।

১৮। অরবিন্দ পোদ্দার; মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত, অক্টোবর, ১৯৫৮, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৩৯-৪০।

১৯। তদেব; পৃ. ৩৯।

২০। মাইকেল মধুসূদন দত্ত; কাশীরাম দাস, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, পৃ. ১২৩।

২১। গোপাল হালদার; বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপ-রেখা, প্রথম খণ্ড : প্রাচীন ও মধ্যযুগ, অরুণা প্রকাশনী, প্রথম অরুণা সংস্করণ, ১৪০১, চতুর্থ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২, পৃ. ৪৪।

২২। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (? — ষোড়শ শতাব্দী), আনন্দ পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৭, পৃ. ৭৮।

২৩। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪ পৃ. ২৩।

২৪। নীহাররঞ্জন রায়; বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, ষষ্ঠ সংস্করণ, মাঘ, ১৪১৪, পৃ. ৫৪৯।

২৫। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত; দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫, পৃ. ।

২৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪৪, পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৩৯৩, পৃ. ৪৪১-৪৪২।

২৭। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪ পৃ. ১৩০।

২৮। সুকুমার সেন সম্পাদিত, বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৩, পৃ. ২৪৫।

২৯। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; কবিকঙ্কণ চণ্ডী (প্রথম ভাগ), শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন সংস্করণ, আগষ্ট, ১৯৫২, পুনর্মুদ্রিত, ১৯৯৬, পৃ. ১৩-১৪।

৩০। তদেব; পৃ. ১৫।

৩১। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪ পৃ. ১০৭।

৩২। তদেব; পৃ. ১০৮।

৩৩। নীহাররঞ্জন রায়; বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, ষষ্ঠ সংস্করণ, মাঘ, ১৪১৪, পৃ. ৭২৩।

৩৪। সুকুমার সেন; কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৫, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ. ৪৩।

৩৫। আশুতোষ ভট্টাচার্য; চণ্ডীমঙ্গলের আরও দুই জন কবি, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পত্রিকাধ্যক্ষ শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ও ত্রিদিবনাথ রায়, ৬০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩।

৩৬। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত; দ্বিজমাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫, পৃ.   ।

৩৭। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৪৩৯।

——০০——

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানিক দত্ত : কবি কথা

স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। স্রষ্টার ব্যক্তিগত পরিচয়, ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় সৃষ্টি-প্রতিমা রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে মধ্যযুগের স্রষ্টাদের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি উদ্ঘাটন করা একটু দুরূহ ব্যাপার। তবুও কবিরা স্বীয় কাব্যের মধ্যে নিজেদের পরিচয়-জ্ঞাপক সামান্য কিছু তথ্য রেখে যেতেন। এরূপ অতিসংক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানের কারণ হয়তো সেই সময়ের— (ক) কবির তুলনায় কবির সৃষ্টির প্রতি পাঠক ও শ্রোতাদের প্রবল আগ্রহ ছিল। (খ) ব্যক্তির চেয়ে গোষ্ঠী তথা সমাজের প্রাধান্য অনেক বেশি ছিল। কবি নিজেকে ব্যক্ত করার উৎকণ্ঠা থাকলেও শ্রোতা বা পাঠকের চাহিদার দিকে লক্ষ্য করে তা করে উঠতে পারতেন না। হয়তো এই কারণে মধ্যযুগের কবিরা নিজের আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক কোন গ্রন্থ লিখে যেতে পারেননি। কিন্তু মধ্যযুগের কাব্যগুলি নিয়ে সমকালের কোন কবি-সাহিত্যিক বা কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি তেমন ভাবে সমালোচনা করেননি, যেখানে আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের মত মধ্যযুগের লেখক পরিচিতি উঠে আসবে। যেটুকু বা উঠে এসেছে তা সম্পূর্ণ কবি-পরিচিতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত সীমিত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম রূপকার কানা হরি দত্ত সম্বন্ধে বিজয় গুপ্ত তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যে উল্লেখ এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দ চক্রবর্তী মানিক দত্তের কথা নামমাত্র উল্লেখ ইত্যাদি। তাতে কবি-পরিচয় বলতে যা বোঝায় তা পাওয়া যায় না। তাই কবিদের পরিচয় উদ্ঘাটনে তাঁদের স্বীয় কাব্যেই বিচরণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে মধ্যযুগের কাব্যগুলিতে কবি পরিচয়ের দু'টি আশ্রয়স্থল বেছে নিতে হয়— (এক) গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশ এবং (দুই) পদশেষে ভণিতা অংশ।

প্রসঙ্গত, 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রধান ও মধ্যযুগেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের গ্রন্থোৎপত্তি অংশে নিজের ব্যক্তি পরিচয়ের সঙ্গে মানিক দত্তের ব্যক্তি পরিচয় বিক্ষিপ্ত ভাবে দিয়েছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তীর উল্লেখ থেকে জানতে পারা যায় যে, মানিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার প্রথম কবি। তাঁর উল্লেখ থেকে কবি মানিক দত্তের পরিচয়টুকু নেওয়া যাক্। তিনি তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'দিগ্‌দেবতাবন্দনা' অংশে মানিক দত্তের প্রতি বিনয় প্রকাশ করে বলেছেন—

> ''মানিক দত্তের দাণ্ডা করিএ বিনয়।
> যাহা হৈতে হৈল্যে গীত পথে পরিচয়।।''[১]

কবি মানিক দত্ত তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সকল ভণিতায় নিজের সম্পূর্ণ নাম উল্লেখ

করেছেন। কাব্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে ও প্রসঙ্গক্রমে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় দিয়েছেন তাতে বোঝা যায় তিনি অশিক্ষিত ছিলেন। তিনি কানা ও খোঁড়া, অর্থাৎ প্রতিবন্ধী ছিলেন। দেবী চণ্ডীর কৃপায় তাঁর বিকলাঙ্গ দূর হয়।

"মানিক দত্তের শিরে নাথীকার ঘা।
কানা খোড়া দূর গেল দিব্ব্য হৈল গা।।"[২]

হয়তো পেশায় তিনি গায়েন ছিলেন। কবি দোহার ও তম্বুর বা তানপুরা বাজনার সঙ্গে গ্রাম-গ্রামান্তরে চণ্ডীর গান করতেন। তিনি রঘু ও রাঘব নামক দুই দোহার বা পালিকে নিয়ে কলিঙ্গে চণ্ডীর গান করতে এসেছিলেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তার বর্ণনা এইরূপ—

"তম্বুর বায়ন তথা দিল দরশন।
রঘু রাঘব পালী আইল দুইজন।।
তিন চারি জনে তবে সম্প্রদা করিল।
কলিঙ্গ নগরে দত্ত আসি উত্তরিল।।"[৩]

এই কলিঙ্গ নগরের রাজার কাছে কবি নিজের আত্মপরিচয় দিয়েছেন। সেখানে তিনি 'প্রফুল্লনগর'-এ তাঁর বাসগৃহের কথা বলেছেন। আবার দেবী চণ্ডীর কাছে তার সহচরি পদ্মা কবির বাসস্থান 'ফুলফুল্যানগর'-এর কথা প্রকাশ করেছে। অনেক বিদগ্ধ সমালোচক এই দুটি স্থানের অবস্থান বর্তমান মালদহ শহরে অবস্থিত বলে অনুমান করেছেন। তাই আগে কবির বাসস্থান যে মালদহ জেলায় তা প্রমাণ করব। অতঃপর মালদহ জেলায় প্রফুল্লনগর বা ফুলফুল্যানগরের অবস্থান প্রমাণ করব। সেই জন্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রফুল্লনগর ও ফুলফুল্যানগরের নাম যুক্ত উদ্ধৃতি যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। আমরা সর্বপ্রথম এই সকল সমালোচকের মন্তব্যগুলি তুলে ধরছি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কর্মী ও 'আদ্যের গম্ভীরা'র রচয়িতা হরিদাস পালিত সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় প্রথম কবি মানিক দত্তের পরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন— "মানিক দত্তের চণ্ডী একটু ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক পাঠ করিলে, কবিকে মালদহের লোক বলিয়াই বোধ হয়। পুরাতন মালদহের নিকটবর্ত্তী কোন ধ্বংসপ্রায় প্রাচীন গ্রামদিতে তাঁহার নিবাস ছিল।"[৪]

বিখ্যাত গবেষক-অধ্যাপক ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার সুকুমার সেন (জানুয়ারি, ১৯০০—৩ মার্চ, ১৯৯২) বলেছেন— "কাব্যের পুথি উত্তরবঙ্গের। উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করিয়া মালদহ অঞ্চলে এই পাঁচালী গান এখনও প্রচলিত আছে।"[৫]

বাংলা সাহিত্যের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ব্যাখ্যাকার অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (৩ জুন, ১৯২০—১৬ মে, ২০০৩) বলেছেন — ".... এখনও মালদহে এই কাব্য উৎসব অনুষ্ঠানে গীত বা পঠিত হইয়া থাকে। .... কবি মালদহের অধিবাসী ...।"[৬]

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিষয়ের সমালোচক সনৎকুমার মিত্রের (৩০ জুন, ১৯৩৩?) কথায় — ‘‘এই কাব্যধারার যিনি আদি কবি হিসেবে পরিচিত তাঁর নাম মানিক দত্ত। (আঃ খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দী)। তিনি ছিলেন প্রাচীন গৌড় বা মালদহ জেলার অধিবাসী।’’[৭]

মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯ জানুয়ারি, ১৯০৯—১৯ মার্চ, ১৯৮৪) বলেছেন— ‘‘মানিক দত্তের রচনা পাঠ করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে, তিনি প্রাচীন গৌড় বা মালদহ অঞ্চলের লোক। তাঁহার কাব্য এখনও মালদহ অঞ্চলেই প্রচলিত আছে। তাহাতে যে সমস্ত স্থানের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা সমস্তই মালদহ বা গৌড়ের সন্নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত।’’[৮]

পরবর্তীকালে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সম্পাদক সুনীলকুমার ওঝা বলেছেন— ‘‘মানিক দত্তের ভাষায় যে আঞ্চলিক শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা সাধারণতঃ মালদহ জেলা, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ এবং বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার পশ্চিমাংশে প্রচলিত। ... মানিক দত্ত যে সমাজ পরিবেশে কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন সে সমাজে মুসলমান রাজত্বের ফলে বিশেষতঃ রাজধানী গৌড়ের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে বসবাসহেতু প্রচুর পরিমাণে ইসলামিক শব্দের ব্যবহার ঘটিয়েছে।’’[৯]

অন্যদিকে, ‘গৌড়ের ইতিহাস’ গ্রন্থের রচনাকার রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেছেন— ‘‘মঙ্গলচণ্ডীর একজন কবি মানিক দত্ত গৌড়ের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের লোক ছিলেন; তিনি কাব্যের নায়ককে মোড় গাঁ দিয়া ছেতেভেতের বিল পার করাইয়া গৌড়ে আনিয়াছেন।’’[১০]

ভূদেব চৌধুরীর (৩০ জুলাই, ১৯২৪?) কথায়— ‘‘মানিক দত্তের পুথির সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় অংশ থেকে জানা যায়, তিনি ফুলুয়া নগরের অধিবাসী ছিলেন। অনেকে এই ফুলুয়া মালদহ জেলার বর্তমান ফুলবাড়ি বলে নির্দেশ করে থাকেন। কবির রচনাংশ সমূহ মালদহ জেলা থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়া কাব্যে বর্ণিত অনেক স্থান মালদহ জেলাতেই অবস্থিত।’’[১১] উক্ত সকল সমালোচক কবি মানিক দত্তের বাসস্থান মালদহ জেলার কথা মেনে নিয়েছেন। তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যে সমস্ত স্থান-নাম ও পথ বর্ণনা রয়েছে তার ভিত্তিতে এইসব বক্তব্যের স্পষ্টতা নির্ধারণ করার চেষ্টা রয়েছে।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধনপতি বা বণিক খণ্ডে ধনপতি শারি-শুয়ার জন্য স্বর্ণ পিঞ্জর তৈরী করতে উজানী থেকে গৌড়ের উদ্দেশ্যে স্থলপথে রওনা হয়। প্রসঙ্গত, উজানী নগর বর্ধমান জেলার অন্তর্গত একটি বাণিজ্য-প্রধান স্থান। ধনপতি গৌড় থেকে পিঞ্জর নিয়ে ফেরার পথে বনগ্রাম, সিমলা নগর ও শীতলপুর নামক স্থানের উল্লেখ আছে। বনগ্রাম ও শীতলপুর মালদহের হাবিবপুর থানায় অবস্থিত। মালদহের District Census Hand Book -এ হাবিবপুর থানার অন্তর্গত বনপুর ও শীতলপুর গ্রাম দুটির নাম উল্লেখ রয়েছে— (১) “Adampur, Agra,

Aharail ... Banchhair, Bankail, Bishnupur, **Banpur**, Barail, Basantepur ..."[১২] এবং (২) "Sadapur, Saidpur, Sahapur, Sankail ... **Sitalpur**, Soladang, Srikrishnapur, Sripur..."[১৩]। আর পথ নির্দেশ অনুযায়ী সিমলা নগর মালদহের এই দুই গ্রামের মাঝামাঝি কোন গ্রাম হওয়া সম্ভব। আবার ধনপতি গৌড় থেকে উজানী নগরে ফেরার সময় জলপথে রওনা হয়েছিল। নদীপথের পার্শ্ববর্তী কয়েকটি স্থানের নাম মানিক দত্ত উল্লেখ করেছেন।

''ডাহিন বামের গ্রামে এড়াইল দূর।
খোস বাজার এড়াইল নামে বিষ্ণুপুর।।
সমুখে গৌউড়ি গঙ্গা তাহা হৈল পার।
বাহাদূরপুরে জাএগ্রা কৈল ফলাহার।।
তাহার পশ্চাত চলিল শঙ্খেশ্বর।
দিতীএ মজিলে বাসা কৈল ব্রহ্মপুর।।
তাহার পশ্চাতে চলিল গণকর।
সেখানে বাসা জাএগ্রা রহিল সদাগর।।''[১৪]

যেমন - বিষ্ণুপুর মালদহের রতুয়া থানার অন্তর্গত গ্রাম। মালদহের District Census Hand Book -এ এর পরিচয় রয়েছে— "Ailpara, Alpara, Amarrinha, Andirampara ... Bhaluara, Bihari, Bijra Bhita, Bisal Gokul, **Bishnupur**, Chandi Prasad, Chandipur, Chandpur ..."[১৫]। খোস বাজার সম্ভবত গৌড়ের বাইশ বাজার বলে সন্দেহ করেছেন মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সম্পাদক সুনীলকুমার ওঝা। তিনি বলেছেন— ''খোস বাজার সম্ভবতঃ গৌড়ের বাইশ বাজারেরই একটি হইবে ...।''[১৬] মালদহ জেলার সম্মুখ দিয়ে বয়ে যাওয়া গৌরী গঙ্গা (খুব সম্ভবত গৌড়ের পশ্চিম দিয়ে প্রবাহিত সুপ্রাচীন নদী) ও বাহাদুরপুর ইংলিশ থানার অন্তর্গত গ্রাম। তার পরিচয় পাই মালদহের District Census Hand Book -এ "Abhirampur, Anandamohanpur, Anandipur, Arapur ... Badulyabari, Bagbari, **Bahadurpur**, Balupur, Bara Chak..."[১৭]। এবং সুনীলকুমার ওঝা বলেছেন— ''গৌড়ীগঙ্গা খুব সম্ভব গৌড়ের পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত সুপ্রাচীন নদীটি। ইংলিশবাজার থানায় বাহাদুরপুর নামে একটি মৌজা এখনও আছে— উহা গৌড়ী গঙ্গার নিকটেই। গৌড়ীগঙ্গাকে বর্ত্তমানে লোকে ভাগীরথীই বলিয়া থাকে।''[১৮] ব্রহ্মপুরের বর্তমান নাম বহরমপুর; এটি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত। L.S.S.O' Malley বলেছেন— "The name Berhampore is an English transferation of the vernacular name Bahrampur, the derivation of which is explained as follows by Mr. Beveridge : "Berhampore (Baharampur)

seems to be a corruption of the Hindu name of the place --- Brahmapur, i.e., the city of Brahma."[১৯]। গণকর মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার একটি রেলস্টেশন। সুনীলকুমার ওঝা বলেছেন— "... গণকর এখনও আছে ঐ নামেই ইহা মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমায় অবস্থিত একটি রেলওয়ে স্টেশন।"[২০] মুর্শিদাবাদের District Census Hand Book -এ গণকর স্থানটিকে জঙ্গীপুর মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত দেখানো হয়েছে— "Elaspur, Enayelnagar, Frasernagar, Gadaipur, **Gankar**, Gankar Chak, Ghorsala..."[২১]। কারণ ধনপতির বিবাহের সময় চার রাজ্যে নিমন্ত্রণ পাঠানো হয়। সেই চার রাজ্য হল— উজানী, ইছানী, মঙ্গলকোট ও অবন্তী।

"উজানি ইছানি অবন্তি মঙ্গলকোট
চারিরার্য্যেত গুয়া গেল।"[২২]

মঙ্গলকোট ও উজানী বর্ধমান জেলায় এখনও অবস্থিত। ঐতিহাসিক বিনয় ঘোষ বলেছেন— "উজানি নগরে লক্ষপতি ধনপতি সদাগরের বাস ছিল। এই হল সেই উজানি-নগর, বর্তমান কোগ্রাম যার একাংশ মাত্র। .... বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট থানার অর্ন্তগত উজানি-কোগ্রাম (কোঁগা নামে পরিচিত)।"[২৩] রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বলেছেন— "ঈশানী বাইছানী, উজানি, চাঁপাই— এই সকল বণিক -প্রধান স্থান ছিল। বর্ত্তমান মঙ্গলকোট, কোগ্রাম, নূতনহাট, পুরাতন হাটী প্রভৃতি প্রাচীন উজ্জয়িনী বা উজানীর স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। কোগ্রামের অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে বর্ত্তমান ইছাবর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ প্রাচীন ঈশানী বা ইছানীর অন্তর্গত। চাঁপাই বা চম্পকনগর এখন বর্দ্ধমান জেলার অধীন।"[২৪] অবন্তী হয়তো তারই নিকটবর্তী কোন স্থান। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, ধনপতি গৌড়ের বিষ্ণুপুর থেকে গঙ্গার পাস ফিরে বাহাদুর হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার ব্রহ্মপুর ও গণকর হয়ে বর্ধমানের উজানী নগরে পৌঁছায়।

ধনপতি দ্বিতীয়বার উজানী নগরের রাজা বিক্রমকেশরের অনুরোধে চন্দন আনতে দক্ষিণপাটনে বা সিংহলে যায়। উজানী নগরের ভ্রমরাঘাট থেকে জলপথে তার যাত্রা শুরু হয়। এই যাত্রা পথে যেসকল স্থানের নাম মানিক দত্ত উল্লেখ করেছেন তা হল— অমুয়ামুলুক, কোদালিয়ার ঘাট, নদীয়া শান্তিপুর, ভীমঘাট, কুমারপুর, মগরা, ইন্দ্রানী নগর, সপ্তগ্রাম, কড়িদহ, রত্নমালার ঘাট এবং সবশেষে সিংহল। আম্বুয়ামুলুক ছিল মধ্যযুগের বিখ্যাত শ্রীচৈতন্য সময়ের কাজীর শাসনাধীন অঞ্চল; এটি বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বলেছেন— "সমুদ্রগড়, আম্বুয়ামুলুক (কাল্না), শান্তিপুর, উলা, গুপ্তিপাড়া ও হালিশহরের নাম পাওয়া যায়। চৈতন্যভাগবতে অন্ত্য খণ্ডে আছে, এই স্থান হইতে গঙ্গা শতমুখী হইয়া সাগরুভিমুখী হইয়াছেন। চৈতন্যদেব এখানে অম্বুলিঙ্গনামে শিবমূর্ত্তি দর্শন করেন। এখন ছত্রভোগের নিকট গঙ্গার খাতের কেবল চিহ্নমাত্র

আছে। প্রাচীন বাঙ্গালা বহু গ্রন্থে মগরার খালের নাম পাওয়া যায়। মগরার জলাবর্ত্তে পড়িয়া অনেক সদাগরের বাণিজ্যতরি ডুবিয়া গিয়াছিল। এ মগরা এখনকার রেলওয়ে ষ্টেশন মগরা হইতে ভিন্ন।''[২৫] কুমারপুর মালদহ জেলার ইংলিশবাজার থানার একটি গ্রাম। মালদহের District Census Hand Book -এ রয়েছে— "Jagadispur, Jamalpur, ... Kaltapara, Kamalpur ... Krishnapur, **Kumarpur**, Kutubpur Phulbari..."[২৬]। এছাড়া ইন্দ্রানীনগর বর্ধমান জেলায়, নদীয়ার শান্তিপুরের উল্লেখ রয়েছে। মধ্যযুগের সপ্তগ্রাম, মগরা হুগলী জেলার বিখ্যাত স্থান।

এছাড়াও সওদাগর ধনপতি গৌড়ে আসার সময় মোড়গ্রাম স্নান করে ছেতেভেতে বিল পার হয়—

''রাজার আরতি সদাগর গঠিবারে সুবর্ণ পিঞ্জর
ছাড়ি বান্যা নিজ উজিয়ানি।
মোড়গ্রামে করি স্নান রন্ধন ভোজন গান
ছাতাভাত্যা এড়াইল তথি।।''[২৭]

এবং গৌড় থেকে ফেরার সময় —

''গৌড়েশ্বরী প্রণমিঞা গঙ্গাপুর হইল পার।
গঙ্গাস্নান করিঞা করিল ফলাহার।।''[২৮]

এই মোড়গ্রাম ও ছেতেভেতে বিল মালদহে অবস্থিত। কেন না কবি সম্বন্ধে রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বলেছেন— ''গৌড়ের নিকটবর্ত্তী লোক না হইলে মোড়গ্রাম, ছেতেভেতের বিল ও গৌড়েশ্বরীর নাম জানার সম্ভাবনা ছিল না।''[২৯]

ধনপতি সিংহল রাজের দ্বারা বন্দী হয়। বহু বছর পর শ্রীমন্ত পিতাকে উদ্ধারের জন্য উজানী নগর থেকে একই পথে নৌকায় দক্ষিণ পাটন বা সিংহলে যাত্রা করে। সেই যাত্রাপথের বর্ণনা করেছেন কবি এই ভাবে—

''সপ্তডিঙ্গা মেলিলেন ভোমরার নীরে।
সারি গাইয়া জায় গাভর সকলে।।
ভোমরা লইল সাধু পাছ করিয়া।
শিবাই নদী উদয়গঙ্গা উত্তরিল গিয়া।।
শিবাই নদী লইল সাধু পাছ করিয়া।
গোপ্তগঙ্গা সদাগর উত্তরিল গিয়া।।
গোপ্তগঙ্গা লইল সাধু পাছ করিয়া।
ভীমঘাটা কুমারপুর উত্তরিল গিয়া।।

চেচায় গাভরগণ হাতে লইয়া সাট।
ডাহিনে বগাইচণ্ডী কোদালিয়া ঘাট।।
বামদিকে হালিম শহর ডাহিনে ত্রিবেনী।
জাত্রাকালে কোলাহল কিছুই না শুনি।।
গঙ্গাতীরে সদাগর দিল দরশন।
নৌকা খেওয়াইল করি দুর্গাকে স্মরণ।।
গঙ্গা ভাগরথী সাধু পাছু করিয়া।
নগর ইন্দ্রানী সাধু উত্তরিল গিয়া।।''[৩০]

এবং বলা হয়েছে— ''ধন্য২ নগর ইন্দ্রানী।
গঙ্গার কুলতে গ্রাম ইন্দ্রানী যাহার নাম
কণ্ডার তত্ত্ব সর্ব্বলোকে জানে।।''[৩১]

শ্রীমন্তের যাত্রা পথে স্থান ও নদীগুলির নাম ক্রমান্বয়ে ভ্রমরা নদী, শিবাই নদী, উদয়গঙ্গা, গোপ্তগঙ্গা (সম্ভবত মালদহ জেলার কাঞ্চন শহরের মরাগঙ্গার প্রাচীন নাম), ভীমঘাটা, কুমারপুর (ইংলিশ বাজার থানার একটি গ্রাম), বগাই চণ্ডী, কোদালিয়ার ঘাট (হুগলী জেলার ত্রিবেণীর কাছে কোন একটি অপরিচিত ঘাট) ইত্যাদি। এর প্রমাণ পাই বাংলা দেব-দেবী, সংখ্যাতত্ত্ব, মুসলমান ধর্মের গবেষক ও সংখ্যাতত্ত্বে পদ্মশ্রী প্রাপ্ত যতীন্দ্রমোহন দত্তের (১০ শ্রাবণ, ১৩০১—৭ আশ্বিন, ১৩৮২) কথায় — ''উড়িষ্যার শেষ গজপতি মুকুন্দ হরিনারায়ণ দে ত্রিবেণী অবধি জয় করেন ও ঐখানে একটি ঘাট তৈরী করেন।''[৩২] হালিমশহর, তার ডান দিকে ত্রিবেণী (হুগলী জেলায়), গঙ্গা ভাগীরথী (মালদহের সাদুল্লাপুরের মহাশ্মশানের পাশে মরাগঙ্গা ভাগীরথী নামে প্রবাহিত, তার নাম হয়ত কবি এক সঙ্গে গঙ্গাভাগীরথী বলেছেন) অতিক্রম করে ইন্দ্রানী নগরে পৌঁছায়। ইন্দ্রানী, ধুরাইচুরাই, নদীয়া, সপ্তগ্রাম, গোপ্তপাড়া — এগুলি বর্ধমান, হুগলী ও নদীয়া জেলার প্রখ্যাত স্থানের নাম।

এছাড়া দেবীকে রণচণ্ডী বা দ্বারবাসিনী বলে সম্বোধন করা হয়েছে। দেবীর এরূপ নাম গৌড়ে প্রচলিত। এই কথার সমর্থনে রজনীকান্ত চক্রবর্তীর কথায় বলা যায়— ''অদ্যাপি চণ্ডীপুর গ্রামে রণচণ্ডী বা দ্বারবাসিনী দেবীর মন্দিরের বিশাল ভগ্নস্তূপ পড়িয়া আছে। দ্বারবাসিনী গৌড়ের নিকটবর্ত্তিনী।''[৩৩] এবং হরিদাস পালিত বলেছেন— ''কবির ভাষা ও বর্ষা বর্ণনা মালদহের উপযুক্ত হইয়াছে।

''ঘরে পাছে আইল পানি, ছাল্যা পুল্যা পানি ছেচে
জুলি কাটিএগ থোক পুতি।''

সুতরাং এই প্রকার ভাষা ও বর্ষা-বর্ণনা দেখিয়া মানিক দত্ত যে মালদহের লোক ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারি।''[৩৪]

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বিবাহের লোকাচার থেকেও কবিকে মালদহের বলে প্রমাণ করা যায়। তাঁর কাব্যে হর-গৌরীর বিবাহের সময় মেনকা ও খুল্লনার বিবাহের সময় রম্ভা 'আইয়' গণ নিয়ে প্রতি ঘরে ঘরে জল সাধতে যায়। সকলে আনন্দিত হয়ে জলসাধার গান গায়। মানিক দত্তের কাব্যে এই জলসাধার গানের সঙ্গে মালদহের প্রচলিত জলসাধার গানের হুবহু মিল আছে।

''প্রথমে সাধেন জল ব্রাহ্মণের বাড়ি।
নেহ গুয়া খাও পান দেহ জলের ঝারি।।
তাহা দিয়া সাজে জল কুম্ভকারের বাড়ি।
নেহ গুয়া খাও পান দেহ জলের ঝারি।।
তাহা দিয়া সাধে জল কর্ম্মকারের বাড়ি।
নেহ গুয়া খাও পান দেহ জলের ঝারি।।
তদপরে সাধে জল বণিকের বাড়ি।
নেহ গুয়া খাও পান দেহ জলের ঝারি।।''[৩৫]

এই গানের সঙ্গে ফণী পালের সংগৃহীত মালদহের জলসাধার গানের মিল লক্ষ্য করা যায়।

''সাজিয়া জল সাধেরে
ওরে মোর সালবাসের রানী না রে—
গেলাম ব্রাহ্মণের বাড়ি তারে দিলাম পান শুপারী
শুভক্ষণে ব্রাহ্মণী নিলে জলের ঝারি না রে—
গেলাম কায়স্থের বাড়ি তারে দিলাম পান শুপারী
শুভক্ষণে কায়স্থের মেয়ে নিলে জলের ঝারি না রে
গেলাম মহাজনের বাড়ি তারে দিলাম পান শুপারী
শুভক্ষণে মহাজনের নারী নিলে জলের ঝারি না রে।''[৩৬]

(জল সাধার গান)

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিব ভিক্ষা করতে যায় কোচদের বাড়ি। তার বর্ণনা এরূপ—

''শিব ভ্রমে উজান ভাটী চৌদিকে কোচের বাটী
কোচ বধু ভিক্ষা দিল থালে।''[৩৭]

এই কোচ জাতির সম্বন্ধে কালীপদ লাহিড়ী বলেছেন— ''কোচজাতি গৌড়ের প্রাচীন অধিবাসী। এই জাতি রাইহোরাণী দেবীর বেদী প্রতিষ্ঠা করে। এখানে পূজায় নিবেদিত ছাগ, মহিষ বলি করা

কোচ ভিন্ন অন্য জাতির অধিকার বহির্ভূত।"[৩৮]

সুতরাং আমরা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কবি মানিক দত্ত মালদহ জেলার অধিবাসী ছিলেন। এখন প্রশ্ন হল মালদহ জেলার কোথায় তাঁর বাসভূমি ছিল? কবি কলিঙ্গ রাজের কাছে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেন তাঁর বাড়ি প্রফুল্লনগর।

"রাজা বোলে মানিক দত্ত কোন দেশে ঘর।
দত্ত বোলে আমার বাড়ি প্রফুল্লনগর।।"[৩৯]

আবার কাব্যের 'দেবখণ্ড'এর বোলম অংশে পদ্মা চণ্ডীকে মর্ত্যে তাঁর মাহাত্ম্যগীত প্রচারের জন্য ফুলফুল্যানগরের অধিবাসী কানা খোঁড়া মানিক দত্তের কথা বলেন।

"পদ্মা বোলে শুন মা সর্ব্বমঙ্গল।
মানিক দত্ত কানা খোড়া ফুলফুল্যানগর।।"[৪০]

'প্রফুল্লনগর' বা 'ফুলফুল্যানগর' কোথায় অবস্থিত? অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— "এই ফুলফুল্যানগর আসলে মালদহের 'ফুলবাড়ি' গ্রাম।"[৪১] কাজেই মানিক দত্তের নিবাস ছিল মালদহ জেলার ফুলবাড়ি নগরে। তবে উল্লেখযোগ্য যে, মালদহ জেলায় একাধিক ফুলবাড়ি নামক গ্রামের অস্তিত্ব রয়েছে। সেগুলি হল —

(ক) মালদহ শহরে পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত মহানন্দা তীরবর্তী ফুলবাড়ি।

(খ) এই শহরের ৪/৫ কিমি দক্ষিণে সুস্তানি মোড়ের পূর্বদিকে অবস্থিত ফুলবাড়ি।

(গ) মালদহ শহরের ১০/১২ কিমি পশ্চিমে মালদহ-মানিকচক রাজসড়কের পাশে নঘরিয়া ফুলবাড়ি বা ফুলবাড়িয়া।

(ঘ) সাগর দিঘীর উত্তর-পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত ফুলবাড়ি।

(ঙ) গৌড়ের রাজপ্রসাদের $১^১/_২$—২ কিমি উত্তরে ফুলবাড়ি মৌজা নামাঙ্কিত ফুলবাড়ি।

প্রথম দুটি ফুলবাড়ি মানিক দত্তের বাসস্থান কোনক্রমেই হতে পারে না। কারণ এই দুটি ফুলবাড়ি অত্যধিক অর্বাচীন। অন্যদিকে, কাব্যের আভ্যন্তরীন উপাদানের সঙ্গে এই দুটি গ্রামের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। আর নঘরিয়া ফুলবাড়িতে কবির বাসস্থান বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। কারণ নঘরিয়া কালিমন্দির নদী ভাঙনের ফলে মানুষ নদীরপাশে ফুলবাড়িয়া নামক স্থানে নতুন বসবাস শুরু করে। তাই মনে হয় এই গ্রামটি ৫০০ বছরের পুরনো হতে পারে না।

সুনীলকুমার ওঝা তাঁর মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কমলাবাড়ির পার্শ্ববর্তী সাগর দিঘীর উত্তর-পশ্চিম পাড়ে একটি গ্রামকে কবির জন্মস্থান ফুলবাড়ি বলে মনে করেন। তিনি বলেছেন—

"... মালদহ হইতে প্রায় মাইল চারেক দক্ষিণে জাতীয় সড়ক ধরিয়া গৌড় অভিমুখে চলিতে থাকিলে যদুপুর ফুলবাড়ী নামক একটি জায়গা পড়ে। সেইস্থান হইতে সদুল্লাপুর মহাশ্মশান যাওয়ার রাস্তা আছে। ঐ রাস্তার প্রবেশমুখকে ফুলওয়ারী গেট বলা হয়।... অনুমান করা চলে যে ফুলুয়ানগরের নাম অনুযায়ী ফুলওয়ারী গেট নামকরণ পরবর্তীতে হইয়া থাকিতে পারে এবং মানিক দত্তের মধ্যে যে সব স্থান, দেবস্থান ও নদনদীর নাম পাওয়া যায় সেসব ঐ এলাকার চারিপাশ দিয়াই অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে মানিক দত্ত ফুলওয়ারী গেট হইতে এক মাইল পশ্চিমে যে গ্রাম বা নগর ছিল সেই গ্রামেই বা নগরেই জন্মিয়াছিলেন।"[৪২] আবার ওঝা নিজেই তাঁর বিশ্বাসকে অনুমান নির্ভর বলে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন— "সাগরদিঘীরই উত্তর-পশ্চিম পাড়ে ছিল নাকি ফুলুয়ানগর— অবশ্য ইহা জনপ্রবাদ এবং কোন ঐতিহাসিক সূত্র-এর সমর্থনে মেলেনা।"[৪৩] খান সাহেব মহম্মদ আবিদ আলি খানের 'Memoirs of Gaur and Pandua' গ্রন্থের ৪০ নং পাতায় গৌড়ের ম্যাপে ফুলওয়ারী গেট রয়েছে। মনে হয় এই ফুলওয়ারীর একমাইল পশ্চিমে ফুলবাড়ি নামক নগর ছিল। কিন্তু ঐ ম্যাপে ফুলবাড়ি স্থানটি দক্ষিণ দিকে নির্দেশ করছে।

এখন গৌড়ের অদূরে উত্তরে ফুলবাড়ি মৌজার নামাঙ্কিত ফুলবাড়ি গ্রাম। প্রসঙ্গত গৌড়ের শেষ হিন্দুরাজা লক্ষ্মণ সেন বর্ধিষ্ণু হিন্দুর বসতি অঞ্চলে তাঁর নতুন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। পাশেই ছিল দ্বারবাসিনী চণ্ডীমূর্তির প্রতিষ্ঠা। গৌড়ের ইতিহাসকার রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেছেন— "দেবীর আদি মন্দির গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার পরে স্থানীয় লোক কয়েকখানি ইট, পাথর রাজবাড়ীর কাছে রেখে তাকেই গৌড়েশ্বরীর স্থান জ্ঞানে পূজা করে থাকে।"[৪৪] অর্থাৎ একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী স্থানান্তরিত করার পর কোন এক সময়ে দ্বারবাসিনীর আসল মন্দির গঙ্গার ভাঙনে পড়ে। তবে রয়ে যায় ইট, পাথর-এর গৌড়েশ্বরীর স্থান। কেননা লক্ষ্মণ সেনের পরেই মুসলমান আক্রমণে তারা নতুন করে দেবীর মন্দির তৈরী করতে পারেন নি। আমাদের এইরূপ ধারণার কারণ হল খান সাহেব মহম্মদ আবিদ আলি খান তাঁর বিবরণে দ্বারবাসিনী চণ্ডীকেই গৌড়েশ্বরী বলে উল্লেখ করেছেন— "A further point to be noticed is that at Kamalabari, which is situated a mile to the north-west of the Sagar Dighi, — the great tank which appears to have been the site of one of the earliest Hindu settlements — the Patron Goddess of Gaur, Gaureswari Devi, was still worshipped in Cunningham's time, and a fair held in her honour in the month of June."[৪৫] গৌড়েশ্বরীর প্রায় ১$^{১}/_{২}$ মাইল উত্তরে ফুলবাড়ি মৌজা নামাঙ্কিত পশ্চিম দিক গৌরীগঙ্গা ও বাকি তিনদিক গড় (বাঁধ) দিয়ে ঘেরা। এখানে পাওয়া যায় প্রাচীন

দালানবাড়ির চিহ্ন এবং পাশের টিলাগুলিতে ছড়ানো ছিটানো পাথর রয়েছে, যা পুরনো দিনের ভীতের নির্দেশ করে। খান সাহেব মহম্মদ আবিদ আলি খান এই পুরনো স্থানকেই উত্তর ফুলবাড়ি বলে নির্দেশ করেছেন— "The high land north of the great Sagar Dighi is supposed to have been the commercial town. It was protected on the east by an embankment connecting the Duarbashini Gate with the Phulwari Gate."[৪৬] সুকুমার সেন মহাশয় 'নগর' প্রসঙ্গে বলেছেন— "প্রাচীন কালে নগর বলতে পাথরের বা ইটের তৈরী গৃহ সংবলিত ধনী অথবা রাজার বা দেবতা অধিষ্ঠিত প্রাচীর ঘেরা গ্রামকেই বোঝাত।"[৪৭] 'বাড়ি' শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, "বেড়া দেওয়া অথবা পাঁচিল ঘেরা স্থান।"[৪৮] গৌড়ের অদূরে এই স্থানটির নামকরণে নগর বা বাড়ি শব্দ দুটির প্রাসঙ্গিকতা পাওয়া যায়। এই অর্থে ফুলবাড়ি ধনী বা রাজা অধিষ্ঠিত প্রাচীর ঘেরা গ্রাম। অন্যদিকে স্থানটিকে কবির জন্মস্থান বলে ধরে নিলে কাব্যে বর্ণিত স্থান, দেবস্থান, নদ-নদীগুলি পাশ্ববর্তী অঞ্চলে হয়ে থাকবে। হরিদাস পালিত বলেছেন— "পুরাতন মালদহের নিকটবর্ত্তী কোন ধ্বংসপ্রায় প্রাচীন গ্রামাদিতে তাঁহার নিবাস ছিল। "ফুলুরা নগর" এই স্থানের নিকটে ছিল বলিয়া মনে হয়।"[৪৯] তাই আমাদের মনে হয়, চণ্ডীমঙ্গলের কবি মানিক দত্তের জন্মস্থান ছিল গৌড়ের অদূরে উত্তর ফুলবাড়ি নামক গ্রামে।

অতঃপর মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে আসা যাক। মধ্যযুগের অন্যান্য কবিদের মতো তিনি রচনাকাল-জ্ঞাপক কোন সংকেত কাব্যে প্রকাশ করেন নি। তার ফলে কবির কাব্যের রচনাকাল নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে দুটি মতের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন— মানিক দত্ত চৈতন্য পরবর্তী, আবার কেউ কেউ বলেছেন— মানিক দত্ত চৈতন্য পূর্ববর্তী কালের কবি। প্রথমে যেসকল বিদগ্ধ সমালোচক তাঁকে চৈতন্য পরবর্তী বলতে চান তাঁদের মতগুলি তুলে ধরব।

সুকুমার সেন মহাশয় বলেছেন— "মানিক দত্তের রচনার সব পুথিই অর্বাচীন, কোনটিই অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে লেখা নয়, অধিকাংশ পুথিই নিতান্ত খণ্ডিত এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে লেখা।"[৫০] আশুতোষ ভট্টাচার্য মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চৈতন্যবন্দনা ও কিছু অর্বাচীন শব্দ লক্ষ্য করে বলেছেন— "পুঁথিখানি ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; কারণ, ইহাতে কালকেতুর নগর পত্তন উপলক্ষে 'ফিরিঙ্গি' শব্দেরও উল্লেখ আছে।"[৫১]

উক্ত দুই বিদগ্ধ সমালোচক মূলতঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংরক্ষিত খণ্ডিত ও প্রক্ষিপ্ত পুথির ভিত্তিতে কবি মানিক দত্তকে অষ্টাদশ শতাব্দীর পরবর্তী কবি বলে মন্তব্য করেছেন। একথা স্মরণে রেখে বলতে পারি— প্রক্ষিপ্ত পুথিতে অর্বাচীন শব্দের অনুপ্রবেশ হওয়া স্বাভাবিক। সুনীলকুমার ওঝার সম্পাদিত গ্রন্থে 'চৈতন্য প্রসঙ্গ'কে প্রক্ষিপ্ত বলা

হয়েছে।[৫২] কেবল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পুথিতে চৈতন্য প্রসঙ্গ রয়েছে। উপরন্তু মানিক দত্তের কাব্যে যে আধুনিক 'ফিরিঙ্গী' শব্দের ভিত্তিতে অর্বাচীন বলা হচ্ছে, ঠিক একই যুক্তিতে 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্যকে পাঁচটি বিদেশী শব্দের জন্য আধুনিক কাব্য বলতে হয়।

এবার আমরা এই মতের উল্টো দিকের মতগুলি লিপিবদ্ধ করে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করে আমাদের মত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমরা অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য দিয়ে এই বিষয়ে প্রবেশ করব। তিনি বলেছেন— "তাঁহার পুঁথিতে প্রচুর হস্তক্ষেপ ঘটিলেও কবি যে মুকুন্দরামের পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন (পুঁথিতে চৈতন্যের উল্লেখ থাকিলেও), উপস্থিত ক্ষেত্রে শুধু একটুকুই অনুমিত হইতে পারে।"[৫৩]

সুপণ্ডিত ও সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭—১৯৩৮) বলেছেন— "মানিক দত্ত প্রথম চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা, তিনি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন।"[৫৪]

মধ্যযুগের সুগবেষক ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার গোপাল হালদার (১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯০২—১৯৬২) অনুমান করে বলেছেন— "চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম রচয়িতা ছিলেন মানিক দত্ত; — সম্ভবত মধ্যযুগেরই প্রাক্-চৈতন্য পর্বের লোক।"[৫৫]

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার ভূদেব চৌধুরী মনে করেন যে, মানিক দত্ত মুকুন্দ পূর্ববর্তী কবি। তাঁর কথায়— "মানিক দত্ত যে তার পূর্ববর্তী কালের লেখক, একথা মনে করা যেতে পারে। ... মানিক দত্তকে আলোচ্য চৈতন্য পূর্ব যুগের অন্তর্ভুক্ত করছি।"[৫৬]

মধ্যযুগের সাহিত্যে সুগবেষক ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার দীনেশ চন্দ্র সেন (৩ নভেম্বর, ১৮৬৬ — ২০ নভেম্বর, ১৯৩৯) বলেছেন— "Manick Dutta refers to the flourishing condition of this temple which must have belonged to an age not earlier than the 13th century."[৫৭]

মধ্যযুগের সাহিত্য-গবেষক তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্তের (৭ আগষ্ট, ১৮৯২ — ?) কথায়— "The earliest poet on Mangal Chandi, yet know to us was Manik Datta who flourished probably in the 13th century. If Dwija Janardana flourished in the same century it is probable that his diction was changed by some later poet... The earliest works dedicated to Mangal Chandi were short but they gradually developed at the hands of later writers and become so eleborate that it took eight night to be sung — a fact mentioned in Chaitanya Bhagavata, accounting for the designation of 'A Slamangata' that the poem has since

borne."[৫৮]

অন্যদিকে, মধ্যযুগের সাহিত্য বিষয়ক বিদগ্ধ পণ্ডিত শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৭ মার্চ, ১৯১১— ২১ জুলাই, ১৯৬৪) বলেছেন— "In the Chandi Mangalas of Bengal we find almost a similar conception of Manik Datta, who flourished in or before the fifteenth century."[৫৯]

গৌড়ের ইতিহাসকার রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেছেন— ''মানিক দত্ত মুকুন্দরাম অপেক্ষা প্রাচীন।''[৬০]

এই সকল বিদগ্ধ পণ্ডিতের উক্তিকে সামনে রেখে আমরা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচনাকালের সদুত্তর খুঁজব। প্রথমত, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সূচনা হয়েছে 'সৃষ্টিতত্ত্ব' দিয়ে। ঠিক অনুরূপ রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' কাব্যটিও। উভয়ের কাব্যে হুবহু মিল রয়েছে। হরিদাস পালিত বলেছেন— ''সেই পূর্ব্বকালে মালদহে যে শূন্যপুরাণীয় বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়াছিল; তাহার নিদর্শন এদেশের প্রাচীন পুথি।''[৬১] ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' কাব্যে রচনা কাল সম্বন্ধে বলা হয়েছে— ''শূন্যপুরাণের অভ্যন্তর সামাজিক অবস্থা বিচারে একে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনা বলতে হয়, কিন্তু অন্যান্য যাবতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, এবং সর্বোপরি ভাষাতত্ত্বের বিচারে এর রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর ওদিকে যেতেই পারে না।''[৬২] এই কথার আলোকে আমরা বলতে পারি মানিক দত্তের রচনাও ষোড়শ শতাব্দীর পরে নয়।

দ্বিতীয়ত, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পাঠ করে মনে হয় তাঁর কাব্যটি সমকালীন পাঠক বা শ্রোতাদের কাছে প্রথম শোনা। কেননা কবি চণ্ডীমঙ্গল ধারার প্রথম কবি এবং তাঁর কাব্যের ঘটনা সম্বন্ধে প্রথমে শ্রোতারা ছিল অজ্ঞাত। সকলের কাছে ছিল তা অদ্ভুত। গায়েন মানিক দত্ত যখন চণ্ডীর গীত কলিঙ্গ নগরে প্রচার করছেন তখন সকল রাজা-প্রজার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল।

> ''মানিক দত্ত করি নাম বিদিত সংসারে।
> শ্রবনে শুনিলাঙ মাত্র অদ্ভুত গান করে।।
> অদ্ভুত পুঁথি পড়ে অনেক গায় গীত।
> লোকের গেল কর্ম্মকার্জ্য মোহিলেক চিত।।''[৬৩]

এবং কবি বলেছেন—

> ''কার না লয় অর্থ কার না লয় ধন।
> গীতে মোহিত হৈল সর্ব্বলোকের মন।।

ভাঙ্গিয়া আইসে প্রজা নাহি পায় স্থান।

পঞ্চম আলাপিয়া অদ্ভুত করে গান।।''[৬৪]

কলিঙ্গের সকল প্রজা এই গান শুনতে ব্যস্ত। এই বর্ণনা বৃন্দাবন দাসের রচিত 'চৈতণ্যভাগবত'-এ দুটি চরণ স্মরণ করিয়ে দেয়।

''কৃষ্ণনামভক্তিশূন্য সকল সংসার।

প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার।।

ধর্মকর্ম লোকে সবে এই মাত্র জানে।

মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।।''[৬৫]

তাই মনে হয়, চৈতন্যভাগবত রচনার প্রাক্কালে বাংলায় চণ্ডীমঙ্গল গীতের জাগরণ পালা শোনার ব্যাপক প্রচলন ছিল। সুকুমার সেনের কথায় — ''চৈতন্যভাগবত ১৪৫৭ শকাব্দে অর্থাৎ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের বছর দুইয়ের মধ্যেই রচিত হইয়াছিল বলা যায়।''[৬৬] তাহলে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল চৈতন্যভাগবত রচনাকালের আগে রচনা হওয়া সম্ভব।

তৃতীয়ত, 'আখেটিক খণ্ডে' কালকেতু বনে পশু শিকার করতে না পেরে 'রাম নাম' গান করতে থাকে। তা শুনে হরিণীর অবস্থা এরূপ—

''পঞ্চম আলাপিআ রাম নাম গান করে

হরিনি মঙ্গল শুনে।।''[৬৭]

কালকেতু তখন হরিণীকে দেখতে পেয়ে তাকে শরবর্ষণ করে। মারা যাওয়ার প্রাক্কালে হরিণী রাম নাম শুনে প্রাণ যাওয়ার অভিলাষ প্রকাশ করে। রাম বাঙালীর কাছে দেবতা বা আইডিয়াল চরিত্রে পরিণত হয়েছিল। আর হরিণী এখানে পশু নয়; আপামর বাঙালীর প্রতিভূ।

''তিলেক বিশ্রাম করি রাম নাম গান করো

শুনিতে জাওক পরাণ।।''[৬৮]

এই রাম নাম ব্যাপক প্রচার লাভ করে বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ বাংলায় কৃত্তিবাস অনুবাদ করার পর। তাই মানিক দত্ত চণ্ডীর কাঁচুলি নির্মাণের বর্ণনায় বলেছেন—

''ধ্যানে জানিল জদি বিনতা নন্দন।

গরুড়ে আসিয়া মৎস্য করিল ভক্ষণ।।

ইতিহাস গীত গাইতে ব্যাজ অনেক হয়ে।

সে গীত রচিয়া গাইছেন কীত্তিবাস মহাশয়ে।।''[৬৯]

কৃত্তিবাসের রামায়ণের সম্পাদক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এর রচনাকাল সম্পর্কে বলেছেন— ''কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনাকাল ১৩৪০ শকাব্দা বলিয়া অনুমিত হয়।''[৭০] প্রসঙ্গত সুকুমার সেন

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের ভূমিকায় সমকালের শাসক শ্রেণীর রামকথা শোনার প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করে একটি উদাহরণ তুলে ধরেন। তা এরূপ— "রামকথা শুনিতে মুসলমানদের প্রবল আগ্রহ ছিল :

যেন পিতা হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে
নির্ভয়ে শুনিলে তাহা কান্দয়ে যবনে।
যবনেও যার কীর্তি শ্রদ্ধা করি শুনে
ভজো হেন রাঘবেন্দ্র প্রভুর চরণে।"[৭১]

তাই মনে হয়, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য এরূপ আবহাওয়ায় রচিত হয়ে থাকবে।

চতুর্থত, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেবখণ্ডে শিবের বিবাহে গঙ্গার রন্ধন প্রসঙ্গ মনসামঙ্গল কাব্যের প্রাচীন কবি বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসাবিজয়' কাব্যের অনুরূপ। বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে সুকুমার সেন বলেছেন "১৪১৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৯৫-৯৬ অব্দে এই কাব্য লেখা হইল।"[৭২] মনসামঙ্গল কাব্যের পর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সাহিত্যাঙ্গনে ভূমিষ্ঠ হয়।

পঞ্চমত, ধনপতির সিংহল রাজ শালবান কর্তৃক বন্দী হলে আক্ষেপ করে যে কথাটি বলে তাতে চৈতন্যের (১৪৮৬ — ১৫৩৩) প্রেমনাম লিখিত পোষকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ধনপতি বলে—

"জোগী বা সন্ন্যাসী হৈব　　　প্রেমের কেথা গলে দিব
মাগি খাইতে জাব উজয়ানি।।"[৭৩]

দ্বিজমাধবের মঙ্গলচণ্ডী কাব্যের সম্পাদক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য বলেছেন— "মুকুন্দরাম মানিক দত্ত নামে জনৈক কবিকে চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মানিক দত্তের প্রদর্শিত পথেই মুকুন্দরাম অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই উভয় কাহিনীই মানিক দত্তের কাব্যে স্থানলাভ না করিলে মুকুন্দরাম কর্ত্তৃক অনুকরণের এই স্বীকৃতি নিরর্থক হইয়া পড়ে।"[৭৪] যদিও সুকুমার সেন মুকুন্দ চক্রবর্তীর রচনাকাল সম্বন্ধে বলেছেন— "... কাব্যরচনা-সমাপ্তিকাল ১৫৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে নয়।"[৭৫] এছাড়া মুকুন্দ চক্রবর্তী নিজেই তাঁর কাব্য সম্বন্ধে বলেছেন—

"রাত্রি দিবা তুয়া সেবি　　　রচিল মুকুন্দ কবি
নৌতন মঙ্গল অভিলাষে।"[৭৬]

'নৌতন' তখনই বলা হয় যখন তাঁর কাছে পুরাতন কিছু থাকে। তাই মনে হয় মানিক দত্তের কাব্য তাঁর কাছে পুরাতন বলে মনে হয়েছে। এ সম্পর্কে সুকুমার সেন-এর মন্তব্য প্রযোজ্য— "মুকুন্দ তাঁহার রচনাকে বার বার বলিয়াছেন "নৌতন মঙ্গল" অর্থাৎ নূতন পাঞ্চালী কাব্য। ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে। এক, প্রথম রচিত চণ্ডীমঙ্গল; দুই, নূতন ধরনের চণ্ডীমঙ্গল। মুকুন্দই যে চণ্ডীর

মাহাত্ম্য বর্ণিবার জন্য সর্বপ্রথম কালকেতু-ধনপতির কাহিনী অবলম্বন করিয়াছিলেন এমন কথা বলিবার পক্ষে একটু বাধার মতো আছে। একটি পুথিতে নাকি পূর্বগামী লেখক মানিক দত্তের উল্লেখ আছে। পাঠটি এই,

মানিক-দত্তের দাণ্ডা করিয়ে প্রকাশ

এখানে "মানিক দত্তের দাণ্ডার" অর্থ আসলে কিন্তু মানিক দত্ত সম্পর্কিত কাহিনী।"[৭৭] যেমন ভাবে ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যকে 'নূতন মঙ্গল' বলেছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তী ও ভারতচন্দ্র মৌখিক উপাদানকে তাঁদের প্রতিভা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিল্পরূপ দিয়েছেন। একথা বলতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন— "... যে বিষয়ে কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা একটা লিখিত আদর্শও লাভ করিয়াছিল। যেমন মুকুন্দরামের আদর্শ ছিল মানিক দত্ত এবং ভারতচন্দ্রেরও আদর্শ ছিল মুকুন্দরাম।"[৭৮] তাই মনে হয়, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি ১৪৯৫ — ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কোন এক সময়ের লেখা হয়ে থাকবে।

তবে মানিক দত্তের জন্মকাল সম্পর্কে কোন হদিস বা তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর গোত্র বা বর্ণ সম্বন্ধে তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। তাঁর চণ্ডীর গীতের প্রতি ভক্তি ছিল। সেই ভক্তির জোয়ারে তিনি চণ্ডীমঙ্গল গীত করতে বেরিয়ে পড়েন। তিনি সুকবি না হলেও গায়েন ও ভক্ত কবি বটে। এই প্রকৃতির এবং চণ্ডীমঙ্গল ধারার প্রথম কবি মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী কীভাবে গ্রন্থিত হয়েছে তা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

তথ্যসূত্র :

১। পঞ্চানন মণ্ডল ভূমিকা ও সম্পাদনা; চণ্ডীমঙ্গল মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত, ভারবি, পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৩৯৯, পৃ. ৫।

২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩৪।

৩। তদেব, পৃ. ৩৫।

৪। হরিদাস পালিত; গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী-গীতে বৌদ্ধভাব, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা (ত্রৈমাসিক), সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু, ১৭ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩১৭, পৃ. ২৪৮।

৫। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (? — ষোড়শ শতাব্দী), আনন্দ, অষ্টম মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৭, পৃ. ৪৫৭।

৬। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড : চৈতন্যযুগ (খ্রীষ্টীয় ১৪৯৩-১৬০৫ অব্দ), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১০-২০১১, পৃ. ৯১।

৭। সনৎকুমার মিত্র; পশ্চিমবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি বিচিত্রা, বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ, স্নানযাত্রা, আষাঢ়, ১৩৮২, পৃ. ১৮৬।

৮। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৩৮৪।

৯। সুনীলকুমার ওঝা; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৫৩।

১০। রজনীকান্ত চক্রবর্তী; গৌড়ের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), সম্পাদক মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ২৭৭।

১১। ভূদেব চৌধুরী; বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়), দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০০২, পৃ. ২০১।

১২। B. Ray (Edit); Alphabetical list of villages and towns, District Census Hand Book, Malda, 1961, p. 277.

১৩। Id; p. 279.

১৪। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৪১।

১৫। B. Ray (Edit); Alphabetical list of villages and towns, District Census Hand Book, Malda, 1961, p. 291.

১৬। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; ভূমিকা, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৪৮।

১৭। B. Ray (Edit); Alphabetical list of villages and towns, District Census Hand Book, Malda, 1961, p. 253.

১৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; ভূমিকা, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৪৮।

১৯। L.S.S.O' Malley; Bengal District Gazetteers Mursidabad, Government of West Bengal, First Reprint, May, 1997, P. 207.

২০। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; ভূমিকা, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৪৮-৪৯।

২১। Bhaskar Ghose (Edit); Alphabetical list of villages and towns, District Census Hand Book, Murshidabad, 1971, p. 6.

২২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২০৭।

২৩। বিনয় ঘোষ; পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পুস্তক প্রকাশক, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৫৭, পৃ. ২৬৫।

২৪। রজনীকান্ত চক্রবর্তী; গৌড়ের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), সম্পাদক মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃ. ১৩৪।

২৫। তদেব; পৃ. ৩১১।

২৬। B. Ray (Edit); Alphabetical list of villages and towns, District Census Hand Book, Malda, 1961, p. 253.

২৭। রজনীকান্ত চক্রবর্তী; মানিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রথম সংখ্যা, একাদশ ভাগ, ১৩১১, পৃ. ৩৪।

২৮। তদেব।

২৯। তদেব।

৩০। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৯৮।

৩১। তদেব।

৩২। যতীন্দ্রমোহন দত্ত; কালকেতুর উপাখ্যান কবিকল্পনা না জনশ্রুতির অনুসরণ?, রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, সম্পাদক রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, ষষ্ঠ বর্ষ, মাঘ, ১৩৭৪, পৃ. ২১।

৩৩। রজনীকান্ত চক্রবর্তী; মানিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রথম সংখ্যা, একাদশ ভাগ, ১৩১১, পৃ. ৩৪।

৩৪। হরিদাস পালিত; গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী গীতে বৌদ্ধভাব, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা (ত্রৈমাসিক), সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু, ১৭ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩১৭, পৃ. ২৪৯।

৩৫। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ.২০৭।

৩৬। ফণী পাল; প্রান্তিক মালদহ জেলার কতিপয় বিয়ের গান, উত্তরবঙ্গের লোকগান, সম্পাদক রতন বিশ্বাস, বইওয়ালা, প্রথম প্রকাশ, ১ বৈশাখ, ১৪১৬, পৃ. ২২৬।

৩৭। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৪৬।

৩৮। কালীপদ লাহিড়ী; গৌড় ও পাণ্ডুয়া, মালদহ সমবায় মুদ্রণী লি:, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৬৮, পৃ. ৪৩।

৩৯। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩৬।

৪০। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩৩।

৪১। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ৩য় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ - ২০০৮-০৯, পৃ. ১৪১।

৪২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৪৬।

৪৩। তদেব।

৪৪। রজনীকান্ত চক্রবর্তী; গৌড়ের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, ১ম সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯,পৃ. ১২৫।

৪৫। M. Abid Ali Khan; Memoirs of Gaur and Pandua, Bengal Secretariat Book Depot, Writer's Buildings, Kolkata, 25 Oct., 1924, P. 41.

৪৬। Id.; P. 42.

৪৭। সুকুমার সেন; বাংলা স্থান-নাম, আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ, ১৪০০, পৃ. ২০।

৪৮। তদেব, পৃ. ২১।

৪৯। হরিদাস পালিত; গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী-গীতে বৌদ্ধভাব, সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা (ত্রৈমাসিক), সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু, ১৭ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩১৭, পৃ. ২৪৮।

৫০। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, (? — ষোড়শ শতাব্দী), আনন্দ, অষ্টম মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৭, পৃ. ৪৪৯।

৫১। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৩৮০।

৫২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; ভূমিকা, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৫৭।

৫৩। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, চৈতন্যযুগ (খ্রী: ১৪৯৩-১৬০৫ অব্দ), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ, ২০১০-২০১১, পৃ. ৯১।

৫৪। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; কবি মুকুন্দরাম বিরচিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী (চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী), প্রথম ভাগ, সম্পাদক তরুণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যলোক, সাহিত্যলোক সংস্করণ, আশ্বিন, ১৪০৭, পৃ. ১৭৬।

৫৫। গোপাল হালদার; বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপ-রেখা, প্রথম খণ্ড : প্রাচীন ও মধ্যযুগ, অরুণা প্রকাশনী, চতুর্থ

মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২, পৃ. ১১৩।

৫৬। ভূদেব চৌধুরী; বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়), দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০০২, পৃ. ২০০-২০১।

৫৭। Dinesh Chandra Sen; History of Bengali Language and Literature, Gian Publishing House, Delhi, First Reprint, 1986, p. 334.

৫৮। Tamonash Chandra Das Gupta; Mukundaram and other poets of the Chandi-Cult, studies old Bengali Literature, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৮, পৃ. ২৯।

৫৯। Shashibhusan Das Gupta; Obscure Riligious Cults, Firma KLM Private Limited, Calcutta, Reprint, 1995, p. 318.

৬০। রজনীকান্ত চক্রবর্তী; মানিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রথম সংখ্যা, একাদশ ভাগ, ১৩১১, পৃ. ৩৫।

৬১। হরিদাস পালিত; গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী-গীতে বৌদ্ধভাব, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা (ত্রৈমাসিক), সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু, ১৭ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩১৭, পৃ. ২৫৩।

৬২। ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত; রামাইপণ্ডিত বিরচিত শূন্যপুরাণ, ফার্মা কে.এল.এম প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৭, পৃ. ১৩-১৪।

৬৩। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩৬।

৬৪। তদেব; পৃ. ৩৫।

৬৫। সুকুমার সেন সম্পাদিত; আদিখণ্ড, চৈতন্যভাগবত (দ্বিতীয় অধ্যায়), বৃন্দাবন দাস বিরচিত, সাহিত্য অকাদেমি, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৩, পৃ. ৬।

৬৬। তবেদ; পৃ. ৩।

৬৭। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৬৯।

৬৮। তদেব; পৃ. ৭০।

৬৯। তদেব; পৃ. ৮৫।

৭০। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভূমিকা সম্বলিত; রামায়ণ, কৃত্তিবাস বিরচিত, সাহিত্য সংসদ, পুনর্মুদ্রণ, জুন ১৯৮৩, পৃ. ।

৭১। সুকুমার সেন সম্পাদিত; ভূমিকা, চৈতন্যভাগবত, বৃন্দাবন দাস বিরচিত, সাহিত্য অকাদেমি, তৃতীয়

মুদ্রণ, ২০০৩, পৃ. ৭।

৭২। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (? — ষোড়শ শতাব্দী), আনন্দ, অষ্টম মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৭, পৃ. ১৬১।

৭৩। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৭৮।

৭৪। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত; দ্বিজমাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫২, পৃ. ।

৭৫। সুকুমার সেন সম্পাদিত; ভূমিকা, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ. ৪৩।

৭৬। তদেব; পৃ. ৪০।

৭৭। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, (? — ষোড়শ শতাব্দী), আনন্দ, অষ্টম মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৭, পৃ. ৪৪৫।

৭৮। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ১০৯।

——০০——

তৃতীয় অধ্যায়

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল : কাহিনী গ্রন্থনারীতি

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মানুষের গল্প বলা ও শোনার প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল। সেই গল্পে ঘটনার মালা গেঁথে কোন এক বা একাধিক চরিত্র কিংবা অভিব্যঞ্জনাকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হত। যেকোন আখ্যানের গঠন প্রক্রিয়ায় 'এরপর কী হল' এই কৌতূহলটা প্রধান থাকে, নতুবা 'কেন এমন হল' এই জিজ্ঞাসাটাই গুরুত্ব পায়। আখ্যানের গঠন প্রক্রিয়ায় এই দুই রীতি নির্মাণতত্ত্বের গোড়ার কথা। প্রাগৈতিহাসিক কালের মানুষের গল্পে ঘটনার ক্রমান্বয়িক সজ্জাটাই সম্ভবত গুরুত্ব পেয়েছিল। অন্যদিকে, পরবর্তীকালের মানুষের গল্পে এসেছে মননের সূক্ষ্মতা। মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিও এরূপ আখ্যানধর্মী ও বর্ণনাত্মক। এ ধরনের কাব্যে কবিকে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির তুলনায় বিষয় ও সমাজকে বেশি প্রাধান্য দিতে হত। সেখানে একটি উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করে কাহিনী গ্রন্থন করা হত। কাহিনী গ্রন্থনায় আধুনিক কবিদের মত মধ্যযুগের কবিদের স্বাধীনতা ছিল না। সমাজ ও ধর্মগোষ্ঠীর চাপ কাহিনী গ্রন্থনার ক্ষেত্রে কবিদের প্রভাবিত করত। ফলে একটি প্রথাগত Form-কে কেন্দ্র করে তাঁরা কাব্যের মূল উদ্দেশ্যকে পরিণতি দিতেন। মধ্যযুগের কাব্যে সেই উদ্দেশ্য হল দেব-দেবীর পূজা প্রচার। এই উদ্দেশ্যকে উপস্থাপনের জন্য কবিরা কাহিনী গ্রন্থনায় কতগুলি বিষয় বা ঘটনাকে তুলে ধরতেন। আবার সেই ঘটনাগুলিকে চরিত্র দ্বারা গতিশীল করে তোলা হত। কবি ঘটনা ও চরিত্র সমন্বিত তাঁর কাহিনীকে শিল্প সম্মত রূপ দান করে থাকেন। প্রসঙ্গত, অ্যারিস্টটল চরিত্রের তুলনায় কাহিনী গ্রন্থনা বা প্লট (Plot)-কেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন— ".... to inquire into the structure of the plot as requisite to a good poem."[১] কাহিনী ঘটনা-সংস্থানানুযায়ী বিবৃত হয় এবং চরিত্র তার প্রধান উপাদান। কাহিনীকে গড়ে তোলা হয় বাস্তব সম্মত করে। তাতে কবির ঘটনা বর্ণনার কৌশল ও রীতি পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলি অলৌকিক দেবদেবীর কাহিনী নিয়ে রচিত। সেই দেবদেবীকে প্রতিষ্ঠা করতে যে কাহিনীগুলি মঙ্গলকাব্যে ভীড় করে তা জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সম্বন্ধে যা বলেছেন তা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী গ্রন্থনার ক্ষেত্রে যোগসূত্র পাওয়া যেতে পারে— "এই শ্রেণীর প্রধান কাব্য মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'তে স্ফুটোজ্জ্বল বাস্তব-চিত্রে, দক্ষ চরিত্রাঙ্কনে, কুশল ঘটনাসন্নিবেশে ও সর্বোপরি, আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্বন্ধ স্থাপনে, আমরা ভবিষ্যৎকালে উপন্যাসের বেশ সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পাইয়া থাকি। ... দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এযুগে জন্মগ্রহণ

করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয় মাত্র নেই।"[২] তিনি উপন্যাসের অন্যতম উপাদান প্লটকে বেশি খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। বস্তুতঃ অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসের প্লটকে মধ্যযুগের প্লট বা কাহিনী গ্রন্থনায় প্রয়োগ করেছেন। আমরাও মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী গ্রন্থনার ক্ষেত্রে নাটকের কাহিনী গ্রন্থনার তুলনায় উপন্যাসের কাহিনীর রীতিকে বেশি গুরুত্ব দেব।

বস্তুতঃ কাহিনী গ্রন্থনা বা প্লটের ক্ষেত্রে কয়েকটি পরিভাষা সচরাচর পরিলক্ষিত হয়। যেমন— গল্প বা কাহিনী (story), ঘটনা (action/envent) ও বিষয় (theme) প্রভৃতি। এদের সমন্বয়ে প্লট গঠিত। প্লট সম্বন্ধে J.A. Cuddon বলেছেন— "The plan, design, scheme or pattern of envents in a play, poem or work of fiction; and, further, the organization of incident and Character in such a way as to induce curiosity and suspense (q.v.) in the spectator or reader."[৩] কিন্তু অ্যারিস্টট্‌ল নাটকের ট্র্যাজিডির প্লট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, প্লটে (১) সমগ্র ও সম্পূর্ণ কাহিনী থাকবে এবং তা হবে সম্ভাব্যতা ও আবশ্যকীয়তা নীতি মেনে ঘটনার পারম্পর্য বর্ণনা। তাঁর কথায়— "A whole is that which has a beginning, a middle, and an end. ... that the sequence of events, according to the law of probability or necessity, will admit of a change from bad fortune to good, or from good fortune to bad."[৪] (২) সমগ্র কাহিনীর মধ্যে ঐক্য থাকবে যা অনিবার্যভাবে গ্রথিত, একটু অংশ বাদ দিলে যেন তার সমগ্রতা কাহিনী থেকে অসংলগ্ন হয়ে যায়। এই সম্পর্কে অ্যারিস্টটল বলেছেন— "Unity of plot does not, as some persons thinks, consist in the unity of the hero. For infinitely various are the incidents in one man's life ... so the plot, being an imitation of an action, must imitate one action and that a whole, the structural union of the parts being such that, if any one of them is displaced or removed, the whole will be disjointed and disturbed. For a thing whose presence or absence makes no visible difference, is not an organic part of the whole."[৫] (৩) বিষয়বস্তু হবে একক, সম্পূর্ণ, অখণ্ড এবং আদি-মধ্য ও অন্ত্য সমন্বিত। তিনি বলেছেন — "It should have for its subject a single action, whole and complete, with a beginning, a middle, and an end."[৬] অর্থাৎ ঘটনার বিন্যাস প্রক্রিয়াকে সাধারণত কাহিনী গ্রন্থনা বলে। কাহিনী কতগুলি ঘটনার হাত ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সেই ঘটনাগুলির যোগসূত্র কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে থাকে। ঘটনার পারম্পর্যের প্রতি পাঠকের আকর্ষণ বা কৌতূহল থাকে। গল্পের

ক্ষেত্রেও এই কৌতূহল লক্ষ্য করা যায়। তবে গল্প প্লটের মত কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ ঘটনার সমষ্টি নয়। E.M. Forster গল্প ও প্লটের মধ্যে পার্থক্য করে বলেছেন— "We have defined a story as a narrative of events arranged in their time-sequence. A plot is also a narrative of events, the emphasis falling on causality."[৭] প্রসঙ্গত তিনি সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়েছেন— " 'The king died and then the queen died,' is a story. 'The king died, and then the queen died of grief,' is a plot. The time-sequence is preserved, but the sense of causality overshadows it. Or again : 'The queen died, no one knew why, until it was discovered that it was through grief at the death of the king.' This is a plot with a mystery in it, a form capable of high development. It suspends the time-sequence, it moves as far away from the story as its limitations will allow. Consider the death of the queen. If it is in a story we say 'and then?' If it is a plot we ask 'why?' "[৮] গল্পের দাবি কালানুক্রমে সাজানো ঘটনা স্রোতের প্রতি কৌতূহলটুকুর উপর। কিন্তু প্লটের দাবি শ্রোতার বুদ্ধির (Intelligence of memory) কাছে এবং ঘটনার সঙ্গে ঘটনার কার্যকারণগত যোগটি মনে রাখার সামর্থ্যের উপর। তবে অহেতুক ঘটনাকে রহস্যের দ্যোতনা (Mystery) দ্বারা জটিল করা শিল্পের পক্ষে হানিকর। একাধিক রহস্যের সৃষ্টিকারী ঘটনা suspence সৃষ্টি করে। তা পাঠকের বুদ্ধির কাছে কোন সমর্থন রাখে না, আবেগপ্রবণ হৃদয়কে আকর্ষণ করে মাত্র। E.M. Forster বলেছেন— "Mystery is essential to a plot, and cannot be appreciated without intelligence."[৯] প্লটে কাহিনীর বিন্যাসের অনিবার্যতা একান্ত প্রয়োজন। উপযুক্ত সময় বা পরিস্থিতিতে বা ঘটনায় সেই উপযোগী চরিত্রের অবতরণ অনিবার্য। তবেই কাহিনীর প্রতিটি অংশের মধ্যে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য বজায় থাকবে। কাহিনীর সঙ্গে বিভিন্ন ঘটনা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকবে। এই প্লট বা কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনী (Subplot) কথাটি যুক্ত রয়েছে। উপকাহিনী সাধারণত একটি প্রধান কাহিনীকে ঘটনা, পরিবেশ ও সমস্যানুযায়ী বিকশিত করে তোলে। উপকাহিনীর মৌল দায়িত্ব প্রধান কাহিনীকে শিল্প পরিণতি দেওয়া। মূল কাহিনীর সূচনার পর তাকে বিভিন্ন ঘটনাস্রোত ও বিচিত্র পরিবেশে উপস্থিত করে বিশেষ একটি বা কয়েকটি মানুষের জীবনের পরিচয় দেওয়া উপকাহিনীর মুখ্য কাজ। উপকাহিনী পরাশ্রিত বলে অধিকাংশ স্থলে অসম্পূর্ণ থাকে। কখন কখন উপকাহিনী সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তার আবেদন মূল কাহিনীর তুলনায় বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। উপকাহিনী গল্প হিসাবে পরিবেশিত হলেও মূল কাহিনীর সঙ্গে তার যুক্তিসিদ্ধ ঘটনা পরম্পরার সম্পর্ক বজায় রাখে। উপকাহিনীর সমস্ত ঘটনাগুলি যেন বাস্তব পরিবেশ ও পরিস্থিতি থেকে

উদ্ভুত হয়ে শুধু নবত্বই নয় — পাঠকের রসচৈতন্যকে জাগ্রত করতে পারে। এই উপকাহিনী শিথিল কিংবা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। তা নির্ভর করে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনা-কৌশলের উপর। আবার ঘটনার জটিলতা অনুযায়ী নির্ভর করবে এর কাহিনীর শিথিলতা হবে, না ঐক্যবদ্ধ হবে। উপকাহিনীর ঐক্য গড়ে ওঠে মূল কাহিনীর মত ঘটনা বা চরিত্রের দ্বারা। সেই ঘটনাগুলির সঙ্গে চরিত্রের সমন্বয় ঘটলে উপকাহিনী ঐক্য লাভ করে।

প্রখ্যাত কথাসাহিত্য সমালোচক অলোক রায় সম্পাদিত 'সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য' গ্রন্থের 'প্লট' প্রবন্ধে শ্যামাপ্রসাদ সরদার প্লটের কয়েকটি ভাগের কথা উল্লেখ করেছেন — (১) অনিবার্য অনুযায়ী প্লট দুই প্রকার — শিথিল প্লট বা লুজ প্লট এবং দৃঢ়পিনদ্ধ প্লট; (২) ঐক্য অনুযায়ী — সরল প্লট ও যৌগিক প্লট; (৩) উপস্থাপন অনুযায়ী — প্যানরামিক প্লট ও সীনিক প্লট এবং (৪) বিন্যাস বা গঠন অনুযায়ী — বৃত্তাকার প্লট, পন্থাকার প্লট ও হর্ম্যাকার প্লট প্রভৃতি।

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের শিথিল প্লটের কাহিনী বা গল্পের প্রতি আকর্ষণ বেশি ছিল। E.M. Forster এধরনের প্লটকে গল্প বলেছেন। তাঁর মতে জটিল প্লটই হল প্রকৃত প্লট। শ্যামাপ্রসাদ সরদার শিথিল প্লট সম্বন্ধে বলেছেন — "যে উপন্যাসের গঠন শিথিল সেখানে কয়েকটি প্রায়বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমবায়ে কাহিনী গঠিত হয়, তাদের মধ্যে কার্যকারণের বা যুক্তিগ্রাহ্য যোগ সূত্র প্রায়শই অনুপস্থিত থাকে।"[১০] চরিত্রকে মহান শক্তিশালী বা আদর্শবান প্রতিষ্ঠার জন্য অতিরিক্ত কাহিনীর অবতারণা করা হয়ে থাকে। ফলে এখানে চরিত্রই বড় হয়ে ওঠে। তাই কাহিনী গ্রন্থনা তার অনিবার্যতার গুণ হারায় এবং ঘটনার মধ্যে পারস্পরিক কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে না। এধরনের প্লটে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা পরিস্থিতির পরিচয় থাকলেও সামগ্রিক ভাবে প্লটের আবেদন রক্ষা করতে পারে না। এ ধরনের প্লটে কালগত বিবর্তনের স্থানে স্থানগত প্রাপ্তিই প্রাধান্য পায়। আবার, লুজ বা শিথিল কাহিনী গ্রন্থনে এমন অনেক ঘটনা থাকতে পারে যা প্লটের লক্ষণাক্রান্ত। অনেক সময় দৃঢ়পিনদ্ধ গঠন প্লটের মধ্যেও এমন কিছু ঘটনার অবতারণা করা হয় যার কোন নিজস্ব মূল্য নেই, কিন্তু মূল কাহিনী বিকাশে তা সহায়ক। কথাসাহিত্যের সমালোচক অলোক রায় তাঁর 'চরিত্র' প্রবন্ধে দৃঢ়সংবদ্ধ প্লটের স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছেন — "দৃঢ়সংবদ্ধ-গঠন (অরগানিক্ প্লট) উপন্যাসের কাহিনী পূর্বপরিকল্পিত, এবং প্রায়শই প্লটের গঠন সেখানে বৃত্তাকার। ফলে চরিত্রের বিকাশও পূর্বনির্ধারিত, তার মধ্যে আকস্মিকতার সম্ভাবনা অনেক কম, কালপারম্পর্যও সেখানে সুবিন্যস্ত।"[১১] এধরনের কাহিনী গ্রন্থনায় এমন কিছু চরিত্র বা ঘটনা বা পরিস্থিতির সংযোগ ঘটানো হয় যা গ্রন্থটির সামগ্রিক বিচারে কাহিনীর সৌন্দর্যস্রষ্টা ও আলোকবর্তিকা। দৃঢ়পিনদ্ধ প্লটে স্থানগত ব্যাপ্তি অপেক্ষাকৃত কম, কালগত বিবর্তনের প্রাধান্য পায় বেশি। আবার এমন অনেক গ্রন্থ আছে যেগুলি শিথিল ও দৃঢ়পিনদ্ধ কাহিনী গ্রন্থনার মধ্যবর্তী শ্রেণীর। সেক্ষেত্রে আকস্মিক ঘটনার প্রবেশও ঘটতে পারে।

তবে কাহিনী গ্রন্থনায় তার স্বাভাবিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করা জরুরী। বস্তুত কাহিনী গ্রন্থনায় শিথিল ও দৃঢ়পিনবদ্ধ গঠনরীতি ব্যাপারটা আপেক্ষিক। কাহিনী গ্রন্থনায় শিথিল প্লটের গুরুত্ব কম। তাই দৃঢ়পিনদ্ধ গঠনের দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এধরনের প্লট দুই প্রকার — গ্রীক্ গঠনশৈলী ও গথিক গঠনশৈলী। গ্রীক্ গঠনশৈলীতে একটি ঘটনা, দৃশ্য বা পরিস্থিতির সঙ্গে অপরটি আটোসাটো ভাবে সংযুক্ত থাকে। সমগ্র কাহিনী বস্তুর থেকে এতটুকু অংশ স্থানচ্যুত করলে কাহিনী গ্রন্থনার প্রাণহীন হয়ে পড়ে। আর গথিক গঠন শৈলীতে এমন কিছু চরিত্র, ঘটনা, দৃশ্য ও পরিস্থিতি থাকে যা সমগ্র কাহিনী বা মূলকাহিনীকে সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক রূপে কাজ করে। মূলকাহিনীর থেকে এরূপ দু'একটি দৃশ্য, ঘটনা ও চরিত্র বিচ্ছিন্ন করলেও মূলকাহিনীর অপমৃত্যু ঘটে না। এইরূপ দৃঢ়পিনদ্ধ কাহিনী গ্রন্থন পদ্ধতিকে গ্রীক ও গথিক স্থাপত্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে।

কাহিনীর ঐক্যের দিক দিয়ে প্লট দু'রকমের — সরল প্লট ও যৌগিক প্লট। এই দু'ধরনের প্লটের কথা অ্যারিস্টটল প্রথম তাঁর 'Poetics' গ্রন্থে বলেছিলেন। সরল প্লটে একটি মাত্র কাহিনী বিবৃত হয়। মূল কাহিনীর পাশাপাশি কোন উপকাহিনী থাকে না। ফলে সরল কাহিনী গ্রন্থনায় কাহিনীর জটিলতা সৃষ্টি হয় না। অ্যারিস্টটল বলেছেন — "Plots are either simple or complex, for the actions in real life, of which the plots are an imitation, obviously show a similar distinction. An action which is one and continuous in the sense above defined, I call simple, when the change of fortune takes place without Reversal of the situation and without Recognition."[১২] এই প্লটের প্রতি পাঠকের আকর্ষণ তুলনামূলক কম। আর যৌগিক প্লটে একটি প্রধান কাহিনীর চারপাশে আরো অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বা অপ্রধান কাহিনীর সঞ্চার হয়। এই ক্ষুদ্র বা অপ্রধান কাহিনীগুলি মূল বা প্রধান কাহিনীর সমান্তরাল বা বৈপরীত্যে শেষে মূল কাহিনীর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ লাভ করে। জটিল বা যৌগিক প্লট সম্পর্কে তিনি বলেছেন — "A complex action is one in which the change is accompanied by such Reversal, or by Recognition, or by both. These last should arise from the internal structure of the plot, so that what follows should be the necessary or probable result of the preceding action."[১৩] মূলকাহিনীর সঙ্গে এই অপ্রধান কাহিনীগুলিকে উপকাহিনীও বলা হয়ে থাকে।

উপস্থাপনা পদ্ধতিগত দিক দিয়ে শ্যামাপ্রসাদ সরদার প্লটের দুটি ভাগের কথা বলেছেন। যথা, প্যানরামিক (Panoramic) ও সীনিক (Scenic)। প্যানরামিক প্লটের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ সরদার বলেছেন — "প্যানরামিক প্লটের গঠনকৌশল শিথিল বিন্যস্ত, একটি মাত্র সূত্রে কেন্দ্রীভূত

নয়। ঘটনাগুলি চরিত্রের স্বভাব ও পরিস্থিতির সঙ্গে আংশিকভাবে কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত। কাহিনীর গতিবেগ মৃদু হয়ে যাওয়ায় বা ক্রম-ক্ষীয়মান অবস্থায় যবনিকাপাত ঘটে।”[১৪] এই ধরনের প্লট কাহিনী-গ্রন্থনা অনিবার্য, যুক্তিগ্রাহ্য ও নাটকীয়তা পূর্ণ নয়। এখানে চরিত্রের সংখ্যা বহু। তাদের অধিকাংশ চরিত্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বর্জিত টাইপচরিত্র মাত্র। ঘটনা নিয়ন্ত্রণে তাদের কোন ভূমিকা নেই। এ ধরনের প্লটে ঘটনা বিন্যাস বিস্তৃত ও শিথিল, কোন একটি সূত্রে কেন্দ্রীয়ভাবে গ্রথিত নয়। কাহিনী ও ঘটনার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে কার্যকারণ সূত্রে বিন্যাস ঘটে না। পরিণতিতে কাহিনী কোন নির্দিষ্ট সমাধানে পৌঁছায় না। এই প্লটের আয়তন মহাকাব্যধর্মী ও বৃহৎ। অন্যদিকে, সীনিক প্লটে বিশেষ একটি দিককে আলোকপাত করাই লেখকের লক্ষ্য হওয়ায়, এখানে জীবনের বিশাল পটভূমি বর্জিত হয়। প্যানরামিক প্লটের মত এর পটভূমি বিস্তৃত নয়। একটি মাত্র সূত্র বিন্যাস কাহিনীতে কেন্দ্রীভূত হয়। কাহিনীর সূচনায় ঘটনা ও চরিত্রের ঘাতে প্রতিঘাতে সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং তার একটি অনিবার্য পরিণামের মধ্য দিয়ে প্রশান্ত সমাপ্তি লাভ করে। এমনকি এ ধরনের প্লটে চরিত্রের সঙ্গে ঘটনার সম্পর্ক পরিপূরক ভাবে বিদ্যমান থাকে। প্রথম থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত এধরনের প্লটে চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে বিন্যস্ত থাকে। জীবনের সুবিস্তৃত বৈচিত্র্যের পরিবর্তে কোন একটি বিশেষ প্রবণতার উপর আলোকপাত করে। ‘সীনিক’ প্লট নাটকীয় ও আকারে সংক্ষিপ্ত।

বিন্যাসপদ্ধতির দিক থেকে প্লট তিন প্রকার বৃত্তাকার, পন্থাকার ও হর্ম্যাকার। এধরনের প্লটের কথা আমরা শ্যামাপ্রসাদ সরদার ও কুন্তল চট্টোপাধ্যায়ের প্লটের আলোচনায় পাওয়া যায়। সাহিত্যের রূপ-রীতির লেখক ও ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসকার কুন্তল চট্টোপাধ্যায় বলেছেন — “ ‘বৃত্তাকার’ প্লট দৃঢ়সংবদ্ধ : একটি কেন্দ্রীয় বীজকে গঠনরূপের অন্তঃসার হিসেবে ধরে ঐ বীজটির ক্রমবিকাশের একটি পূর্ণ-বলয়িত বিন্যাস গড়ে তোলা হয়; স্থান-কাল-ঘটনার সামঞ্জস্যে, আদি-মধ্য-অন্ত-সম্বলিত একটি কাহিনী অনিবার্য ও সুস্পষ্ট পরিণতিতে পৌঁছায়।”[১৫] বৃত্তাকার প্লটে আদি-মধ্য-অন্ত সম্বলিত এক কেন্দ্রীয় কাহিনী থাকে। একটি বিশেষ সমস্যাকে কেন্দ্র করে কাহিনীর ক্রমবিকাশ ও পরিণতি। লেখক সেই ঘটনার দিকে বেশি দৃষ্টি রাখেন। সেই ঘটনাকে যুক্তিগ্রাহ্য ও অনিবার্য স্পষ্টরেখায় সমাপ্তির দিকে কাহিনীকে অগ্রসর করে তোলেন। এই জাতীয় বৃত্তাকার কাহিনী বিন্যাসের মধ্যে নাটকীয়তার ঐক্য বিদ্যমান। অন্যদিকে, কুন্তল চট্টোপাধ্যায় পন্থাকার প্লটের স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছেন — “ ‘পন্থাকার প্লট শিথিলগঠন : জীবনের টুকরো ছবি, একটি ভাবদৃষ্টি ও কিছু চরিত্রের সমাহারে সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত তার গতি। কোন এক পান্থজনের জীবনপরিক্রমার বিচিত্র অভিজ্ঞতা গ্রথিত হয়ে এ প্লটের নির্মাণ।”[১৬] পন্থাকার প্লটের কাহিনীর গ্রন্থনা শিথিল। কয়েকটি টুকরোটুকরো দৃশ্য বা কয়েকটি চরিত্র বা কয়েকটি ছবিকে একসূত্রে গ্রন্থনা করা হয় এখানে। তার মাঝখান থেকে কোন দৃশ্য বা চরিত্র বা ঘটনা তুলে নিলেও কাহিনীর মধ্যে

বিচ্ছিন্নতা আসে না। হর্ম্যাকার প্লটের গঠন প্রকৃতি জটিল। হর্ম্যাকার প্লট সম্বন্ধে কুন্তল চট্টোপাধ্যায় বলেছেন — ‘‘হর্ম্যাকার প্লট জীবনের বিস্তৃত প্রেক্ষিতে নির্মিত এক জটিল গঠনরূপ। মূল কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনীর সংযোগে, বহু সংখ্যক ও বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশে, ঘটনা ও পরিস্থিতির বৈচিত্র্যে ‘হর্ম্যাকার’ প্লট একটি আশ্চর্য অর্কেস্ট্রা যেন; এর বিন্যাস একই সঙ্গে সুসংবদ্ধ ও শিথিল।’’[১৭] মূলকাহিনীর পাশাপাশি দু’একটি উপকাহিনীর সংযোগ থাকে। বিস্তৃত পটভূমিকায়, বিচিত্র ও বহু চরিত্রের, বহু ঘটনার সমাবেশ এই ধরনের প্লটকে একই সঙ্গে দৃঢ় পিনদ্ধ ও শিথিলগুণের অধিকারী করে তোলে। সে যেমন প্লটই হোক তাকে যেন চরিত্র ও কাহিনীর সম্পর্ক অন্বিত হয়। তার সঙ্গে স্থান, কাল ও পাত্র — এই ত্রয়ী ঐক্য বজায় থাকে। স্থানের সঙ্গে কাহিনীর কাল বা সময়ের সঙ্গে কাহিনী, পাত্র-পাত্রী বা চরিত্রের সঙ্গে কাহিনীর বিন্যাস পদ্ধতির সামঞ্জস্য থাকে, তবেই একটি জীবন্ত প্লট বা কাহিনী গ্রন্থনা হতে পারে।

লক্ষণীয়, প্রায়ই একটি মাত্র ঘটনা বা চরিত্র বা পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে প্লট রচনা শুরু হয়। লেখক তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে বা কোন লোকমুখে শোনা গল্পের মধ্য থেকে একটি পরিস্থিতি নির্বাচন করেন এবং সেই পরিস্থিতির বিস্তারের দ্বারা প্লট রচনা করেন। আবার, কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেই প্লট রচনা করা হয়। এই ঘটনা জীবনাভিজ্ঞতা জাত হতে পারে। তবে কার্যকারণ সূত্রে তা গ্রথিত হতে হবে। কখন পূর্ব নির্ধারিত কোন কাহিনীর ছক অনুসরণ করেও প্লট রচনা করা হয়। সেক্ষেত্রে চরিত্রের প্রতি প্রাধান্য বেশি; চরিত্র সৃষ্টিতে কাহিনীকে একটু পাল্টে নবরূপ দান করা মাত্র।

এই গঠনতত্ত্বের আলোকে মঙ্গলকাব্য বিচার করার পূর্বে মঙ্গলকাব্যের উৎস ও বর্ণনাকৌশল সম্বন্ধে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করব। কারণ কাহিনী গ্রন্থনার ক্ষেত্রে কতটা মঙ্গলকাব্যের গঠনরীতিকে অনুসরণ করা হয়েছে তা জানা যাবে। সেই সঙ্গে কতটা শিল্পসম্মত রূপ পেয়েছে তা নির্ধারণ করা যাবে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীদের মাহাত্ম্য যতই ফেনিয়ে বলা হোক না কেন, সে তো মুখরোচক গল্পই। এই গল্পগুলি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আঙিনায় প্রথম ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। তখন এদের সম্ভবত আকার ছিল ছোট ও অনতিস্ফুট। কিন্তু ক্রমে তা আকারে বৃদ্ধি পায় এবং নানা লক্ষণে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। পণ্ডিতদের মতে মঙ্গলকাব্যগুলির যে গল্প রয়েছে তার শৈশব অবস্থার সঙ্গে ব্রতকথার সম্পর্ক এমনই। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন — ‘‘... ব্রতকথার মৌখিক ধারার উপরই কালক্রমে মঙ্গলকাব্যের লিখিত ধারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।’’[১৮] ব্রতকথাগুলির ও মঙ্গলকাব্যের উদ্দেশ্য একই। উভয়ের লক্ষ্য দেবদেবীর মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার করা। মঙ্গলকাব্যের গঠন বা শরীর সংস্থান সম্বন্ধে এটা ভাবা দরকার, যা মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থনারীতির প্রচলিত ভাবনাকে স্পর্শ করবে।

বিশেষত মধ্যযুগের বাঙালী কবিরা ছিলেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুচ্ছানুসারী। তাঁরা মঙ্গলকাব্যের সাধারণ উপকরণ হিসাবে রারমাস্যা, চৌতিশা, নারীগণের পতিনিন্দা, বিবাহাচারের বিস্তৃত বিবরণ, নানাবিধ বিষয়ে অনাবশ্যক দীর্ঘ তালিকা নির্মাণ ইত্যাদিকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। মঙ্গলকাব্যের গঠনের ক্ষেত্রেও এই সাধারণ সূত্রকেই সকলে মেনে নিয়েছেন। যেমন — (১) মঙ্গলকাব্যের আখ্যানটি হবে বৃত্তাকার। গল্পের সূচনা ঘটবে যেখানে, অন্তিম সমাপ্তিও ঘটবে সেখানেই। তাই দেখা যায়, প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের কাহিনী শুরু হয়েছে স্বর্গলোকের বিবরণ দিয়ে; পরে মর্ত্যলোক ঘুরে আবার স্বর্গলোকে গল্প সমাপ্তি লাভ করেছে। (২) প্রতিটি মঙ্গলকাব্যই এগিয়েছে কোন-না-কোন দেবদেবীর মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। মর্ত্যলোকে তাদের পূজা প্রচার করে একাধিক মানব-মানবী, যারা প্রকৃত পক্ষে দেবলোকবাসী। ফলে মঙ্গলকাব্যগুলির দেবখণ্ডের শেষে একটা না একটা অভিশাপের প্রসঙ্গ থাকেই, যার কাহিনীকে মর্ত্যমুখী করে তোলা হয়। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণীয় ব্রত কথাগুলির আখ্যান। এই ব্রতগুলি মঙ্গলকাব্যের মত মর্ত্যে দেবদেবীর মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ার প্রাথমিক উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল। তবে মঙ্গলকাব্যের অভিশাপ প্রসঙ্গটি ব্রতকথায় সংযুক্ত ছিল না। (৩) মঙ্গলকাব্যে অভিশাপ দেওয়ার ক্ষেত্রেও শরণ নেওয়া হত সংশ্লিষ্ট চরিত্রটির দোষত্রুটির, নইলে বাস্তবতাবোধ ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই আগে থাকতে প্রয়োজনীয় আয়োজন করেন কবিরা, যাতে ঘটনাটি আকস্মিকতা দোষদুষ্ট না হয়। এক্ষেত্রে মানবসংসারের ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণাটিকে কবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকেন। দেবতারা সদ্‌গুণের হয়েও এক্ষেত্রে ছলনা করতে এবং তুচ্ছ অপরাধে ভয়ানক শাস্তি দিতে পিছপা হয় না। দৈববিধানের অমোঘতার ধারণাও এই ঘটনার ভিতর দিয়ে মানব-মনে পুঁতে দেওয়ার প্রয়াস ছিল। (৪) প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই মিলেছে শিব-প্রসঙ্গ, যা দেবখণ্ডের কাহিনীর বড় অংশ। কোন কোন মঙ্গলকাব্য শিবকেন্দ্রিক পুরাণ কিংবা কালিদাসের কুমারসম্ভবের আশ্রয়ে রচিত হলেও বেশিরভাগ কবিই অনুসরণ করেছেন বাংলার লোকায়ত শিবকে। (৫) মঙ্গলকাব্যের চারটি স্পষ্ট পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। এগুলি যথাক্রমে — (ক) বন্দনা, (খ) গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ, (গ) দেবখণ্ড ও (ঘ) নরখণ্ড। প্রথম দুটি পর্যায়ে গল্পের কোন আভাস পাওয়া যায় না। দেববন্দনার অংশটুকু রচিত হয় মঙ্গলাচরণের লক্ষ্য নিয়ে। দ্বিতীয় পর্যায় গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণে প্রায় সব কবিই তাঁদের সমকালীন ইতিহাসকে স্পর্শ করে গিয়েছেন। এই অংশে আবশ্যিক ভাবে এসেছে দৈবাদেশ, পৃষ্ঠপোষক বা প্রভুর আদেশ কিংবা ঐ জাতীয় কোন প্রণোদনার কথা, যার দ্বারা কবিরা কাব্য লিখতে প্রলুব্ধ হয়ে থাকেন। তৃতীয় পর্যায়ে দেবখণ্ডে আখ্যানও কম-বেশি গতানুগতিক। মনসা ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিবের দাম্পত্য জীবন অবতারণ করা হয়েছে গল্পরস পিপাসু পাঠকদের জন্য। এবার নরখণ্ডের কথা। এই অংশের গল্পটিই মঙ্গ

লকাব্যের মূল গল্প।

মঙ্গলকাব্যের এই গল্পগুলি বর্ণনাত্মক। মঙ্গলকাব্য নির্মাণের ক্ষেত্রে — (১) শাস্ত্রীয় উপাদান (২) ঐতিহ্যগত উপাদান ও (৩) কাব্যরচনার সমকালীন বাস্তব উপাদান — এই তিনটি ধরনের উপাদানে সুস্পষ্ট উপস্থিতির সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এই তিনটি উপাদানের পারস্পরিক মিশ্রণের অনুপাত সব কবির কাব্যে একরকম ভাবে পাওয়া যায়না। মনসামঙ্গল কাব্যের হাসান-হোসেনের পালাটি কাব্যরচনার সমকাল থেকে উঠে আসা এক ধরনের বাস্তব উপাদান। এই আখ্যানের জন্ম নিশ্চিত ভাবে তুর্কী বিজয়ের পরবর্তী পর্যায়ে কোন এক সময়ে হয়েছে। এই সঙ্গে এটাও লক্ষণীয়, এই গল্পের আয়োজন অনেক কবিই করেন নি। আবার যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যেও কাহিনীর সমতার অভাব রয়েছে। আরো একটা কথা। মনসামঙ্গলের কেন্দ্রীয় আখ্যান চাঁদ বণিককে ঘিরে দানা বাঁধলেও এতে আরো কতগুলি উপকাহিনী রয়েছে। হাসান-হোসেনের পালা ছাড়া বাকিগুলো হল রাখালদের মনসাপূজা, ধন্বন্তরী ওঝার কাহিনী ও জালু-মালুর উপাখ্যান ইত্যাদি। সমাজে তথাকথিত শ্রমজীবী নিম্নশ্রেণীর মধ্যে দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারিত হওয়ার পর চাঁদ বণিকের মতো গণ্যমান্যের দ্বারা দেবী স্বীকৃতি পেতে চেয়েছিল — এমন একটা সমাজ-অভীক্ষা যেন বেরিয়ে আসে আখ্যান গঠনের পারম্পর্যের ভিতর দিয়ে। বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে দেখা যায়, রাখালিয়া উপাখ্যানে দেবী জরতী ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশ নিয়ে তিন দিনের উপবাস কাটাতে রাখালদের কাছে দুধ চেয়েছে। কিন্তু রাখালরা সে কথায় আমল দেয়নি। ফলস্বরূপ সর্পদংশনে তাদের বিপুল গো-সম্পদ বিনষ্ট হয়। বিপন্ন গোয়ালারা তখন কাতর হয়ে ক্ষমাভিক্ষা চাইলে ও দেবীর পূজা দিলে পূর্বের গোধন আবার ফিরে পায়। উদ্ধতকে শাস্তি আর অনুগতকে কৃপা — দেবদেবীদের এমন সরলরৈখিক আচরণ ব্রতকথাগুলিতে সহজেই পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে, জালু-মালুর গল্পে দেব-বিরোধিতার কোন প্রসঙ্গই নেই। তাই দেবী অকাতরে তার অনুগ্রহ বিতরণ করেছে দরিদ্র জেলেদের প্রতি। এই গল্পগুলিকে সংগঠনের দিক থেকে মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী বলে গণ্য করা যায়। চাঁদের বিরুদ্ধে মনসার সক্রিয়তা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও ক্রূরকর্মের মধ্য দিয়ে ক্রমশ দ্বন্দ্বে তুঙ্গ স্থান স্পর্শ করেছে। দুইয়ের মধ্যে সংগ্রাম হয়েছে তীব্র থেকে তীব্রতর। তবে এই ক্রমোন্নতিময় আখ্যানে হঠাৎ ছন্দ-পতন আনে অনিরুদ্ধ-ঊষাহরণ ও যমযুদ্ধের অংশটি। কেমন করে লখিন্দর ও বেহুলা স্বর্গলোক ছেড়ে পৃথিবীতে এল সেই ঘটনাটি বিজয় গুপ্ত এতটা বিশদে বলেছেন, যাতে মূল গল্পের চলমানতা ও সমুন্নত গতি নষ্ট হয়েছে। সংরূপটি মঙ্গলকাব্য হলেও গল্পগঠনের মূল শর্ত লঙ্ঘিত হওয়ায় কাহিনীও তার প্রার্থিত আবেদন ও আকর্ষণ হারিয়েছে।

প্রসঙ্গত, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী গ্রন্থনায় আমরা এই প্রথাগত রীতি (Technique), পুরাণ ও তন্ত্রপ্রসঙ্গ কতটা নিয়ন্ত্রিত করেছে, তা লক্ষ্য করব। সেই সঙ্গে কবির

সামাজিক দায়বদ্ধতা, ধর্মীয় প্রভাব, লোকবিশ্বাস ও সমকালিন মানুষের জীবনের চাহিদা কাহিনী গ্রন্থনে প্রভাবিত করেছে কিনা তার দিকে নজর রাখব।

মানিক দত্ত তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে সূচনা করেছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় এই গ্রন্থন রীতি নতুন। কবি কাব্যের প্রথমেই গায়েনী রীতিতে পদ্যের আদলে কিন্তু গদ্য ভাষায় ধর্মের জন্ম কাহিনী বৃত্তান্ত লোক সম্মুখে বলছেন। গৌড়ের ইতিহাসকার রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেছেন— "মানিকদত্তের পদ্য, পদ্যের গন্ধযুক্ত গদ্য-রচনামাত্র।"[১৯] ব্রতকথা শুনলে যে মঙ্গল সাধন হয় তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে কাব্যের সূচনায়। সেই সূত্রে কবি বলতে চেয়েছেন যে, ধর্ম নামক সত্যের জন্ম কথা শ্রবণ করলে শ্রোতার পাপ ও দুঃখ হরণ হবে।

"মন দিএগ শুন জয় ধর্ম্মের কাহিনী।
দুঃখ খণ্ডে হরে পাপ শুনি আদ্যবানী।।"[২০]

ব্রতকথার সাধারণ রীতি দ্বারা কাহিনীর সূচনা করে মূল স্রোতে ঘটনা প্রবেশ করেছে। মঙ্গলকাব্যের সাধারণ রীতি কবি লঙ্ঘন করলেও সমকালীন মধ্যযুগীয় বাতাবরণে এরূপ ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা অসঙ্গত নয়। তাতে কাহিনী অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এসেছে। অতীত ঘটনাটি হল আদি বুদ্ধের ন্যায় এই ধর্মের জন্ম শূন্য থেকে এবং তার কোন হাত, পা ও স্কন্ধ ছিল না। হঠাৎ তার সকল কিছু হল। বৌদ্ধধর্মের 'শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ' নিরাকার ছিলেন। এই কাব্যেও ধর্ম —

"বাপের বিজ্জ জন্ম নইল না ধরিল মাএ।
শূন্যতে জন্মিল ধর্ম্ম মাংস পিণ্ডকায়।।
*　　　*　　　*
হস্ত নাহি পদ নাহি কন্ধে নাহি মাথা।
জে রূপে জন্মিল ধর্ম্ম তার শুন কথা।।
আচম্ভিতে ধর্ম্ম গোলোক ধিআইল।
চক্ষু কান নাক আদি সকল হইল।।"[২১]

এভাবনা রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ'-এ লক্ষ্য করা যায়। শূন্যপুরাণে ধর্মের জন্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে —

"দেবতা দেহারা ছিল পূজিবাক দেহ।
মহাশূন্য মধ্যে পরভুর আর আছে কেহ।।
*　　　*　　　*
দআর আনে ধর্ম্ম বসিল আপনে।
চৌদ্দ জুগ গেল পরভুর এক বস্তু জানে।।

চৌদ্দ জুগ বই পরভু তুলিলেন হাই।
উদ্ধনিস্বাসে জনমিলেন পক্ষ উল্লুকাই।।
জনমিআ উল্লুক পক্ষ উড়িআত জাএ।
সূন্যে বৈসি নিরঞ্জন দেখিবারে পাএ।।''[২২]

অতঃপর ধর্ম চোদ্দ যুগ জলের উপর যোগ নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। ধ্যান ত্যাগ করে সামনে প্রাণী জগতের প্রতিনিধি উলুক পাখিকে দেখতে পায়। তার কথায় ধর্ম সৃষ্টি কার্যে মনোনিবেশ ঘটায়। ধ্যান ভঙ্গের সাধারণ পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে অপর একটি চরিত্রের সম্মুখীন হওয়া এবং নতুন ঘটনার দিকে কাহিনী-যাত্রার পথ সুগম করা হল।

এরপরই ঘটনায় চরিত্রের সক্রিয়তা এবং ঘটনা নিয়ন্ত্রণে তার ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। তাতে ধর্ম কর্তৃক মন্ত্রের দ্বারা পদ্মফুল সৃষ্টি হল। বৌদ্ধ ধর্মে ও বৌদ্ধ শিল্পে পদ্মের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ধর্মের মধ্যে ব্রহ্ম শক্তির আবির্ভাব ঘটে। এই পদ্ম সৃষ্টির আদি প্রতীক। ধর্মের আদ্যমূল জপ করার সঙ্গে তান্ত্রিক সাধনার 'মূলধার'-এর যোগ আছে বলে মনে হয়। মূলাধারে প্রবৃত্তির অবস্থান। সেই প্রবৃত্তি শক্তি দেহস্থিত আদ্যমূল। করুণাবশত সেখান থেকে সে মৃত্তিকা সৃষ্টি করে তাকে নখ দিয়ে টিপে তিন ভাগ করে। প্রশ্ন হল কেন নখে টিপে ধর্ম মৃত্তিকা তিন ভাগ করে? কারণ হিন্দু ধর্মে নখ, অস্থি ও শবকে অশৌচ বলে মনে করা হয়। কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকরা এগুলিকে পরম পবিত্র বলে মনে করে। তাই পবিত্র জিনিসের স্পর্শে পৃথিবী যাতে পুণ্য পবিত্র হয়, সেকারণে হয়তো ধর্ম মৃত্তিকা নখে টিপে পৃথিবী সৃষ্টি করে।

''মন্ত্রের প্রতাপে হৈল কমলের ফুল।
সেইখানে বসি ধর্ম্ম জপে আদ্যমূল।।
মনতে ভাবিএ্যা ধর্ম্ম পাতালে পশিল।
পাতালে জাইএ্যা ধর্ম্ম মৃত্তিকা সৃজিল।।
মৃত্তিকা সৃজিএ্যা ধর্ম্ম হস্ততে রাখিল।
নখের টিপনে মাটি তিন ভাগ কৈল।।''[২৩]

পৃথিবী সৃষ্টি করে ধর্ম তাকে স্থাপন করার জন্য একে একে গজ, কূর্ম অবতার হয়েছে। কিন্তু তারা পৃথিবীর ভার বহনে অসমর্থ হলে ধর্ম নিজের পৈতা ছিঁড়ে বাসুকি নাগের সৃষ্টি করে। তার মাথার উপর পৃথিবীকে স্থাপন করা হল।

এরূপ কাহিনীতে পাঠকের সামনে অলৌকিক গল্পের প্রতি মনসংযোগকারী কয়েকটি ঘটনার উপস্থাপন করা হয়েছে। মধ্যযুগীয় দেবমাহাত্মমূলক আবহাওয়ায় তা স্বাভাবিক বলে মনে হয়। সেখানে দেখা যায় ধর্মের হাই বা 'হাম্বি' থেকে আদ্যার জন্ম। আদ্যাকে দেখে ধর্মের সম্ভোগ বাসনা

জাগ্রত হয় এবং ধর্ম আদ্যাকে ধরার জন্য অগ্রসর হয়। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য আদ্যা উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম দিকে ধাবিত হলে তা থেকে চারটি দিকের সৃষ্টি হয়। এই কাহিনী কৌতূহলোদ্দীপক ও অলৌকিক। তার বাস্তব ভিত্তি নেই। কিন্তু এর সঙ্গে নারীর আত্মসম্মান রক্ষার প্রসঙ্গটির দ্বারা কবি বাস্তবজ্ঞানের যোগসূত্র রক্ষা করেছেন। মধ্যযুগের মানস প্রবণতায় আবদ্ধ অলৌকিক পরিপূর্ণ বর্ণনা কবি দিয়েছেন।

"আদ্যাকে ধরিতে ধর্ম্ম চারিদিকে গেল।
পূর্ব্ব পশ্ছিম উত্তর দক্ষিন সেই হৈতে হৈল।।"[২৪]

এই অলৌকিক সৃষ্টি বর্ণনা ও কাম সম্ভোগের রহস্যের বর্ণনাই পরবর্তী ঘটনার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছে বলে মনে হয়। কাম প্রবৃত্তির প্রকাশে ধর্মের বীর্যপাত হয় এবং সেই বীর্য থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের জন্ম হয়। জন্মের পর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন জন তপস্যায় মগ্ন হয়। এর কারণ সম্বন্ধে কোন সম্ভাব্য উত্তর নেই। চরিত্র যেন ঘটনার স্রোতে ভেসে চলেছে। তার সূত্র ধরেই তাদের তপস্যার কপটতা পরীক্ষার জন্য ধর্মের শবরূপ ধারণ। কবির বর্ণনাটি এরূপ —

"মায়া করি মরা রূপে ধর্ম্ম ভাসি জাঅ।
জেই ঘাটে ব্রহ্মা জাএ্যা তপস্যা ধিআঅ।।
ভাসিয়া লাগিল ধর্ম্ম ব্রহ্মা দেবের ঘাটে।
তিল কুশ ছাড়িয়া ব্রহ্মা উপর পারে উঠে।।
*　　　*　　　*
ই তিন ভুবন মধ্যে ব্রহ্মা একজন।
চিনিতে না পারে ব্রহ্মা অনাদ্য নিরঞ্জন।।
*　　　*　　　*
মরা দেখি বিষ্ণু তিল কুল ফেলি দিল।
তপস্যার ঘট ছাড়ি উপর উঠিল।।
*　　　*　　　*
মরা দেখি শিব তিল কুল ফেলি দিল।
তপস্যার ঘাট ছাড়ি উপরে উঠিল।
ধ্যান করিএ্যা শিব পিতাকে চিহ্নিল।
মৃত্যু পিতাকে শিব কান্ধে করি নিল।।"[২৫]

এই অংশটুকু রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে বর্ণিত হয়েছে এইভাবে —

"তিন ঠাঁই তপিস্‌সা করিল তিন ভাই।
কি দরব্ব পাইলা তথা কহু মোর ঠাঁই।।
বম্ভা বিষ্ঠু বোলে গোঁসাই চিনিতে পারিলাম।
আচম্বিতে পচা গন্ধ নাসাতে পসিলাম।।
ত্রিলোচন বোলে পরভু সুন ভগবান্‌।
তুম্বারে চিনিআ নাম হইল ত্রিনআন।।"[২৬]

তবে কবি মানিক দত্তের কাব্যে এই অংশটুকু বিস্তৃত রূপে বলা হয়েছে। তুলনায় সেইকথা রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে অনেকটাই সংক্ষেপে বলা হয়েছে।

কাহিনীতে আদ্যা এবং তার জন্মের কথাকে এত বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন যে অহেতুক কাহিনীতে রহস্য উন্মোচন হয়েছে। সেক্ষেত্রে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পিতৃ-আদেশে বিবাহে অসম্মত হলে শিব তার অনুরোধে বিবাহ করতে মনস্থির করে। কিন্তু শিব আদ্যাকে সাতবার দেহ ত্যাগ করার কথা বলেছে। শিব তার প্রমাণ স্বরূপ আদ্যার সাত জন্মের সাতটি হাড় গলায় রাখার কথা বলে। কাহিনী অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই ধর্ম বিশ্বাস একান্ত অপরিহার্য বলে মনে হয়।

"শিব বোলে শুন তুমি   তবে বিভা করি আমি
আদ্যা যদি সাতবার মরে।।
সাতবার মরিব   সাতখান হার লব
হাড়মালা গলাএ পড়িব।
আদ্যা দেহা ছাড়িএঞা   পুনুজন্ম লঅ গিএঞা
তবে তাকে বিবাহ করিবো।।"[২৭]

কবি আদ্যার সাতটি জন্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। তিনি আদ্যার একে একে ভৃগু মুনির ঘরে, যশোদার উদরে, কুম্ভকারের ঘরে, দক্ষের ঘরে হরের বণিতা সতী নামে, দক্ষযজ্ঞের পর হরিঘরে জন্মের কথা বলার পর তার বিশ্লেষণ করেছেন। সেখানে এইটুকু অংশ বাদ দিলে বোধহয় কাহিনীর কার্যকারণ পারম্পর্য বিঘ্নিত হত না।

তাই কবি আদ্যার ছয়বার জন্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে অনির্বায ভাবে সপ্তম জন্মের কাহিনীতে চলে আসতে পারতেন। কিন্তু কবি মানিক দত্ত এই কাব্যে আদ্যাকেই দুর্গারূপে হিমালয় গৃহে মেনকার উদরে জন্ম গ্রহণ করার কথা বর্ণনা করেন। সেই বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের গঠনরীতি অনুযায়ী হয়েছে। জন্মের পর পঞ্চতীর্থের পবিত্রজল দিয়ে তাকে স্নান করানো হল। তার নাম রাখা হল গৌরী। একে একে তার পঞ্চমাসে অন্নপ্রাশন ও পাঁচ বছরে কর্ণভেদ করা হয়।

"দাই আসিএঞা কন্যার নাড়ি ছেদ কৈল।

পঞ্চতীর্থের জল আনি স্নান করাইল।।
শাস্ত্রের বিধান মতে শুধ্বিতা হইল।
গোউরি বুলিঞা কন্যার নাম থুইল।।
এক দুই তিন গৌউরির পঞ্চ মাস হৈল।
পঞ্চ মাসের কালে অন্ন পরাশন কৈল।।
ছয়সাত আটনয় দশ মাস হৈল।
এগার মাসের পরে বছর হইল।।
এক দুই তিন চারি পঞ্চ বছর হৈল।
পঞ্চ বচ্ছরের কালে কন্নবেদ কৈল।।"[২৮]

কবি লৌকিক সংস্কার ও প্রথাগত কাঠামোয় এই বর্ণনা করেছেন। শিব ও গৌরীর মিলনের সূত্রে নারীর শিবতুল্য স্বামী প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার বিশ্বাসকে হর-গৌরীর মিলন ভাবনা গ্রন্থনে সাহায্য করেছে। সেই শিব পূজার মধ্য দিয়ে শিব-গৌরীর সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। কাহিনী এই পর্যন্ত সরল রৈখিক।

এরপরই কাহিনীর মধ্যে একটি উপকাহিনী প্রবেশ করে। সেই উপকাহিনীর চরিত্র হল কামদেব, তার স্ত্রী রতি ও সরস্বতী। কাহিনীর ধারা পরিবর্তনের জন্য তাদের আগমন। তাদের আগমনে কবি কাঙ্ক্ষিত পুরাণের একটি ঘটনাকে কারণ হিসাবে তুলে ধরেছেন। সেটি হল তারকাসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ দেবকূলকে রক্ষার জন্য শিবপূত্র কার্তিকের জন্ম হওয়ার প্রয়োজন। তাই কবি শিব-গৌরীর বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কারণ সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করতে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কবি বলেন —

"দেবগণের তরে ইন্দ্র বলেন বচন।
তারক অসুরের ভএ কাপে দেবগণ।।
ব্রহ্মা বোলে শিবের পুত্র কার্ত্তিক জন্মিবে।
কার্ত্তিকের রণে তারক অসুর মরিবে।।
শিবের বিভা হৈলে কার্ত্তিক জন্মিবে।
শিবের বিভার তরে দেবগণ ভাবে।।"[২৯]

বিবাহের জন্য প্রথমে শিবের ধ্যানভঙ্গ করা প্রয়োজন। তাই কামদেবকে আনা হয়। শিবের ধ্যান ভঙ্গ করলে কামদেব ভস্মীভূত হয়। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী রতির ক্রন্দন অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। এই পরিস্থিতিতে সরস্বতী তাকে কামদেবের পুনর্জন্মের কথা বলে। এই ঘটনার পরিণতি আকর্ষণীয় ও করুণরসে সিক্ত। সংক্ষিপ্ত পরিসরেই উপকাহিনীটি মনুষ্য জীবনের চরম বাস্তবতাকে পরিস্ফুট

করে তুলতে সাহায্য করেছে। মূল কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে এর যুক্তিসিদ্ধ সুযোগ ও অবসর রয়েছে।

এই উপকাহিনী বিধৃত হওয়ার পর কাহিনী মূল স্রোতে প্রবাহিত হয়। তা কাহিনীর পরম্পরা গুণ রক্ষা হয়েছে। কাহিনী শিব গৌরীর বিবাহের পদযাত্রায় উন্নীত হয়। কঠোর তপস্যারত গৌরীর মানসিক দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা লক্ষ্য করে শিব আনন্দিত হয়। শিব হিমালয় গৃহে ঘটক হিসাবে প্রেরণের জন্য নারদ চরিত্রের কাহিনীতে প্রথম আগমন। হিমালয় কন্যা গৌরীকে শিবের সঙ্গে বিবাহ দিতে সম্মত হয়। তাই শিব সকল দেবতাদের নিমন্ত্রণ করতে বলে। কিন্তু দেবতারা বলে—

> ''প্রেত ভূত লঞা শিব থাক শ্মশানতে।
> অন্নজল কে খাইবে তুমার গৃহতে।।''[৩০]

তাই তারা গঙ্গার রান্না ছাড়া অন্ন গ্রহণ করবে না। এই কারণে পুরাণের গঙ্গা ও শান্তনুর দাম্পত্য জীবনের ঘটনা কাহিনীতে প্রবেশ করেছে। উচ্চবর্ণের দেবসমাজের কাছে শিব অপবিত্র, অস্পৃশ্য ও নিম্নবর্ণের। তাদের কাছে গঙ্গা পবিত্র। গঙ্গার এই পবিত্র ধারণা 'বিষ্ণুপুরাণ্ম' গ্রন্থে পাওয়া যায়। সেখানে পরাশর গঙ্গা সম্বন্ধে বলেছে —

> ''শ্রুতাভিলষিতা দৃষ্টা স্পৃষ্টা পীতাবগাহিতা।
> যা পাবয়তি ভূতানি কীর্ত্তিতা চ দিনে দিনে।।''[৩১]

(অর্থাৎ, ''প্রতিদিন যাঁহার নাম শ্রবণে, যাঁহার অভিলাষে; দর্শনে স্পর্শনে পানে, অবগাহনে বা কীর্ত্তনে প্রাণিগণ পবিত্র হয়।''[৩১]) এই পবিত্র গঙ্গার ধারণা লোকসমাজে প্রচলিত। সেই পবিত্র গঙ্গাকে দিয়ে শিবের বিবাহের রান্নার জন্য শান্তনু মুনির কাছ থেকে শর্ত করে আনা হয়েছিল। শান্তনু মুনি শিবকে শর্ত দেয় যে —

> ''রাত্র মধ্যে গঙ্গা অনিঞা দিহ তুমি।
> প্রভাত হইলে গঙ্গা না লইব আমি।।''[৩২]

এই প্রসঙ্গে একই কথা শান্তনু শিবকে বলেছিল বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল কাব্যে। সেখানে বলা হয়েছে —

> ''শান্তনু বলেন গোসাঞি শুন ত্রিলোচন
> আজি আনি দিহ গঙ্গা আমার সদন।
> যদি ভাগীরথী আজি বঞ্চেন তথাই
> তবেত গঙ্গারে আমি নাহি দিব ঠাঞি।''[৩৩]

কিন্তু নারদ চরিত্রের ঝগড়ার বৈশিষ্ট্যকে শিবের শর্ত ভঙ্গের কারণ হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। তাই শান্তনু মুনি গঙ্গার চরিত্র ভ্রষ্টের কারণে তাকে পরিত্যাগ করে। শিব বাধ্য হয়ে তাকে মাথায় ধারণ করে। গঙ্গাকে স্বামী শান্তনুর পরিত্যাগের কথা মহাভারতেও রয়েছে। কিন্তু সেখানে শান্তনু

মুনি গঙ্গাকে ত্যাগ করেছে পুত্রদের ভাসিয়ে দেওয়ার কারণে। তাই পুরাণের এই বর্ণনার সঙ্গে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের এই অংশের কাহিনীর কোন সাদৃশ্য নেই। বাংলার জনপ্রিয় মৌখিক সংস্কৃতিতে গঙ্গা শিবের স্ত্রীতে পরিণত হয়েছে। গঙ্গা ও শান্তনুর দাম্পত্যের লোকপ্রচলিত কাহিনীকে এখানে উপকাহিনী হিসাবে যুক্ত করা হয়েছে। মূল কাহিনীর প্রধান পুরুষ চরিত্র শিবের সঙ্গে তার সম্পর্কের দিকটিও প্রচলিত সমাজ থেকে সংগ্রহ করা। কবি মানিক দত্ত এভাবে মূল কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে লোকপ্রচলিত পুরাণের কাহিনীগুলিকে যুক্ত করে দিয়েছেন।

অতঃপর শিবের অধিবাসের দ্রব্য সামগ্রী প্রেরণকে কেন্দ্র করে নারদের ভীমকে সঙ্গে করে হিমালয় গৃহে যাত্রার ঘটনা বিবৃত হয়েছে। কিন্তু ক্ষুধাবশত ভীম ও নারদ সেগুলি খেয়ে তার স্থানে কাদা, বালু পূর্ণ করে হিমালয় গৃহে পৌঁছায়। তাতে তাদের প্রতি মেনকার ক্রোধ জন্মানো স্বাভাবিক। তা নিয়ে উভয় পক্ষের ঝগড়াও চরিত্র ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তাৎপর্যপূর্ণ। লোকসমাজে প্রচলিত নারদের ঝগড়া এবং ভীমের শক্তিশালীরূপ কাহিনীর মধ্যে জটিলতা ও হাস্য পরিহাসের সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয় এই বিবাহকে সামনে রেখে আরও বহু চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। তারা হল হিরা তারা, সুরেশ্বরী, মোহিনী ও পিঙ্গলা প্রভৃতি নারীগণ। তারা গৌরীর বিবাহে জল সাধতে এসেছে। এদিকে শিব হাড় মালা গলায় পরে, সাপ জটায় বেঁধে তার মধ্যে গঙ্গাকে স্থাপন করে এবং শিঙ্গা, বেণু হাতে নিয়ে বৃষের উপর বসে বিবাহে উপস্থিত হয়। বিবাহ সভায় নারদের কথায় শিব শাশুড়ির সামনে উলঙ্গ হয়ে যায়। শিবের এরূপ নগ্ন চেহারা দেখে মেনকা লজ্জিত হয়। 'পদ্মপুরাণ'-এর সৃষ্টিতত্ত্বেও শিবের যে চিত্র অঙ্কিত রয়েছে সেটি হল —

> ''পুরা শর্ব্বঃ স্ত্রিয়ো দৃষ্টা যুবতীরূপশালিনীঃ।
> গন্ধর্ব্বকিন্নরাণাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ সর্ব্বতঃ।।১
> মন্ত্রেণ তাঃ সমাকৃষ্য ত্বতিদূরে বিহায়সি।
> তপো ব্যাজপরো দেবস্তাসু সঙ্গতমানসঃ।।২
> অতিরম্যাং কুটীং কৃত্বা তাভিঃ সহ মহেশ্বরঃ।
> ক্রীড়াঞ্চকার সহসা মনোভাব-পরাভবঃ।।৩''[৩৪]

(অর্থাৎ, ''পুরাকালে মহাদেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর এবং মনুষ্যগণের রূপবতী যুবতী স্ত্রীসকল দেখিয়া মন্ত্রবলে তাহাদিগকে আকর্ষণ পূর্ব্বক অতি দূরে আকাশপথে লইয়া গেলেন। দেবদেব তপস্যাব্যাজে তাহাদের সহিত সংগম করিবার মানসে এক অতিরম্য কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি মনভাবের পরাভব কর্ত্তা হইলেও সেই সকল রমণীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।''[৩৪]) তবে এই চিত্রের সঙ্গে এই কাব্যের চিত্রের একটু তফাৎ রয়েছে। উলঙ্গ শিবকে দেখে এয়োগণ লজ্জিত হয়। তারা শিবের কপালে ফোটা দিতে গেলে সাপ ছোপ মারতে উদ্যত হয়। তা দেখে এয়োগণ তাকে

'বাদিয়া'-র সন্তান বলে সম্বোধন করে। নির্লজ্জ বৃদ্ধ শিব সেই অবস্থায় ডমরু বাজিয়ে হাসতে থাকে এবং তার চারপাশে ভূত-প্রেতও নাচতে থাকে।

''আইল মেনকা রানী জাঙাই বরিতে।
জাঙাই নাঙ্গটা দেখি রহে হেট মাথে।।
শিবের কপালে আইহ ফোটা দিতে জায়।
শিবের জটের সর্প্প ছই দিতে চায়।।
নারীগণ বলে শিব বাদিয়ার পো।
কপালে চন্দন দিতে সাপে মারে ছো।।
এতেক নাঙ্গটা শিব মাথে সাপের জটা।
বর নহে এই শিব বাদিয়ার বেটা।।
শিবকে দেখি নারীগণ দূরতে পলায়।
শাশুড়ের আগে শিব ডমরূ বাজায়।।
বুড়ার বেশ হওঞা শিব হাসি ২ পড়ে।
কথা কহিতে শিবের দণ্ড গোলা নড়ে।।
প্রেত ভূত সঙ্গে শিব নাচে চারিপাশে।
শিব চরিত্র দেখি সকলিএ হাসে।।''[৩৫]

পদ্মপুরাণের কাহিনীতে শিব ছিল নারীর শ্লীলতানাশক ও রুদ্র, তার সঙ্গে ছিল পিনাক। সেখানে শিব আর্য সংস্কৃতির বাহক। পরবর্তীকালে মঙ্গলকাব্যের কবিদের হাতে সে পরিণত হয়েছে শ্মশানচারী বৃদ্ধ, গলায় হাড়ের মালা, হাতে ডমরু ও শিঙ্গা এবং তার বাহন হয়েছে ভূত-প্রেত। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীতে শিবের আর্যেতর লৌকিক সংস্কৃতির মিলন মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একথা বলা অসঙ্গত হবে না।

সেই সঙ্গে কাহিনীতে এসেছে বাস্তবতার ছোঁয়া। কন্যার দাম্পত্য জীবনের চরম ভবিষ্যতের কথা ভেবে মেনকা স্বামী হিমালয়ের উপর ক্রুদ্ধ হয়। মাতা হিসাবে মেনকাই অনুভব করতে পারে সমাজের এই বয়োবৈষম্য বিবাহের পরিণতি। কিন্তু হিমালয় তাকে শিবের মহিমা ও ক্ষমতার কথা বলে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করে। তবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অবলা নারীর মনে বিশ্বাসের দৃঢ় বাঁধ গড়ে ওঠে না। তাই ভবিষ্যতে চরম অশান্তি হওয়ার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয় বলে মনে হয়েছে মেনকার। প্রসঙ্গত, নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয় — ''শিব-গৌরীর বিবাহ-প্রসঙ্গ লইয়া সমসাময়িক বাঙালীর হৃদয়াবেগ ও চিত্তে স্পর্শালুতা প্রত্যক্ষগোচর তেমনই অন্যদিকে বাঙালী চিত্তে নারীর প্রাধান্য ও নারীভাবনার প্রসারও সমান প্রত্যক্ষ।''[৩৬] মধ্যযুগে

অসহায় অবলা নারীর ক্রন্দন ও আত্মহত্যা ছাড়া সুখ-শান্তি-আনন্দের কোন পথ ছিল না বলে মনে হয়। মেনকার মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের সমাজ বাস্তবতার দিকটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

এর পর মুহূর্তেই কবি কাহিনীর গতি পথকে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সে ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে শাশুড়ির নিন্দায় অসহ্য শিবের রাম ব্রহ্ম মন্ত্র জপের মাধ্যমে মোহনরূপ ধারণ করার প্রসঙ্গটি।

"রাম ব্রহ্ম মন্ত্র শিব হৃদএ জপিল।
কামিনীমোহনরূপ শিব ঠাকুর হৈল।।"[৩৭]

কাহিনীর মোড় ঘোরাতে কবি রাম ব্রহ্মমন্ত্রকে কৌশলে কাজে লাগিয়েছেন। শিবের মত কুলীন বৃদ্ধ মানুষের কাছে রাম ব্রহ্ম ও ঈশ্বররূপে পূজিত। রামের এই স্বরূপ অধ্যাত্ম ও অদ্ভুত রামায়ণেও লক্ষ্য করা যায়। এই কাব্যের কাহিনী ধারায় রামের ঈশ্বরত্বে পরিণতি হওয়ায় ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব পড়ে থাকবে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার সুকুমার সেন বলেছেন— "চৈতন্যের আবির্ভাবের আগে বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণবদীক্ষা দুই রকমের ছিল — বেশির ভাগ কৃষ্ণ মন্ত্রে আর অল্প ভাগ রাম মন্ত্রে। রাম মন্ত্রের দীক্ষা উত্তরপূর্ব বঙ্গে আসাম পর্যন্ত বেশি প্রচলিত ছিল।"[৩৮] পরবর্তীকালে এর প্রভাব লক্ষ্য করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার সুকুমার সেন মহাশয় মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী সম্বন্ধে বলেছেন — "গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ছাপ যথেষ্টই আছে।"[৩৯] সমকালীন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে কবি চরিত্রের এবং কাহিনীর মোড় ঘোরাতে কাজে লাগিয়েছেন। স্বভাবতই মেনকা শিবের মোহনীয় রূপ দেখে আনন্দিত হয়। হিন্দু মতে কলাগাছ স্থাপন করে তার মাঝে সুবর্ণ ঘট রেখে পূর্বমুখে পুরোহিত বসে বিবাহের কার্য শুরু হয়। সেখানে শিব দুর্গাকে নিয়ে সাতবার বিবাহ মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করে। শিব-দুর্গার গলায় পিতা হিমালয়ের পুষ্পমালা প্রদান অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক এবং স্বতন্ত্রও বটে। পুরোহিত শিবের পূর্বপুরুষের নাম জিজ্ঞাসা করলে সে ব্রহ্মার দিকে তাকিয়ে হাসতে শুরু করে। কারণ সে অনাদি পুরুষ এবং সমুদ্রমন্থনের গরল পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিল। মহাভারতে শিবের এই পরিচয়ের সঙ্গে লোকসমাজে প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতিকে কবি কাহিনীতে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ করেছেন। শুধু তাই নয়, বিবাহের দান স্বরূপ দুই দাসীসহ সিংহ বাহন প্রদান উচ্চশ্রেণীর দুর্গা চরিত্রের অনুগামী।

"উচ্চারিএগা নাম গোত্র কন্যা দান কৈল।
দুই দাসী সিংহ বাহন দুর্গাকে দিল।।"[৪০]

শিব-দুর্গার বিবাহ কবির কথায় আদ্যগীত। এই আদ্যগীত যে জপ করবে সে যমের ভয় বা মৃত্যুকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করতে পারবে। কবির কথায় —

"শিব দুর্গার নাম জেবা জপে হৃদয়তে।

শমনের ভয় সেই তরিবে হেলাতে।।
আদ্যগীত শিবের বিভা এই আদ্যবাণী।
গাইল মানিক দত্ত ভাবিঞা ভবানী।।"[৪১]

কবি মানিক দত্ত লোকসমাজের সম্মুখে তাদের জীবন তরীর পথ নির্দেশ করে দিচ্ছেন। ব্রতকথার লোক প্রয়োজনীয়তাকেই কবি কাহিনীর মধ্যে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়— "... মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর উপর মেয়েলী ব্রতকথাগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাবও কিছু কিছু কার্যকর হইয়াছে। ... মঙ্গলকাব্যের মূল দেবচরিত্রের মৌলিক উপাদান বিষয়ে বিশেষ কোন পার্থক্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। উভয়দিকেই উদ্দিষ্ট দেবতা ভক্তের রক্ষক এবং অভক্তের সংহারক এবং উভয়ক্ষেত্রেই দেবতাদের মর্ত্যলোকে নিজস্ব পূজা প্রচারই লক্ষ্য।"[৪২] এই ব্রতকথার দ্বারা গ্রথিত কাহিনী ক্ষণে ক্ষণে শিথিল প্রাপ্ত হয়েছে।

তারপর কবি কাহিনীর কার্যকারণ সূত্রানুযায়ী কালানুক্রমিক গ্রন্থনার পিনদ্ধ রক্ষা করতে পারেন নি। প্রধান কাহিনী মূল স্রোত থেকে পাশ ফিরে আবার মিলিত হয়েছে। কবি মানিক দত্ত শিব-দুর্গার বিবাহের ব্রতকথা লোক সমাজে শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করার পর হঠাৎ কাহিনী দুর্গার দেহের ময়লায় তৈরী গণেশের জন্মের প্রসঙ্গে প্রবেশ করেছে। বিবাহের পর গণেশের জন্ম কথার বিষয় বিশ্বাসযোগ্য। এরূপ গৌরীর বাল্য বয়সে শিব পূজার মধ্যে সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা সম্ভাবনার বীজ সুপ্ত ছিল। কিন্তু কোথায় যেন কাহিনীর ক্রম অগ্রগতিতে একটু অসঙ্গতি ঠেকে। মাঝে তাদের দাম্পত্য জীবনের কথা বললে হয়তো কাহিনী গ্রন্থনায় সন্তান লাভের ঘটনাটি অনিবার্য মনে হত। যাইহোক, গণেশের জন্ম বৃত্তান্ত বলার ভঙ্গী লোকগল্প বলার মতো এবং কল্পনাপ্রসূত। দুর্গা তার অঙ্গের মল দিয়ে একটি পুতুল নির্মাণ করলে শিব তাতে জীবন দান করে।

"একদিন দুর্গা অঙ্গের মলি উঠাইল।
মলির পুতুলি এক নির্ম্মান করিল।।
মলির পুতুলি শিব জীব দান দিল।
গণেশ পুত্র বলিঞা তাহার নাম থুল্য।।"[৪৩]

গণেশের জন্ম বৃত্তান্ত কাহিনী অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ বটে। এই বর্ণনার সঙ্গে বামন পুরাণের গণেশ জন্মের মিল রয়েছে। পুরাণের দেবদেবী সম্পর্কে গবেষক শম্ভুনাথ কুণ্ডু যথার্থই বলেছেন — "গণেশের জন্মবৃত্তান্ত কল্পনানির্ভর এবং সেই সঙ্গে কৌতুকপ্রদও বটে। বরাহপুরাণে (২৩ অ.) রুদ্রশিবের দেহজাত গণেশ রুদ্রেরই প্রতিমূর্ত্তিরূপে কল্পিত। ... কালক্রমে গণপতি রুদ্র-শিব থেকে পৃথক দেবসত্তায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন বলেই মনে হয়। শিব পুরাণের জ্ঞানসংহিতায় (৩২ অ.)

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে (৩২ অ.) পার্বতী পঙ্ক দ্বারা গণেশমূর্ত্তি নির্মাণ করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। বামনপুরাণে (৫৪ অ.) দেবীর গাত্রমল থেকে তাঁর জন্ম। মৎস্যপুরাণে (১৫৪ অ.) উমা গাত্রমার্জনচূর্ণ দিয়ে গজাননকে সৃষ্টি করেন। বৃহদ্ধর্ম (মধ্যখণ্ড ৩০ অ.) ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের গণেশখণ্ডে (৯ অ.) পুরাণকার গণেশজন্মকে কেন্দ্র করে বিচিত্র কাহিনীর অবতারণা করেছেন। গণেশের গজমুণ্ড নিয়েও পুরাণকারদের অনুরূপ কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে রুদ্ররূপী গণপতি অপেক্ষা রুদ্রপুত্র গণেশই সমধিক প্রসিদ্ধ।''[৪৪] মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে গণেশের জন্ম বৃত্তান্তের মিল রয়েছে বামনপুরাণের সঙ্গে। এই জন্মবৃত্তান্তকে কেন্দ্র করে নতুন ঘটনার সমাবেশ। সেটি হল শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ডুচ্ছেদ। শিবের কথায় চণ্ড উত্তর মুখে শুয়ে থাকা ইন্দ্রের হস্তির মুণ্ডু কেটে গণেশের মাথায় স্থাপন করল এবং মন্ত্র জপ করে শিব মুণ্ডু জোড়া দিল। কবির কথায় —

''শিব ঠাকুর বলে চণ্ড শুন মোর কথা।/উত্তর মুণ্ডে যেবা থাকে য়ান তার মাথা।।
উত্তর মুণ্ডে শুঞা ইন্দ্রের হস্তি ছিল।/ হস্তির মুণ্ড কাটি চণ্ড শিবকে য়ানি দিল।
মন্ত্র জপি শিব ঠাকুর মুণ্ড জোড়া দিল।/ শুণ্ড মুণ্ডে গণপতি উঠিয়া বসিল।।''[৪৫]

এই বর্ণনার সঙ্গে কৃত্তিবাস ওঝার 'রামায়ণ'-এর আদি খণ্ডের কিছু অংশের সাদৃশ্য রয়েছে। সেই অংশটুকু তুলে ধরা হল —

''দেবগণ বলেন শুনহ বিশ্বমাতা।
শনির দৃষ্টিতে ভস্ম গণেশের মাথা।।
* * *
আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা তবে পবনেরে।
মুণ্ড কাটি আন যেবা উত্তর শিয়রে।।
গঙ্গানীর খাইয়া ইন্দ্রের ঐরাবত।
উত্তর শিয়রে শুয়েছিল নিদ্রাগত।।
কাটিয়া তাহার মুণ্ড আনিল পবন।
রক্তমাংসে জীয়াইল হৈল গজানন।।''[৪৬]

উভয় স্থানে গণেশের নাম গণপতি পাওয়া যায়। পুরাণে রুদ্রের নাম ছিল গণপতি। কিন্তু পরবর্তী কালে রুদ্রের গুণাবলী তার পুত্র গণেশের মধ্যে বর্ষিত হওয়ায় তাকে গণপতি বলা হয়। প্রসঙ্গত, পুরাণের দেবদেবী সম্বন্ধে গবেষক শম্ভুনাথ কুণ্ডু বলেছেন — ''প্রাথমিক পর্বে রুদ্রই গণপতি, গণাধিপ রূপে পরিচিত হলেও পরবর্তীকালে রুদ্রপুত্রে উক্ত গুণকর্ম আরোপিত হতে দেখা যায়। গণের পতিরূপেই তিনি গণপতি।''[৪৭] মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীতে গণেশের জন্ম

বৃত্তান্তে পুরাণ ভাবনার সঙ্গে লৌকিক ভাবনারও সংমিশ্রণ ঘটেছে বলে মনে হয়। সেই লৌকিক ভাবনা হল গণেশের মুষিক বাহন। Alige Getty বলেছেন — "... his elephant-head and his mouth, the rat, indicate that, although he may have been taken over from indigenous mythology, he belonged originally to an animal cult."[৪৮] এই সকল পৌরাণিক ও লৌকিক ভাবনার সঙ্গে গণেশের মুখে সমকালীন রাম গুণগানকে সংযুক্ত করে দিয়েছেন কবি। তাই মনে হয় মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে গণেশের জন্ম কথা একই সঙ্গে পৌরাণিক লৌকিক কাহিনীর সঙ্গে সমকাল রামকথা সচেতন মিশ্র সংস্কৃতির পরিচায়ক। গণেশ জন্ম-বৃত্তান্ত কাহিনীর মধ্যে আলাদা একটি প্লটের বীজ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়, যা অত্যন্ত কৌতূহলজনক।

গণেশ জন্মের পর কার্তিকের জন্মরহস্য সম্পর্কে কবি অত্যন্ত অলৌকিক বর্ণনা দিয়েছেন। ঘটনা নিয়ন্ত্রণে কার্তিক চরিত্রের কোন ভূমিকা নেই। মূল কাহিনীর সূত্র ধরে কেবল রহস্য সৃষ্টি হয়েছে। শিব-গৌরীর পুত্র কার্তিকের জন্মের কারণ বলা হয়েছে অত্যাচারী তারকাসুরকে নিধন করার জন্য। এই প্রসঙ্গে শম্ভুনাথ কুণ্ডু বলেছেন — ''বিভিন্ন পুরাণে কার্ত্তিকের বিচিত্র জন্ম-বৃত্তান্তের পরিচয় বিবৃত হয়েছে। উপযুক্ত সেনাপতির অভাবে দৈত্যহস্তে দেবগণ বিপর্যস্ত স্বর্গচ্যুত। তারকাসুরের অত্যাচার থেকে দেবগণ তথা ত্রিভুবনকে রক্ষা করার জন্যই শিব ও পার্বতীর পুত্ররূপে তাঁর মহাবির্ভাব।''[৪৯] মানিক দত্ত চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারের কাহিনী বলতে গিয়ে কার্তিকের জন্মের একটু ছোট কাহিনী মাঝখান থেকে বলে দিয়েছেন। তার বর্ণনা কৌশল পাঁচালী ঢঙ্গের। কবি বলেছেন এইভাবে —

''শুন ২ সর্ব্বজন   কার্ত্তিকের বিবরণ
জে রূপে কার্ত্তিক জন্মিল।''[৫০]

সেই জন্মরহস্যের ঘটনা কৌতূহলোদ্দীপক। ঘটনাটি হল শিব রতিরঙ্গের সময় তার বীর্যপাত হলে তা দুর্গা তার উদরে ধারণ করে। সেই বীর্য এতটাই ভয়ঙ্কর ও প্রচণ্ড যে তিন-চার মাসের বেশি ধারণ করতে অক্ষম হলে তা অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। অগ্নিও সেই বীর্য গঙ্গাতে ফেলে দেয়। এরূপ গুণসিন্ধু বীর্য তিন মাসের বেশি ধারণ করতে অক্ষম হলে তা বনে রাখা হয়। সেখানে ছয় মাথা যুক্ত কার্তিকের জন্ম হয়। সে বলবান ও তার বাহন ময়ূর। তারকাসুরের নিধনকারী হিসেবে কার্তিককে জন্মের উৎস থেকেই শক্তিশালীরূপে দেখানো হয়েছে। এই বর্ণনা বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন রকম। মহাভারতে কার্তিকের জন্মের কথা বলা হয়েছে এইভাবে —

''ষট্‌কৃত্বস্তত্র নিক্ষিপ্তমগ্নে রেতঃ কুরূত্তম্!।
তস্মিন্ কুণ্ডে প্রতিপদি কামিন্যা স্বাহয়া তদা।। ১৫।।

তৎ স্কন্নং তেজসা তত্র সংবৃতং জনয়ৎ সুতম্।
ঋষিভিঃ পূজিতং স্কন্নমনয়ৎ স্কন্দতাং ততঃ।। ১৬।।
ষট্‌শিরা দ্বিগুণশ্রোত্রো দ্বিনাসাক্ষিভুজক্রমঃ।
একগ্রীবৈকজঠরঃ কুমারঃ সমপদ্যত।। ১৭।।"[৫১]

(অর্থাৎ, "কুরুশ্রেষ্ঠ! কামুকী স্বাহাদেবী প্রতিপৎ তিথিতে সেই স্বর্ণকুণ্ডে ছয় বার অগ্নিদেবের শুক্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।। ১৫।। সেই শুক্র তেজে আবৃত ছিল, তাই ঋষিরা তাহার আদর করিয়াছিলেন; ক্রমে সেই শুক্র একটী পুত্ররূপে পরিণত হল; স্কন্দ — অর্থাৎ স্থলিত শুক্র হইতে জন্মিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম হইল স্কন্দ।। ১৬।। সেই বালকটীর ছয়টী মাথা, বারখানি কাণ, ছয়টী নাখ, বারটী চোখ, বারখানি হাত, একটী গ্রীবা এবং একটী উদর হইয়াছিল।। ১৭।।"[৫১]) কিন্তু স্কন্দপুরাণে কার্তিকের জন্মের কথা বলা হয়েছে একটু অন্যভাবে। সেখানে শিবের বীর্য অগ্নি ধারণ করে। কিন্তু সে তা সহ্য করতে পারে না। বনের ঋষিগণের পত্নীরা শীতকালে অগ্নি তাপ নিতে গেলে সেই বীর্য তাদের দেহে সঞ্চারিত হয়। তারফলে ঋষিগণ তাদের অভিশাপ দেয় এবং তারা আকাশের নক্ষত্রে পরিণত হয়। তখন তারা —

"তদানীমেব তাঃ সর্ব্বা ব্যাভিচারেণ দুঃখিতাঃ।
তৎ সসর্জ্জুস্তদা রেতঃ পৃষ্ঠে হিমবতো গিরেঃ।। ৭৬
ঐকপদ্যেন তদ্রেতস্তপ্তচামীকরপ্রভম্।
গঙ্গায়াঞ্চ তদা ক্ষিপ্তং কীচকৈঃ পরিবেষ্টিতম্।। ৭৭
ষন্মুখং বালকং জ্ঞাত্বা সর্ব্বে দেবা মুদান্বিতা।"[৫২]

(অর্থাৎ, "ব্যভিচার-দোষে কৃত্তিকাগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইল। তৎকালে হিমগিরির পৃষ্ঠে সেই রেতঃ বিসর্জ্জন করিলেন। ক্রমে সকলের রেতঃ একীভূত হইয়া তপ্ত চামীকরাকর ধারণ করিল এবং ঘটনাক্রমে সত্বরই তাহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া কীচকসমূহে পরিবেষ্টিত হইল। দেবগণ তখন সেই রেতঃকে ষন্মুখ বালকরূপে অবগত হইয়া মুদান্বিত হইলেন।"[৫২]) আবার, কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্' কাব্যের দশম সর্গ-এ বলা হয়েছে —

"কৃশানুরেতসো রেতস্তাসামভি কালেবরম্।/ অমোঘং সঞ্চচারাথ সদ্যো গঙ্গাবগাহনাৎ।। ৫৪।।
রৌদ্রং সুদুর্দ্ধরং ধাম দধানা দহনাত্মকম্।/ পরিতাপমবাপুস্তা মগ্না ইব বিষাম্বুধৌ।। ৫৫।।
অক্ষমা দুর্বহং বোঢুমদৃশ্বনো বহিবাতুরাঃ।/ অগ্নিং জ্বলন্তমন্তস্তা দধানা ইব নির্যযুঃ।। ৫৬।।
অমোঘং শাম্ভবং বীজং সদ্যো নদ্যোঙ্কিতং মহৎ।/ তামামভ্যুদরং দীপং স্থিতং গর্ভত্বমাগমৎ।। ৫৭।।
সুজ্ঞা বিজ্ঞায় তা গর্ভভূতং তদবোঢ়মক্ষমাঃ।/ বিষাদমাদধুঃ সদ্যো গাঢ়ং ভর্ত্তৃভিয়া হ্রিয়া।। ৫৮।।
ততঃ শরবণে সার্দ্ধং ভয়েন ব্রীড়য়া চ তাঃ।/ তদগর্ভজাতমুৎসৃজ্য স্বান্ গৃহানভিনির্যযুঃ।। ৫৯।।

তাভিস্তত্রামৃতকরকলাকোমলং ভাসমানং তদ্বিক্ষিপ্তং ক্ষণমভি নভো গর্ভমভ্যুজ্জিহানৈঃ।

স্বৈস্তেজোভির্দিনকরশতস্পর্দ্ধমানৈরমানৈর্বক্তৈঃ ষড়্‌ভিঃ স্মরহরগুরুস্পর্দ্ধয়েবাজনীব।।৬০।।"[৫৩]

(অর্থাৎ, "অনন্তর গঙ্গাজলে অবগাহন হেতু মহাদেবের সেই অমোঘ রেতঃ ষট্‌কৃত্তিকার শরীরাভ্যন্তরে সঞ্চারিত হইল।। ৫৪।। তাঁহার সেই দুর্দ্ধর দহনাত্মক রুদ্রতেজ ধারণ করিয়া বিষসমুদ্রে নিমগ্নের ন্যায় (দুঃসহ) সন্তাপ প্রাপ্ত হইলেন।। ৫৫।। তাঁহার সেই দুর্ব্বহ তেজঃ বহনে অসমর্থ ও আতুর হইয়া যেন জ্বলন্ত অগ্নি অন্তরে ধারণপূর্ব্বক জল হইতে বহির্গত হইলেন।। ৫৬।। গঙ্গা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সেই তীব্র অমোঘ শৈববীজ তাঁহাদের উদর মধ্যে সংস্থিত হইয়া গর্ভত্ব প্রাপ্ত হইলো।। ৫৭।। সম্যক্ জ্ঞানবতী কৃত্তিকারা সেই তেজঃ গর্ভে পরিণত হইয়াছে জানিয়া ও তাহা বহনে অসমর্থ হইয়া স্বামীর ভয়ে ও লজ্জায় অত্যন্ত বিষন্নভাব প্রাপ্ত হইলেন।। ৫৮।। তদন্তর সেই ষটকৃত্তিকা ভয় ও লজ্জার সহিত শরবনে সেই গর্ভ পরিত্যাগ করিয়া নিজ গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।। ৫৯।। তাঁহারা সেই শরবনে শশিকলার ন্যায় কোমল সেই গর্ভ ক্ষণকাল মধ্যে আকাশে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলে, শত শত সূর্য্যের প্রতি স্পর্দ্ধাকারী সেই অপরিমেয় তেজঃ স্মরহরগুরু ব্রহ্মার মস্তকের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়াই যেন ছয়টি মুখ প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিল।। ৬০।।"[৫৩]) এখানে যেসকল পুরাণে কার্তিকের জন্মের রহস্যময় কাহিনী রয়েছে তার সঙ্গে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কার্তিকের জন্মের কাহিনীর কিছু কিছু মিল রয়েছে। কবি মানিক দত্ত হুবহু পুরাণ থেকে এই অংশটিকে কাহিনীর মধ্যে গ্রহণ করেন নি। তিনি পুরাণের ভাবনার সঙ্গে চণ্ডীর গর্ভে শিবের বীর্যকে ধারণ করার কথা সংযুক্ত করেছেন। তিনি কার্তিকের এই জন্ম রহস্যকে শিব ও দুর্গা অবলম্বনে রচিত মূল কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত করে একটা আলাদা উপকাহিনীর সৃষ্টি করেছেন।

এই কাহিনীর পর মানিক দত্ত দেবী চণ্ডীকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তার সম্বন্ধে স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করেছেন। তার ফলে কাহিনী গ্রন্থনায় কার্যকারণ সূত্র ও অনিবার্যতার গুণ হারিয়েছে। সেখানে দেবী চণ্ডীকে তিনি কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী নিয়ে দুর্গাকে মাতৃরূপেই চিহ্নিত করেছেন। কবির কথায় —

"নম নম নম মাতা নম নারায়নি।
তুমার চরণ বন্দ লুটাঞা ধরনী।।
অপার মহিমা তুমার বলিতে না জানি।
সৃষ্টি রক্ষিনী মাতা আদ্যা ভবানী।।
*　　　*　　　*
গণেশ লইঞা কোলে পঞ্চ দেবতা।

নাএকের কামনা সিদ্ধ কর দুর্গামাতা।''[৫৪]

এই বর্ণনার সঙ্গে কাব্যের মূল অভিপ্রায়ের কোন যোগ নেই। সন্তান বৎসল দেবীর প্রতি ভক্তের আত্মিক স্তুতি বাক্যই প্রধান হয়ে উঠেছে।

তারপর তিনি যে উপকাহিনীটি তুলে ধরেছেন সেখানেও চণ্ডীর মাহাত্ম্যকে প্রকাশ করার অবকাশ রয়েছে। সেই উপকাহিনীটি হল পুরাণের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত মধুকৈটভ অসুরদ্বয়ের জন্মের ঘটনা। এই ঘটনায় অসুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণ স্বরূপ চণ্ডীর আবির্ভাব। মধুকৈটভ অসুরদ্বয়ের জন্ম ও তাদের থেকে বহু অসুরের জন্মের কথা তিনি গল্পের মত করে বলেছেন।

''একদিন বিষ্ণু কর্ণতে হস্ত দিল।
কর্ণমূলে মধুকৈটভ অসুর জন্মিল।।
জন্মিতে ২ অনেক অসুর হৈল।
লেখা জোখা নাই অসুরময় হৈল।।
সকল অসুর হৈল বড়ই প্রচণ্ড।''[৫৫]

এই মধুকৈটভের জন্মের ঘটনার সঙ্গে 'মার্কণ্ডেয়পুরাণম্' গ্রন্থে বর্ণিত তাদের জন্ম কথার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে বিষ্ণু যোগনিন্দ্রা অবলম্বন করলে —

''তদা দ্বাবসুরৌ খোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ
বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ।। ৫০''[৫৬]

(অর্থাৎ, ''তখন বিষ্ণু-কর্ণমলসম্ভূত, মধু ও কৈটভ নামে বিখ্যাত ভয়ঙ্কর অসুরদ্বয় ব্রহ্মাকে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছিল।''[৫৬]) 'দেবী-ভাগবত'-এ মধুকৈটভ জন্মের কথা প্রায় অনুরূপ পাওয়া যায়। '' ... মহাবলশালী মধুকৈটভ নামক দানবদ্বয় ভগবান বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হইয়া সাগর জলেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করত কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিল।''[৫৭] এদের ভয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকুণ্ডে লুকিয়ে পড়ে। বিষ্ণু অসুরের দৌরাত্ম্য শুনে ক্রোধান্বিত হয়। তাদের সঙ্গে বিষ্ণুর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেই যুদ্ধ 'ষাটি সহস্র' বছর চলতে থাকে। এই উভয়পক্ষের মল্ল যুদ্ধের বর্ণনা আমরা 'দেবী-ভাগবত' গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে পাই। মল্ল যুদ্ধে অপরাজেয় হয়ে অসুরদ্বয় বিষ্ণুকে তাদের জলের উপর নিধন করতে বলে। তাই বিষ্ণু মধুকৈটভ অসুরদ্বয়কে উরুর উপর রেখে বধ করল। কিন্তু সেই অসুরের রক্তে আরো অসুরের জন্ম হতে থাকে।

''রণতে অসুর জদি মরে একজন।
এক অসুরের রক্তে জন্মে কতজন।।''[৫৮]

বিষ্ণু নিরূপায় হয়ে দেবী দুর্গার শরণাপন্ন হল। দশভুজা দুর্গাকে যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন শিব ত্রিশূল,

বরুণ নাগপাশ, যম যমদণ্ড প্রদান করল। এই বর্ণনার সঙ্গে 'মার্কণ্ডেয়পুরাণম্' গ্রন্থে দেবীর প্রাপ্ত অস্ত্রের মিল রয়েছে।

> ''শূলং শূলাদ্বিনিষ্কৃষ্য দদৌ তস্যৈ পিনাকধৃক্।
>
> * * *
>
> কালদণ্ডাদ্যমো দণ্ডং পাশঞ্চাম্বুপতির্দদৌ।''[৫৯]

(অর্থাৎ, ''অনন্তর মহাদেব স্বকীয় শূল হইতে শূল আকর্ষণ করিয়া সেই দেবীকে প্রদান করিলেন। ... যম কালদণ্ড হইতে দণ্ড উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে দিলেন। বরুণ তাঁহাকে পাশ প্রদান করিলেন।''[৫৯]) ক্রোধান্বিত চণ্ডী অসুরদের একে একে সংহার করতে লাগল। সেই যুদ্ধে মহাবীজ ও রক্তবীজ নামে দুই অসুর রথ থেকে মাটিতে পড়ে গেলে দেবী চণ্ডী তাদের মাথা কেটে নেয়। তারপর চণ্ডী ক্রোধিত হয়ে সারথি সহ মহীধর নামে অসুরকে গলার্ধকরণ করে। কবি বলেছেন —

> ''ক্রোধিত হঞা দুর্গা মাতা মুখ মেলিল।
>
> সারথি সহিতে তাকে গিলিঞা ফেলিল।।''[৬০]

এর সঙ্গে 'মার্কণ্ডেয়পুরাণম্' গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে —

> ''পার্ষ্ণিগ্রাহারঙ্কুশগ্রাহি - যোধঘন্টাসমন্বিতান।
>
> সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্।। ৯।।
>
> তথৈব যোধং তুরগৈ রথং সারথিনা সহ।
>
> নিক্ষিপ্য বক্তে দশনৈশ্চর্ব্বয়ত্যতিভৈরবম্।। ১০।।''[৬১]

(অর্থাৎ , ''দেবী — পশ্চাদ্রক্ষক, অঙ্কুশগ্রাহী যোদ্ধা ও ঘন্টার সহিত হস্তিসমূহকে এক হাতে গ্রহণ করিয়া মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত যোদ্ধাগণকে গ্রহণপূর্ব্বক মুখে নিক্ষেপ করিয়া অতিভয়ঙ্কররূপে চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন।''[৬১]) দেবী চণ্ডী যত অসুরদের মুণ্ডু কাটতে লাগল ততই অসুরের সংখ্যা বাড়তে লাগল। এই অবস্থায় চণ্ডী খাপর পেতে রক্ত পান করে থাকে, তাদের ছেদন মুণ্ডুর মালা গলায় পরিধান করে।

> ''অসুরের মুণ্ড কত রণতে কাটিল।/ জত কাটে তত অসুর বাড়িতে লাগিল।।
>
> দেবগণ আসিঞা দুর্গাকে যুক্তি দিল।/ রণস্থল যুড়ি দুর্গা খাপর পাতিল।।
>
> জোগিনী সঙ্গে যুক্তি করি যুঝিছে ভবানী।/ দুর্গা পদভরে তথা কাপিছে ধরনী।।
>
> অসুরকে কাটে দুর্গা খাপর উপরে।/ খাপর ভরিঞা রক্ত দুর্গা পান করে।।
>
> প্রচণ্ড হইঞা দুর্গা ঘোর রণ করে।/ অসুরের মুণ্ড কাটি মুণ্ডমালা পড়ে।।''[৬২]

আমরা 'মার্কণ্ডেয়পুরাণম্'-নেও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা পাই। সেখানে বলা হয়েছে —

> ''পলায়নপরান্ দৃষ্টা দৈত্যান্ মাতৃগণাদ্দিতান্।

যোদ্ধুমভ্যায়যৌ ক্রুদ্ধো রক্তবীজো মহাসুরঃ।। ৩৯
রক্তবিন্দুর্যদা ভুমৌ পতত্যস্য শরীরতঃ।
সমুৎপততি মেদিন্যাস্তৎপ্রমাণস্তদাসুরঃ।। ৪০
*   *   *
যাবন্তঃ পতিতাস্তস্য শবীরাদ্রক্তবিন্দবঃ।
তাবন্তঃ পুরুষা জাতাস্তদ্বীর্য্যব বিক্রমাঃ।। ৪৩
*   *   *
ইত্যুক্ত্বা তাং ততো দেবী শূলেনাভিজঘান তম্।
মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজস্য শোণিতম্।। ৫৬''[৬৩]

(অর্থাৎ, ''মাতৃগণ-পীড়িত দৈত্যগণ পলায়ন করিতেছে দেখিয়া রক্তবীজ নামে মহাসুর ক্রোধে যুদ্ধ করিতে আগমন করিল। এই রক্তবীজাসুরের শরীর হইতে এক বিন্দু রক্ত যখন মাটিতে পতিত হয়, তখনই ভূমি হইতে তদ্‌নরূপ একটি অসুর উৎপন্ন হয়। ... তাহার শরীর হইতে যত রক্তবিন্দু পতিত হইল, তত পুরুষই উৎপন্ন হইল। .... এ দিকে সেই আহত অসুরের শরীর হইতে যে সকল শোণিত ক্ষরিত হইতে লাগিল, চামুণ্ডা সেই সকল শণিত মুখ দ্বারা গ্রহণ করিতে লাগিলেন।''[৬৩]) মুণ্ডমালা পরিধান করে চণ্ডী শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুরদ্বয়ের সঙ্গে পরাক্রম যুদ্ধে মত্ত হয়। সেই যুদ্ধে দেবী চণ্ডী ঘর্ম নিঃসৃত হয় এবং সেই ঘাম থেকে কালীর জন্ম হয়। কালী চামুণ্ডা হয়ে যুদ্ধে নামে এবং শুম্ভ-নিশুম্ভকে কেটে তার মাংস ভক্ষণ করে। কালীই আবার দুর্গারূপে রথ ও তার সারথিকে গলার্ধকরণ করে। লক্ষণীয়, আদ্যা এই কাব্যের কাহিনীতে দুর্গাতে, দুর্গা ভয়ঙ্করী কালীতে পরিণত হয়েছে। তার ভয়ঙ্কর সংহার রূপে পৃথিবী টলমল করে কাঁপতে থাকে। সেই বর্ণনা এইরূপ —

''রণ করে দুর্গা মাতা অতি যে গম্ভীর।/ রণ করিতে দুর্গার ঘামিল শরীর।।
ঘাম মুছিয়া দুর্গা ভূমিতে ফেলিল।/ দুর্গার ঘামেতে কালী তখন জন্মিল।।
চামুণ্ডা হঞা কালী রণতে নাম্ভিল।/ শুম্ভ নিশুম্ভকে কাটি তার মাংস খাল্য।।
মুণ্ড মালা পহ্রিয়া হইল বিপরীত।/ রথারথি গিলে দুর্গা সারথি সহিত।।
দিগম্বরী বেশে হঞা যুধ্য করিল।/ অসুর গণকে কালী সংহার করিল।।
রক্তে নদী ভাসি জায় হাসে খলখল।/ পদভরে পৃথিবী কাপিছে টলমল।।''[৬৪]

'দেবী-ভাগবত' গ্রন্থের ৩০ ও ৩১ অধ্যায়ের (পৃ. ৩১০-১৬) চামুণ্ডার ও কালীর শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ ও শণিত পান, মুণ্ডমালা পরিধানের কথা পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮৯ ও ৯০ অধ্যায়ে দেবী চণ্ডীর শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুরদ্বয়ের নিধনের অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে কালী দুর্গার দেহ থেকে জন্ম এবং একথা দেবী-ভাগবত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত হয়নি। কিন্তু 'পৌরাণিক অভিধান'-

এর সংকলক সুধীরচন্দ্র সরকার বলেছেন — ''শক্তি-উপাসকরা কালীকে আদ্যাশক্তি বলে উপাসনা করেন। ... বিশেষতঃ শুম্ভ-নিশুম্ভের সহিত যুদ্ধে, দেবতারা পরাজিত হয়ে স্বর্গ হতে বিতাড়িত হন ও দেবী আদ্যাশক্তি ভগবতীর স্তব করতে থাকেন। তখন দেবীর শরীর-কোষ হতে অপর এক দেবী আবির্ভূতা হন। সেই দেবী কৌষিকী নামে খ্যাত। দেবী কৌষিকী শরীর হতে নিষ্ক্রান্ত হলে, ভগবতী দেবী কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেন এবং সেই থেকে ইনি কালিকা বা কালী নামে পরিচিতা। ... দেবী কালী (পার্বতী) ও চণ্ডিকা (কৌশিকা) শুম্ভ-নিশুম্ভের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।''[৬৫] মানিক দত্ত শুম্ভ-নিশুম্ভের নিধনের কাহিনীতে পুরাণকে এবং তন্ত্রের শক্তিদেবীর উপর বেশি জোর দিয়েছেন বলে মনে হয়।

দেবীর সংহার রূপ প্রকাশেও তন্ত্রের প্রভাব রয়েছে। কাহিনী গ্রন্থনায় মূল কাহিনীর সঙ্গে এর অল্প সম্পর্ক থাকলেও দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারই এখানে মুখ্য। তাই দেবীর সংহার রূপকে শান্ত করতে এবং সৃষ্টি রক্ষার জন্য শিব উলঙ্গ হয়ে রণস্থলে শুয়ে পড়ে। কালী শিবকে অসুর ভেবে তার বুকের উপর পা দিয়ে দাঁড়ায়। সেই মুহূর্তে শিবকে দেখে লজ্জায় জিহ্বা দাঁতে চাপা দেয় এবং দেবী শান্ত হয়।

''সৃষ্টি রক্ষার তরে শিব রণতে আইল।
উলঙ্গ হইয়া শিব রণতে শুইল।।
হুহুঙ্কার ছাড়ি ক্রোধে দিঞা করতালি।
অসুর বুলিঞা শিবের বুকে চড়িলেন কালী।।
পদ তলে শিবকে দেখি লজ্জা বড় পাল্য।
দন্তে জিহ্বা ধরি কালী ক্রোধ নিবারিল।।''[৬৬]

এখানে কবি মানিক দত্ত কার্তিকের জন্মের কথা বলার পর চণ্ডীর স্তব করেই কাহিনীকে পুরাণ বিষয়ের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেছেন। তার ফলে দেবী চণ্ডীর কাহিনীর মধ্যে পুরাণে দেবী চণ্ডীর সঙ্গে সম্পর্কিত ছোট উপকাহিনী ও ঘটনা সংযোজিত হয়েছে। প্রধান কাহিনীর সঙ্গে এর সংযোগ স্বল্প। প্রধান কাহিনী ও তার প্রধান দেবী চরিত্রকে পাঠক সমাজে আকর্ষণীয় করে তুলতে গিয়ে মূল কাহিনী হয়েছে বিলম্বিত। তাতে মূল কাহিনী মঙ্গলকাব্যের কাঠামো থেকে অন্য ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। তাই এই অংশে কাহিনী গ্রন্থনার দৃঢ়তা বজায় থাকেনি বলে বোধ হয়।

অতঃপর কাহিনী মূল ধারায় ক্ষণকালের জন্য প্রবাহিত হয়। দেবী চণ্ডী নিজে পূজা প্রচারের জন্য নারদকে নিয়ে ইন্দ্র সভায় উপস্থিত হয়। ইন্দ্রের কাছে পুত্রদ্বয় পালনের জন্য সে পঞ্চদাসী প্রার্থনা করে। ইন্দ্র হারা, তারা, সত্যা, কমলা ও পদ্যা নামে পঞ্চদাসী তাকে প্রদান করে। এই পঞ্চদাসীকে দেখে কামাতুর শিব উন্মত্ত হয়। দেবী চণ্ডী তখন দাস-দাসীদের সঙ্গে শিবের কাম

প্রবৃত্তি নিবারণের ইচ্ছাকে দেবসমাজের ভয় দেখায়। একথায় শিব ভীত না হয়ে চণ্ডীকে নীতিবাক্য বলেছে —

“শিব বোলে শুন দুর্গা কহি আমি বানী।
জে জন পালন করে সে জন জননী।।”[৬৭]

কবি এই নীতি বাক্যকে চণ্ডীর মত মাতার পরাজয়ের অস্ত্র স্বরূপ তুলে ধরেছেন। তাই চণ্ডী শিবের সম্মুখে দাসীকে উপস্থিত করতে বাধ্য হয়। কাহিনীতে নারীর অসহায় অবস্থাকে কেন্দ্র করেই চণ্ডীর স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বেরিয়ে পড়ার ঘটনা বর্ণিত হয়। এই ঘটনায় কয়েকটি নারী চরিত্রের অনুপ্রবেশ কাহিনীতে লক্ষ্য করা যায়। তাদের সামাজিক পরিচয় সারথি ও জ্যোতিষী। তাদের মধ্যে ছিল সারথি ইমলা ও বিমলা এবং জ্যোতিষী পদ্মাবতী। এই পূজা প্রচারের ঘটনাকে সামনে রেখে অপর একটি মার্কণ্ডেয়পুরাণের ঘটনা এসেছে। সেটি এখানে দান্দ্বিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তার সূচনা পদ্মাবতীর কাছে দেবীর আগমনের মধ্য দিয়ে। পদ্মাবতী তাকে মর্ত্যে পদ্মার পূজা প্রচলনের ঘটনা বলে। সে ধূম্রলোচন নামক অসুরের সেবা করায় মর্ত্যে তার পূজা প্রচলন হয়। একথা শুনে দেবী চণ্ডী অতিষ্ঠ হয়ে ধূম্রাসুর বধের কথা তাকে বলে। সকল দেবতা ধূম্রাসুরের সেবা করলেও প্রবল পরাক্রমশালিনী দেবী চণ্ডী তাকে বধ করেই মর্ত্যে পূজা প্রচারের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছে। দেবী চণ্ডীর কথায় —

“ক্রোধে বলে নারায়নি শুন বাছা নারদ মুনি
জদি অসুর মারিবারে পারি।
দেবের ঘুচাব ভয় আনন্দ হৃদয়
গুপ্তকথা তোমাকে কোএগদি।।”[৬৮]

এই পূজা প্রচারের জন্য চণ্ডী সমকালীন মানুষেরপুথির প্রতি বিশ্বাসের দিকটি বড় করে তুলে ধরা হয়েছে।

“পুঁথি মেলিল পদ্মা উচ্চারিল
ধূম্র ভয়ে মর্থপুরে না আইযে দেবতা।।”[৬৯]

তাই চণ্ডী মর্ত্যে ধূম্রাসুরকে বধ করতে যায়। তাতে নারীর অসুর বিরোধিতা দেখে তাদের প্রমাদ মনে হয়েছে। এই প্রমাদের আড়ালে রয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চিরায়ত সংস্কার। তবে যুদ্ধে উভয় পক্ষের মধ্যে অশ্লীল গালাগালি অস্বাভাবিক ও লৌকিক গ্রাম্য বলে মনে হয়। ভয়ঙ্কর লড়াই দেখে নারদ ভয়ে রণস্থল থেকে পালিয়ে শিবের কাছে চণ্ডীর আসন্ন বিপদের কথা বর্ণনা পরবর্তী ঘটনার পরিপূরক। শিব তখন বৃষের উপর বসে শিঙ্গা, ডমরু, চক্র ও বাণ নিয়ে রণস্থলে উপস্থিত হয়। শিবের শিঙ্গা, ডমরুর সঙ্গে বিষ্ণুর চক্র ও বাণ ধারণ করা তার চরিত্রের

পক্ষে অনুপযুক্ত মনে হয়। শিবের আজ্ঞায় চণ্ডী বাণ দিয়ে ধূম্রাসুরের মাথা কাটে। কবির কথায় —

“শিবের আজ্ঞাএ দুর্গা হস্তে বাণ নিল।

অস্ত্রে মাথা কাটিয়া বুকে শেল দিল।।”[৭০]

‘মার্কণ্ডেয়পুরাণ’-এও দেবী চণ্ডীর ধূম্রাসুর বধের কথা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে —

“ইত্যুক্তঃ সোহভ্যধাবৎ তামসুরো ধূম্রলোচনঃ

হূঙ্কারেণৈব তং ভস্ম সা চকারাম্বিকা ততঃ।।”[৭১]

(অর্থাৎ, “দেবী এই কথা বলিবা মাত্র সেই ধূম্রলোচন নামক অসুর তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। তখন অম্বিকা হূঙ্কার দ্বারা সেই অসুরকে ভস্মীভূত করিলেন।”[৭১]) দেখা যাচ্ছে যে মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবী চণ্ডী ধূম্রালোচনকে হূঙ্কারের দ্বারা ভস্মীভূত করে। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সেখানে দেবী চণ্ডী বাণ দ্বারা তাকে নিধন করে। মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য কারণ হিসাবে এসেছে ধূম্রাসুরের বধের ঘটনা। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিবের পত্নীপরায়ণতার দিকটি। কবি এখানে ঘটনা পরিস্থিতি অনুসারে গ্রন্থনা করেছেন। সেই জন্য তিনি মার্কণ্ডেয়পুরাণকে তার অনুঘটক হিসাবে কাজে লাগিয়েছেন।

ধূম্রলোচন নিধনে তার মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য পদ্মা তাকে কলিঙ্গে দোহরা নির্মাণ করতে বলে। কাহিনী এখান থেকে মর্ত্যভূমিতে বিচরণ করে। কলিঙ্গে দোহরা নির্মাণ করার জন্য বিশ্বকর্মাকে চণ্ডী স্মরণ করে। বিশ্বকর্মা দেবীর কাছে সহকর্মী হিসেবে শক্তিশালী হনুমানকে দিতে বলে। হনুমান যে প্রবল শক্তিশালী তার প্রমাণ এর ফাঁকে কবি দিয়েছেন। বিশ্বকর্মার সঙ্গে ভীম ও অর্জুন নামে দুই শ্রমিক এই দোহরা নির্মাণের কাজে যোগ দান করে। এদের নাম পুরাণে ক্ষমতা, পৌরুষত্ব ও বীরত্বের দিক দিয়ে অতি পরিচিত। এই সকল নাম মধ্যযুগেও প্রচলন ছিল। আর কবি এই দোহরা নির্মাণের প্রসঙ্গে এই চরিত্রগুলিকে সাধারণ মানুষের ভূমিকায় নির্বাচন করেছেন। সেই সঙ্গে কবির সমাজ বাস্তবতার পরিচয় পওয়া যায়।

প্রসঙ্গক্রমে, কবি মর্ত্যভূমির কাছে দেবী চণ্ডীর পূজার মাহাত্ম্য ও উপযোগিতা চণ্ডীর বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

“পদ্মা চল জাই মহীমণ্ডলে।

রত্ন জানিয়া   জে নরে সেবা করে

ধনে বংশে উদ্ধারিব তারে।।

অসমএ তরাব আর   দোতরে করিব পার

রাজঘরে করিব ভালাই।

জে নর মরিয়া জায়   তাকে হব বরদায়

আপন ভুবনে দিব ঠাই।।”[৭২]

সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে একথা জানিয়ে দেবী চণ্ডী কলিঙ্গরাজ সুরথকে স্বপ্ন দেখিয়েছে। তার লক্ষ্য সাধারণ মানুষ, উপলক্ষ্য রাজা সুরথ। যদি রাজা তার পূজা করে তবে অকাতরে সাধারণ মানুষও তার পূজা করবে। তাই কবি প্রথমেই সাধারণ মানুষের মন আকর্ষণ করার জন্য দেবী চণ্ডী পূজার মাহাত্ম্য ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি রাজা সুরথকে উপলক্ষ্য করে স্বপ্নে পূজার নিয়মাবলী উপস্থাপন করেছেন। সেই পূজা পদ্ধতির সঙ্গে তন্ত্রের পূজা পদ্ধতির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তন্ত্রের প্রচণ্ডা শক্তি দেবী চণ্ডীকে ছাগল, মেষ ও মহিষ বলিদানে সন্তুষ্ট করা হয়। তাকে সন্তুষ্ট করা গেলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ও অসাধ্য সাধন হয়। এই অদ্ভুতদেবীর স্বপ্ন দেখার পর প্রভাতে রাজা রাজসভায় পাত্রমিত্রদের স্বপ্নের সকল কথা বলে। তার আদেশে সকল প্রজাকে দেবী পূজার কথা বলা হয়। সকল প্রজা রাজার শক্তিদেবীকে ছাগল, মহিষ ও মেষ নিয়ে দুন্দুভি বাজিয়ে পূজা করতে যায়। তার সঙ্গে রাজবংশী লোকবাদ্য সারিন্দা ও পীণাক বাজানো হয়। সেই সঙ্গে নাটুয়া লোকনাট্য করতে করতে যায়। রাজা সুরথ স্নান করে দেহসুদ্ধি করে নেয় এবং ছাগ, মহিষ বলির সঙ্গে রক্তজবা দিয়ে বিনয়ের সঙ্গে পূজা করে। তার বর্ণনা কবির ভাষায় —

“রাজা পুনুর্ব্বার করি স্নান   দেহরাতে অধিষ্ঠান

নানামতে দুর্গা পূজা করে।

ছাগ মহিষ জত   তাহারা বলিব কত

বিনি জবাতে পূজা করে।।”[৭৩]

ছাগল ও মহিষ বলি দিয়ে এবং রজোগুণের জবা ফুল দিয়ে পূজা করলে শক্তিদেবী চণ্ডী সন্তুষ্ট হয়। কবি সমাজের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেবার জন্য কাহিনীতে লোকবাদ্য, লোকনাট্য নাটুয়ার কথা এবং তন্ত্রের পূজা পদ্ধতির কথা তুলে এনেছেন বলে মনে হয়।

এরপর কাহিনী গ্রন্থনায় কবির আত্মপরিচয় উঠে এসেছে। তাকে দেবীর মর্ত্যে পূজা প্রচারের সঙ্গে একই সম্পর্কের সূত্রে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এখানে স্পষ্ট করে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা না থাকলেও স্বপ্নাদেশের কথা উল্লেখিত হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে মর্ত্যলোকে দেবী চণ্ডীর পূজা প্রবল প্রচারের জন্য রাজা সুরথের পর কবি গায়েন মানিক দত্তকে নির্বাচন করেন। পূজা প্রচারের জন্য ইন্দ্র ভুবনে পুথি আনতে যাওয়াকে কেন্দ্র করে সমকালীন পুথির পবিত্র মূল্যের পরিচয় উঠে এসেছে। সেই পুথির অর্ধেক ইন্দ্র, বাসুকি, গন্ধর্ব সকলে নিল মান-সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য। আর চণ্ডী তার অর্ধেক নিয়ে এল এবং তার লাথি দ্বারা কানা খোঁড়া কবি সুস্থ হল। এরূপ অলৌকিক ঘটনা কবি চণ্ডীর পুথি প্রাপ্তি ও তাকে প্রদানের ক্ষেত্রে কাহিনীতে সংযোজন করেছেন। স্বাভাবিক ভাবে মানিক দত্ত তম্বুর রঘু ও বায়েন রাঘবকে নিয়ে কলিঙ্গ মাঝে দেবীর মঙ্গল গীত

করতে আসে। তা কলিঙ্গের সকল প্রজার আনন্দের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাতে রাজসভায় প্রজাদের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে কলিঙ্গরাজ সুরথের সঙ্গে দেবীভক্ত মানিক দত্তের দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছে। তাঁকে রাজ সভায় ধরে আনা হয়। মানিক দত্ত দেবীর স্বপ্নের কথা বললেও সুরথ তাকে বন্দী করে। কবি এই ঘটনায় বলেন —

"বন্দি পড়িয়া দত্তে ভবানী স্মরণ করে
মা কেন গীত শিখাইলে মোরে।।"[৭৪]

কবিকে দেবীই মঙ্গলগীত শিখিয়েছে। সেই গীতের কারণে তার এই পরিস্থিতি। স্বভাবতই, দেবী তার ভক্তের প্রতি সহৃদয় হয়। মানিক দত্তের এরূপ অবস্থায় দেবী চণ্ডী সুরথ রাজকে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখায় এবং তাতে তার ঐশ্বর্যভাবের প্রকাশ বড় হয়ে উঠেছে। ভীত কলিঙ্গরাজ শেষ পর্যন্ত কবিকে অত্যন্ত মান-সম্মানের সঙ্গে ছেড়ে দেয়। এভাবে কলিঙ্গে দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের পরেও কবি কাহিনীতে দেবী চণ্ডীর ঐশ্বর্যভাব প্রকটিত করার ঘটনা এসেছে। সেই ঘটনাটি হল কলিঙ্গরাজ সাক্ষাতে দেবীকে দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ। তা কাহিনী গ্রন্থনায় অতিরিক্ত মেদ অংশ বলা যায়। সুরথ চণ্ডীর উদ্দেশ্যে বলে —

"সুরথ বলে দুর্গা পূজিলাম দুইবার।
না দেখিলাম নিজ মূর্ত্তি দূরভাগ্য আমার।।
স্বপন দেখিলাম মূর্ত্তি পত্যয় না জানি।
সাক্ষাতে দেখিলে গিঞা ভাগ্য হেন মানি।।"[৭৫]

সেই প্রসঙ্গে দেবী চণ্ডীর দশভূজা মূর্তি ও সিংহে আরোহন রূপ এবং দশহস্তের মাহাত্ম্য ও ত্রিনয়নের কারণ কাহিনীতে উঠে এসেছে। মনে হয় কবি দেবী চণ্ডীর রূপকথা বলার আগ্রহে অধীর। জনসম্মুখে দেবীর ঐশ্বর্যভাব ও তার দশভূজার রহস্য উন্মোচন করলে সাধারণ মানুষ আকর্ষণ অনুভব করবে। গায়েন কবি হিসেবে এটাই তার লক্ষ্য ছিল বলে মনে হয়। এতে কাহিনী গ্রন্থনায় প্রধান চণ্ডী চরিত্রকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। দুর্গার দশভূজের নাম ও তার কারণ এত সুন্দর ভাবে কোথাও বা কোন পুরাণে বর্ণিত হয় নি। সম্ভবত কবি শ্রোতা মনোরঞ্জনের জন্য কাহিনীতে এরূপ ভক্তিগাঢ় ও রসঘন বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন।

তবে দুর্গার এই অদ্ভুতরূপের বর্ণনায় কলিঙ্গরাজের কি প্রতিক্রিয়া তা কাহিনী গ্রন্থনায় বর্ণিত হয় নি। তারপরই চণ্ডীর পশুসৃজন বিষয়টি কাহিনীর মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। সেও অনেকটাই মুখরোচক ও লোকরঞ্জন (entertainment) করার মতো বলে মনে হয়। চণ্ডীর দশ ভুজার রহস্য উন্মোচনের পর পশু সৃজন বিষয়টির কোন কার্যকারণ সূত্র নেই। দেবী চণ্ডী পদ্মার কথায় পশুসৃজন করতে আরম্ভ করে। সেই ক্ষেত্রে পশুদের বিভিন্ন নামের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। সেই

পশুদের দেবী চণ্ডী আহারের ব্যবস্থা করে নি। এই পরিস্থিতিতে দেখা যায় শিব ও নারদের মর্ত্যভূমির দিকে যাত্রার ঘটনা। তাই শিব অনাহারে পশুদের দেখে চিন্তিত হয় এবং —

"শিব বোলে এমত কর্ম্ম কোন দেবে করে।
জীব সৃজন করি পালন না করে।।"[৭৬]

পশুদের অনাহারে রাখার ঘটনাকে কাহিনী গ্রন্থনায় কবি চণ্ডী ও শিবের দ্বন্দ্ব হিসেবে নির্বাচন করেছেন। লোক-চক্ষে এই অন্যায়বোধটি শিবের মধ্য দিয়ে সজাগ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিবের মত যোগীমানুষ মন্ত্রের প্রতাপে প্রথম বন সৃজন করে নি। তার বীজ সৃজনকে সামনে রেখে কাহিনীতে বলি রাজা নামক চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। বীজ সৃজনের ঘটনা কাহিনীকে বিস্তৃতি দান করেছে। শিব বীজের জন্য বলি রাজার কাছে যায়। বলি রাজা তাকে বীজ দেওয়ার পর সে বিজুবন সৃষ্টি করে। বিজুবন সৃজনের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে এহেন গাছ নেই যা বর্ণিত হয়নি। কবি বিজুবনের বর্ণনায় একটি দীর্ঘ গাছের তালিকা প্রদান করেছেন। এই বর্ণনার কাহিনী গ্রন্থনার সঙ্গে কোন যোগ নেই। তবুও কবিরা পাঠকের বা শ্রোতাদের মনোসংযোগকে ভিন্ন দিকে পরিচালিত করতে এরূপ বর্ণনা করতেন। নদীকুলে ঝাউ গাছ এবং পাশে কুশি গাছের বর্ণনা সৌন্দর্যের পরিচয়বাহী। পশুদের অনাহারের বিষয়কে কেন্দ্র করে বিজুবন সৃজন। বিজুবন সৃজনের ঘটনায় প্রবেশ করার জন্য কাহিনীতে কারণ স্বরূপ দেবী চণ্ডীর পশু সৃজন, অনাহারের বিষয় এবং বলি রাজার কাছে যাত্রা এবং বীজ আনয়নের ঘটনাগুলি ভীড় করেছে। সেখানে পশুদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের বর্ণনা না করে এত বিচিত্র গাছের বর্ণনা করা হয়েছে, যা আমাদের সৌন্দর্যের আকর্ষণে ও চিত্তহরণের কারণ হয়ে উঠেছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কাহিনী থেকে বনের বিচিত্র বর্ণনা অংশটুকু বাদ দিলে কাহিনী গ্রন্থনায় কোথাও কার্যকারণ সূত্র লঙ্ঘিত হবে না। কাহিনীতে এই অংশটি অতিরিক্ত বলে মনে হয়। আবার ভাঙ্গ সৃজনের ঘটনা ও তার গুণাবলীর বর্ণনাংশ মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় তা সমৃদ্ধ হয়েছে। মূল কাহিনীর মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে পশুখাদ্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন ভাঙ্গ সৃজনের কথা ও তার গুণাবলীর বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে। তা লোক সমাজের কাছে তথ্য প্রদান (information) ও শ্রোতার মনসংযোগ আকর্ষণের কারণ বলে ধারণা করা যেতে পারে। দৃঢ়পিনদ্ধ প্লট বা প্রকৃত কাহিনী গ্রন্থনায় এরূপ ঘটনার বিস্তৃতি একান্ত অপরিহার্য নয়। তবে শিব ও চণ্ডীর দ্বন্দ্ব সৃজনের জন্য এরপর চণ্ডীর মর্ত্যে যাত্রার ঘটনাটি প্রাসঙ্গিক। দেবী বিজু বনের পশুগণের আনন্দিত অবস্থা দেখে আচম্বিত হয়। তার সহচরী পদ্মা তাকে শিবের ঐ বিজুবনের সৃজনের কথা জানায়। তা শুনে চণ্ডী ক্রোধান্বিত হয়। এবং পদ্মাকে সে বলে —

"দেবী বোলে শুন পদ্মা আমার বচন।
কি মতে হইবে মোর ব্রতের সৃজন।।"[৭৭]

সুতরাং দেবীর কাছে ব্রতকথা প্রচার করা মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। পশুদের দ্বারা তার পূজা ব্যর্থ হলে কাহিনীতে আসে ইন্দ্র-ছলনার ঘটনা। সেই ঘটনার সূচক হল পদ্মা। সহচরী চরিত্র হিসাবে কাহিনীতে তার ভূমিকা অসামান্য। সে তাকে ভাটি বাঁকে তপস্যায় রত ইন্দ্রকে ছলনা করে পুত্রবর দান করতে বলে। তার দ্বারা তার পূজা প্রচার হবে।

"পদ্মা বোলে মাতা মোর জোড় কর।
ভাটি বাঁকে তপস্যা করে ইন্দ্র সুরেশ্বর।।
তাহাকে ছলিয়া তুমি দেহ পুত্রবর।
তবে পূজা মর্ত্তে হবে কহিলাঙ সকল।।"[৭৮]

এই যুক্তি করে চণ্ডী কৈলাশে আসে। শিব তখন বৃষের উপর চেপে ভিক্ষা করতে যায়। এরপর মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চণ্ডী ও শিবের দাম্পত্য জীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের গঠন রীতি অনুযায়ী শিব-গৌরীর সংসার জীবন অংশটি সাধারণত বিবাহের পর বর্ণিত হয়ে থাকে। কিন্তু মানিক দত্তের কাব্যে একটু আলাদা। তিনি গণেশ ও কার্তিকের জন্মের পর সেই অবকাশটুকু অতিক্রম করে অসুর দলনী দেবী দুর্গার রূপ, দুর্গা থেকে কালীর জন্ম-রহস্য, ইন্দ্র সভা থেকে পুত্র পালনের জন্য পঞ্চদাসী প্রাপ্তি, মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য শত্রু ধূম্রাসুরকে বধ, মর্ত্যে কলিঙ্গ নগরে তার দোহরা নির্মাণ, গায়েন মানিক দত্তের দ্বারা দেবীর পূজা প্রচার, আবার কলিঙ্গর রাজ সুরথকে তার দশভুজা ও ত্রিনয়নি রূপের রহস্য ব্যাখ্যান এবং বিজু বনের সৃজন ও তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে গৌরীর সংসার জীবনে প্রবেশ করেছেন। কাহিনী গ্রন্থনে এই বিষয়টির অবস্থান ঘটনার কালানুক্রমিক বিকাশের অনেকটাই পড়ে। মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত রীতি অনুযায়ী কাহিনী গ্রন্থনে শিব-গৌরীর বিবাহ ও সংসার জীবনের মাঝে অনেক ঘটনার সহাবস্থান ঘটেছে। তাতে মনে হয়, কাহিনী গ্রন্থনার দৃঢ়পিনদ্ধতা অনেকাংশে ক্ষুন্ন হয়েছে।

কবি মানিক দত্ত শিব-গৌরীর সংসার জীবনের বর্ণনা স্বল্প পরিমাণে দিয়েছেন। কবি চরিত্রকে বেশি প্রাধান্য দিতে গিয়ে ঘটনার জাল বুনেছেন। এই কাব্যে তিনি শিব ও গৌরীর দ্বন্দ্ব এবং তাদের প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী করে দেখানোতে বেশি মনোযোগী। শিব গৃহে সম্বল নেই বলে ভিক্ষায় বের হয়। অন্যদিকে, ভিখারী শিব যে 'ত্রিদশের ঈশ্বর' একথা পাঠককে সচেতন করে দেওয়া হচ্ছে। ভিখারী শিব ডুম্বুরু ও শিঙ্গা বাজিয়ে নগরে ভিক্ষায় বের হয়। সে উজান ভাটিতে ভিক্ষা করতে গেলে কোচ বাড়ির বধূরা তাকে ভিক্ষা দেয়। কবির কথায় —

"শিব ভ্রমে উজান ভাটী   চৌদিকে কোচের বাটী
কোচ বধূ ভিক্ষা দিল থালে।"[৭৯]

এর সঙ্গে তিনি সমাজের বিভিন্ন জীবিকা ভিত্তিক জাতির নামও তুলে ধরেছেন। সমাজের এই

রূপটিকে তিনি স্বল্প পরিসরেই সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। এমনকি, শিবের দাম্পত্য জীবন ও দরিদ্র গৃহে বস্তুগত প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। ভিক্ষা থেকে ফিরে এসে শিব দুই পুত্রকে কোলে তুলে নেয়। এখানে শিবের পিতৃসত্তা ও সংসারী রূপটি কাহিনীর মধ্যে সংযোগ ঘটানো হয়েছে।

"বেলা হৈল দুই প্রহর   মহাদেব চলিল ঘর
দুই পুত্র হৈল আগুয়ান।।
দেখিয়া পুত্রের মুখ   অন্তরে বাড়িল সুখ
পুত্র তুলি কোলতে করে।"[৮০]

ভিক্ষায় প্রাপ্ত বিভিন্ন দ্রব্য নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে কোন্দলের সূত্রপাত হয়। অভাবের সংসারে দুই ভাইয়ের কোন্দল স্বাভাবিক। শিব তাদেরকে শান্ত করার জন্য ঋষি কন্যা গৌরীকে অনুরোধ করেছে এবং গৌরী তাদের শান্ত করে রন্ধন করতে যায়। শিবকে মহাযোগী ও গৌরীকে ঋষির ঝি বলার পাশাপাশি শিব-গৌরীর সংসার জীবনে লোকজীবনের সাধারণ রূপকেও একই সূত্রে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, অরবিন্দ পোদ্দারের ভাষায় বলা যায় — "মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ... তাই লৌকিক জীবনের পটভূমিতে আছে যে অলৌকিক পরিবেশ, পার্থিব মানুষের পেছনে আছে যে অপার্থিব দেবদেবীর রাজত্ব, তাও সুনিশ্চিতভাবে মানবিক রসে, ভাবনা-চিন্তায়, ভোগ-তৃপ্তিতে সিঞ্চিত।"[৮১]

এরপরই দাম্পত্য জীবনে আসে ভাঙ্গনের ছবি। তার কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে দুর্গার পূজা প্রচার জনিত শিবের ঈর্ষা। তা কাহিনী গ্রন্থনার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ও বাস্তবসম্মত। কলিঙ্গ নগরে শিব-ভক্ত রাজা সহ সকলে আদ্যার পূজা করে। শিব দ্বারে আসা সত্ত্বেও রাজা তাকে দেখা দিল না। এতে শিব ক্রুদ্ধ হয় এবং সুরথ রাজাকে অভিশাপ দিয়ে চলে আসে। এই ঘাতপ্রতিঘাতের পর থেকে কাহিনী মোড় ফেরে। কাহিনীতে বৃদ্ধা রূপে দুর্গা ইন্দ্রকে ছলনার বিষয়টি সামনে আসে। এখান থেকে দেবী নিজেকে প্রতিষ্ঠার পর্ব অন্য মাত্রা পায়। সে তপস্যায় মগ্ন ইন্দ্রকে কচ্ছপদের পলায়নপরতার দ্বারা তপস্যা ভঙ্গ করতে সচেষ্ট হয়। সে বলে —

"ব্রহ্মার ব্রাহ্মনী আমি   শিবের ঘরনী
আর বিষ্ণুর ঘরের কমলা।
ঈশ্বরী পার্ব্বতী   সায় শাকাম্ভরী
জয় দেবী সর্ব্বমঙ্গলা।"[৮২]

এমনকি, দেবী চণ্ডী ইন্দ্রের মনে তার প্রতি প্রত্যয় এবং শিবের প্রতি অনাস্থা জন্মানোর জন্য অতীতের রামায়ণের ঘটনা এবং বর্তমানের শিবের কোচ গৃহে যাত্রার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছে। অতীতের

ঘটনাটি হল শিব ভক্ত রাবণকে তার সন্তান প্রদানের অক্ষমতা এবং বর্তমানের ঘটনাটি হল নিম্নশ্রেণীর কোচ রমণীগণের সঙ্গে শিবের সম্ভোগ প্রবৃত্তির হীন চরিত্রের কথা কাহিনীতে উঠে আসে। এই রামায়ণের এবং কোচ রমণীর গৃহে যাত্রার ঘটনা দুটি ইন্দ্রের মন পরিবর্তনের কারণ হিসাবে উপস্থাপনা করা হয়। তা সত্ত্বেও সে অটল। এই পরিস্থিতিতে দেবরাজ ইন্দ্রকে চণ্ডীর ভয়ঙ্কর ও সংহার রূপ দেখান হয়।

"সিংহের পৃষ্ঠে দিয়া পা বেগ্রে হেলাইঞা গা
অসুরে হানিল শেলের ঘা।
ইন্দ্র বলিয়া ডাক দিল   ইন্দ্র মস্তক তুলিয়া চাইল
ত্রি নয়ানী হৈল দশভূজা।।
দেখি ইন্দ্র ভয়ে পাইল   ভূমে দণ্ডবৎ কৈল
বারে ২ করয়ে প্রণতি।
আপনার নিজ মূর্ত্তি   আপোনি সম্বর মাতা
নিশ্চয়ে জানিলাম পার্ব্বতি।।"[৮৩]

দেবী চণ্ডীর অলৌকিক শক্তির ও ভয়ঙ্কর রূপের প্রতি বিশ্বাস জাগানোর পরই দেবী তাকে পুত্র বর দিতে পেরেছে। সম্ভবত, মধ্যযুগের আবহমণ্ডলে সাধারণ পাঠক ও শ্রোতাকে দেবীর মহিমার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য এই অলৌকিক শক্তির অবতারণা করা হয়েছে।

একই বস্তু ভাবনা থেকে দেবী শচীর সন্তান প্রসবের ঘটনাটি এরপর বর্ণিত হয়েছে। শচীর উদর থেকে দশ মাস দশ দিন পর পুত্রের জন্ম দেব-দেবীভাবনা পূর্ণ নয়; তা একান্ত মানব-মানবী কাহিনী। দেবতা তার আবরণ মাত্র। মনুষ্য সমাজে পুত্র জন্মের পর সুবর্ণ কাটারি দিয়ে নাড়ীচ্ছেদ, পঞ্চদিবসে পাঁচটি, নামকরণ, পঞ্চমাসে অন্নপ্রাসন ও পঞ্চবৎসরে চূড়াকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন রীতি-নীতি এখানে অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই নীলাম্বরের জন্মের পর বিবাহ বিষয়টি কাহিনীর মধ্যে অনিবার্য হয়ে ওঠে। পিতা ইন্দ্র কর্তৃক পুত্র নীলাম্বরের বার বছর বয়সে বিবাহের জন্য তৎপর মধ্যযুগের বাল্য বিবাহ রীতি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সে কারণে নারদকে দিয়ে বিরাট নগরে চন্দ্র মুনির গৃহে যাত্রার প্রস্তুতি লগ্নে তার বাহন ঢেঁকির যে সজ্জার বর্ণনা দিয়েছে তা কাহিনীর মধ্যে অতিরিক্ত অংশ বলা যায়। তা একান্ত অবাস্তব ও লৌকিক উপাদান নির্ভর।

"ঢেকির চক্ষ নির্ম্মান কৈল সামুকের খুশি।
কন্ধ ফেলিয়া দিল কাপড়ের ঝুলি।।
ঢেকির কমরে বান্ধে শামুকের ঘাগর।

মুড়া ঝাটা বান্ধে নারদ গলাতে চামর।।
ঢেকির মাথাএ বান্ধে আম্রের শাখা।
ব্রহ্ম মন্ত্র জপিল মেলিল দুই পাখা।।”[৮৪]

এই অবাস্তব ও হাস্যকর বর্ণনাকে লোকসম্মুখে বিশ্বাস জাগানোর পাশাপাশি ‘ব্রহ্ম মন্ত্র’কে তুলে ধরা হয়েছে। অবশেষে নারদ কর্তৃক চন্দ্রমুনির কন্যা নীলাম্বরকে দান করা কথা যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমনি সেকালের বিবাহ জীবন এবং তার পরবর্তী জীবন সুষ্ঠু সুন্দর হয়ে ওঠার জন্য উভয়ের রাশি গোত্র যাচাই করে নেওয়া হয়েছে। এই বিবাহ পদ্ধতির সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর বিবাহ রীতির মিল আছে। কিন্তু নারদের অজ্ঞাতে নীলাম্বর বিবাহ করতে গেলে কাহিনীর মধ্যে শুরু হয় চাঞ্চল্যকর ঘটনার উন্মোচন। ক্রোধান্বিত হয়ে নারদ বিবাহ সভায় উপস্থিত হয়ে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেয়। ইন্দ্রের ক্ষমা প্রার্থনায় সে শান্ত হয়। সেই জন্য কবি মানিক দত্ত এই ঘটনার মধ্য দিয়ে নারদ চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে অবকাশ পেয়েছেন। অতঃপর ছায়াবতীর সঙ্গে নীলাম্বরের বিবাহ হয়। বিবাহে ছায়াবতীকে গৌরীর মত দুইজন দাসী সহ বহু দানসমগ্রী দেওয়ার সামাজিক রীতি এখানে এসেছে। কবি লিখেছেন —

“দানে জোতুকে তুশীল দুইজন।
ভাণ্ডার ভাঙ্গীয়া দিল রজত কাঞ্চন।।”[৮৫]

বিবাহের পর নীলাম্বরকে অভিশাপ দানের ঘটনাটি কাহিনীতে এসেছে। এটি দেবদেবীদের মানবরূপ গ্রহণ করার সুপ্রাচীন রীতি।

শিব পূজক নীলাম্বরকে নিয়ে শিব-দুর্গার দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। নারদকে সেই দ্বন্দ্বের কারণ হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এখান থেকে কাহিনীর মধ্যে জটিলতা বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে চরিত্রের সংখ্যাও কাহিনীর মধ্যে বাড়তে থাকে। সৃষ্টি হয় মূল কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত বৃত্তাকার উপকাহিনীর। শিব ও দুর্গার দ্বন্দ্ব নিরপরাধ নীলাম্বরকে নিয়ে। শিব বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যের অধিকার কায়েম করতে চেয়েছে। অন্যদিকে, দুর্গা ন্যায্য কর্তব্যের খাতিরে নীলাম্বরকে তার পূজারী করতে ব্যতিব্যস্ত। এরূপ দ্বন্দ্বের বীজ পূর্বেই ইন্দ্রকে পুত্র বর দেওয়ার মধ্যে নিহিত ছিল। তারই অনিবার্য ফলস্বরূপ শিব ও দুর্গার দ্বন্দ্ব।

“জন্মিয়া আমার বরে না পূজে আমাকে।
পুষ্প তুলি নীলাম্বর পূজিব শিবকে।।
শিব ঠাকুর বলে দুর্গা বলিএ তুমাকে।
ভক্তের পুত্র ভক্ত পূজিবে আমাকে।।”[৮৬]

লড়াইয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে উভয়ের দেহ নিষিক্ত ঘর্ম থেকে অলৌকিক ভাবে ধর্মকেতু, নিসানকেতু,

নিদয়া ও কমলা নামে চরিত্রের জন্ম হয়। কাহিনীতে চরিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই চারি ব্যাধ চরিত্রকে নিয়ে সম্পূর্ণ একটি উপকাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। এই উপকাহিনীটি নীলাম্বরকে ছলনার কাছে কবি কাহিনীতে ব্যবহৃত করেছেন। দুর্গা নীলাম্বরকে নিরপরাধে জোর করে অভিশাপ দিতে চেয়েছে। মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য নিরপরাধ ভাবে তাকে তার পূজারি করার মধ্যে কোন গৌরব নেই। অথচ এই অগৌরবের, নির্মমতার পথ ধরেই দেবীর পূজা প্রচার সম্ভব হয়ে ওঠে। স্বার্থ চরিতার্থ করার যুপকাষ্ঠে দেবী হরিণী বেশ ধারণ করে। ধর্মকেতু ও নিশানকেতু নামে ব্যাধদ্বয় তাকে শিকার করতে ধনুর্বাণ নিয়ে ছোটে। এই দৃশ্য বীজুবন থেকে নীলাম্বর দেখে মর্ত্যের আনন্দময় স্বাধীন জীবনের কথা ভেবে দুঃখ করতে থাকে। ক্ষুধায় ও দুঃখে কাতর চিত্তে নীলাম্বর ভাল মন্দ উভয় ধরনের ফুল উৎপাটিত করে। সেই পরিস্থিতিতে তার চরিত্রের পক্ষে তা স্বাভাবিক। তার এই অন্যমনস্কতায় দুর্গা চাটিরূপে ফুলের ভিতর আত্মগোপন করে এবং শিব পূজার সময় তাকে দংশন করে। তাতে শিব ক্রুদ্ধ হয় এবং নীলাম্বরকে অভিশাপ দেয়। শিবের এরূপ অভিশাপের কারণ কাহিনীর মধ্যে পূর্বপরিকল্পিত।

এরপর স্বাভাবিক ভাবে কাহিনী স্বর্গপুর থেকে মর্ত্যে অবতরণ করে। নিদয়াকে স্বপ্নে পুত্র দানের মধ্যে সামাজিক সত্য লুকিয়ে আছে। নিদয়ার মত মধ্যযুগের সকল নারীর পুত্র লাভ করা আকাঙ্ক্ষার ধন ছিল। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের প্রথানুয়ায়ী কাহিনীতে স্বপ্ন দ্বারা তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। নিদয়ার পুত্র সন্তানের জন্য দুঃখ ছিল বলেই বোধ হয় দেবী পুত্র সন্তান প্রদান ও তার প্রতি প্রকৃত দয়া। এটা কাহিনীতে নারী মনস্তত্ত্বের সামাজিক সত্যতাকে প্রমাণ করে। আশিস্‌কুমার দে সঙ্গত কারণে বলেছেন — ''নিদয়াকে দেবীর পুত্রলাভের স্বপ্নদান তাই সামাজিক সত্যের এক প্রতিফলন। সামাজিক আকাঙ্ক্ষা (পুত্র লাভ) নিদয়ার স্বপ্নের কারণ। দেবী সেই কামনাপুরণের অনুপ্রেরক মাত্র।''[৮৭] অন্যদিকে, দেবী নিশানকেতুর স্ত্রী দয়াবতির গর্ভে ফুল্লরাকে স্বপ্নে দান করে। কবির ভাষায় —

''জেইখানে দয়াবতি শুইএগ্রা নিদ্রা জায়।
শিয়রে বসিয়া দুর্গা স্বপন দেখায়।
*   *   *
হের ধর কন্যা খানি দিলাঙ তোমার তরে।
ফুলরা বলিয়া নাম রাখিবা ইহারে।।''[৮৮]

লক্ষণীয়, কাহিনীতে ধর্মকেতুর স্ত্রী নিদয়া এবং নিশানকেতুর স্ত্রী কমলা নাম হওয়া সত্ত্বেও এখানে দয়াবতির উল্লেখ রয়েছে। এমনকি, ফুল্লরার পূর্বজন্মের কোন নামেরও উল্লেখ নেই। কাহিনীতে এরূপ যোগসূত্র হীন ঘটনাও পাওয়া যায়।

তবে কালকেতুর জন্মের পর বাঙালীর রীতি-নীতিগুলি স্বাভাবিক ভাবে এসেছে। এটি মঙ্গলকাব্যের মূল কাঠামোর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। এই নিয়ম-নীতির সঙ্গে নীলাম্বরের জন্মের সময় পালিত নিয়ম-নীতির হুবহু মিল রয়েছে। নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ জাতি বলে নতুন করে কোন নিয়ম নীতি বর্ণিত হয়নি। কালকেতু শৈশব থেকেই বীর ও শিকারে পারদর্শী ছিল। ব্যাধ সন্তান রূপে তাকে হয়তো শ্রোতা মণ্ডলীর সামনে এমন বীর ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। পিতার সঙ্গে স্নানের সময় কালকেতুর এই বীরত্বের ও বিক্রমের বিষয়টি এসেছে।

"ইটা গোটা মারে পড়ে সমুদ্রের পার।
পাথর গোটা মারে পড়ে লঙ্কার দ্বার।।"[৮৯]

এরপর আসে কালকেতুর বিবাহ-বিষয়। সেখানে কালকেতুর বিবাহের কোন নির্দিষ্ট কারণ নেই। যেন ঘটনার আবর্তে কালকেতুর বিবাহ বিষয়টি কাহিনীতে ভেসে চলেছে। সেখানে ধর্মকেতু সরাসরি তার পুত্রের সঙ্গে স্বর্ণকেতুর কন্যার বিবাহের প্রস্তাব দেয়। লক্ষণীয়, কাহিনীতে ফুল্লরার পিতার নাম নিশানকেতু ও স্বর্ণকেতু দুটি নাম পাওয়া যায়। কালকেতু-ফুল্লরার বিবাহে উচ্চ হিন্দু-বিবাহ রীতির অনুসরণ করা হয়েছে। সেখানে পণ্ডিত ডেকে পঞ্জিকা দেখেই বিবাহ ঠিক করা হয়। বিবাহের বর্ণনায় যে সকল বাদ্যযন্ত্রের কথা এসেছে তাতে শিষ্ট সমাজ ও লোক সাধারণের বাদ্যযন্ত্রকে একত্রিত করা হয়েছে। নিম্নশ্রেণীর ব্যাধকুলের বিবাহে শিষ্ট সমাজের এই দামামা, দগড়া, রাইবাশ বাদ্যযন্ত্র পরিবেশ অনুযায়ী অনুকূল না হলেও বিবাহ সভায় আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের বসতে হরিণের চামড়া দেওয়ার মধ্যে সেই পরিবেশ ও পরিস্থিতি বর্ণনায় কবি সমতা বজায় রেখেছেন। এছাড়া কালকেতুর বিবাহে উচ্চবর্ণের ন্যায় দান স্বরূপ পাঁচজন নর্তকি, দেড় বুড়ি কড়ি, কালো দড়ি ও 'শুকতের টোনা' বা শুকনো পাতায় মন্ত্র পড়ে বস করার উপায়ও প্রদান করা হয়েছে। তাতে কাহিনী গ্রন্থনায় হিন্দু সমাজের বিবাহ রীতির সঙ্গে নিম্নবর্ণের বিবাহ পদ্ধতির সংযোগ সূত্রের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কালকেতুর বিবাহের পর ধর্মকেতু, নিদয়া এবং নিশানকেতু, কমলা ইত্যাদি চরিত্রকে নিয়ে গঠিত উপকাহিনীটি মূল কাহিনী থেকে আকস্মিক ভাবে বিদায় নিয়েছে। কালকেতু ও ফুল্লরার জন্ম ও বিবাহ সম্পন্ন করার জন্য কবি এই উপকাহিনীর প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। কিন্তু মূল কাহিনী থেকে এই উপকাহিনীটি বিদায়ের কোন সম্ভাব্য কারণ বর্ণিত হয়নি। ধর্মকেতু ও নিশানকেতু শিকারে বের হলে দেবী চণ্ডী তাদের চোখে কাল হয়ে বসে। চণ্ডীর ছলনায় তারা একে অপরকে পশু মনে করে উভয় উভয়কে বাণ বিদ্ধ করে এবং তারা মারা যায়। এরূপ মৃত্যুতে কবি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। অভিজাত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি পুষ্ট রীতিকে তিনি নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ জাতির ক্ষেত্রে

প্রয়োগ করেন নি। কবি বলেছেন —

"কাল হয়া বৈসে দেবি দুহার চক্ষের মাঝার।
দুহারে দেখিল দুহে পশুর আকার।।
দুয়ে ছাড়িল বাণ দুয়ে লৈল দুয়ের প্রাণ
মরিয়া গেল স্বর্গ ভুবন।"[৯০]

কিন্তু ধর্মকেতু ও নিশানকেতুর মৃত্যুর পরে কোন্ কারণে তাদের দুই স্ত্রী নিদয়া ও কমলার মৃত্যু হল তার কোন কার্যকারণ যোগ নেই। তাদের উপকাহিনীটি রহস্যময় রয়ে গেল। এবারে কাহিনীতে এসেছে কালকেতুর সংসার ধর্মের কথা। কালকেতু সকলের মৃত্যুর পর সকল বিধি কর্ম করল। কবি কালকেতু ও ফুল্লরার বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার উদ্দেশ্যে এই সকল চরিত্রের প্রয়োজন বোধ করেন। তাদের জন্ম, বিবাহ, সন্তান প্রসব, সন্তানের বিবাহ এবং সংসার ধর্ম পালনের জন্য বনে শিকারে গিয়ে দেবীর ছলনায় মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনা নিয়ে একটি বৃত্তাকার প্লটের সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও সেই প্লটের বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; তবুও প্রকৃত জীবন বৃত্ত বলতে যা বোঝায় তা কাহিনীর মধ্যে স্বল্প পরিসরে ছিল।

এই জীবন বৃত্তটির পর কালকেতুর জীবিকাবৃত্তির সূচনা হয়। কাহিনী কালকেতুর গৃহে এসে পৌঁছায়। সেই শিকারজীবী ব্যাধ জীবনের কথা বলতে গিয়ে কালকেতুর মহিষ বধে কৃষকদের আনন্দের কথা আমাদের সেসময়কার কৃষিতে মহিষের অত্যাচারের বিষয়টি স্মরণ করে দেয়। মহিষ বধের পরই কবি বাঘ বধের কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে তিনি বাঘের বিভিন্ন দেহাংশের উপকারিতা সম্বন্ধে শ্রোতাদের সম্মুখে লোক সাংবাদিকতা করেছেন। কাহিনীর মধ্যে এমন করে লোক ঔষধ ও দ্রব্যাদির বর্ণনার দ্বারা শ্রোতাদের আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে কবি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জীবন-জীবিকাকে সন্নিবেশিত করেছেন। সেখানে সন্ন্যাসী বাঘের চর্ম আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে, ধনীরা বাঘের নখ সোনা জড়িয়ে গলায় দেয়, বৈদ্য বাঘের হাড় দেহ-প্রবিষ্ঠ বিষকে জল করার প্রয়োজনে, ডোমরা বাঘের তেল নেয় বাত কমাতে এবং বাঘের দাড়ি কিনে নেয় শত্রু নিঃশেষ করার জন্য। মূল কাহিনী বিচ্যুত সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত এই অংশটি কাহিনী গ্রন্থনের ক্ষেত্রে একেবারে অপরিহার্য না হলেও গায়েন কবির পক্ষে এই বর্ণনা স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। তিনি কালকেতুর পশুশিকারের মত অপরিহার্য অংশের উল্লেখ করতে গিয়েও সমাজমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। কালকেতু বনে কোন উপযুক্ত পশু দেখতে না পেয়ে চিন্তিত হয়। সেই অবস্থায় সে রামনাম গান করতে থাকে। মঙ্গল ও কল্যাণময় রামনাম গান শুনে হরিণী মোহিত হয়ে পড়ে।

"পঞ্চম আলাপিআ রাম নাম গান করে

হরিনি মঙ্গল শুনে।।''[৯১]

নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ সমাজেও রামনামের ব্যাপকতা প্রকাশ পায় এবং তার স্বর্গীয় মাধুর্যভাবে তন্ময় হয়ে যায় হরিণী। এর প্রমাণ স্বরূপ আমরা গৌড়ের ইতিহাসকার রজনীকান্ত চক্রবর্তীর একটি মন্তব্য তুলে ধরতে পারি — ''ব্যাধচণ্ডালাদি নীচ জাতীয় লোকও কথকের মুখে রামায়ণ মহাভারতাদি শ্রবণ করিতে পাইত।''[৯২] নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ কালকেতু সম্ভবত এরূপ কথকের মুখ থেকেই শুনে থাকবে। এই রাম নামের প্রতি যে মানুষের দুর্বল চিত্ততার দিক রয়েছে তাকে সেই সুযোগে কালকেতুর শিকারে কাজে লাগানো হয়েছে। মৃত্যুকালেও হরিণী কালকেতুকে রামনাম করতে বলেছে। হরিণী কালকেতুকে বলে —

''তিলেক বিশ্রাম করি রাম নাম গান করো

শুনিতে জাওক পরাণ।''[৯৩]

কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'-এ 'লঙ্কা কাণ্ড'-এ এরূপ ভাবে প্রকাশ রয়েছে —

''রামনারায়ণ নাম বলে সেই জন।

রথেতে পাঠায় যম বৈকুণ্ঠভুবন।।''[৯৪]

রামনামের পবিত্র, সত্য ও ব্রহ্ম বাণী শ্রবণে যাতে প্রাণ যায় তার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে হরিণী; তাহলেই তার স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। এমনকি, কালকেতু রামকথা জানার জন্য হরিণীকে পণ্ডিত বলেছে। সেই পণ্ডিতকে হত্যা করে কালকেতু তার দক্ষিণ হস্ত, ধনুক পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছে এবং তার মাথায় যাতে বজ্র পড়ে তার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছে। এমনকি, হরিণীর কথায় সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের দিকটিও প্রকাশ পেয়েছে। সে কালকেতুকে বলে —

''আমার মাংস কিঞ্চিত ব্রাহ্মণেক দিয় দান

তবেশে পাপ হরিনি স্বর্গ পুরে জান।।''[৯৫]

সমকালে গৌড়ে রামভক্তি এবং সমাজে ব্রাহ্মণদের অধিকার সর্বোচ্চ ছিল বলে মনে হয়। এই সামাজিক ও ধর্মীয় ভাবনাকে মানিক দত্ত কালকেতুর পশু শিকার অংশে প্রকট করে তুলেছেন।

স্বাভাবিক ভাবে কাহিনীর পারম্পর্য অনুযায়ী মাংস বিক্রয়ের ঘটনাটি আসে। সেখানে কালকেতুর শিকারে প্রাপ্ত মাংস নিয়ে স্ত্রী ফুল্লরা শ্রীকলার বাজারে বিক্রয়ের জন্য যাত্রা করে। সেই বাজারের পটভূমিকায় উঠে এসেছে নিম্নশ্রেণীর সামাজিক অবস্থানের চিত্রটি। নিম্নশ্রেণীর ব্যাধবধূ ফুল্লরার কাছে নগরের মহাজন ক্রেতাদের কুদৃষ্টি তাদের দারিদ্র্য জীবনে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে 'ব্যাধিনী' বলে সম্বোধন করার মধ্যে তার সামাজিক স্থানটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তেমনি তার আত্মসম্মান বোধটিও সেক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, সংসারে স্বামীর কাছেও তার কোন ভালোবাসা ও সহানুভূতির লেশমাত্র নেই। নিরুপায় এই নারীটির সাংসারিক প্রয়োজনে এবং

সামাজিক অবস্থানের চাপে পড়ে কান্না ও অদৃষ্টের উপর দোষারোপ ভিন্ন তার অন্যপথ খোলা নেই।

"মাথায়ে মাংসের ডালি বেড়াইমো বাড়ি বাড়ি
লোকে ব্যাধিনি কহিবে আমারে।।"[৯৬]

তবে ফুল্লরা চরিত্রের স্বভাব পরিস্থিতির অনুকূল করে বর্ণিত হয়েছে। এই অবস্থার থেকে উদ্ধারের জন্য ফুল্লরা দেবীর ছলনার সম্মুখীন হয়। সেই ছলনা বর্ণনায় বিনিময় প্রথার স্বরূপটি উঠে আসে। সমকালে কড়ি দ্বারা সবরকম জিনিসপত্র কিনতে হত; এই প্রথার পরিচয় পাই ছদ্মবেশী দেবীর ফুল্লরার কাছ থেকে মাংস ক্রয় করার সময়।পঞ্চাশ কাহন কড়ি দিয়ে ফুল্লরার কাছ থেকে মাংস ক্রয় করলেও পরক্ষণে দেবী তাকে নিঃস্ব করেছে। সেই চিত্র অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

"পঞ্চাশ কাহন কড়ি পায়া হরশিত হৈল মায়া
ফুলুরা নড়িল ধীরে ধীরে।"[৯৭]

নিঃস্ব কালকেতু ও ফুল্লরার আত্মধিক্কারে উঠে এসেছে গামছা বিক্রেতা ব্যক্তিদেরও চাকর-নফর নিয়ে জীবন যাপন করার মত স্বপ্ন। তার মত দরিদ্র জীবনে এরূপ সুপ্ত মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন স্বাভাবিক। কালকেতু দুঃখময় সংসার জীবনের প্রতি অতিষ্ঠতার প্রসঙ্গে সমাজ সচেতন কবি মানিক দত্ত শ্রোতা-পাঠকের আকর্ষণ বা মনোসংযোগ ঘটিয়েছেন একটি দৃঢ় বাস্তব সত্য বা নীতিকথার প্রতি। ফুল্লরা এই বিষম পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের আশ্বাস কালকেতুকে দিয়েছে এইভাবে —

"প্রভু পুরুস হয়া না হইয় কাতর।
পুরুস কাতর জারা স্ত্রিয় বিদায় দেয় তারা
ফুলুরা জাইবে অন্যতর।।
প্রভু পুরুসের দশ দশা কখন গরিব কখন রাজা
কখন হৈতে পারে দণ্ডের মদন।
পৃথিবীতে ঝড় হয় সেহ কতক্ষন রয়
দুখ সুখ প্রভু পূর্ব্বেকার ভজন।।"[৯৮]

ফুল্লরার এই নীতিকথার মধ্যে নিহিত আছে ভবিষ্যতে কালকেতুর রাজা হওয়া এবং তাদের রোমান্টিক জীবনের মূল সূত্রটি। কাহিনীতে এরূপ যোগসূত্র স্থাপন গঠন কৌশলের দিক থেকে পাঠক শ্রোতাদের আগাম চমকপদ অবস্থা পরিবর্তনের কৌতুহলোদ্দীপক পূর্বাভাস বলা যেতে পারে।

এরই মাঝে মঙ্গলকাব্যের গঠনরীতি অনুযায়ী পশুগণের গোহারী বর্ণিত হয়েছে। সেই

প্রসঙ্গে পশুগণের আর্তনাদ যন্ত্রণা প্রকট বা জীবন্ত করে তোলার তুলনায় দেবী চণ্ডীর নতুনতর স্বরূপ উন্মোচনে কবি বোধ হয় বেশি আগ্রহী। পশুগণের গোহারী অংশে দুর্গার সঙ্গে কালীকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পশুগণ কালকেতুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেবীর শরণাপন্ন হয়েছে। একে একে বেজি, বাঘ, নেউল, হাতি, ঘোড়া, বিড়াল, কুকুর, শৃগাল, হরিণ, শোশক প্রভৃতি পশু তাদের বিপন্ন অবস্থার কথা দেবীকে জানায়। কালী তাদের পালন বা রক্ষা করেছে। যে কালী অসুরের ধ্বংসকারিণী সেই কালীই বিপন্ন পশুদের পালনকর্তা। এই প্রথাগত ধারণাটি এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে। তবে পশুগণের গোহারী অংশে পশুদের তুলনায় কালকেতুর চরিত্রের প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তার চরিত্রানুযায়ী এই বর্ণনা সুসঙ্গত হয়েছে। শুধু কালকেতুকে নয়; দেবী চণ্ডীকে অন্যরূপে এখানে দেখানো হয়েছে। সে কালী রূপিণী; ভক্তের পালনকর্ত্রী। হরিণীর গোহারী অংশ এক্ষেত্রে তুলে ধরা হল —

“দুইটা হরিনি আমি নওাইল মাথা।
কান্দিয়া২ কয় আপন দুঃখের কথা।।
বনের তিন্ন খাইয়া বীরের কিবা ধারি।
আপনার মাংস জগত হৈল বৈরি।।
তারে বর দিল কালি জগতের মাতা।”[৯৯]

পশুদের গোহারী সম্বন্ধে কবির পূর্ণমাত্রায় বস্তুগত পরিচয় ছিল বলে মনে হয়। কালকেতু সংসারের প্রয়োজনে পশুহত্যা করেছে। পশুরা সমকালের নিষ্পেষিত সমাজ। সেই পশুদের বিভিন্ন দেহাংশ (হরিণীর মাংস, শোশকের হাত-পা, কান) অন্যদের মনোরঞ্জনের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিপন্ন পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের জন্য পশুদের মত মানুষকেও শক্তিদেবীর দ্বারস্থ হতে হয়েছিল।

এই দুঃখময় অবস্থায় কবি মানিক দত্ত অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে কালকেতুর দুঃখময় জীবনে হাস্যরসাত্মকময় ভোজন বর্ণনায় প্রবেশ করতে ব্যতিব্যস্ত হয়েছেন। পশুদের গোহারী অংশটি তিনি সচেতন ভাবেই কাহিনীর মধ্যে স্বল্প পরিসরে গুটিয়ে নিয়েছেন। তাঁর কাব্যে কালকেতু ও ফুল্লরার সংসার জীবনের কথাই অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। কবি পশুদের গোহারীর ঘটনা বলেই হঠাৎ অপর একটি গল্পে প্রবেশ করার মত কৌশলে কালকেতুর গৃহ বর্ণনায় মনোনিবেশ ঘটিয়েছেন। উভয় ঘটনার সঙ্গে কোন কার্যকারণ সূত্র বর্ণিত হয়নি। কবির বর্ণনা ভঙ্গিতে তার প্রমাণ মেলে —

“সভাকারে বর দিল সর্ব্বমঙ্গল।
পশু বর দিল মাতা মঙ্গলচণ্ডীগণ।।
কালকেতুক নঞা কিছু শুন বিবরণ।
আপন গৃহেতে হইল বীরের গমন।।”[১০০]

কালকেতুর ক্ষুদ্রপাতে সাতহাড়ি আম্বানি ফুল্লরার ঢেলে দেওয়া অভাবের সংসারে অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। কালকেতুর আম্বানি খাওয়ার ভঙ্গিতে কবি হাস্যরসিকতা করেছেন। দুঃখময় ও অভাবে জর্জরিত সংসারে এরূপ খাদ্যের সমাবেশ রোমান্টিক ভাবনা বা অবচেতন আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে। কবির ভাষায় —

"খুদিআ মাণের পত্র আনিল কাটিআ।
সাত হাড়ি আম্বানি দিলেন ঢালিআ।।
পত্রে না রয় আম্বানি গড়াগড়ি জায়।
ক্রোধ হঞা মহাবীর মৃত্তিকা মিশায়।।
পিষ্ঠের পাছে দুই গোপ ফেলিল বান্ধিআ।
আমানি খায় বীর হামকুড়ি দিআ।।
ছয় বুড়ি কুচিলা খাইল নয় বুড়ি ধুতুরা।
আড়িতে মাপিআ খাইল জটিয়া ভাঙ্গের গুড়া।।"[১০১]

কালকেতুর ভোজনরসিকতার পরেও তার চরিত্রকে পরিস্ফুট করার জন্য পুনরায় শিকার যাত্রার ঘটনাটি তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে কালকেতু চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলতে কাহিনীকে ধনিয়াডাঙ্গা বন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার সঙ্গে এক বানিয়ার সাক্ষাৎ হয়। তার সঙ্গে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে কালকেতুর আত্মসম্মানবোধটি বড় করে তোলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে উপায় স্বরূপ বেছে নেওয়া হয়েছে একটি তুচ্ছ এবং চরিত্র পরিপন্থী ঘটনাকে। সেই ঘটনাটি হল অলৌকিক শক্তিসম্পন্না দেবী চণ্ডী কর্তৃক কালকেতুর চোখে ধুলো দেওয়া। এই ঘটনাটি যেমন হাস্যকর তেমন দেবী চরিত্রের বাতানুকূল নয়। একেবারেই লৌকিক চিত্রকে যেন কাহিনীর মোড় ফেরাতে ব্যবহার করা হয়েছে। কবির কথায় —

"য়েক মুঠা ধূলা দুর্গা হস্তে করিআ।
কালকেতুর চক্ষেত মাতা মারিল ছিটিআ।।"[১০২]

এরপরই কাহিনীতে কালকেতুর ধনপ্রাপ্তির সুপরিচিত অংশটি বর্ণিত হয়েছে। সাধারণ অত্যাচারিত পশুসমাজকে রক্ষার জন্য দেবীর কালকেতুকে ধনদান করার উদ্দেশ্যে কাঁচুলি নির্মাণ ও তা দিয়ে ছলনার প্রসঙ্গটি কাহিনীতে আসে। তবে এই অংশটি কবি শুরু করেছেন সমকালের রামভক্তি দিয়ে। সেখানে বলা হয়েছে — "শ্রী শ্রী রাম করুনা নাচাড়ী।/ ধনবরের পালা আরম্ভ।।"[১০৩] এখানে কালকেতু বনে পশু না পেয়ে কাঁদতে থাকে এবং সে সময় মায়ামৃগ রূপে দেবীর আবির্ভাবে তার চরিত্রের এক নাটকীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মৃগ শিকার করতে কালকেতু যে বাণ ছাড়ে তা এখানে রূপকথার মত ভক্তপ্রাণে পরিণত হয়েছে। বাণ দেবীর উদ্দেশ্যে বলে —

"বাণ বলে মৃগ তুইরে পলাবু কতদূরে।
আমার বিধাতা বৈলাছে মৃগ তোমাক বধিবারে।।"[১০৪]

কালকেতু কর্তৃক বন্ধনে ভক্তবৎসল দেবীর কার্তিক ও গণেশের প্রতি মাতৃস্নেহের ধারা ঝরে পড়েছে। সেই সঙ্গে দেবতা হয়ে মনুষ্যজাতির হাতে বন্ধন — দেব সমাজে তা কলঙ্কের কারণ। এমনকি, স্বামী তাকে সম্ভ্রম ভ্রষ্টের জন্য গৃহে তুলবে না। দেবীর এই দুটি সামাজিক সচেতনতার বিষয় আলোকপাত করার পরই কাঁচুলি নির্মাণের বিষয়টি কাব্যে এসে ভীড় করেছে। যদিও মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত রীতি অনুযায়ী এই অংশটি অপরিহার্য। তবে কবির চার প্রকার কাঁচুলি নির্মাণের বিষয়টি অনেকটা বিস্তৃত করেছেন। তার পরিচিত বস্তুজগতের বিভিন্ন লোক উপাদান ও সমকালে প্রচলিত রামায়ণ ভাবনা কাহিনী নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তার ফলে কাহিনী গ্রন্থনায় প্রচুর দেবতার নাম, পুষ্পের নাম, পাখির নাম, মৎস্যের নাম ও প্রসঙ্গক্রমে পুরাণের প্রসঙ্গ এসেছে। সেই সঙ্গে অনিবার্য কারণ বশত কাহিনীতে চিত্রগোবিন্দ চরিত্রটির আগমন ঘটে। চিত্রগোবিন্দ দ্বারা নির্মিত দেব-কাঁচুলিতে বিভিন্ন পুরাণের দেবতার নাম এবং তাদের লোক বাহনের প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, ধর্ম, ব্রহ্মার হংস, নারায়ণের গরুড়, শিবের বৃষ, ভগবতীর সিংহ, গণেশের ইঁদুর, কার্তিকের ময়ূর, জলধরের ধবল ঘোড়া, ইন্দ্রের হাতি, শমনের মহিষ, পবনের হরিণ, গঙ্গার মকর, কালিকা গোসানীর মরা, সরস্বতীর শ্বেতকাক, লক্ষ্মীর পেঁচা, নারদের ঢেঁকি, ষষ্ঠীর বিড়াল প্রভৃতি পুরাণ এবং পুরাণ বহির্ভূত দেবদেবীর নাম তালিকা ও বাহনের নাম কাহিনীতে অতিরিক্ত সংযোজন ঘটেছে।

লক্ষণীয়, কবি দেব-কাঁচুলি নির্মাণে প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম অনুযায়ী ধর্মের নাম উল্লেখ করে অন্যান্য দেবদেবীর নাম ক্রমান্বয়ে সাজিয়েছেন। দেব-দেবীদের স্বরূপ ও বাহনের বর্ণনায় লোকবিশ্বাস কতকটা কার্যকর হয়েছে। অতঃপর তিনি পুষ্প কাঁচুলি নির্মাণের প্রসঙ্গে এসেছেন। সেখানেও তিনি আমাদের পরিচিত বহু ফুলের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন — তুলসী, কেয়া, কেতকী, যূথি, মালতি, পারিজাত, ওলট, চাপা, নাগেশ্বর, কমল, শ্বেত জবা, রক্ত জবা, কেলী, কদম্ব, গোলাপ, বক, মাধবী, শেফালি, ধুতুরা, সুন্দি, শালুক, রক্তহলা, সূর্যমণি, দ্রোণ, বিষ্ণুপদী, ভূমি, চাপা ইত্যাদি ইত্যাদি নীলবর্ণের, শ্বেত বর্ণের সকল ফুলের উল্লেখ আছে। মৎস্য কাঁচুলি বর্ণনায় গ্রামে প্রাপ্ত দাড়িকা মাছের কথা বলেই কবি তিমি মাছের কথা বলেছেন। তিমি মাছের প্রসঙ্গে রামায়ণের ঘটনা অনুপ্রবেশ করেছে। তিনি কবিত্ব শক্তির সংযমবোধ ধরে রাখতে পারেন নি। সমকালে প্রচলিত রামায়ণের প্রতি শ্রোতাগণের আকর্ষণ এবং কবির সেই আকর্ষণের প্রতি মনোযোগ উভয়ই এক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে। রামায়ণে রামচন্দ্রের সেতু বন্ধনে তিমি মাছ পাথর ভক্ষণ করছে এবং সেই তিমি মাছকে আবার ভক্ষণ করার জন্য গরুড়কে আমন্ত্রণ করার ঘটনা

এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে বাল্মীকির রামায়ণের 'কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড'-এর ৬৭ তম সর্গে অজগরের শিলা গ্রাসের কথা আছে এবং হনুমানের অনুরোধে গরুড় অজগরকে গ্রাসের উল্লেখ রয়েছে। আর কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'-এর 'সুন্দর কাণ্ড'-এ বর্ণনার সঙ্গে মানিক দত্তের এই বর্ণনার হুবহু মিল নেই। সেখানে বানর সেনারা সমুদ্রপথ কেবল বর্ণনা করেছে। এখানে গরুড় ও অজগর বা তিমির উল্লেখ পর্যন্ত নেই। কৃত্তিবাসের রামায়ণে বলা হয়েছে —

''রাম জয় করিয়া বীর পর্ব্বতে দিল নাড়া।/ উপড়িয়া ফেলে যত পর্ব্বতের চূড়া।।

... শাল পিয়াল গাছ পড়িল আড়ভাতি।/ তথির উপরে ফেলে নল সেনাপতি।।[১০৫]

মানিক দত্ত বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের রচিত রামায়ণের হুবহু ঘটনা অনুসরণ করেন নি। তিনি লোক প্রচলিত রামায়ণ কথাকে একটি কার্যকারণ সম্পন্ন ঘটনায় উপস্থাপন করেছেন বলে মনে হয়। এই তিমি মাছের কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গ ক্রমে রামায়ণের ঘটনা বলার পর কবি আবার বিভিন্ন মাছের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন — গাগড়, মৌরালী (মুরালী), সংকর, মাগুর, রুই (রুহি), কাতল, রিঠা (ইঠা), বাচা, শরপুটি (শেরণপুঠি), টেঙরা (টেঙ্গর), রাইম, চেলা, দারকা (ডারিকা), ভেদা (ভেদড়), কোদালী, রোয়াল (বোদালী), গজা (গাজাড়), শৌল (শৌল), ইলিশ (ইলিশা), খলশে (খলিশা), পাতাসি, মোয়া (মঞা) ও কাঁকিলা ইত্যাদি।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মৎস্য কাঁচুলির পর পক্ষী কাঁচুলির কথা বলা হয়েছে। সেখানে ক্রমে খগপতি, যে বিষ্ণু ভক্তি করে; টীয়া, তোতা, যে বিষ্ণুনাম বলে, বাদুড়, শারস (শারক), খঞ্জন, রাম শারস (রাম শারক), গাঙ্গ শারণ (গাঙ্গ শারক), কাল পেচা, ফেচুকা, লক্ষ্মী পেঁচা, রাঙ্গাটুলী, পাডুক, হরিতাল, গয়াল, বাঙ্গান, সাথকাল, হাড়ীচেচাঁ, সাতভাইয়া, ময়না (ময়েনা), টিটীহি, মোড়া, ময়ূর প্রভৃতি পাখির উল্লেখের পর যখন চকা (চখোয়া) পাখির প্রসঙ্গ আসে তখন তার সঙ্গে রামায়ণের সম্পর্ক কি তা অত্যন্ত কৌশলে ব্যক্ত করা হয়েছে। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে রামের সীতা হারানোর ঘটনা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে সীতাকে অনুসন্ধান করতে রাম-লক্ষ্মণ চকা পাখির কাছে উপস্থিত হয়। রামচন্দ্র তাকে সীতার কথা জিজ্ঞাসা করলে সে তাকে কর্কশ বাণীতে তার স্ত্রী রক্ষার অক্ষমতার কথা শুনিয়ে দেয়। তাই রামচন্দ্র তাকে অভিশাপ দেয় যে, একই স্থানে থেকেও স্বামী-স্ত্রী কেউ কারো মুখ দেখবে না। আবার কানি বক তাকে সঠিক পথ নির্দেশ না দেওয়ার ফলে অভিশপ্ত হতে হয়। এরূপ রামায়ণ সম্পর্কিত নীতিকথার আভাস চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাঁচুলি নির্মাণের বর্ণনায় পাওয়া যায়। কবি লিখেছেন —

''ময়ূর লেখিল আর চখোয়া সুন্দরে।/ বনবাসে রামচন্দ্র শাপ দিল জারে।।

পক্ষ কাচুলী লেখে বিচিত্র শোভায়ে।/ বাশের থোপে তেলাকুখা লাফে২ জায়ে।।

বাজ পক্ষ লেখিল জে জ্ঞাতি হত্যা করে।/ কানি বগ লেখিল শ্রীআর আশা করে।।

রাম অবতারে জখন সীতা চাহিআ ফিরে।/ লক্ষণ পুছিল কথা কানি বগের তরে।।

ই পথে দেখিছ সীতা গেল কোথাকারে।/ তোমাকে করিয়ে সুদ্ধি শুন সমাচারে।।

* * *

দুই ভাই আছিলা জদি হাতে ধনুক ধরি।/ দুই ভাই রাখিতে নারিলা এক নারী।।

ব্যর্থ ধনুক ধর ভাই দুইজন।/ দুই ভাই থাকিতে সীতা হরিল রাবণ।।

এতমত বক জদি করিল বিধর্ম।/ ক্রোধে জ্বলিল তবে রাজা রামচন্দ্র।।

* * *

আজি হৈতে কানী বক শ্রীআর আশা করে।/ চারি মাস বারিষাতে থাকিবে বাসরে।।

বকী তোকে পুষিবেক আনিয়া আহারে।/ উচ্ছিষ্ট খাইআ জীবে শুনবে বেটা পক্ষী।।"[১০৬]

মূল বাল্মীকি রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ময়ূর পাখির উল্লেখ আছে। তবে চখা ও বক পাখির এরূপ কথোপকথন ও অভিশাপের ঘটনা নেই। কিন্তু কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ'-এর অরণ্যকাণ্ডের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যায় —

"শুন হে চখা পাখি বলিয়ে তোমারে।/ তুমি নাকি দেখিয়াছ মোর জানকীরে।।

... শুনিয়া চকোরা বলে কর্কশ বচন।/ আক্ষেপিয়া বলে পক্ষী কমললোচন।।

দুই মহাবীর তোরা দেখি ধর্নুদ্ধর/ এক স্ত্রী রাখিতে নার বনের ভিতর।।

... সহিতে না পারি তোর বিরূপ কথন।/ শাপ দিলে ব্যর্থ নহে আমার বচন।।

এক স্থানে থাকহ দম্পতি দুইজন।/ স্ত্রী পুরুষে নহে যেন মুখ নিরীক্ষণ।।

... বক বলে শুন প্রভু তুমি নারায়ণ।/ ... অনুমানে বুঝিলাম সেই সীতা সতী।।

... রাম বলেন বক তোরে বর দিলাম আমি।/ চারি মাস বরিষার পানি না ছুইবা তুমি।।"[১০৭]

এভাবে কবি মানিক দত্ত তাঁর কাব্যে জনরুচির দিকে লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত কৌশলে রামায়ণের নীতিগান গেয়েছেন। পাশাপাশি অন্যান্য পাখিদের কথা বলতে গিয়ে সত্যযুগের ভারথ পাখির ডিম বোয়াল মাছ কর্তৃক ভক্ষণ এবং তা উদ্ধারের জন্য গরুড়ের আগমন প্রসঙ্গটি কাহিনীতে এসেছে। এভাবে একই ঘটনা প্রসঙ্গে ভারথ পাখি, তার সমস্যায় গরুড় পাখি ও তার অসম্মতি, পাখা খসে যাওয়া, পাখা চুরি, চোর ধকড়িয়াকে কোতাল ফেচুকার লাথি মারা, গরুড়ের ডানা ফিরে পাওয়া এবং গরুড় সাগর বন্ধন ও ভারথ পাখির ডিম রক্ষা ইত্যাদি কার্যকারণ সম্পর্ক যুক্ত একটি ছোট কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। সেই সঙ্গে এসেছে সমাজের চুরি, তার শাস্তি প্রদানে সভা গঠনের ব্যাপারটি। পক্ষী কাচুলির কথা বলতে গিয়ে কবি কখন এরূপ সমাজ সচেতনতা অথচ পুরাণের ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন তা পাঠক বা শ্রোতা বুঝতেই পারে নি। অল্পক্ষণের মধ্যে শ্রোতার চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর কথা ভুলে গিয়ে এরূপ পুরাণের ঘটনায় মনোনিবেশ ঘটিয়ে ফেলেছে।

এরপর কাহিনী মূল শ্রোতে বহমান। পাঠক বা শ্রোতার আচমকা শ্রুতিভ্রম হয় এবং চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীতে মনোসংযোগ ঘটে।

চণ্ডী চারথান কাঁচুলির মধ্যে একটি পরিধান করে কালকেতুকে ধনদানের উদ্দেশ্যে যাত্রার ঘটনা পরিস্থিতি অনুযায়ী একটি নারী চরিত্রের সন্নিবেশ সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর সম্পর্কের দিকটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ গৃহে যাত্রার প্রাক্ মুহূর্তে পঞ্চদাসীকে চণ্ডী স্বামী শিবের উদ্দেশ্যে সামাজিক অপরাধের জন্য মিথ্যা কথা বলতে বলে। যাত্রা পথে তার মোহন রূপ দেখে নারদের উক্তিতেও শিবের অসৎ আচরণ তথা নিচু শ্রেণীর হীরা কোচের সঙ্গে অসামাজিক সম্পর্কের আভাস পাওয়া যায়। কালকেতুর মত দরিদ্র গৃহে দেবী চণ্ডীর ধনপ্রদান বিষয়টিতে তাদের আর্থিক পরিবর্তনের আভাস পেয়েছে। প্রাকৃতিক জগতে মনোরম পরিবর্তনের আভাস যেমন কতগুলি গুণাবলীতে প্রতিফলিত হয় তেমনি কালকেতুর দরিদ্র সংসারে আর্থিক পরিবর্তনের প্রতিভাস কবি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

"কালকেতুর ঘরে আসে জগতের প্রাণ।
বৃক্ষ ডালে থাকিয়া কোকিলে করে গান।।"[১০৮]

এই বর্ণনার পর কবি ছদ্মবেশী ষোড়শী রমণী দেবী চণ্ডীর সঙ্গে ফুল্লরার সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে তার সতীনসমস্যা বিষয়টি উন্মোচনের কথা শ্রোতা বা পাঠককে শোনাতে চেয়েছেন। মানিক দত্তের ফুল্লরা দেবীকে সতীন সন্দেহে প্রথম এক বয়োজ্যেষ্ঠ নারীর কাছে উপস্থিত হওয়া অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য। ফুল্লরার এই সমস্যাতে কবি অত্যন্ত কৌশলে পরিস্থিতি অনুযায়ী এই চরিত্রকে কাহিনীতে সন্নিবেশ করেছেন। সেখানে তার সমস্যা উত্থাপন করায় সে ফুল্লরাকে স্বামী কালকেতু আসার আগেই বিদায় দিতে বলে। ফুল্লরার সম্মুখ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য এখানে নামহীনা মাসী চরিত্রটি কাহিনীতে এসে ভীড় করেছে। কিন্তু চরিত্রটিকে মধ্যযুগের নারীর সম্মুখ সঙ্কট থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে কবি সঠিক নির্বাচন করেছেন। তাই তার কথায় ফুল্লরা সচকিত হয়ে বিপদ এড়ানোর পন্থা অবলম্বন করেছে। সেক্ষেত্রে ফুল্লরা তাকে উভয়ের জাতিগত ও আর্থিক অবস্থার পার্থক্য অত্যন্ত কৌশলে তুলে ধরেছে এবং ব্যাধিনী হওয়ার সামাজিক যন্ত্রণা তার সামনে তুলে ধরেছে।

সেই সঙ্গে কাহিনীতে নাটকীয়তা উন্মোচিত হয়। ফুল্লরা দেবী চণ্ডীর কুল সচেতন করেছে এবং যৌবন রক্ষার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে। একজন নারী অপর এক নারীকে তার রূপ সৌন্দর্য ও যৌবন সম্পর্কে সজাগ করেছে। যাতে দেবী চণ্ডী এত দুঃখের সংসারে থাকার তুলনায় স্বীয় রূপ-যৌবনের প্রতি সচেতন হয়। তাই ফুল্লরা দেবী চণ্ডীর বিভিন্ন অঙ্গের সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছে। ফুল্লরার এরূপ স্ত্রী মনস্তত্ত্বের প্রকাশ প্রশংসার যোগ্য। কাহিনী গ্রন্থনায় আগন্তুক সতীনকে তাড়ানোর এরূপ কৌশল অত্যন্ত আশ্চর্যের ও চরিত্রের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করে। ফুল্লরার বিচক্ষণ

বার্তায় চণ্ডী তাকে কটাক্ষ করে বলে যে, তার স্বামীও ভিখারী। সে দুই পুত্রকে নিয়ে এখানে থাকবে। এটাই তার মনোবাঞ্ছা। তার কটাক্ষপূর্ণ বাক্যবাণ ফুল্লরার হৃদয়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয় এবং দেবী বলে —

“তে পথের মধ্যে আমি আছিলাম বসিয়া।
কালকেতু আনিলে মোকে সত্য বাক্য দিয়া।।”[১০৯]

সেই সত্যবাণী ফুল্লরার মত নারীর কাছে বেদনাদায়ক বটে। নিজের গৃহে নিজের অধিকার হারানোর যন্ত্রণা তার উপর বর্ষিত হয়েছে। কাহিনী গ্রন্থনায় ও চরিত্রের হৃদয়ের যন্ত্রণা উন্মোচনের ক্ষেত্রে বাস্তব চিত্রটিকে ফুল্লরার সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে সতীন সমস্যা ও কৌলীন্য প্রথার ভিন্ন চিত্র মানিক দত্ত তুলে ধরেছেন। তা কবির বস্তুপৃথিবীর অভিজ্ঞতা লব্ধ বলে মনে হয়। দেবী চণ্ডী ফুল্লরাকে কালকেতুর দেওয়া সত্যবাণী বলেছে। তা এরূপ —

“না করিব কুন কর্ম্ম থাকিব বসিয়া।
জে কিছু অন্নব্যঞ্জক রান্ধহ বসিয়া।।
অর্ধেক অন্নবেঞ্জন আমার ভক্ষন।
আমার স্থানে শুন রামা উপদেশ বচন।।
তাহার অর্ধেক পাবে কেতু আহিড়ী।
পাও বা না পাও রামা ফুলরা সুন্দরি।।
শুনিলে ভক্ষনের কথা হৈয়া সাবধান।
শয়নের কথা কই তোমার বিদ্যমান।।
দুই পুত্র কোলে করি কেতুর আগে শুইব।
তুমি পায়ে তৈল দিবা আনন্দে থাকিব।।
আলস্য লাগিলে জাতিবে হস্ত পাও।
গ্রীষ্ম লাগিলে দিবে দণ্ড পাখার বাও।।”[১১০]

তার প্রতি দেবী চণ্ডীর আঁটকুড়া অপবাদ শুনে ফুল্লরা ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে গালাগাল দেয়। তা সত্ত্বেও ফুল্লরা ক্রমে অধিক বিচলিত হলে দেবী বলে — “অতি বেস্ত হৈলে ঘরে নাহি জাব আমি।।”[১১১] তখন নিরুপায় ফুল্লরা সতীন সমস্যা অতিক্রম করার জন্য বড় অস্ত্র ব্যবহার করে। সেটি হল তার বারো মাসের দুঃখ কষ্টের কাহিনী।

‘ফুল্লরার বারমাসীয়া’ মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর প্রথাগত রূপ। কেবল ফুল্লরার নিজের স্থান সতীন দখল করবে বলে সচেতন নয়, সেই সঙ্গে বারমাসে তার স্বামী কালকেতুকে কীরূপ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয় এবং তার ফলে তার সংসার জীবনে কীরূপ অসহনীয় বাতাবরণ

নিয়ে আসে তা অত্যন্ত স্পষ্ট করে ও কৌশলের সঙ্গে তুলে ধরেছে। কবি বাস্তব অভিজ্ঞ, দরদী ও মানবিক না হলে বোধহয় এরূপ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হত না। সেই বারমাস্যায় প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা, অর্থনৈতিক দুর্বলতা, নিয়তির নির্মম পরিহাস, আশ্বিনের দশভুজার পূজা, অগ্রহায়ণে নবান্নের মত উৎসব এবং প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে মানব মনের সম্পর্ক ব্যক্ত হয়েছে। তবে লক্ষণীয়, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বারমাস্যা বর্ণনা স্বতন্ত্রতার পরিচায়ক। তাঁর কাব্যে বারমাস্যা জ্যৈষ্ঠ মাস দিয়ে সূচনা এবং বৈশাখ মাসে সমাপ্তি। কবি জ্যৈষ্ঠ মাসের বর্ণনায় বলেছেন —

''প্রথমে জৈষ্ঠ মাসে উথলিল বন।
হাথে গণ্ডিপ করি প্রভু ভ্রমিছে কানন।।
মৃগ পায়া প্রভু মোর হরিসে আইসে ঘরে।
মাথায়ে চোপড়ি করি জাঙ মাংস বেচিবারে।।''[১১২]

শ্রাবণ মাসের অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনায় —

''শ্রাবণ মাসেত ইন্দ্র বরিষে পঞ্চ ধারে।
মৃগ না পায়া প্রভু সন্ধ্যাতে আইসে ঘরে।।
উধার করিতে গেইলো পড়সির বাড়ি।
না পায়া উধার কচুর শাক তুলি।।''[১১৩]

অগ্রহায়ণ মাসের নবান্নের বর্ণনায় —

''অগ্রান মাসেত শিঙ্গে বাহেরায়।
চর্ম্ম উড়ি ফুরে প্রভু বস্ত্র নাহি গায়।।
ঘরে ঘরে আনন্দ হয়ে নৌতুন ধান।
অন্ন বিনে দেখ মোর দগধে পরাণ।।''[১১৪]

বসন্ত ঋতুতে প্রাকৃতিক জগতে মিলনের মেলা সূচনা হয়। সেখানে কালকেতু ফুল্লরাকে গৃহে রেখে লোকালয়ে নিজের সম্ভোগ বাসনা তৃপ্ত করে। কিন্তু এই মিলনের পরিবেশে ফুল্লরার তনু মন জ্বলে যায়। আর বৈশাখ মাসের বর্ণনায় —

''বৈশাখ মাসেত নরে নানা ব্রত করে।
কেহো করে দান পূন্য ভব তরিবারে।।
পরলোক তরিতে আমার নাহি জ্ঞান।
রাত্রি দিনে পশু বধি সে সন্ধান।।
অভাগিনীর দুঃখের কথা শুনিলে য়াপুনি।
এতেকে চলহ তুমি বড়ার ঘরনী।।[১১৫]

বারোমাসের দুঃখ-কষ্টের বর্ণনার চাতুরীর পরেও দেবীর প্রতিক্রিয়া না করলে ফুল্লরাকে বিশেষ একদিনের জীবনের সূক্ষ্ম প্রতিভাস তুলে ধরতে হয়েছে। তার মধ্যে ফুল্লরাকে মিথ্যার অবলম্বন নিতে হয়েছে। সেই মিথ্যাকে কেন্দ্র করে চণ্ডীর সঙ্গে তার বাক্‌চাতুর্য্যের দ্বন্দ্ব চলেছে। তাই দেবী ফুল্লরাকে বলেছে —

"বীরকে ভাড়িয়া খাইয়া এই কথা বুঝাও।
সেহি চাতুরালী কথা আমাকে শুনাও।।
ভবানী কহিল কথা করিয়া কৌতুকে।
বাজিল বিশম শেল ফুলরার বুকে।।[১১৬]

এই কথায় ফুল্লরা রাগান্বিত হলে তাকে চণ্ডী হিতবাণী বলে এবং সেই হিতবাণীই ধনদানের কারণ। সত্য-মিথ্যার সাধারণ কৌশলকে ধনদানের কারণ হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। নিঃসন্তানবতী ও দরিদ্র ফুল্লরার কাছে দেবী কর্তৃক তাদের দুঃখ নিরসন করার আশ্বাসবাণী স্বাভাবিক। চণ্ডীর কথায় বিচলিত হয়ে ফুল্লরা বয়স্ক ও সমাজ অভিজ্ঞ মাসীর কাছে সমস্ত কিছু জানায়। তার কাছে দেবী চণ্ডীকে রেখে কংস নদীর তীরে কালকেতুর কাছে যায়। সেখানে কালকেতুর জলের উপর ধ্যানস্থ রূপ পূর্ব ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। কবির কথায় — "জলেত তপস্যা করে ব্যাধের নন্দন।।"[১১৭] কালকেতুকে ফুল্লরা চাপড়ের ঘা দিয়ে জাগ্রত করল এবং অন্যের নারী হরণ করা পাপ কর্ম — এ বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দিল। সে নারী ফুল্লরার কাছে দেবকন্যা বলে মনে হয়েছে। রামের মত দেবতার স্ত্রী হরণে রাবণের পাপ কর্মে রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। কালকেতুও সেই একই পাপ কর্মে নিযুক্ত হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে রামায়ণের রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের পাপের কথা এসেছে। রামায়ণের ঘটনা বর্ণনার দ্বারা মানিক দত্ত পাঠক সমাজকে আকৃষ্ট এবং সতর্কীকরণ করার একটি অভিনব প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন। তিনি পাঠক বা শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে সমগ্র রামায়ণকে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরেছেন। সেই সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ফুল্লরা কালকেতুকে বলেছে —

"ফুলরা বলেন প্রভু কহিব তোমারে।/ বাল্মীক পুরাণ কথা রচিল মুণিবরে।।
রাম না জন্মিতে ছিল যাটি সহস্র বৎসর।/ পুরাণ রচিল মুনি মধুর অক্ষর।।
আপনে জন্মিল বিষ্ণু দশরথের ঘরে।/ চারি অংশে জন্মিলেন চারি সহদরে।।
কৌশল্যা সুমিত্রা আর কেকই মহারানী।/ তিন রানীর চারি পুত্র জেন দিনমনী।।
কৌশল্যার পুত্র হৈল প্রভু নারায়ণ।/ সুমিত্রার পুত্র দুই লক্ষন শত্রুঘন।।
ভরত নাম পুত্র হৈল কেকই রানীরে।/ জার দোষে বনবাসে গেল রঘুবরে।।
পিতার সত্য পালিতে প্রভু রাম আইল বন।/ সঙ্গেত জানকি আর অনুজ লক্ষন।।
বনবাসে জানকি হরিল দশাননে।/ সুগ্রীরের সনে জাইয়া করিল মিলনে।।

বানরগণ লৈয়া সাগরে হৈল পার।/ সবান্ধবে রাবণ রাজা করিল সংহার।।

নারীর কারণে রাবণ সবংশে মরিল।/ রাবণ রাজার কথা তোমাকে কহিল।।"[১১৮]

ফুল্লরার কথায় কালকেতু তাকে কঠোর সত্য করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। কালকেতু দেবীর সমগ্র রূপ পরিদর্শন করে পরম ভক্তের ন্যায় মাটিতে লুটিয়ে তাকে প্রণাম করে। যাকে মাসী ও ফুল্লরা সতীন ভাবে তাকে কালকেতু প্রণাম করলে তারা মনে করে তাদের গৃহে কোন মহাজন উপস্থিত হয়েছে। সমাজে মহাজন শ্রেণীর প্রতি প্রজাকুলের পদানত হওয়ার বাস্তব সত্যটি কবির প্রত্যক্ষগোচর ছিল। তাই হয়তো ফুল্লরা কালকেতু দেবীর সম্মুখে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার সময় এই কথাটি বলেছে। কালকেতুর মধ্যে দেবীর স্বরূপটি যেমন সত্য ছিল তেমনি সমাজের উচ্চ-নিম্নশ্রেণীর কঠোর ভেদাভেদ নীতিটি সম্পর্কে সজাগ ছিল। সমাজে ব্যাধ জাতির স্থান ছিল সর্বনিম্নে এবং সমাজের কাছে সে দুর্নীতিগ্রস্ত রাঢ় নামে পরিচিত ছিল। এরূপ নিম্নশ্রেণীর অচ্ছুত-অস্পৃশ্য গৃহে এক রাত অতিক্রম করলে সমাজের চোখে সে খারাপ তথা ঘৃণার পাত্রী হয়ে যাবে। সেই প্রসঙ্গে অত্যন্ত কৌশলে সমাজ সচেতনার উদ্দেশ্যে কবি রামায়ণে সীতার পুনর্বার বনবাস যাত্রার কথা তুলে ধরেছেন। সমাজের কঠোর নীতি রাজা রামচন্দ্রও মানতে বাধ্য হয়েছিল। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা সেখানে তুচ্ছ। রামায়ণের এই কঠোর সমাজনীতিকে কালকেতু দেবী চণ্ডীর সতীত্বহানীর সমান্তরাল করে তুলেছে। কাহিনী গ্রন্থনায় কবি লোকসমাজের এই চিরাচরিত ধারণা ও মান্যতাকে কালকেতু কর্তৃক দেবীকে বিতাড়নের কারণ স্বরূপ কাজে লাগিয়েছেন।

অতঃপর কবি কাহিনী গ্রন্থনায় চরিত্রকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। লোক সমাজের কাছে দেবী মাহাত্ম্য বলতে গিয়ে কাহিনী অনেকটা শিথিল হয়েছে। দেবী চণ্ডী কালকেতুর গৃহ ছাড়তে অস্বীকৃত হলে সে তাকে সূর্যসাক্ষী করে বাণ মারে। কিন্তু তাতে তার বাণ ব্যর্থ হলে কালকেতুর দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে ঘা লাগে এবং তাকে দেবী বলে স্বীকার করতে তার মন দোদুল্যমান হয়ে ওঠে। এমনকি, দেবী চণ্ডী তাকে ধনুক ছেড়ে দিতে বলে এবং তাকে স্বীয় অঙ্গুরী প্রদান করে। তার মত সাধারণ দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর মানুষের কাছে সোনার অঙ্গুরীটি খাঁটি কিনা সন্দেহ করা এবং হতবাকের কারণও বটে। কিন্তু ফুল্লরা কালকেতুকে মায়া দুর্গার ধন নিতে বারণ করে। ফুল্লরা কালকেতুকে বলে — "কি বুঝিয়া লইবে প্রভু মায়া দুর্গার ধন।।"[১১৯] এই মায়া দেবীর শক্তি। স্যার জন উড্রফ বলেছেন — "Maya, which achieves this, is one of the powers of the Mother or Devi ."[১২০] সাধারণ ব্যাধ দম্পতির দেবীর প্রতি অবিশ্বাস করা স্বাভাবিক। তার প্রতি বিশ্বাস জন্মানোর জন্য দেবীর ভয়ঙ্কর শক্তি রূপের প্রকাশ অংশটির প্রয়োজন হয়। দেবী কালিকাই মানুষের দুঃখ নিস্তারের একমাত্র উপায়। সেকথা জানাতে এবং শ্রোতাদের নব প্রতিষ্ঠিত দেবীর শক্তির প্রতি আশ্বাস জন্মানোর জন্য বার বার কাহিনীতে তার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। চণ্ডীর সেই

স্বরূপে কালীর মিশ্রিত রূপটিকেই কবি বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন — "পার্বতী, উমা, সতী এবং দুর্গা-চণ্ডিকার ধারা মিলিয়া পুরাণ-তন্ত্রাদিতে যে এক মহাদেবীর বিবর্তন দেখিতে পাই, তাহার সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে আর একটি ধারা, তাহা হইল কালিকা বা কালীর ধারা। এই কালী বা কালিকাই বাঙলাদেশের শক্তি সাধনার ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সর্বেশ্বরী হইয়া উঠিয়া দেবীর অন্য সব রূপ অনেকখানি পিছনে ফেলিয়াছেন।"[১২১] দুর্গার কালী স্বরূপা তন্ত্রের রূপটি কবি এখানে প্রকট করে তুলেছেন। তার বিকট মূর্তি দর্শনে কালকেতু ও ফুল্লরা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। দেবী তাদের মাতৃসুলভ কোলে তুলে নেয়। দুর্গার উগ্রমূর্তির সঙ্গে স্নেহময়ী মাতৃকারূপটিও এখানে স্পষ্ট। তার রূপের মধ্যে তন্ত্রের পুরুষ প্রকৃতির গূঢ় তত্ত্ব রয়েছে সেকথাও দেবী কালকেতুকে বলেছেন।

"আমি পুরুষ প্রকৃতি বটি কহিলাঙ তোমারে।
গোপ্ত কথা আর জানি পুছহ আমারে।।"[১২২]

সর্বোপরি শশিভূষণ দাশগুপ্তের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন — "প্রথমতঃ, সাংখ্যের নির্গুণ পুরুষ ও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির তত্ত্ব। দ্বিতীয়তঃ, তন্ত্রের 'বিপরীতরতাতুরা' তত্ত্ব। তৃতীয়তঃ, নিষ্ক্রিয় দেবতা শিবের পরাজয়ে বলরূপিনী শক্তিদেবীর প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ যাহা মনে হয় তাহা হইল এই, প্রাচীন বর্ণনায় কালিকা শিবারূঢ়া নন, শবারূঢ়া; অসুরনিধন করিয়া অসুরগণের শব তিনি পদদলিত করিয়াছেন, সেই কারণেই তিনি শবারূঢ়া বলিয়া বর্ণিতা।"[১২৩] দেবীর মাতৃতন্ত্র সম্পর্কে প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় তন্ত্রের শক্তির কথা বলেছেন। তাঁর কথায় — "Shakti (Kali) of the Shakti Cult is the Mother or the supreme being."[১২৪] কাহিনী গ্রন্থনায় কবি দেবীর ধনপ্রদান বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বহুস্থানে দেবীর স্বরূপ অধিক পরিমাণে জোর দিয়েছেন। তার দ্বারাই কালকেতুকে দেবীর প্রতি বিশ্বাস জন্মানোর চেষ্টা চলেছে। তাতে কাহিনীতে দেবী চণ্ডীই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে এবং কাহিনীর গতি হয়েছে মন্থর।

দেবী চণ্ডী কর্তৃক ধন দানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাহিনী গ্রন্থনা শিথিল হয়েছে। কাহিনীকে আরও জটিল করে তুলতে এসেছে দুটি চরিত্র। যদিও তাদের আগমনের পরিবেশ ও পরিস্থিতি সঙ্গত। সেক্ষেত্রে প্রথমে কালকেতু ও ফুল্লরা দেবীর ধন গ্রহণ করতে অসম্মত হয়। এই অসম্মতির কারণের পিছনে সমাজের কয়েকটি নীতি কথা উঠে এসেছে। ফুল্লরা বলেছে যে, নিঃস্বরাই সর্বকালে সুখী। এই চিরন্তন সত্যকে কবি প্রচারের ঢঙে বলেছেন এইভাবে —

"জার ঘরে ধন আছে তার শুন কথা।
মধ্য পাথারে তার ডাকাইতে ভাঙ্গে মাথা।।

ধন নাঞিঃ জন নাঞিঃ কি করিব গারি।

আনন্দে দুইজনে বঞ্চিব কোলাকুলি।।"[১২৫]

কালকেতুর মত সাধারণ রোজ খেটে খাওয়া মানুষের প্রচুর অর্থ দেখলে ধূর্ত প্রকৃতির মানুষ দ্বারা ঠকবার এবং রাজা কর্তৃক অভিযোগের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া সকলের চক্ষুশূল হওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যায়। এই ধারণা কালকেতুর মত ব্যাধ সমাজের অভিজ্ঞতালব্ধ এবং তা চূড়ান্ত সমাজ সত্য। কিন্তু দেবী চণ্ডী এই চরম সত্যের বিপরীতে অপর একটি দৃঢ় সত্যকে তুলে ধরেছেন। সেটি হল ধন-সম্পদই সকল শক্তির মূল কারণ। এর দ্বারাই দেবী তাকে সকলের উপর প্রভুত্ব বিস্তার তথা 'ঠাকুরালি' করতে বলেছে। এই রকম সামাজিক সত্যকে কবি চরিত্রের ভাবনায় সন্নিবেশ করায় কাহিনী গ্রন্থনা একটু জটিল হয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত কালকেতু দেবীর কাছ থেকে হাতে কঙ্কণ চেয়ে নেয়। ডালিম্ব গাছের গোড়া থেকে এক ঘট ধন উত্তোলন করার জন্য কঙ্কণ বদলে খন্তা ও কোদাল আনতে কালকেতু গৃহস্থ মণ্ডল বা মোড়লের কাছে উপস্থিত হয়। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে দুটি চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে। এই গৃহস্থের কাছে কালকেতু দেবী প্রদত্ত কঙ্কণ নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তার ধারণাতীত মূল্যের বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাই গৃহস্থ মণ্ডল কঙ্কণের মূল্য বুঝতে না পারলে কালকেতু পুরাই দত্ত নামে বাণিয়ার কাছে উপস্থিত হয়। সে কঙ্কণের মধ্যে ধর্ম নিরঞ্জনের নাম দেখে শিরে ঠেকিয়ে নেয়। এই কঙ্কণ বিক্রি করার মধ্যে আদি দেবতা ধর্মের বাতাবরণকে ফলপ্রসু করা হয়েছে। ফলে সে ধর্মের নাম দেখেই তা সাগ্রহে গ্রহণ করে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় কালকেতুর এরূপ কঙ্কণ নিয়ে গৃহস্থ মণ্ডল ও পুরাই দত্ত নামক বাণিয়ার কাছে যাওয়ার প্রসঙ্গটি কাহিনীতে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছে। সেই সঙ্গে উভয়ের কাছে কালকেতুর যাওয়া ও বিক্রয় করার ক্ষেত্রে ধর্মের বাতাবরণকে প্রাধান্য ও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই জন্য বোধ হয় কবি কালকেতুর কঙ্কণ বিক্রি করার ক্ষেত্রে গৃহস্থ মণ্ডল ও পুরাই দত্ত নামে বাণিয়া এই দুইটি চরিত্র অবতারণা করেছেন।

দেবী কর্তৃক কঙ্কণ প্রদানের পর কাহিনীতে এসেছে দেবীর শতনাম প্রসঙ্গটি। এটি কাহিনী ধারার সঙ্গে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে কবি সংযুক্ত করে দিয়েছেন। কালকেতু কঙ্কণ লাভ করেও দেবীর স্বরূপ ও শতনাম শুনে তার প্রতি প্রবোধ জ্ঞান করতে চেয়েছে। সেখানে দেবী তার শতনামের মধ্যে যেসকল নাম উল্লেখ করেছে সেগুলি হল ক্রমান্বয়ে — চণ্ডিকা, চর্চ্চিকা, চামুণ্ডা, কালিকা, চণ্ডবতী, মহামায়া, শুভা, শুভঙ্করী, ইন্দ্রানী, ব্রহ্মাণী, নারসিংহী, কৌমারী, শক্তিরূপিনী, জয়ঙ্করী, জয়া, শঙ্করী, অভয়া, বেদবতী, নারায়ণী, কালি, কপালিনী, কৌশিকী, কামিনী, বৈষ্ণবী, শিব বণিতা, গৌরী, শাকম্ভরী, গঙ্গা, সুরেশ্বরী, আদি দেবী, গোমতী, সতী, জয়ন্তী, ভয়ঙ্করী, ভীমা, উগ্র, চণ্ডা, উমা, মহাতেজা, জমুনা, জোগিনী, যশোদা নন্দিনী, যোগনিদ্রা, জয়প্রদা, মৃড়ানী, অম্বিকা,

প্রচণ্ড কালিকা, শিবা, বিজয়া, পার্ব্বতী, বিষ্ণুপ্রিয়া, বিশালাক্ষী, খড়্গনী, শূলিনী, খেটক ধারিণী, দাক্ষী, কার্তিকী, কামরূপিনী, খগেশ্বরী, চণ্ডী, জলেশ্বরী, জয়দূতী, তপস্বিনী, জক্ষিনী, ত্রিপুটা, ত্রিনেত্রা, সঙ্কটা, শতভূজা, দ্বারবাসিনী, গদিনী, চক্রিণী, পিঙ্গলা, মোহিনী, সাবিত্রী, যোগরূপিনী, সরস্বতী, কামক্ষ্যা, কিরাতী, চণ্ডমুণ্ডা, চতুর্ভূজা, আদ্যা, কালরাত্রি, সর্বানী, সহস্রাক্ষী, শতভূজা, অপর্ণা, বামাক্ষী, সুবেশা, প্রত্যঙ্গী, শুভেশ্বরী, জগন্মাতা, শান্তি ইত্যাদি। এই সকল নামের উল্লেখ অধিকাংশ বেদ ও পুরাণে লক্ষ্য করা যায়। আর দেবী চণ্ডীর 'দ্বারবাসিনী' নামটি স্থানীয় মালদহ জেলার আঞ্চলিক নামের প্রত্যক্ষ প্রভাব জাত। প্রমাণ স্বরূপ ভবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর কথায় বলা যায় — "এই দ্বারবাসিনী দেবীর মন্দির গৌড়ের উপকণ্ঠে স্তূপাকারে এখনও বর্ত্তমান।"[১২৬] দেবী চণ্ডীর শতনামের উল্লেখ আমরা 'দেবীপুরাণ' গ্রন্থে লক্ষ্য করি। সেখানে দেবীর বিভিন্ন নাম এবং সেই নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা রয়েছে। তা এরূপ —

> "শিবা মূক্তিঃ সমাখ্যাতা যোগিনাং মোক্ষগামিণী
> শিবায় যো জপেদ্দেবী শিবা লোকে ততঃ স্মৃতা
> *   *   *
> সোমসূর্য্যানিলাস্ত্রীণি যস্যা নেত্রাণি ভার্গব।
> তেন মা এ্যম্বকা দেবী মুনিভিঃ পবিকীর্ত্তিতা।।
> যোগাগ্নিনা তু যা দগ্ধা পূনর্জ্জাতা হিমালয়ে।
> পূর্ণসূর্য্যেন্দুবর্ণাভা অতো গৌরীতি সা স্মৃতা।। ৭
> জলায়ানা নরা গৌর্য্যা সমুদ্রশয়নাথবা।
> নারায়ণী সমাখ্যাতা নরনারীং প্রকুর্ব্বতা।। ৮
> স্মরণাদিভয়ে দুর্গে তারিতা রিপুসঙ্কটে।
> দেবাঃ শক্রাদয়ো যস্মাৎ তেন দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা
> কং ব্রহ্মা কং শিবঃ প্রোক্রমশ্মসারঞ্চ কং মতম্
> ধারণাদ্বসনাদ্‌বাপি কাত্যায়নী মতা বুধৈঃ।।"[১২৭]

(অর্থাৎ, "শিব শব্দের অর্থ মুক্তি, দেবী যোগিগণের মোক্ষফল প্রদান করেন। শিবফলের নিমিত্ত দেবীর আরাধনা করা হয় বলে তার নাম শিবা। ... চন্দ্র, সূর্য্য, এবং বায়ু ইঁহারা দেবীর নেত্রত্রয়স্বরূপ, এইজন্য মুনিগণ তাঁহাকে ত্র্যম্বকা বলেন। দেবী যোগানলে স্বীয় তনু দগ্ধ করে পুনর্ব্বার হিমালয়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া পূর্ণচন্দ্র সদৃশ গৌর দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার নাম গৌরী। নার-শব্দে জল বুঝায়, এই জল দেবীর আশ্রয় কিংবা তিনি সমুদ্রশায়িনী, এরজন্য তাঁহার নাম নারায়ণী। স্মরণমাত্রেই দেবী ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে দুর্গম শত্রুসঙ্কট-ভয় হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন

বলিয়া তাঁহার নাম দুর্গা। 'ক' শব্দে ব্রহ্মা এবং 'ক' শব্দে শিব; ইহাদিগকে ধারণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম কাত্যায়নী।")[১২৭] এছাড়াও এরই সঙ্গে এই গ্রন্থে দেবীর জয়ন্তী, অজিতা, বিজয়া, কালী, কপালিনী, কপালি, চামুণ্ডা, কৌশিকী, ভবানী, অপর্ণা, সাবিত্রী, ত্রিশূলী, শঙ্করী, ত্রিনয়না, ভগবতী, সর্বজ্ঞা, শান্তি, অপরূপা, শৈল-রাজ-সূতা, মাতৃকা, বেদমাতা, ব্রাহ্মণী, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী ও ব্রজী ইত্যাদির নামের উল্লেখ রয়েছে। দেবী চণ্ডীর এই শত নামে শক্তিরূপিনী দিকটি স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। এর কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। তবে সেখানে দেবী চণ্ডীর সঙ্গে বৈদিক যুগের অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অরণ্যানীর সংযোগ ঘটেছে। কারণ দেবীর এই স্বরূপের সঙ্গে বর্তমান কালকেতুকে ধন প্রদান এবং অরণ্য পশুদের রক্ষার সম্বন্ধ রয়েছে। আর কালকেতু জীবিকায় পশুশিকারী এবং প্রচুর ধনসম্পত্তির প্রতি তার নির্লোভিই কাহিনীতে অরণ্যানী দেবীর সঙ্গে বিপরীত ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। এই দেবীর সম্বন্ধে সুকুমার সেন বলেছেন — "চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু উপাখ্যানের দেবী হলেন এই অরণ্য-চণ্ডী। পশুদের মাতা তিনি, কালকেতুর হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই তিনি ব্যাধের সন্তানকে রাজা করে দিয়েছিলেন।"[১২৮] কালকেতুর সঙ্গে দেবীর মনোবাঞ্ছার বৈপরীত্য প্রকাশ পেয়েছে এইভাবে —

"মৃত্তিকাতে ঘাও মারে ব্যাধের নন্দন।
খন্তার ঘায়ে কেতুর কপাল করে টনটন।।
কালকেতু বলে মোর ধনে নাই সাধ।
মৃগবধি মাংস বেচিয়া খাব ভাত।।"[১২৯]

অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনকে এই নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ চরিত্রটি হঠাৎ মেনে নিতে পারেনি। তবে কাহিনীর অনিবার্যতার কারণে কালকেতু দেবীর অনুরোধে খেজুর ও নারিকেল গাছের গোড়া থেকে সাত ঘড়া ধন উত্তোলন করে। সাত ঘড়া ধনের মধ্যে কালকেতু ছয় ঘড়া এবং দেবীকে এক ঘড়া দিয়েছে। যেই দেবী তাকে এই ধন প্রদান করল তখন কালকেতু তার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করল। কালকেতুর মত অতি নিম্নবিত্তের মানুষের পক্ষে এরূপ আচরণ নতুনত্বের নয়। ধন নিয়ে কালকেতু গৃহে পৌঁছায়। তারপর কাহিনীতে ধনপূজার অভিনব ঘটনাটি এসেছে। কাহিনীধারায় ধন-পূজার ঘটনাটির বর্ণনা অতিরিক্ত অংশ বলে মনে হয়। কালকেতুর ভাঙা ঘরে ধন পূজা দ্বারা তা স্থায়ীকরণে অস্বাভাবিকতা ও অলৌকিকতার প্রভাব রয়েছে।

আখেটিক খণ্ডে এরূপ ধনপূজার লৌকিক বিশ্বাস ও আচরণের ঘটনা কাহিনী গ্রন্থনায় নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে। দেবী চণ্ডীর দুর্গা চামুণ্ডা স্বরূপের সঙ্গে এখানে লক্ষ্মী দেবী ভাবনা যুক্ত হয়ে গেছে। তবে কবি বিভিন্ন তথ্য প্রদান করলেও কাহিনী গ্রন্থনার ক্ষেত্রে তা শিথিলতা গ্রাস করেছে। এছাড়া কালকেতু তার ধন নিয়ে গুজরাট নগর পত্তন করবে কিনা সে বিষয়ে কোন সদুত্তর

কাহিনীতে পাওয়া যায় না। বরং কালকেতুর মত সামাজিক পরিচয়ে নিম্নস্তরের ব্যাধ জাতির কাছে অকস্মাৎ বহু ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়ে ওঠা রাজদণ্ডের কারণ হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে। রাজতন্ত্রে রাজাই সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রজা তার অধীনস্ত। সেই প্রজা যদি অর্থে রাজা সম হয় তাহলে ক্ষমতাবান রাজা তাকে দুষ্কৃতির অভিযোগে দণ্ড বিধান করবে। তাই কালকেতু দেবীকে বলে —

"ধনের কার্য্য নাঞি কহিলাঙ তোমারে।
ধনবান হইলে রাজাএ দণ্ড করে।।"[১৩০]

সমাজে এরূপ ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন অভিজ্ঞতার আভাস দিয়েই কবি মানিক দত্ত এই দণ্ড বিধান থেকে মুক্তির উপায় স্বরূপ দেবী চণ্ডীর ব্রতের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই ব্রতের নিয়ম ও মঙ্গলবাণী ধ্বনিত হয়েছে।

"শুন বাছা কালকেতু শুন মোর বানী।
জে নাম স্মরিলে বাছা আসিব আপুনি।।
অরন্যে প্রান্তরে আর মর্থভুবনে।
দৈত্যে বেড়িয়া থাকে সংকট জে স্থানে।।
সে সব সংকটে আমি রাখিএ সকল।
জদি একচিত্ত ভাবে শুনে আমার মঙ্গল।।
রাইহ হইয়া শুনে যদি আমার মঙ্গলব্রত।
যুগে২ থাকেন তাহার রাইহত।।
বিধবা হইয়া শুনে আমার মঙ্গল।
অন্তঃকালে দেই তাকে রাঙ্গা পদে স্থল।।
শুন বাছা কালকেতু মোর হিতুবানী।
নিজ নামে স্মরিলে বাছা আসিব আপনি।।"[১৩১]

এই মঙ্গলব্রতের পাশাপাশি কাব্যে ধন বিক্রি করার কথা প্রসঙ্গে পুরাই দত্তের নাম উল্লেখ থাকলেও তার সঠিক ব্যাখ্যা কবি এড়িয়ে গেছেন। বরং সেইস্থানে মঙ্গলচণ্ডীর পশুবলি দিয়ে শনি-মঙ্গলবারে পূজার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে দেবী চণ্ডীর শক্তি স্বরূপটি অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। দেবী পশুবলী দ্বারা সন্তুষ্ট হয়। তার পূজা হয় শনি ও মঙ্গলবারে। প্রসঙ্গত, দ্বিজমাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য বলেছে— "উগ্র মার্তৃ-মূর্ত্তির ন্যায় মঙ্গলবার এই দেবীর প্রিয় বার।"[১৩২] মধ্যযুগে মানুষের উর্দ্ধে দেবতার স্থান — এরও পরিচয় পাই কালকেতুর উদ্দেশ্যে দেবী চণ্ডীর উক্তিতে। দেবী চণ্ডী কালকেতুকে বলে —

"তোমার কুড়িয়াতে আমার পদভর।

ইহার উপরে বান্দিহ দিব্য আমার পূজার ঘর।।"[১৩৩]

এভাবে কবি মানিক দত্ত কালকেতুর ধন প্রাপ্তি এবং গুজরাট নগর স্থাপনের পূর্বে কয়েকটি আনুষাঙ্গিক সামাজিক ও ধর্মীয় ভাবনার উন্মোচন ঘটিয়েছেন। এই সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষঙ্গগুলি কাহিনীকে ধীর করেছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শৈল্পিক লক্ষ্যের থেকে একটু বেরিয়ে উপলক্ষ্যকে বড় করে তোলা হয়েছে। তবু সেই উপলক্ষ্যগুলিও মধ্যযুগের বিশিষ্ট ভাবনার পরিচায়ক।

এরপরে কাহিনীতে আসে গুজরাট নগর পত্তনের ঘটনা। গুজরাট নগর পত্তন ঘটনাটি তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অকস্মাৎ অনুপ্রবেশ ঘটেছে। পূর্ববর্তী ঘটনার সঙ্গে গুজরাট নগর পত্তনের কোন স্পষ্ট কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। দেবী চণ্ডী কালকেতুকে ধনপ্রদান করে নগর পত্তনের কথা উল্লেখ করেনি। উপরন্তু গুজরাট নগর পত্তনের সময় দেবীর সহায়তার জন্য যে অসুবিধার কারণ উপস্থাপনা হয়েছে তাও স্বাভাবিক জনজীবনের সঙ্গে অটুট সম্পৃক্ত নয়। কবি কালকেতুকে দেবীর দ্বারস্থ হওয়ার কারণ স্বরূপ বাঘের ভয়ে এক ঘোড়া খাদে পড়ে যাওয়া এবং তার সঙ্গে অন্য সকলেও পালিয়ে যাওয়াকে দেখিয়েছেন। তার ফলে চণ্ডীর আগমন ঘটে। দেবী চণ্ডীর চক্রবাণের অনলে সকল বন কেটে সাফ হয় এবং উচু-নিচু সমান করে গুজরাট নগর স্থাপিত হয়। সেখানে একশত বাড়ি স্থাপন করলেও কালকেতুর বাড়ি সবার উপরে। এবং নিরাপত্তা রক্ষার জন্য চার দ্বারে চার জন দারোয়ান নিযুক্ত করে। কালকেতু গুজরাট নগরের রাজা হলে সেখানে পুরীর ভিতর দেবীর দোহরা নির্মাণ করে। দোহরা তৈরী করে পূজার বর্ণনায় তন্ত্রশাস্ত্রের নিয়মাবলীর প্রভাব রয়েছে। কালকেতু পশুবলি দিয়ে শনি-মঙ্গল বারে ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা করা হয়েছে। তার আগে সে ভূত সুদ্ধি ও বিভিন্ন ন্যাস করে নেওয়া হয়। সাধারণত তন্ত্রশাস্ত্রে ঘট স্থাপন করে যে দেবী পূজার প্রধান অঙ্গ তাও এখানে লক্ষ করা যায়। এর কারণ সম্বন্ধে 'তন্ত্রকথা' গ্রন্থের রচয়িতা চিন্তাহরণ চক্রবর্তী বলেছেন — "ইহার কারণ বোধ হয় ইহাদের মূর্তির ভীষণতা।"[১৩৪] মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এর উল্লেখ পাওয়া যায় —

"বান্ধিল দেহরা ঘর পুরীর ভিতরে।
বলি দিয়া করে পূজা শনি মঙ্গল বারে।।
*　　　*　　　*
উত্তর মুখে স্থাপিল দুর্গার ঘট বারা।
মণিমুক্ত দিয়া কনকে বান্ধে ঝারা।।
ধূপদীপ দিয়া করিল অন্ধকার।
কাএ মনে ভবানীক লাগিল পূজিবার।।
বীজ মন্ত্র জপিয়া ঘটতে দিল জল।

সেই সময় য়াইল দুর্গা সর্ব্বমঙ্গল।।”[১৩৫]

লক্ষণীয় তন্ত্রশাস্ত্রে দেবী পূজার একটি উপায় হল মন্ত্র। 'মন্ত্র' শব্দের অর্থ হল 'মননাৎ ত্রায়তে' অর্থাৎ যে বস্তু মনন করতে করতে ত্রাণ পাওয়া যায়। মন্ত্রতন্ত্র তন্ত্রশাস্ত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তন্ত্র মতে প্রত্যেকেরই ইষ্টদেবতার বীজ মন্ত্র রয়েছে। এই বীজ মন্ত্রের দ্বারাই কালকেতু দেবী চণ্ডীকে সহজে পেল। এরূপ দেবী চণ্ডীকে কালকেতুর স্মরণ করার কারণ —

“চারি রাজ্যের প্রজা দুর্গাকে করএ ভজন।

তব না ভরিল গুঞ্জুরার এককোন।।”[১৩৬]

এরূপ পরিস্থিতিতে মানুষকে আস্বস্ত করার জন্য শক্তিদেবীর প্রয়োজন ছিল। সেই পরিস্থিতির অনুকূল করেই কবি কাহিনীতে শক্তিরূপিনী চণ্ডীকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সেজন্য কবি এখানে দেবী পূজায় শক্তিরূপিনী চণ্ডীর পূজায় তন্ত্রশাস্ত্রের কথা এনেছেন। কাহিনী ধারা এখানে তন্ত্রশাস্ত্রের পূজা পদ্ধতির দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত।

এরপর কাহিনীতে নতুন নতুন ঘটনা ও চরিত্রের বহু সমাবেশ ঘটেছে। আর কলিঙ্গ রাজ্য ভাঙ্গার থেকে কাহিনীতে দ্বান্দ্বিক পরিবেশের সূচনা হয়। সেক্ষেত্রে দেবী চণ্ডী কর্তৃক গুজরাট নগরে বসতি স্থাপনের উপায় বর্ণিত হয়েছে। চণ্ডীর গুজরাট নগরে বসতি স্থাপনের জন্য উপায় বের করতে নারদ চরিত্রকে আনয়ণ করা হয়। নারদই কলিঙ্গ রাজ্য ভাঙ্গার বুদ্ধি দেয়। দেবী চণ্ডী প্রথমে এই কার্যে কলিঙ্গের চার মণ্ডলকে তার ব্রতের মঙ্গল এবং শক্তিরূপিনী রূপের কথা স্বপ্নে বলে। প্রভাতের স্বপ্ন সত্য — এই লোক বিশ্বাসে তারা চারজন কলিঙ্গের সকলকে নিয়ে পালিয়ে যেতে রওনা দেয়। তারা জানে সম্পদ ও ঐশ্বর্য সমাজে শক্তির মূল প্রাণকেন্দ্র। মধ্যযুগের সাহিত্যের গবেষক আহমদ শরীফ-এর কথা প্রসঙ্গত মনে আসে — “মঙ্গলকাব্যগুলো বাঙালী হিন্দুর মন-মনন ও সংস্কৃতির প্রসূন। অর্থই হচ্ছে শক্তির উৎস, ধন যার আছে মান তারই।”[১৩৭] দেবী চণ্ডী কলিঙ্গের মণ্ডলদের গুজরাট নগরে পাঠানোর জন্য অলৌকিক স্বপ্ন, পার্থিব চিন্তা, পরকাল ভাবনা, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য লোক বিশ্বাস ও তন্ত্রের শক্তি দেবীর স্বরূপটিকে কাজে লাগানো হয়েছে। এর ফলে কাহিনীতে ঘটনার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হয়। সে যাইহোক, কালকেতুর জন্ম থেকে কলিঙ্গ ভাঙন পর্যন্ত কাহিনীর আদিপর্ব।

আর কাহিনীর মধ্য পর্বের সূচনা হয় ভাঁড়ু দত্তের সঙ্গে চণ্ডীর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। চার মণ্ডলের পর মঙ্গলকাব্যের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি তথা পুরাতন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ভাঁড়ু দত্তের কথায় তার উদ্ভব। সেখান থেকেই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর মধ্যে Climax-এর সূত্রপাত। ভাঁড়ু দত্ত কলিঙ্গ রাজ্যে অন্যান্য মণ্ডলদের মধ্যে তার সামাজিক অবস্থান সর্বোচ্চ।

“শুনিয়া ভাড়ুর বানী   চারি মণ্ডল মনে গুনি

হৃদয়ে জপিছে নারায়নী।

দুষ্ট ভাড়ুয়া বেটা বাদে লাগিল মাতা ঠেটা

উদ্ধার কর মাতা নম নারায়নী।।"[১৩৮]

কারণ, ভাঁড়ু দত্ত প্রতিষ্ঠিত কলিঙ্গ রাজ্য ভেঙ্গে নব প্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগর প্রতিষ্ঠা করতে নারাজ। তাতে চণ্ডীর সম্পূর্ণ ব্রত প্রচারের উদ্দেশ্য অসমাপ্ত থাকবে। তাই ভাঁড়ু দত্তের মত অসামাজিক ও সমাজ বিরোধী চরিত্রকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য দেবী চণ্ডীর স্বর্গপুরে ইন্দ্রের কাছে যাত্রা। ইন্দ্রপুরে যাত্রায় হিতোপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে চণ্ডীর সহচর হয়েছে নারদ। নারদ চরিত্রটি চণ্ডীর তথা কাহিনীর গতি প্রবাহকে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রভাবিত করেছে। লক্ষণীয় যে, ইন্দ্রের সভায় নিম্নশ্রেণীর দেবী চণ্ডীকে অদ্ভুত সমাদরের সঙ্গে আতিথেয়তায় বরণ করছে।

"শচীর মাথে দিয়া ইন্দ্র আগর চন্দন।

চাম্পার ফুলের মালা পরিষদগণ।।

মাথে করি নিল ইন্দ্র দিব্য সিংহাসন।

সমুখে আসন থুইয়া বন্দিল চরণ।।"[১৩৯]

মঙ্গলকাব্যে তথা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী গ্রন্থনায় এই বিনয়ের দিকটি কবি তুলে ধরেছেন। দুই সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব নয়; বিপদে উভয়ের মধ্যে মানবিক সম্বন্ধই এর মূল কথা। মধ্যযুগের প্রাজ্ঞ গবেষক অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন — "সম্ভবত, প্রথমে অলীক অলৌকিক দেবদেবী পরিকল্পনা, পরে মিশ্রিত অলৌকিক-মানবিক জগতের বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে মানুষের মন ও দৃষ্টি বিশুদ্ধ মানবিক জগতে নিবদ্ধ হয়। ... এই ইতিহাস মানুষেরই আত্মচেতনার বিকাশের ইতিহাস। আত্মচেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কাব্য ধীরে ধীরে পৌরাণিক ও দেবদেবীর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে পার্থিব মানবিক জীবনকে সৃষ্টি করে। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের মানবায়িত দেবদেবীর কাহিনীর মধ্যে মানুষের বর্দ্ধিষ্ণু আত্মচেতনার স্বাক্ষর বর্তমান।"[১৪০] তাই দেবীর মুখে সমস্ত ঘটনা শোনার পর ইন্দ্র আট জন মেঘকে ডাকল। তার ফলশ্রুতিতে আট প্রকার মেঘের শক্তি মহিমা ও কথন ভঙ্গিতে রূপকথার প্রকাশ পেয়েছে। সেই আট প্রকার মেঘের নাম হল — হুরুকা, দুরূকা, আবর্ত, সামর্ত, কালাপাহাড়, আন্ধারিয়া, কালিয়া ও সিন্দুরিয়া ইত্যাদি। কথনভঙ্গি, অতি শক্তিমহিমা ও তোষামদ লক্ষ্য করে চণ্ডী অন্তরে তাদের অক্ষমতার অনুভব করে এবং হেসে 'নাল মাহিনা' * বা চাষের জমি বেতন স্বরূপ ভোগ করার অভিযোগ শোনায়। অতঃপর দুই জন মেঘ ছাড়াও দেবী চণ্ডী

*এই চাষের জমি বেতন স্বরূপ দেওয়ার ব্যবস্থা সুলতান আমলে (১২০৬—১৫২৬) 'ইক্তা' ব্যবস্থায় প্রচলন ছিল। মুঘল আমলে তা 'মনসবদারি' ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয়। তার বর্ণনা এইরূপ— "The jagirdars were usually mansabdars, holding ranks (mansabs) bestowed upon them by the emperor. These ranks were generally dual, viz. zat and sawar, ... The pay scales for both ranks were minutely laid down, and the manasabdars received their emoluments either in cash (naqd) from the treasury, or, as was more common, were

assigned particular areas as - jagirs."—Irfan Habib, The Agrarian System of Mughal India (1556-1707), Oxford University Press, Second Revised Edition, 1999, P. 299-300.

পবন নন্দন বীর ও শক্তিশালী হনুমানকে দিয়ে সমগ্র কলিঙ্গ রাজ্যকে পাখার মত ঘুরায়। অন্যদিকে, ভাঁড়ুকে বিড়ম্বনা করার জন্য চারিদিকে জলকীর্ণ করে দেয়। ভাঁড়ু দত্ত তখন তার ইষ্ট দেবতা শিবের প্রতি অনাস্থা ও ইন্দ্রের প্রতি ভরসা হারায়। তবু সে দুর্গার মত নতুন দেবীর বশ্যতা স্বীকার করতে অসম্মত হয়। ভাঁড়ুর মধ্য দিয়ে পুরাতন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দুর্বলতা ও উদাসীন শিবের প্রতি অনাস্থা এবং নতুন দেবী চণ্ডীর প্রতি ফল্গুধারার মত কিঞ্চিৎ আসক্তির আভাস পাওয়া যায়। অরবিন্দ পোদ্দার-এর কথা এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য — "মানুষের মধ্যে জীবনকে ঘোষণা করার, প্রতিকূল পরিবেশের দুর্দৈব থেকে আত্মরক্ষা করার, যে সহজ প্রবৃত্তি আছে তা নিজেকে প্রকাশ করতে চায়, কিন্তু নিষ্ক্রিয় জীবনদর্শন ও আরাধ্য দেবতা তার পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তখনই আঘাতের স্পর্শে সৃষ্ট নতুন ব্যক্তিসত্তার অন্ত-বিরোধ দেখা দেয়; মানুষের নিজস্ব সত্তা যেন বিরোধী দুটো সত্তায় বিভক্ত হয়ে যায় — এক, তার পুরাতন ভাবাদর্শের প্রতি আকর্ষণ; দুই, সৃষ্টি চেতনায় উন্মুখ নতুন। এই দু'য়ের সংঘাত থেকেই নতুন ব্যক্তিসত্তার আবির্ভাব। এই সংঘাতে পরিবেশের সঙ্গে খাপ-না-খাওয়া পুরাতন আদর্শ আপনাকে বাঁচাতে পারে না; মধ্যযুগের ঝড়-ঝঞ্ঝায় বিপর্যস্ত আবহাওয়ায় শিব তাই বেমানান।"[১৪১] মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর বিড়ম্বনায় ভাঁড়ু দত্তের এরূপ মনোভাবনার পরিচয় স্বাভাবিক। অতঃপর শিব পূজক ভাঁড়ু দত্তকে উপযুক্ত শায়েস্তা করতে ব্যর্থ হয়ে চণ্ডী তার সতীন তথা শিবের স্ত্রী গঙ্গার কাছে সাহায্যের জন্য দ্বারস্থ হয়। ভাঁড়ু দত্তের অপরাজয়কে সামনে রেখে কবি চণ্ডী ও গঙ্গার মধ্যে সতীন ভাবনা জনিত দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করার অবকাশ পেয়েছেন। তাই গঙ্গা তাকে সাহায্য করতে অসম্মত হলে চণ্ডী ইন্দ্রের কাছে উপস্থিত হয়। ইন্দ্রের কথায় গঙ্গার পুত্র ডাক ও ডেউরের কাছে আসে। ভাঁড়ু দত্তকে শায়েস্তা করতে বিভিন্ন স্থানে যাত্রা ও ব্যর্থতা বর্ণনায় কাহিনী অনেক জটিল হয়েছে।

এরপরই আসে কাহিনী গ্রন্থনায় বাস্তবতার ছোঁয়া। তাতে দেবী চণ্ডীর ডাক ও ডেউরের পুরীতে যাত্রা এবং তাদের আপ্যায়ন বাস্তবপ্রসূত। তাদের দ্বারা ভাঁড়ুকে বিড়ম্বনা করার পূর্বে দেবীর কলিঙ্গের অন্যান্য প্রজার প্রতি বাৎসল্যরসাসিক্ত রূপ ঝরে পড়ে, তাই সে কলিঙ্গের অন্যান্য প্রজাদের প্রেরণ করে। তারপর চারি প্রকার বন্যার দ্বারা কলিঙ্গ ভাসিয়ে দেয়। তাতে ছত্রিশ জাতির কলিঙ্গ ছেড়ে যাওয়ার কথা পাওয়া যায়। তা অত্যন্ত বর্ণনাবহুল নয়। তবে তার মাঝেই সমাজের বয়োবৃদ্ধদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা ধরা পড়েছে। তারা কখন আশ্বিন মাসে বন্যা দেখে নি। বন্যার আগমনে ধান ডুবে যাওয়ায় কৃষকদের মাথায় হাত; ছোট-বড় বাড়ি ভেঙ্গে যাওয়া, মোদকের মুদির দোকান, কাপাসের কাগজ ভেসে যাওয়া, ঘরের গৃহপালিত পশু, তৈজস পত্র ভেসে যাওয়া এবং সেই অকস্মাৎ বিপদে 'কারো সর্বনাশ কারো ভাদ্র মাস'। কবি মানিক

দত্তের এই বর্ণনা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত এবং তা সহজসরল ও বর্ণনাবহুল রূপ ধরা পড়েছে। তবে সেই বর্ণনা কাহিনীর ক্ষেত্রে বিস্তৃত হলেও বাস্তবতা ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ নিখাদ সত্য। লৌকিক জীবনে এরূপ সত্য চিত্রের এক ঝলক কবি এখানে সংযোজন করেছেন।

অতঃপর ভাঁড়ুর অবস্থার উপর পাঠকের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। ভাঁড়ু প্রবল পরাক্রমে দেবীর সঙ্গে লড়ে গেছে। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সে যথেষ্ট আত্মশক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছে। আত্মশক্তি জাগিয়েছে তার পুরাতন ধর্ম বিশ্বাস ও সামাজিক মর্যাদার প্রেরণা থেকে। কিন্তু কাহিনীর অনিবার্য রথচক্রে তাকে দেবী চণ্ডীর শরণাপন্ন হতে বাধ্য হতে হয়। লক্ষণীয়, ভাঁড়ু দত্ত একাই দেবী চণ্ডীর প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়নি; তার সঙ্গে ছিল তার গোষ্ঠী। কবি তা বর্ণনা করেছেন এই ভাবে —

"মাটি ভাঙ্গিয়া বেটা উগার বান্ধিল।
সগোষ্ঠি সহিতে ভাড়ু উগারে চড়িল।।
ধীরে২ গেল বন্যা উগারের তরে।
টুই ফাড়ি দিয়া বন্যা উঠিলেন চালে।।
চালে চড়িয়া ভাড়ু চারিদিগে চাএ।
ভাড়ু বলে আমার বৈরী হৈল মহামায়ে।।
জেই দিগে ভাড়ু চাহে সেই দিগে বাণ।
ভাড়ু বলে মহামাএগ রাখহ পরাণ।।"[১৪২]

সম্ভবত, ভাঁড়ুর এই পরাজয়ের পিছনে পরিবারের স্নেহ ও দায়িত্ববোধ সক্রিয় ছিল। সম্মুখ বিপদ থেকে বাঁচার তাগিদে ভাঁড়ু দেবী চণ্ডীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলে দেবীও তাকে সহ সগোষ্ঠীকে বাঁচাবার জন্য ভেলা এগিয়ে দেয়। কারণ ভাঁড়ু মারা গেলে তার ব্রত পূর্ণ হবে না। তাই দেবী চণ্ডী তার মত ঠগঠামন বা প্রতারককে রক্ষা করল। এখানে দেবী চণ্ডীর চরম ভক্ত-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিত স্বভাবই তার কারণ। যে কিনা শত্রু বা প্রতিবাদীকে চরম বিপদে ফেলতে পারে, আবার তার প্রতি অনুগ্রহ প্রার্থী হলে প্রাণরক্ষা করতেও এগিয়ে আসতে দেরী হয়না। প্রসঙ্গত, অরবিন্দ পোদ্দার-এর মন্তব্য মনে পড়ে। তিনি বলেছেন — "শক্তি-কল্পনার মধ্যে মানুষের দুটো সহজাত প্রবৃত্তি পরিশোধিত রূপে প্রকাশ লাভ করেছে — একদিকে তাঁর বাঁচার আকূতি, আত্মরক্ষার ও সেজন্য প্রয়োজনীয় সংগ্রামের প্রেরণা; এবং অন্যদিকে সৃষ্টি ও পালনের আকূতি। আর এই দুই প্রেরণার সংযুক্ত অভিপ্রকাশের ভিতর দিয়ে মানুষ নিজেকেই প্রকাশ করেছে, প্রকাশ করেছে তার মনোগত ভাবকে যে সে মানুষ, এবং মানুষ হিসেবে তার জীবনের অব্যক্ত লক্ষ্য হলো নিজেকে উপলব্ধি করা।"[১৪৩] শেষ পর্যন্ত ভাঁড়ু দত্ত এই মানবিকতার খাতিরে দেবী চণ্ডীর নতুন রাজ্যে আগমনে বাধ্য হয়। আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রতি দৃঢ়বদ্ধ ভাঁড়ুর শক্তিরূপিনী দেবীর কাছে পরাজয়ই

বড় হয়ে ওঠে। ভাঁড়ু দত্তের এই পরাজয় কাহিনী গ্রন্থনায় মূল কেন্দ্রিয় উদ্দেশ্যের দিক থেকে স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

কাহিনী ধারার কালানুবৃত্তে ভাঁড়ু দত্ত কংশ নদীর তীরে সকল প্রজার সামনে উপস্থিত হয়। প্রজাদের জন্মভূমি থেকে উৎপাটিত করার মনদুঃখকে লক্ষ্য করে সে সহানুভূতি প্রকাশ করে। প্রসঙ্গত, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মুকুন্দ চক্রবর্তী সম্বন্ধে বলেছেন — "... মুকুন্দরামের গ্রন্থে এই migration বা দেশত্যাগের ব্যাপারটি এত সহজে সম্পন্ন হয় নাই।"[১৪৪] সমালোচকের এই মন্তব্য মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ক্ষেত্রে খাটে না। সকল প্রজার উদ্দেশ্যে বলে — "মন ব্যথা দেখি কেন জত প্রজাগণ।।"[১৪৫] এই দুঃখের কারণ অনুসন্ধান এবং তাদের সমর্থন পাওয়ার কৌশলী চরিত্র রূপে ভাঁড়ু দত্তকে এখানে সঠিক অঙ্কন করা হয়েছে। এধরনের চতুর চরিত্র আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতে সহসা লক্ষ্য করা যায়। কালকেতুর মত সহজ-সরল ব্যাধের কাছে ভাঁড়ুর মত বিচক্ষণের উদ্দেশ্য সাধন কাহিনীতে অসামঞ্জস্য বলে মনে হয় না।

এরপর কাহিনীতে প্রথানুসৃত গুজরাট নগরের বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-বৃত্তির মানুষের বসতি স্থাপন বিষয়টি এসেছে। সেখানে প্রথমে কবি মুসলমানদের বসতির কথা বলেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর তথা মধ্যযুগের মুসলমান শাসকদের প্রতি আনুগত্যবশত এরূপ বর্ণনা অসম্ভবের কিছু নয়। মুসলমানদের মধ্যে মীর, পাঠান, উচ্চশ্রেণীর মানুষ ছাড়াও শেখ, কাজী, মোল্লা, ফকির প্রভৃতি ধর্মপ্রাণ আছে। তার পাশাপাশি পাখি বিক্রেতা, বিভিন্ন জাতির ব্রাহ্মণ, নগরের মাঝে কায়স্থ ও বৈদ্য ইত্যাদি জাতি নিয়ে আশিটি ঘর এবং পশ্চিমে বাণিয়া, নগরের মাঝে কৈবর্ত্য, তেলি, মালী, কুমার, কামার, বারই, গোয়ালা, তৈলঙ্গা, মোদক, মাছুয়া প্রভৃতি সম্প্রদায় কালকেতুর গুজরাট নগরে বসতির জন্য আসে। কবি প্রথমে ছত্রিশ জাতির নাম এবং তারপর তাদের জীবিকার কথা পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় বর্ণনা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে কালকেতুর গুজরাট নগরে বাণিয়া হাট, গোত্তাল হাট, তৈলঙ্গা, মোদকি, পুড়ি, মালী, তিয়র, কামার ও চাড়াল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন হাটের কথা পাই। এই বিষয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — "যে সমস্ত বিভিন্ন জাতি ও ব্যবসায় বৃত্তির প্রতিনিধি এই নতুন শহরে বাস করিতে আসিল, তাহাদের মাধ্যমে ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা সমাজ বিন্যাসের একটা অতি তথ্য সমৃদ্ধ ও চিত্তাকর্ষক ছবি পাওয়া যায়।"[১৪৬] সেক্ষেত্রে কবি মানিক দত্তের বর্ণনা এরূপ —

"প্রথমে মোশলমানকে করিল মোশলমান।/ হাড়ি কারি বসিল মীর পাঠান।।

*　　　　　*　　　　　*

গাও দশ খোজা বৈসে এ মরা নগরে।/ কাজি মোল্বা জত সব বসিল থরে থরে।।

সেখ ফকির বৈসে গেল শানকি বোঝা২।/ এক সাথে বৈসে গেল আশি হাজার খোজা।।

পক্ষ বেচা বসিল সব থরে থর।/ এক দিগে বসি গেল মনের বাজার।।

ব্রাহ্মণ টোলা বসিল নগর মাঝারে।/ কত জাতি ব্রাহ্মণ বৈসে লেখা নাহি তারে।।

কাএস্ত বসিয়া গেল বৈদ্য আশি ঘর।/ পশ্চিমে বাণিয়া বৈসে লএ কৈতর।।

কৈবর্ত্ত বসি গেল নগর মাঝারে।/ গুড়ি পড়ি কুড়ি বসিল থরে২।।

তেলি মালী বসি গেল কুমার কামার।/ ছত্রিশ জাইত প্রজা বৈসে বীরের বাজার।।

আর জত বসিল লোক কি কহিব তরে।/ নগর মধ্যে হাট পড়ে শনি মঙ্গল বারে।।

প্রথমে কৈবর্ত্ত্য বৈসে বাজারে বেচে ধান।/ বারই ভাই বসিল তারা বেচে পান।।

বাণিয়া হাট বসি গেল অন্য২ পসার।/ গোওাল হাট বসি গেল মধুর বাজার।।

তৈলঙ্গা হাট বসি গেল বাজারে বেচে ভুণি।/ বীরের বাজারে বেচে ভোট কম্বল খানি।।

হস্তী ঘোড়া খরিদ হএ বীরের বাজারে।/ চারি রাজ্যের রাজা আইসে বানিজ্য করিবারে।।

মোদকি হাটা হালুই হাটা খাজা কাটে জারা।/ পুড়ি হাটা কুড়ি হাটা খিড়া বেচে তারা।।

কামার হাটা বসি গেল কোদালি ফাল গড়ে।/ হাড়ি পাতিল বেচে কুমারের বাজারে।।

মালী হাটা বসি গেল তারা বেচে ফুল।/ সেথনি বঙ্গদেশে ধরে ধম্মতুল।।

তিয়র হাট বসি গেল বাজারে বেচে ছাচ।/ চাড়াল হাটা মাছুয়া হাটা বাজারে বেচে মাছ।।"[১৪৭]

আর্য রাজা সুরথের বিরুদ্ধে সমাজে পীড়িত অনার্য দেবী চণ্ডী ও তার অনার্য ভক্ত কালকেতুর ভিন্ন কল্পনার রাজ্য গুজরাট নগর পত্তন একপ্রকার সর্বধর্ম সমন্বয়ের ফলস্বরূপ। তবে প্রায় সব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেই একই বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। এখানে কবি স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ ঘটাতে পারেন নি। তবে তার রাজ্য ছিল বিভিন্ন রাজ্যের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল — এই বাণিজ্য ব্যবস্থার প্রসারের এই তথ্য আমাদের অভিভূত করে। মধ্যযুগে বাণিজ্য ব্যবস্থার সুন্দর আভাস তাঁর কাব্যে পাই। এমন কি, তিনি গুজরাট নগরে বসবাসকারি সকল প্রজার জন্য অট্টালিকা তৈরী করা, খলিফাদের চাঁদা তোলার কঠোর নীতি উচ্ছেদ করা, তুরঙ্গে গিয়ে সকলের ভালো-মন্দ তদারকি করা ও দরিদ্রের অর্থপ্রদান করা ইত্যাদি সমকালীন মানুষের সহানুভূতি অর্জনকারী বিষয়কে এখানে তুলে ধরেছেন। কবি এরূপ প্রজা বৎসল আদর্শ রাজার কথা সমাজের কাছে তথা সমকালের শ্রোতা-পাঠকের সম্মুখে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। অনার্য ব্যাধ কালকেতুর মহৎ ভাবনার কথা প্রসঙ্গে অরবিন্দ পোদ্দার-এর মন্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে — "এই সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে বা আর্য ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার বিরুদ্ধে অনার্য ভাবধারার বিজয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের বাঙ্গালী ভাব-মুক্তি অর্জন করে। এই মুক্তি তার একান্তই কাম্য ছিল; বিবদমান সাংসারিক বিধিব্যবস্থার এবং সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভবত সে এই পথেই অর্জন করতে চেয়েছে। বিভিন্ন ভাবধারার সমন্বয়ের সাহায্যে তাহার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র নতুনভাবে গড়ে উঠতে আরম্ভ করে; সে সকলকেই গ্রহণ করল,

কাউকেই অনাদরে দূরে ঠেলে দিল না। কালকেতুর আদর্শ রাজ্য স্থাপনের মধ্যে সকলকে গ্রহণ করার মনোভংগীর স্বাক্ষর রয়েছে। সেখানে বসবাসের জন্য ব্রাহ্মণরা আসছেন, কায়স্থরা আসছেন, ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-গোপ-ধীবর প্রভৃতিরা আসছেন, মুসলমানরাও আসছেন। সবাই সেই রাজত্বে চণ্ডীর কৃপা লাভ করে' সুখশান্তি সমৃদ্ধিতে জীবন নির্বাহ করতে পারে। ... তাই একটা নির্দিষ্ট স্বার্থ ও উদ্দেশ্য মঙ্গলকাব্য রচনার মূলে থাকলেও এর মধ্য দিয়ে একটি ঐক্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে।"[১৪৮] কালকেতুর গুজরাট নগরে বিভিন্ন জাতি-ধর্মের মানবিক সমন্বয় থাকলেও তা হিন্দু সংস্কৃতি বা পুরাণ সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয়। কালকেতু বিষ্ণুর নাম করে যজ্ঞে একশত ব্রাহ্মণ প্রদান করে। অনার্য ব্যাধ কালকেতুর ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের এই সংস্কৃতির প্রতি সমাদর উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। তবে কবির বিভিন্ন জাতি ও ব্যবসায় বিভিন্ন বৃত্তিজীবীর কথা আলোকপাত অংশটি বিস্তৃত ও তথ্যবহুল হলেও সুগ্রন্থিত নয়।

এরপর ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরা কাহিনীতে আবশ্যক হয়ে ওঠে। সেই কারণে কাহিনী গ্রন্থনায় গুজরাট নগরে অবস্থিত হাটের পটভূমি এসেছে। ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুর নতুন প্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরের আশাতীত সুব্যবস্থা, পরিকল্পনা ও সুযোগ-সুবিধা লক্ষ্য করে ঈর্ষান্বিত হয়। কাহিনীতে ভাঁড়ুর এই রূপ আচরণ অস্বাভাবিক নয়। তার মত দুষ্ট বা 'নাবড়' প্রকৃতির চরিত্রই রাজা কালকেতুকে রাজ্য শাসনের বিষয়ে সচেতন করে দিতে চেষ্টা করে। অতঃপর সে সাতপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে শাক, দুধ ও মাছ ওয়ালার কাছে তোলা বা আয়কর তুলতে যায়। তাতে প্রজাদের প্রতি ভাঁড়ু দত্তের বিরূপ আচরণে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার কয়েকটি দিক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তার দ্বারা শাকওয়ালার তিন কাঠা জমির জন্য নয় 'তঙ্কা' বা টাকা কর, দুধ ওয়ালার গৃহে নয় জন মানুষের ও বহু গরুর পরিসংখ্যানের উপর শোষণের চিত্র ফুটে উঠেছে। কবি এই অর্থনৈতিক অবস্থার সুন্দর তথ্য প্রদান করেছেন। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ভাঁড়ু দত্তের শোষণ নীতির বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হলেও তা সমাজ অভিজ্ঞতার দলিল। এই অর্থনৈতিক জীবনে 'কড়ি' ও 'পোন'কে দ্রব্যবস্তুর পরিমাণক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। এই অর্থনৈতিক শোষণ ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা আদর্শ গুজরাট নগরের ক্ষেত্রে অনিবার্য নয়। প্রজাদের প্রতি পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিপরীত আচরণের কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিন্তু ভাঁড়ু দত্তের মত শঠ চরিত্রের দ্বারা এরূপ কাজ কাহিনীর ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

কাহিনী ধারা এখানে সহজ সরল গতিশীল। চরিত্ররাই কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। মাছুয়ানীর উপর ভাঁড়ুর অর্থনৈতিক শোষণ ও অত্যাচার অভিযোগকেই কালকেতু ও ভাঁড়ুর মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। এর থেকে কাহিনীতে পুনরায় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুর মত নিম্নশ্রেণীর সামাজিক অবস্থান তুলে ধরার আড়ালে তার মহত্ত্ব ও উচ্চবিত্তের

স্বমহিমা প্রকাশ পেয়েছে। অপমানিত ভাঁড়ু দত্তকে কলিঙ্গ রাজ সুরথের কাছে উপস্থিত হওয়া তার মত চরিত্রের পক্ষে স্বাভাবিক। রাজা ভাঁড়ু দত্তকে দেখে পারাজয়ের বা অক্ষমতার লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায়। সেই মুহূর্তে ভাঁড়ু দত্ত রাজার শান্ত সিগ্ধ লজ্জার ফাঁকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাজদরবারের চাকরদের দোষী করেছে। রাজার তখন আত্মসম্মানে একটু উষ্ণ হাওয়া লাগে এবং সে মাথা তুলে তাকায়। সেই সময় ভাঁড়ু দত্ত মাথা নত করে। চরিত্রের স্বকীয় আচরণ কাহিনীকে জীবন্ত ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে এবং ভাঁড়ু ও সুরথ কর্তৃক কাব্যে নাটকীয়তার প্রকাশ হয়েছে।

ভাঁড়ু দত্ত ও কলিঙ্গরাজ সুরথের নাটকীয়তার পর কাহিনীর সঙ্গে বিযুক্ত এই বৈষ্ণবীয় ভাবনার 'দিশা' টি অনিবার্য বলে বোধ হয় না। কলিঙ্গরাজের প্রজাবাৎসল্যের জন্য মাটিতে পড়ে ক্রন্দনেও প্রজাবৎসল রামচন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দিশা অংশে বলা হয়েছে — ''দণ্ডের রাজা হএয়রে রাম হএ২।।''[১৫০] কলিঙ্গরাজের এরূপ বালকোচিত আচরণ একজন রাজার পক্ষে যেমন বেমানান তেমনি তার প্রজাবাৎসল্যের এই অংশটুকু মূল কাহিনী ধারা থেকে বাদ দিলেও যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হবে না। মূলতঃ বৈষ্ণবীয় অথবা হিন্দু ধর্মের প্রভাবের বশবর্তী হয়ে কবি এই অংশটি চিত্রিত করেছেন, ভাবা অসঙ্গত হবে না।

কেননা, আবার কলিঙ্গ রাজের ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে ক্রন্দন বালকসুলভ ও অসঙ্গতিপূর্ণ। তার এই ক্রন্দনে চারজন সর্দারের আগমন এবং রাজার আদেশে তাদের কালকেতুকে বন্দী করতে যাওয়া বিপরীত ঘটনার সংঘাত ধ্বনিত হওয়া স্বাভাবিক। আচমকা কালকেতুর রাজদ্বারে আক্রমণ ঘটনাটি সংঘাতপূর্ণ ও গতিশীল বলা অসমীচীন হবে না। কালকেতুকে বন্দী করার জন্য কলিঙ্গের চার কোতালের শক্তির, বুদ্ধির ও আকারের বিশালতা কৌতূহলোদ্দীপক বটে। কালকেতুর রাজ্য আক্রমণে আগত কোতালদের মধ্যে দু' জনকে আকারে ও বুদ্ধিতে পুরাণ চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই যুদ্ধ বর্ণনাকে কবি পুরাণের যুদ্ধ সম করে অঙ্কন করেছেন। কবি প্রচলিত প্রকৃতি-বিষয়ক প্রবাদের দ্বারা যুদ্ধ বর্ণনার বিপরীত সংঘাতকে স্পষ্ট করে তুলেছেন।

> ''ঢালি বন্দুকি পাইক তার নাহি লেখা।
> ধবল মেঘেত জেন বিষ্ঠ দিল দেখা।।''[১৫১]

কবি কালকেতুকে বন্দী করার ঘটনা বর্ণনায় পুরাণ দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাকে সংঘাতপূর্ণ ও কবিত্ব যুক্ত করে তুলেছেন।

বলা বাহুল্য, কালকেতু চরিত্রটি এই বিপরীত ঘটনার প্রতিস্পর্দ্ধি। তার মধ্যে মোকাবিলা করার মত ক্ষাত্ররক্ত উপস্থিত। এমনকি, তার মত বীর ও শক্তিশালী ব্যাধের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা যেন যুদ্ধে যাত্রায় অধীর আগ্রহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কালকেতু ফুল্লরার সঙ্গে পুরাণের

রাজ-রাজড়াদের মত পাশা খেলায় মত্ত ছিল। সেই রাজকীয় পরিবেশে পাইক অন্তঃপুরে এসে তাকে যুদ্ধের খবর দেয়। তখন কালকেতু কিন্তু পরিস্থিতি জানতে চেয়েছে; ভয়াবহ অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় ঝাঁপ দেয় নি। প্রথমে উঁচুতে উঠে চারিদিকের অবস্থা লক্ষ্য করে। প্রজাদের ক্রন্দনে তার মন ভিতরে ভিতরে ব্যাকুল হয়। তার চরিত্রের বিচক্ষণতা ও প্রজাদের প্রতি সহৃদয় বোধ প্রতিকূল ঘটনায় আলোকবর্তিকা। পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী এই আচরণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রচলিত লোকবিশ্বাস দ্বারা ফুল্লরা এই সংকটাবস্থাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে। ফুল্লরা তাকে বলে —

> ''রামা অগ্রে হৈলা রাজা পছ্যাতে কি নঞা মাঞা
> জন্মিয়া মরন একবার।
> পুরুষে পুরুষ মারে সংসারেত জশ বাড়ে
> জন্মিয়া মরিব একবার।।
> আমি না করিব চুরি কার সঙ্গে বাদন্তরি
> কার সঙ্গে বিবাদ ঝগড়া।
> ঝড়ে জেন পড়ে কালা এমতি ছিড়িব মাথা
> হস্তি কাইটে ভরাএ খাপরা।।''[১৫২]

ফুল্লরার এই কথায় মনঃশিক্ষার উপাদান রয়েছে। তা সত্ত্বেও কালকেতু অনড়। তাই যুদ্ধে ফুল্লরার স্বামী কালকেতুর মৃত্যু হলে অনাথিনীর রূপ যৌবনের কী হবে সে বিষয়ে চিন্তিত হওয়া মধ্যযুগে দাঁড়িয়ে ফুল্লরার মত নারীর পক্ষে ভাবনা স্বাভাবিক। ফুল্লরার মধ্য দিয়ে ষোড়শ শতাব্দীর নারীর অনিকেত বা rootless ভাবনা প্রকট হয়ে উঠেছে। এটাকে কারণ দেখিয়ে কবি শেষ পর্যন্ত কালকেতুকে দিয়ে দেবী চণ্ডীর পূজা করিয়েছেন। সেই দেবী পূজায় তন্ত্রের প্রভাব রয়েছে অনুমান করা যায়। তন্ত্রের দেবী ভাবনার সঙ্গে লোকবিশ্বাস একাকার হয়ে গেছে। কালকেতুর প্রদত্ত পূজায় আনন্দিত দেবী যুদ্ধে রক্ষা কবচ স্বরূপ 'হিড়িমকসের চাল' প্রদান করে। এই হিড়িমকসের চাল জীবন ধারণের প্রতীক বোধ হয়। সেই চালে ফুল্লরা দেবী দুর্গার কালী ও কমলা দ্বিবিধ রূপ দেখে। কালী এবং কমলা ভয়ঙ্করী ও শক্তি দেবী; তারা ভক্তকে সংকট থেকে রক্ষা করে। এই বিশ্বাস ফুল্লরার মত সমকালীন সমাজেও ছিল। তাই হয়তো কবি ফুল্লরার সম্মতিতে কালকেতুকে এই চাল নিতে আত্মস্থ করেন। যে ফুল্লরার একসময় দেবীর প্রতি অবিশ্বাস ছিল তার এখন প্রবল বিশ্বাস কালকেতুকে বিস্মিত করে। কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গের যুদ্ধে দেবী-প্রদত্ত 'হিড়িমকসের চাল'-এর অলৌকিক শক্তির প্রকাশ পেয়েছে। তার ফলে দেবী 'হিড়িমকসের চাল' থেকে শৃগাল, শকুনি ও সিংহ অবতার দ্বারা কালকেতুকে যুদ্ধে একে একে রামানন্দ, দেবানন্দ ও শোভানন্দের সঙ্গে প্রবল দ্বন্দ্ব সংঘাতে সাহায্য করেছে। তাতে প্রতিপক্ষের হাত থেকে ভক্ত কালকেতুকে রক্ষার

জন্য দেবী চণ্ডীর শক্তিই প্রাধান্য পেয়েছে। এই অবস্থায় কালকেতু বলে — "তিন দ্বার জিনিলাম দুর্গার বাহুবলে।।"[১৫৩] তাই কালকেতু দেবীর সহায়তায় নয়; নিজের ক্ষাত্র বলে যুদ্ধ জয় করতে চেয়েছে। কালকেতুর মধ্যে এই চারিত্রিক গুণটি পূর্ব থেকেই ছিল। তাই কাহিনী গ্রন্থনায় তার এরূপ আচরণ অসামঞ্জস্য নয়। পাইকরা তাকে পরধনে রাজা হওয়ার অভিযোগ শোনালে সে বলে —

"পর ধন জেবা জন খাবে পর ঘর।
ক্ষত্রিকুলের ধম্ম নহে রণ ছাড়িবার।।"[১৫৪]

এই অংশে কালকেতু চরিত্রে সংগ্রামে যাত্রার প্রতি একাগ্রচিত্ততা ঘটনার মধ্যে দ্বন্দ্বের সুর ধ্বনিত করেছে। ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন — "গল্পের শেষে কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধ বর্ণনায় কিছুটা ঘটনাগত দ্বন্দ্বের সুর বেজেছে।"[১৫৫] তারপরও দেখা যায় যে, কালকেতু দেবী চণ্ডীর দ্বারস্থ হয়েছে। চরিত্রের মধ্যে যে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত স্পন্দন এবং গতিশীলতা বজায় ছিল তা পুনরায় স্তিমিত হয়ে যায়। কাহিনী ধারায় দেবী তথা তার শক্তিকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়াই তার অন্যতম কারণ। যুদ্ধে রক্তাক্ত ও সংজ্ঞাহীন কালকেতুর দেহের উপর দেবীর বাম পা রাখা ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। তার এই রূপকে সকলে 'ছিন্নমস্তা' বলে আখ্যা দিয়ে থাকে। ভক্ত কালকেতুকে রক্ষার জন্য দেবী চণ্ডীর ছিন্ন মস্তা রূপ ও প্রেতরূপ শক্তি দেবীর অন্য এক মহিমা। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন শক্তি দেবীর বিভিন্ন স্বরূপ-ভাবনা মানুষের মজ্জায় রয়েছে। কবি মানিক দত্ত তাকে তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চণ্ডীর রূপ ভেদে স্থান দিয়েছেন। এখানে কবির মধ্যে সাধকের দৃষ্টিভঙ্গিটি বড় হয়ে উঠেছে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত দেবীর স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছেন — "... ব্যবহারিক জীবনে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য দেবীগণের রূপ ও মহিমা যতই পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা করুন না কেন, ধর্মব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁহারাও ঐক্যবাদী; তাঁহাদের মুখেও ঐ এক কথা — একই মায়ের বিচিত্র লীলা!"[১৫৬] মধ্যযুগের ধর্ম সাধনা যুক্ত প্রথানুসরণই কবির মজ্জাগত। আর সেই যুগোপযোগী ধর্ম সাধনাই কবির কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাতে শেষ পর্যন্ত দেবীর অনুগ্রহ প্রার্থী কালকেতুর জয় এবং সুরথ রাজের পরাজয় ঘটে। দেবীর মহিমা প্রচারের মাঝে কালকেতু চরিত্রে প্রতিকূল পরিবেশ পরিস্থিতিতেও রাজার মত উঠে রুখে দাঁড়ানোর স্বতন্ত্র মহিমা সুপ্ত ছিল। কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গ রাজের যুদ্ধ ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা এবং দেবী মহিমায় বেশি মনোযোগী হওয়ায় কবি কালকেতু চরিত্রটিকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। তারপরও কবি ঘটনাকে চণ্ডীর মাহাত্ম্যকীর্তনে পর্যবসিত করেন। সেই মাহাত্ম্যটি হল ভক্ত-অভক্ত যে দেবীর প্রতি সদয় হয় দেবী তার অনুকূলে প্রীত হয়। ব্যর্থ সুরথরাজ কর্তৃক দেবী চণ্ডীর পূজা এবং তাকে অভয় প্রদানই তার প্রমাণ। সেখানেও তার শক্তি পূজা তথা তন্ত্রসাধনার পূজা পদ্ধতিই মুখ্য হয়ে উঠেছে। এমনকি, মধ্যযুগে সমাজ শ্রেষ্ঠ

ব্রাহ্মণের কাছ থেকে সুরথরাজের যুদ্ধের জন্য অনুমতি প্রার্থনার বিষয়টিও সমাজ সত্যকে প্রকট করে। সর্বোপরি, মধ্যযুগে দেবদেবী মহিমান্বিত অলৌকিক আবহমণ্ডলে পড়ে কবিরা সমাজের অনুকূলে কাব্যের ঘটনা সন্নিবেশনে মনোযোগী হতেন।

অবশেষে রাজা সুরথ কর্তৃক কালকেতুকে বন্দী করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাহিনীতে নাটকীয় বর্ণনা কৌশল এবং হাস্যরসের আভাস রয়েছে। তা কবি কালকেতুকে বন্দী করার পূর্ব মুহূর্তের আগমন দৃশ্য তুলে ধরেছেন এই ভাবে —

''আইল সকল লোক গুজরাট নগরে।
কেহু টিপাটিপি করি জাএ পুরীর ভিতরে।।''[১৫৭]

তিনি এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ফুল্লরার নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন। সেই বর্ণনার রীতি একেবারেই পাঁচালী ছাঁচের একটি দৃশ্য বর্ণনা করাই যেন কবির উদ্দেশ্য। কবি তা বর্ণনা করেছেন এই ভাবে—

''ভাডু দত্ত আইল জদি পুরীর ভিতর।
ফুলুরাকে লইয়া কিছু শুনহ উত্তর।।
ভাডু বলে শুন খুড়ি আমার উত্তর।
এখন জানি হইল খুড়া রাজ্যের ঈশ্বর।।''[১৫৮]

কালকেতুকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার সময় রামায়ণের রামচন্দ্রের বনবাস যাত্রার ছায়াপাত ঘটেছে — এরূপ অনুমান করা যেতে পারে। কবি লিখেছেন —

''বীরকে লইয়া জাএ কান্দে রামা উভরাএ
বীরক করে পুরীর বাহিরে।
কান্দে নগরের লোক অনেক পাইল শোক
বীর কান্দে পিঞ্জর মাঝারে।।''[১৫৯]

কালকেতুকে বন্দী করে রাজা সুরথের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে সুরথের সঙ্গে কথোপকথনে ঘটনার পুনরাবৃত্তি রয়েছে বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত, মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধে যে কথা ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন তা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ক্ষেত্রেও মনে আসে — ''ঘটনাসজ্জায় অনুবৃত্তি আছে, পারম্পর্য নেই। কালকেতুর জীবনের যে বিবরণ তাকে কতকগুলি খণ্ডচিত্রের সমন্বয় বলেই মনে হয়।''[১৬০] তবে কালকেতুর বন্দী এবং এরূপ দুরবস্থায় কালকেতুর 'চৌতিশা' কাহিনীতে মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত রীতি অনুযায়ী কালকেতু কর্তৃক বিবৃত হয়েছে। সেই চৌতিশায় কালকেতু দেবীর মহিমা স্মরণ করার পাশাপাশি ধন-লোভই তার দুঃখের কারণ সেই সামাজিক সত্যকেও তুলে ধরেছে। তার দুঃখ দেখে পদ্মা চণ্ডীকে রক্ষা করতে অনুরোধ করে। তাতে দেবী চণ্ডীর প্রতিক্রিয়া মানবিক। দেবী এখানে তার অলৌকিক

শক্তির প্রলেপ বাড়িয়ে প্রতিশোধ স্পৃহাপরায়ণ মানব চরিত্রে পরিণত হয়েছে। পদ্মা ও চণ্ডী চরিত্রের মানবিক আচরণ কাহিনীতে কালকেতুর বন্দীদশা উন্মোচনের একমাত্র উপায় বলে বিবেচিত হয়েছে। তাই পদ্মার কথায় চণ্ডী কলিঙ্গরাজ সুরথকে স্বপ্ন দেখায়। সেই সঙ্গে কালকেতুর বন্দীকে কেন্দ্র করে কবি একটি সামাজিক সত্যের ছবিকে তুলে ধরেছেন। তা স্বামীর উদ্ধারের জন্য নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ কুলবধূ ফুল্লরার সমাজে সর্বোচ্চ পদমর্যাদা ভোগী ব্রাহ্মণ পদতলে লুটিয়ে ক্রন্দন করার চিত্র ফুটে উঠেছে।

এরপরেই কাহিনীতে ভাঁড়ু দত্তের শাস্তি ঘটনাটির অবতারণা ঘটে। এখান থেকে কাহিনীর অন্ত্যপর্বের সূচনা হয়। তাকে মাথা মুড়িয়ে, গায়ে ঘোড়ার মূত্র দিয়ে, পিঠে মোড়া বেঁধে, চারপাশে সাতজন শত্রু বা 'বৈরী'কে দিয়ে সতর্ক পাহারায় রাখা হয়। তাদের দ্বারা তার মাথায় ওড়ের ফুল বাঁধা হয়। যে ব্যক্তি তাকে শুদ্ধি করতে আসে তাকে সে স্বীয় লজ্জা নিবারণের জন্য বারাণসীর তীর্থভূমি ভ্রমণের কথা উত্থাপন করে। ভাঁড়ু দত্ত চরিত্রটি ব্যাধ খণ্ডের সমাপ্তিতেও জীবন্ত। কাহিনীর সঙ্গে তার উপস্থিতি সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু এরপরই হঠাৎ কার্যকারণ সম্পর্কহীন একটা ঘটনার উত্থাপন করা হয়। সেটা হল কালকেতুর পরজন্মে স্বর্গে যাত্রার জন্য পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষা। এইরূপ ভাবনার কারণ স্বরূপ বলা হয় —

"কোন ছাড় দত্ত ভাড়ুয়া নাবড়   সে মোকে আটকুর বোলে
এত দুঃখ না সয় শরীরে।"[১৬১]

কালকেতুর মুখে এই কথার পূর্ব কোন সঙ্গতি নেই। যেন মনে হয়, কবি কাহিনীকে খুব সংক্ষেপে সমাপ্ত করতে ব্যস্ত হয়েছেন। কালকেতু তার উত্তরাধিকার ভাবনায় গঙ্গার তীরে দেবী চণ্ডীর পূজার জন্য মনস্থ করে। সেখানে দেবী চণ্ডীর পুরাণের 'হৈমবতী' ও জলদেবী রূপের সঙ্গে গ্রাম্য বধূর জীবন্তমূর্তি একাকার হয়ে গেছে। কবির কথায় —

"পূজিতে২ বীরের   কায় সিদ্ধি হৈল
কৈলাস বাসিনি দেবী অন্তরে দেখিল।
বৌহারি মূর্ত্তি ধরি   মলিন বসন পরি
কলসী কাখেত লইল।।
দেবী জলভরে   জলক্রীড়া করে
ডাকিয়া বীরেক বলিল ভবানী।"[১৬২]

দেবীর এই মিশ্ররূপ সম্পর্কে সুকুমার সেন-এর একটি মন্তব্য তুলে ধরতে পারি — "এই সূত্রেই দুর্গা দেবীর সব চেয়ে পুরোনো নাম পাই 'হৈমবতী' অর্থাৎ 'হিমবৎ-বাসিনী'।... বাসন্তী দুর্গা পৃথক দেবতা। ইনি জলদেবী বা নদী দেবতা। বেদে এ দেবতার কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে। এ দেবতার

ভাবনায় ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে বিদেশী ঐতিহ্যের মিশ্রণ অনেকটা থাকতে পারে। পরবর্তী কালের পুরাণ কাহিনীতে এই জলদেবীর এক সংস্করণ জাহ্নবী হয়ে শিবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।"[১৬৩] এই অংশের বর্ণনায় কবি পুরাণ ও লোকজীবনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, শেষে দেবী তাদের পুত্র সন্তান দিতে অস্বীকার করলে তারা অগ্নিতে প্রবেশ করে স্বর্গ পুরে যাত্রা করে। মৃত্যুকালীন হিন্দু সংস্কার এখানে স্পষ্ট। কালকেতু ও ফুল্লরা দুজনে স্বর্গে গিয়ে স্বর্গের পরিচয় ধারণ করলেও নীলাম্বরের সঙ্গে পিতার সাক্ষাৎ স্বর্গের 'হৃদিহীনতা'কে ভুলিয়ে দেয়। কবি সেখানেও মানবিক গুণের স্পর্শ দিয়েছেন। তিনি বাৎসল্য রসের স্নিগ্ধ ধারায় স্নাত করে ব্যাধ খণ্ড সমাপ্ত করতে বেশি আগ্রহী। সেই বর্ণনা এরূপ —

"ইন্দ্রপুরি শুনি নীলাম্বরের কথা।
হরিস বদনে ইন্দ্র আইল তথা।।
প্রাণপুত্র বলি আগুলিয়া লইল কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুমু দিল বদন কমলে।।"[১৬৪]

এইভাবে, কবি মানিক দত্ত তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতু উপাখ্যান একটি অসমাপ্ত বৃত্তাকার প্লটে সমাপ্ত করেন। জন্ম, বিবাহ, পুত্র সন্তান প্রসব ও মৃত্যু ইত্যাদি নিয়ে যে একটি সমগ্রবৃত্তের কাহিনী তা এখানে পাওয়া গেল না। অতঃপর গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে ব্রত প্রচার করার কথা।

"চারিদিনের ব্রতকথা সমাপ্ত হইল।।
চারিদিনের ব্রতকথা সমাপ্ত করিঞা।
বসিলা ভবানী দেবী চিন্তাযুক্ত হয়া।।
নারদে উঠিয়া বোলে ঈশ্বর ঘরনি।"[১৬৫]

এই ব্রতের প্রচার মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রাচীনতার প্রকাশ করে। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্য-এর মন্তব্য এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে — "ব্রতকথাগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের এক একটি অপরিহার্য অঙ্গ, তাহার ফলে ইহাদের মধ্যে দিয়া একটি প্রধান গুণ এই প্রকাশ পাইয়াছে যে, বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া ইহারা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইতে রক্ষা পাইয়াছে। অতএব ব্রতকথাগুলি একটি প্রাচীনতর ও অধিকতর রক্ষণশীল ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং কোন কোন সময়ে যে ব্রতকথার কাহিনী পল্লবিত হইয়া মঙ্গল কাব্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে দেখা যায়, ইহার অর্থ এই যে, ব্রতকথা হইতেই মঙ্গলকাব্য রচনার প্রেরণা ও বিষয়-বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে — মঙ্গলকাব্য হইতে ব্রতকথার প্রেরণা কিংবা বিষয়-বস্তু গৃহীত হয় নাই।"[১৬৬]

'কালকেতু উপাখ্যান' বা 'ব্যাধ খণ্ড' পেরিয়ে কবি মানিক দত্ত ধনপতি-খুল্লনা-শ্রীপতির উপাখ্যান তথা বণিক খণ্ডে প্রবেশ করেছেন। আপাত দৃষ্টিতে এটিই কাব্যের শেষতম খণ্ড বা বিভাজন। এই খণ্ড সম্বন্ধে সুকুমার সেন তাঁর মুদ্রিত 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল' গ্রন্থের ভূমিকা অংশে বলেছেন — ‘‘কালকেতু-উপাখ্যানের তুলনায় ধনপতি-উপাখ্যান বেশি জনপ্রিয় ছিল, অর্থাৎ ধনপতি-শ্রীপতির কাহিনীটিই প্রধানত গীত হইত। তাই এই উপাখ্যানটির পুথি বেশি পাওয়া যায়। শুধু কালকেতু-উপাখ্যানের পুথি দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।’’[১৬৭] এই জনপ্রিয়তার পিছনে কয়েকটি কারণ অনুমান করা যেতে পারে — (১) কালকেতু উপাখ্যানে আরণ্যক পরিবেশে একজন নির্ধন ব্যাধ দেবী চণ্ডীর অলৌকিক মহিমায় রাজায় পরিণত হওয়া — এই কাহিনীর সঙ্গে শ্রোতা ও পাঠকমণ্ডলীর একাত্মতার অভাব ঘটে। অন্যদিকে, ধনপতি খণ্ডের কাহিনীতে অভিজাত সমাজের কথা স্থান পেয়েছে এবং সেখানে সামাজিক কাঠামোয় গার্হস্থ্য পরিবেশ পাঠকের কাছে অধিক আকর্ষণের কারণ, তা বলাই বাহুল্য। (২) কালকেতু-উপাখ্যানে দেবী চণ্ডী ফুল্লরার তুলনায় কালকেতুর উপর বেশি জোর দিয়েছে। কিন্তু ধনপতি বা 'বণিক খণ্ড'-এ ধনপতির তুলনায় নারী খুল্লনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নারীর কৃচ্ছতা, স্বামীর প্রতি নিষ্ঠা, পারিবারিক জীবনে নারীর সতীন সমস্যা অত্যন্ত জীবন্ত করে তোলা হয়েছে। (৩) এই কাব্যের ধনপতি উপাখ্যানটিতে বাঙালীর ঘরের কথা বড় হয়ে উঠেছে। সপত্নী সমস্যার তীব্রতা এক বিশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শ্রোতাকে সচকিত করে। কামনাসর্বস্ব ধনপতি, লহনার বিগত যৌবন, প্রেমহীনতার ব্যথা, খুল্লনার দুঃখভোগ ধনপতি কাহিনীকে জনপ্রিয় করে তুলতে সাহায্য করেছিল।

দেবী চণ্ডীর বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পূজা প্রচারের জন্য ধনপতির উপাখ্যানের অবতারণা। সেক্ষেত্রে ধনপতি উপাখ্যানে স্পষ্টতই দুটি ভাগ আছে। প্রথমে খুল্লনা ধনপতির পরিচয় ও বিবাহ এবং ধনপতি খুল্লনার পুনর্মিলন। দ্বিতীয় অংশে রাজাদেশে ধনপতির সিংহল যাত্রা এবং সেখান থেকে মুক্তিলাভ। এর মধ্যেই দেবীর মহিমাজ্ঞাপক মাহাত্ম্য প্রকাশ পেয়েছে। তার জন্য কাহিনীতে বহু ঘটনার ও উপকাহিনীর সংস্থান ঘটেছে।

প্রথমে ধনপতি ও লহনার জন্ম, বিবাহ, খুল্লনার সঙ্গে প্রণয় বা মোহের কারণে বিবাহ, গৌড়ে যাত্রা এবং খুল্লনার সঙ্গে ধনপতির পুনর্মিলন ঘটে। এই ঘটনাগুলির মধ্যে প্রবেশ করার পূর্বে কবি মানিক দত্ত আখেটিক খণ্ডের সঙ্গে ধনপতি খণ্ডের কার্যকারণ সূত্রকে একসঙ্গে বেঁধে দিয়েছেন। 'আখেটিক খণ্ড'-এর সমাপ্তি যদি কারণ হয়, তবে 'বণিক খণ্ড' তার কার্য। সেই কার্যকারণ সূত্রটি একটি স্বরে আবদ্ধ। সেটি হল দেবীর অষ্টদিনের ব্রতপ্রচার করা। আখেটিক খণ্ডের শেষে কালকেতু পুনরায় স্বর্গে নীলাম্বর রূপে প্রত্যাবর্তন করলে দেবী অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ে।

"ইন্দ্রের পুত্রবধূ ইন্দ্রের তরে দিল।
চারিদিনের ব্রতকথা সমাপ্ত হইল।।
চারিদিনের ব্রতকথা সমাপ্ত করিঞা।
বসিলা ভবানী দেবী চিন্তাযুক্ত হয়া।।"[১৬৮]

একই ব্রতকথার অনুবর্তন বণিক খণ্ডের সূচনায়। সেই সময় নারদ তাকে নলকুবেরের পুত্র কর্ণমুনিকে ছলনার কথা বলে এবং তার দ্বারা বাকি চার দিনের ব্রতকথা প্রচারের পরিকল্পনা করে।

"পুনরপি নারদ বলে শুন মামী তুমি।
নল কুবরের পুত্র নাম কর্ণমুণি।।
তাহাকে ছলিয়া নাম্ভায়ো আদ্যা ভবানী।
তাহা হৈতে চারিদিনের পাবে পূজাপানি।।"[১৬৯]

প্রথমে উপায় স্বরূপ নারদ তাকে রূপ-যৌবন দিয়ে শিবকে ভোলাতে বলে। নারদ চরিত্রটিকে এখানে কবি কাহিনীর গতিপথ পরিবর্তনের কাজে লাগিয়েছেন। তাতে দেবী চণ্ডীর রূপ-সজ্জার দীর্ঘ পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষা বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। সমকালীন সমাজে উচ্চবিত্ত নারীর পোশাক-পরিচ্ছদ, বিচিত্র বহু মূল্যের অলংকার ও সুগন্ধী পুষ্প পরিধানের পরিচয় আমরা দেবীর রূপসজ্জায় লক্ষ্য করি।

"ষোড়শ বৎসরের দেবী জৌবন হৈইল।
বেশ করিতে দুর্গা আপনে বসিল।।
পেটারি ধরিয়া তার ঘুচাইল ঢাকনি।
হস্তে করি লইল চিরণ কাঁকৈখানি।।
সুবর্ন চিরনি দুর্গা হস্তে করিয়া।
গোট২ কেশ জত নইল ঊভারিয়া।।
বারটি বিয়নি কৈল খোপার গাথনি।
সুগন্ধি সুজাতি পুষ্প খোপার সাজনি।।
পুষ্প সৌরবে অলি উড়ে সারি২।
জড়াজড়ি করিয়া পড়ে ভোমরা ভুমরি।।
*　　　*　　　*
মধুমত্ত হইয়া ভ্রমর উড়িতে না পারে।।
পত্র বিদারে পুষ্প গন্ধ দূরে জায়ে।
মহামত্ত হইয়া খোপার মধুখায়ে।।

সুগন্ধি তৈল দিয়া মুখ্যানি মাঞ্জন।
পূর্নিমার চন্দ্র জেন দেখিতে সুশোভন।।
*　　　　*　　　　*
নাসাতে বেসর পড়ে করে ঝলমল।
পূর্ন শশী জিনি মাতা শ্রীমুখমণ্ডল।।
বেশে বেষ্টিত মাতা মধ্যে শোভে চুনি।
মুকুতার হিল্লোল তার মধ্যে মনি।।
অধরে অরুণ ছটা জেন বিম্বফল।
কপালে সিন্দুর পড়ে নঞানে কজ্বল।।
উপর কর্ণের অলঙ্করন করে ঝলমল।
নাম্ভা কর্ণেত মাতা পড়িল কুণ্ডল।।
নাসিকার উপরে মাতা অর্দ্ধচন্দ্র শোভা।
শ্রীমুখমণ্ডল জেন অরূণের আভা।।
গলাতে সুবর্ণ হার নাম মনোহর।
বনমালা হৃদে দোলে পরম সুন্দর।।
অক্ষয় কবচ পড়ে হৃদয় মাঝার।
মণিমুক্তা থোপা২ গাথনি তাহার।।
দুই হস্তে শোভা করে সোবন্ন দুই তাড়।
দুই থরে বাজুবন্ধ বিবিধ প্রকার।।
দুই বাহু শঙ্খ পড়ে শ্রীরামলক্ষন।
হেটে উপড়ে শোভে চারি কঙ্কন।।”[১৭০]

এই বর্ণনায় কীট-পতঙ্গের আকৃষ্ট হওয়ার প্রসঙ্গে দেবীর কামোত্তেজিত রূপ বা শৃঙ্গার রসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে শঙ্খের বন্ধনে রাম-লক্ষণের অটুট বন্ধনের উপস্থাপনা অন্তত শ্রোতা বা পাঠকের কাছে কৌতূহলও আকর্ষণের বিষয়। সর্বোপরি, মঙ্গলকাব্যের প্রথানুসরণের দিকটি প্রাধান্য পেলেও কাহিনী গ্রন্থনের দিক থেকে এই রূপ সজ্জার বিবরণীতে দৃঢ়তা হারিয়েছে। কিন্তু দেবীর রূপের সঙ্গে পূর্ণিমার চাঁদ, পূর্ণ শশী, অরুণের ছটার, অর্ধচন্দ্র, অরুণের আভা ইত্যাদির মত উপমা ব্যবহারে মানিক দত্তের কবিত্বের পরিচয় রয়েছে।

কবি দেবদেবীর ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের প্রতি মুহূর্তের জীবন-সংস্কারকে সন্নিবেশিত করেছেন। তাতে কাহিনী গ্রন্থনায় পরিবেশ পরিস্থিতিতে সমকাল সমাজ কার্যকর হয়েছে। তা

বর্ণিত হয়েছে এইভাবে যে, দেবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে শিবের কামোত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। সেই মুহূর্তে দেবীর আচরণ নাট্যাভিনেত্রীর ন্যায় বলে মনে হয়। পাশাখেলা হারজিতের উপর শিবের মনোবাঞ্ছা পূরণের অভিপ্রায় নির্ধারণ করল। সেই ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা হল কর্ণমুনিকে। কিন্তু কর্ণমুনি শিবের ভয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে নারাজ হলে দেবী তাকে উদ্ধার করার কথা উত্থাপন করে। কর্ণমুনিকে মিথ্যাসাক্ষী দেওয়ার জন্য তথা চণ্ডীর স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তাকে পুরাণের একটি কাহিনী শুনিয়েছে। সেই পুরাণ কাহিনীর সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী ধারার সঙ্গে মিল নেই; কিন্তু চরিত্রের মনের দৃঢ়তা বন্ধনের উদ্দেশ্যে লোকশিক্ষার উপাদান স্বরূপ পুরাণ-কাহিনীকে মূল চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর প্রসঙ্গে অবতরণ ঘটেছে। সেই বহির্ভূত কাহিনীটি হল রামায়ণের কাহিনী। চণ্ডী কর্ণমুনিকে বলেছে —

"সাক্ষী দিতে তোর বৈরী হয় শূলপাণি।
উদ্ধারিয়া লব তোরে নম নারায়নী।।
রাবণ সেবক তার ত্রিভুবনে জানে।
চদ্যচৌযুগ অমর বর দিল পঞ্চাননে।।
এতেক বৈভোগ তার লঙ্কার ঈশ্বর।
শ্রীরামের ব্রহ্ম অস্ত্রে গেল জমঘর।।
শুনিয়াছি মহিষাসুর শিব ভজন করে।
ভজনেত তুষ্ট হইল দেব দিগাম্বরে।।
শিব বলে মহিষাসুরা বর লেহ তুমি।
জেই বর চাহ তাহা তোরে দেই আমি।।
কাগতি মিনতি করিল বিস্তর।
একরাত্রি দেহ মোকে গৌরীর বাসহর।।
শিব বলে কপটে তুমি চাহিলা বাসহর।
দেব মায়া না বুঝিলা সে হত বর্ব্বর।।
শিবের বরে ছলিতে য়াইলা মহিষাসুর।
অস্ত্রে মাথা কাটিয়া পঠানু জমপুর।।"[১৭১]

এবং রামায়ণের কথা বলতে বলতে আবার চণ্ডী শিব কর্তৃক তার সেবক ইন্দ্রকে লাঞ্ছনা করার কথা উদাহরণ স্বরূপ উপস্থাপন করে। কালকেতুর দ্বারা তার চারদিনের ব্রতকথা প্রচার হয়। তার চারদিনের ব্রতকথা প্রচারের জন্যই কর্ণমুনিকে ছলনা। একথা বলতে গিয়ে কাহিনীতে যেমন রামায়ণের কথা এসেছে তেমনি বর্তমান পরিস্থিতির উপায় সন্ধানে অতীতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি

ঘটেছে। সেই সঙ্গে চণ্ডী কর্ণমুনিকে বণিক ঘরে জন্মাবার কথা বলার মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের প্রতিপত্তিশালী ও ক্ষমতার অধিকারী বণিক শ্রেণীর উন্নত সামাজিক অবস্থানকেও পরিস্ফুট করেছে। এতে কবির বণিক শ্রেণীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কেও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। চণ্ডী কর্ণমুনিকে বলে —

> ''মিথ্যা কথা কহিতে জদি শাপ দেন তোরে।
> উত্তম স্থানে জন্মাইব ধনিকের ঘরে।।
> বণিক কুলে জন্মাইব তোখে দিব ঘর বাড়ি।
> বিবাহ করাইব দুই পরম সুন্দরী।।''[১৭২]

চণ্ডীর এই কথায় সমাজের বহু বিবাহ প্রথা ও বণিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দময় জীবনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কাহিনী গ্রন্থনায় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একটি লৌকিক অভিপ্রায়কে সামনে আনা হয়েছে। সেই জন্য কর্ণমুনিকে দিয়ে মিথ্যা কথা বলার জন্য বাক্‌দেবী সরস্বতীর স্মরণ। তার কাক বাহন কাহিনীতে বিরল ব্যতিক্রম। এখানে কবি পাখির সঙ্গে লোকমানসের নিবিড় সংযোগ লক্ষ্য করে সম্ভবত প্রাচীন দেবী সরস্বতীর সঙ্গে লোক জীবনে পরিচিত কাককে বাহন হিসাবে তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গত, নির্মলেন্দু ভৌমিক-এর একটি মন্তব্য তুলে ধরতে পারি — ''কাক ধূর্ততার প্রতীক বলে সর্বত্র স্বীকৃত, 'ধূর্ত' বললে কাককে অধঃপতিত বলে মনে করা হয়।''[১৭৩] বাক্‌দেবীর সঙ্গে এই ধূর্ত কাককে সংযুক্ত করার পিছনে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের এই অংশে বর্ণিত সরস্বতীর ভূমিকার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অভিপ্রায়টি সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে বলে মনে হয়। এই বাক্‌দেবী কর্ণমুনিকে দিয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে বাধ্য করেছে। স্বভাবতই, কর্ণমুনিকে শিব মিথ্যা সাক্ষীর জন্য নরলোকে জন্মের অভিশাপ দেয়। এরূপ কাব্যের মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অভিশাপ দান মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রে কাহিনীর পটভূমি পরিবর্তনের একটি অভিপ্রায় অত্যন্ত সুকৌশলে কবিরা প্রয়োগ করতেন। তবে চণ্ডীর চক্রান্তে শিব কর্তৃক স্বীয় শিষ্য অভিশপ্ত হয়। এতে শিব ক্রুদ্ধ হলে চণ্ডী তাকে তার প্রতি বিরাগ দূর করতে তাদের 'অর্ধনারীশ্বররূপ' বা 'হরগৌরী' মূর্তির কথা বলে এবং উভয়ে মিলনে আবদ্ধ হয়। প্রসঙ্গত, এক্ষেত্রে শশিভূষণ দাশগুপ্তের একটি মন্তব্য তুলে ধরতে পারি — ''তন্ত্রমতে অদ্বয়-সত্যের দুই রূপ; একরূপ গুণাতীত নিবৃত্তিস্বরূপ — এই রূপই চিন্মাত্রতনু শিব ও অপর রূপ ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি — তিনি প্রবৃত্তিস্বরূপিণী — সংসার-প্রপঞ্চের কারণভূতা। এই শিব বা শক্তি কেহই অন্যোন্যনিরপেক্ষ নহেন; পরম অদ্বয় স্বরূপে এই উভয়ে থাকেন এক হইয়া — ইহাই শিব-শক্তির মিথুনরূপ। এই শিব-শক্তি মিলিতাবস্থাই পরমার্থ — ইহাই জীবের একমাত্র কাম্য।''[১৭৪] অন্যদিকে, শৈব-শাক্তের দ্বন্দ্ব মিমাংসার আভাস পাওয়া যায়। কবি ও সমালোচক কালিদাস রায়

বলেছেন — ''শিবদুর্গার অর্ধনারীশ্বর মূর্তি দেখাইয়া কবি শৈবশাক্তের দ্বন্দ্বের সমাধান যেমন করিয়াছেন — চণ্ডীর মুখে হরিনামের মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়া তেমনি শাক্ত-বৈষ্ণব দ্বন্দ্বেও মীমাংসা করিয়াছেন।''[১৭৫] চণ্ডী বলে —

''হরগৌরী দুই করি জানে জেইজন।
দ্বিতীয় ভেদ করিলে তার নরকে গমন।।''[১৭৬]

'হরগৌরী'-র অভেদ তত্ত্বই শিবের বিরূপ ভাবনার পরিবর্তনের কারণ। তারফলে সে কর্ণমুনিকে মর্ত্যে গিয়ে চণ্ডীর পূজা প্রচারে অনুমতি দেয়। তারপর কর্ণমুনির মর্ত্যে জন্ম নিয়ে ক্রন্দন। সেই ক্রন্দনের কারণ হয়ে উঠেছে হিন্দুধর্মের কর্মফলবাদ, জন্মান্তরবাদ, মনুষ্য জন্মের দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি বিষয়গুলি। কিন্তু দেবী চণ্ডী তাকে ধনি বণিক গৃহে জন্মানোর আশ্বাস বাণী শোনায় এবং তাকে আত্মস্থ করার জন্য পুনরায় হরগৌরীর অভেদ তত্ত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অতঃপর চণ্ডী কর্ণমুনির 'প্রাণ' বা 'জীব' আঁচলে নিয়ে মর্ত্যে গমন করে। এরই সঙ্গে কাহিনীর পটভূমিকা স্বর্গ থেকে মর্ত্যে প্রত্যাবর্তন করে। নতুন আরও চরিত্রের সমাবেশ ঘটে কাহিনীর মধ্যে। সেই সঙ্গে মর্ত্যমানবের জৈবপ্রবৃত্তি ও জন্মকালীন রীতি-নীতির বিষয়গুলি কাহিনীতে স্বভাবতই অনুপ্রবেশ করে। কর্ণমুনির 'জীব' বা প্রাণ নিয়ে দেবী চণ্ডী উজানী নগরের জয়পতির গৃহে আসে। জয়পতি যাতে তার স্ত্রী উর্বশীর সঙ্গে মিলনের জন্য পীড়িত হয় তার জন্য কামদেব চরিত্রের আগমন।

তারপর কর্ণমুনি মর্ত্যে ধনপতি নামে জন্মানোর আগে গর্ভধারী মাতার অবস্থার পুঙ্খাণুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কাহিনীর অনিবার্য বিষয় হিসাবে ধনপতি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তীর্থের জলে স্নান, ষষ্ঠী জাগরণ, নামকরণ, পাঁচ মাসে চূড়াকরণ ইত্যাদি সামাজিক রীতি-নীতিগুলি এসেছে তা উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের বলে মনে হয়। যা মঙ্গলকাব্যের প্রথানুগত ও ধনপতির মত বণিক গৃহের পক্ষে তা অসামঞ্জস্য নয়। কবি বলেছেন —

''নানা তীর্থের জল দিয়া স্নান করাইল।
তিন দিবসের ছাল্যা ধুল বাড়াইল।।
পাচ দিবসের ছাইলা পাচটি করিল।।
ছয়দিবসে করিল ষষ্ঠি জাগরণ।
একমাসে করাইল তার নামকরণ।।
শতেক ছাইলার নাম বাছিল জয়পতি।
ব্যাক্ত নাম থুইল সাধু ধনপতি।।
দিবসে২ বাড়ে সাধুর নন্দন।
পঞ্চ বৎসরের কালে কৈল চূড়াকরণ।।''[১৭৭]

এরপরই কবি গল্প বলার ঢঙে লহনার জন্মের কথা বলেছেন। কবি বলেছেন — ''অখন লহনার জন্ম শুন বিবরণ।।''[১৭৮] কিন্তু তার 'জন্ম কথা' নামমাত্র কাব্যে স্থান পেয়েছে। তা কাহিনী গ্রন্থনার ক্ষেত্রে কবির সংযমশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে ফুল্লরার তুলনায় ধনপতির প্রতি কবির আগ্রহের দিকটিও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। নিধুপতির ঘরে শুধু তার জন্ম একথাই এখানে পাই। জন্মের সাত বছর পর থেকে লহনা দেবী চণ্ডীর ব্রত পালন করে। তাতে মেয়েলী ব্রতে সকলের মঙ্গল উদ্দেশ্যগুলি প্রকাশ পেয়েছে। ব্রত কামনার ফলস্বরূপ ধনপতির মত গন্ধ বণিকের সঙ্গে তার বিবাহ। ব্রতকথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-প্রচলিত বাল্য বিবাহের ও রামায়ণ কথা তুলে ধরা হয়েছে। কবি মধ্যযুগের পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অনুকূল করে লহনার দ্বাদশ বৎসরে বিবাহের চিত্র অঙ্কন করেছেন। সেই সঙ্গে কবি লহনার স্বামীর কথা বলতে গিয়ে রামায়ণের রামের মত পতিপরায়ণ স্বামী-আকাঙ্ক্ষার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। এইভাবে কবি মানিক দত্ত লহনার বিবাহের পূর্বাভাস বা ভূমিকায় লৌকিক ব্রতকথার প্রয়োজনীয়তা ও রামায়ণ প্রসঙ্গকে এক সূত্রে বেঁধেছেন।

সমাজে প্রচলিত বিবাহ-সম্পর্কিত রীতি-নীতি মঙ্গলকাব্যের প্রথানুসারে কাব্যে এসেছে। লহনার বিবাহ বিষয়ে তা লক্ষ্য করা যায়। লহনার বিবাহ বর্ণনায় উচ্চ হিন্দু সমাজের আভাস পাওয়া যায়। নিধুপতি তার বিবাহযোগ্য কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তিত হওয়া এবং তার কুলের ব্রাহ্মণকে ডেকে আনা স্বাভাবিক। সেই পরিস্থিতিতে নিধুপতি তার কাছে জয়পতির সুন্দর পুত্র ধনপতির কথা জানতে পায়। ধনপতি ও লহনার বিবাহ নিয়ে নিধুপতি ও ব্রাহ্মণ ঘটকের কথাবার্তায় বিবাহ-বিষয়ক কয়েকটি আশ্চর্য নিয়ম নীতি সঙ্গত কারণে পরিস্ফূট হয়ে উঠেছে। সেগুলি হল — কুল বিচার, শুভক্ষণ নির্ধারণ, নক্ষত্র রেবতী বিচার, দিনক্ষণ বিচার ইত্যাদি। কবি লহনার বিবাহে ব্রাহ্মণের বেদমন্ত্র উচ্চারণ ও দানে দাসী দেওয়ার রীতি আর্যসংস্কৃতির পরিচায়ক রূপের বর্ণনা করতে বিস্মৃত হন নি।

''দানদ্রব্য দিল সাধু সেইখানে বসি।
কন্যার সংহতি দানে দিল দুবাদাসি।।''[১৭৯]

বিবাহে দাসীদের পণ্যে পরিণত করার রীতি মধ্যযুগের অভিজাত পরিবারে প্রচলন ছিল। সেই রীতির প্রতিভাস পাই ধনপতির বিবাহে নিধুপতির কন্যার সঙ্গে দাসী দানে দেওয়ার ক্ষেত্রে। অতুল সুর এই প্রথা সম্বন্ধে বলেছেন — ''দাসদাসী রাখা ঋগ্বেদের আমল থেকেই ভারতে প্রচলিত ছিল। তবে মধ্যযুগে এই প্রথা বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল।''[১৮০] ধনপতির বিবাহ রীতির বিভিন্ন প্রথা উচ্চবিত্ত সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কবি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কাহিনীতে স্থান দেওয়ায় তা অনেকটা বাস্তব সম্মত হয়ে উঠেছে। তবে পুত্র বিবাহের পর জয়পতির মৃত্যু কার্যকারণ সম্পর্কহীন। তা কাহিনীতে গল্পের মত। প্রসঙ্গত, F. M. Forster -এর Plot সম্পর্কে বলতে গিয়ে

গল্পের সঙ্গে প্লটের পার্থক্য করেছেন — " 'The king died and then the queen died,' is a story."[১৮১] জয়পতির মৃত্যু এরূপ একটি গল্পমাত্র। তবে জয়পতির অন্তেষ্টিক্রিয়া হিন্দুসংস্কার মেনে কবি বর্ণনা করেছেন।

তবে কবি লহনার চিত্র গল্পের ঢঙে তুলে ধরছেন। তার বলন ভঙ্গী গল্পের ঢঙের। যেমন — ''লহনাক লইয়া কিছু শুন বিবরণ।।''[১৮২] এই বিবরণটি হল লহনার দেবী চণ্ডীর প্রতি অন্যমনস্কতা এবং তাকে দেবীর সতীন ও নিঃসন্তানের অভিশাপ প্রদানের ঘটনা। দেবী চণ্ডী যেমনি নিঃসন্তানকে সন্তান প্রদান করতে পারে তেমনি বিরূপ হলে সংসারের সুখ হরণ করতে পারে — সেই স্বরূপটি এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। কাহিনী গ্রন্থনায় দেবী চণ্ডীর এরূপ অভিশাপ কাহিনীর মোড় ঘোরাতে সাহায্য করেছে।

কবির বর্ণনা কৌশলে স্বর্গকে কঠোর বাস্তবের মাটিতে বিভূষিত হয়েছে। এ কাহিনীর পটভূমি স্বল্পসময়ের জন্য স্বর্গপুরে পরিবর্তন হয়। চণ্ডীর মূল উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে এই কাহিনীর পটপরিবর্তন। একই সঙ্গে সরল প্লটের মত কাহিনীতে আরো চরিত্রের আগমন ঘটেছে। নারদের পরামর্শে চণ্ডী ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত হয়। তাদের উদ্দেশ্য হল রত্নমালাকে ছলনার দ্বারা অভিশপ্ত করে মর্ত্যে তার পূজা প্রচার করা। কবি তার আগে মালাধরের পরিচয় দিয়েছেন। তার পিতা জয়ধর এবং মাতা রত্নমালা; তার দুই স্ত্রী উলুবা ও দুলুরা। তারা সকলে দেবসভায় নর্তকী। তাই চণ্ডী ইন্দ্র সভায় তাদের নৃত্য দেখতে যায়। ইন্দ্র মাতুলি নামে একজনকে দিয়ে রত্নমালাকে সহ পাঁচজন নর্তকীকে ডাকতে আদেশ দেয়। তারা ক্ষণেক আগে এই সভায় নৃত্য করে পরিশ্রান্ত। কিন্তু তারা বাধ্য হয় শেষ পর্যন্ত রাজ-আদেশের কাছে নিরুপায় হয়ে মাথা নত করতে। তাদের কথায় নিম্নশ্রেণীর পরিশ্রমিদের উপর অসহায়, যৎপরোনাস্তি, যথেচ্চার অত্যাচারের প্রত্যক্ষ বাস্তবরসের চিত্রটি অনুমান করা যায়। এই পরিশ্রমের কারণেই রত্নমালার নৃত্যে তালভঙ্গ, চণ্ডী কর্তৃক অভিশপ্ত হওয়া এবং মর্ত্যে জন্মগ্রহণের কার্যকারণ ঘটনার বিবৃত হয়েছে।

স্বভাবতই, রত্নমালা ইছানী নগরের রম্ভার উদরে খুল্লনা নামে জন্মগ্রহণ করে। তার জন্মের বৃত্তান্ত ও জন্মের পর পবিত্র জলে স্নান, ছয় দিনে ষষ্ঠী জাগরণ, এক মাসে নামকরণ, পাঁচ বছরে চূড়াকরণ, তালপাতার কাঠি দিয়ে কর্ণচ্ছেদ প্রভৃতি রীতি ধনপতির মত উচ্চবিত্তের সংস্কার মেনে এখানে বর্ণিত হয়েছে। দেবী চণ্ডীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে ধনপতির দ্বিতীয় বিবাহের জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছে। ধনপতির দ্বিতীয় বিবাহের কারণ — সে আঁটকুড়া এবং সেই জন্য রাজ্যে আর্থিক দুর্ভোগ। ধনপতিকে এই আঁটকুড়া অপবাদ দেওয়ার নিমিত্তে দেবীর দ্বারা রাজাকে স্বপ্ন দেখান হয়েছে। এখানে অলৌকিক বিষয়কে ধনপতির দ্বিতীয় বিবাহের কারণ হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

"চিয়রে দণ্ডের রাজা গায়ে কর বল।
তোর ঘরে আইলাম দুর্গা সর্ব্বমঙ্গল।।
আটকুড়া ধনপতি আছে নগর ভিতর।
তাহাকে পুরিতে য়াসিতে না দিহ সত্তর।।"[১৮৩]

কিন্তু রাজা রাজ্যের দুরবস্থার কথা উপস্থাপন করলে ধনপতি তা অর্থ দিয়ে নিবারণের উপায় বের করে। তাতে সমাজে বণিক শ্রেণীর ধন-সম্পত্তির প্রাচুর্যই বড় হয়ে উঠেছে। সে যাই হোক রাজা তাকে দ্বিতীয় বিবাহের কথা বললে সে সতীন সমস্যার তীব্রতার বিষয়টি রাজার সামনে তুলে ধরে। মধ্যযুগে উচ্চবিত্ত সমাজে বহুবিবাহ প্রথা ব্যাপক প্রচলন ছিল সত্য। তার যন্ত্রণাও কম ছিল বলে মনে হয় না। তাই ধনপতির দ্বিতীয় বিবাহে অনীহা প্রকাশ স্বরূপ সতীন জ্বালার তীব্রতাকে উন্মোচন করে। এই সতীন সমস্যা-রূপ সামাজিক ব্যাধি রাজার সামনে উপস্থাপিত করলেও দেবীর স্বপ্নাদেশই এখানে বড় হয়ে ওঠেছে। শেষ পর্যন্ত ধনপতিকে কোতাল দিয়ে রাজ দরবারের বাইরে বের করে দেওয়া হয়। ধনপতি গৃহে পা দেওয়া মাত্র লহনার স্বামীপরায়ণতা লক্ষ্য করে তার কণ্ঠস্বর নিম্নগামী হয়। ধনপতি এরূপ একটি উত্তপ্ত কটুক্তি শুনেও পরিস্থিতির কাছে মৃদুভাষী; তা অত্যন্ত সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কবির ভাষায় —

"আইল লহনা নারী হস্তেত জলের ঝারি
বলিতে লাগিল সাধু মৃদু২ করি।।"[১৮৪]

ধনপতির দাম্পত্য জীবনে কোন সন্তান না হওয়ায় স্ত্রী লহনাকে তার জন্য দায়ী করেছে। লহনা তার কাছ থেকে চার বৎসর সময় চেয়ে নিয়েও শেষ পর্যন্ত নিজের রাগ সংবরণ করতে পারে না। নিঃসন্তানবতী লহনা অন্যপুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করে সন্তান প্রসব করার কথা বললে সেই তীব্র জ্বালাময় বাক্যবাণ ধনপতি সহ্য করতে পারে না। সেই দাম্পত্যের কলহে দুর্বলা দাসীর আগমন, এরপর ধনপতির পায়রা উড়াতে বের হওয়ার ঘটনাটি অত্যন্ত সুসঙ্গত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। দাম্পত্য কলহকে কেন্দ্র করে কবি ধনপতির পায়রা উড়ানোর মাধ্যমে পূর্বেই শ্রোতাগণকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে দ্বিতীয় বিবাহের পূর্বাভাস।

"সাধু বলে কোথা গেলা দুবুলা কিঙ্করী।
বাঞ্ছি লহনার তাপ সহিতে না পারি।।
পাএরা খেলিতে জাব ইছানি নগর।
তথা বিবাহ করিব লক্ষের সদাগর।।"[১৮৫]

লক্ষণীয়, ধনপতির সঙ্গে এই পর্যন্ত লক্ষপতির বা তার কন্যা খুল্লনার যোগাযোগ বা পরিচয়ের কোন বার্তা কাহিনী ধারায় পাওয়া যায় নি। হঠাৎ ধনপতি কর্তৃক লক্ষপতির কন্যাকে বিবাহ করার

বিষয়টি উত্থাপন যে সম্পর্ক সূত্রহীন তা অনুমান করা যায়।

তবে কাহিনীতে ধনপতির সঙ্গে খুল্লনার সাক্ষাৎকল্পে অভিজাত বণিক সমাজের পায়রা উড়ানোর ঘটনাটি এসে যায়। ধনপতি যে ধনি অভিজাত তার প্রমাণও রয়েছে কাহিনীতে। সে পায়রা উড়ানোর জন্য সঙ্গে জনার্দন ওঝা ও পথপ্রদর্শক হিসাবে তার ভাই বুলনকে নিয়েছে। সেই খেলার পটভূমি ধুলিয়া ময়দান। সেখান থেকে ধনপতির পায়রা গিয়ে লক্ষপতির দক্ষিণ ঘরের চালে বসে। আর খুল্লনা তখন উত্তর ঘরে বারান্দায় খেলা করছিল। পায়রা যেন ধনপতি ও খুল্লনার মিলনের মধ্যস্থতা করেছে। তার সুন্দর চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এই পায়রার মধ্য দিয়ে কবি খুল্লনার প্রতি কামোত্তেজনার একরূপ আভাস দিয়েছেন, বলা যায়। কেননা, ধনপতির পায়রা খুল্লনার কাঁচুলির আঁচলে নর-নারীর মিলন ছবি দেখে তার আঁচল ছিঁড়ে দেয়।

''আচলের মধ্যে লবরঙ্গ দেখিয়া
কাচুলি চিরিয়া ফেলিল।।''[১৮৬]

স্বাভাবিক ভাবে ধনপতিও খুল্লনার কাছে পায়রা আনতে গেলে তার প্রতি কামমুগ্ধ হয়। যে ধনপতির আঁটকুড়া অপবাদে আত্মসম্মান জাগ্রত হয়, কামদগ্ধ হয়ে সেই ধনপতিই মান সম্মান বোধ হারিয়েছে। সমাজে দ্বিতীয় বিবাহের তুলনায় আঁপকুড়া অপবাদ কঠোর ছিল বলেই ধনপতি চরিত্রের এইরূপ সঙ্গতিপূর্ণ পরিবর্তন সে নিজের খুড়তুতো শ্বশুরকে সরাসরি নির্লজ্জের মত খুল্লনাকে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। সে প্রথমে লক্ষপতিকে উপযুক্ত কন্যার বিবাহ না দেওয়ার ব্যর্থতা পরিবেশন করেছে। লক্ষপতি সমাজের এই সত্যকে নতমস্তকে গ্রহণ করে এবং ধনপতির সম্মুখে কন্যা বিবাহের বিধান চায়। আর সেই সময় ধনপতি বলে —

''এক কথা লক্ষপতি বলি তোমার তরে।
তোমার পিতার পুন্যে কন্যা দান কর মোরে।।''[১৮৭]

এইভাবে ধনপতি ও লহনার কলহ, পায়রা উড়ানো, ধনপতির সঙ্গে খুল্লনার সাক্ষাৎ, কামদগ্ধ হয়ে নির্লজ্জের মতো লক্ষপতির কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া — সত্যিই পাঠককে বিস্মিত করে। যেন চরিত্রের ক্রিয়াকলাপই ঘটনাগুলিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

ধনপতির বিবাহ নিয়ে আর একটি দিকও আমাদের চকিত করে। সে হল মধ্যযুগে দাঁড়িয়ে লক্ষপতি কন্যার বিবাহ ধনপতির সঙ্গে দেবে কিনা সে বিষয়ে স্ত্রী রম্ভাবতীর কাছে মতামত চাইতে যাওয়া।

''আর বিবাহ করিতে জদি সাধ থাকে তোরে।
আগে জিজ্ঞাসিয়া আসি রম্ভাবতীর তরে।।
রম্ভা য়াজ্ঞা করে জদি কন্যা কর দান।

তবে পণ্ডিত পঠাইয়া দিহ কভু নয় য়ান।।''[১৮৮]

তবে রম্ভাবতীর কন্যার বিবাহ সম্পর্কে মতামত ও ঘটক বা পণ্ডিত পাঠানোর কোন বিবরণ কাব্যে নেই। সরাসরি ঘটক জনার্দন ধনপতির সঙ্গে সাত বছরের বালিকা খুল্লনার বিবাহ দিতে বলে। কিন্তু রম্ভাবতী সতীনের গৃহে কন্যা বিবাহের জ্বালা অনুভব করে নারাজ হলে জনার্দন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নারীর অবস্থাগুলি তুলে ধরে। সে রম্ভাকে বলে —

''সাত বৎসরের হৈলে ছুত হয়ে নারী।
দশ বৎসর হৈলে পূর্ন কুমারী।।
এগার বৎসর হৈলে চঞ্চল হয়ে চিত।
বার বৎসর হৈলে পুষ্প বিগশিত।।
তোমার খুলুনা হৈল সপ্ত বৎসরে।
এহি সময় বিবাহ দেহ ধনপতির তরে।।''[১৮৯]

সতীন জ্বালার জন্য রম্ভাবতী কন্যার বিবাহে অসম্মত হলেও জনার্দন কথিত এই সামাজিক কঠিন শৃঙ্খলের কথা শুনে মানব চরিত্র হিসাবে আনন্দিত হবার কথা নয়। ''শুনিএগত রম্ভাবতী আনন্দিত হইল।''[১৯০] কাহিনী ধারায় মাতা রম্ভাবতীর কন্যার বিবাহ বিষয়ে এরূপ আচরণ কার্যকারণ সম্পর্ক লঙ্ঘন করেই কবি ধনপতির সঙ্গে খুল্লনার বিবাহের বিষয়টি দেখালেন। সেই বিবাহের পটভূমিকায় নারীরা অপশাসনের বিরুদ্ধে ও পুরুষ নিন্দার প্রাণোচ্ছল প্রকাশ পেয়েছে। শুধু তাই নয়, কবি বিবাহ সম্পর্কিত বিধি-নিষেধগুলি সমকালীন শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

মধ্যযুগে নারীদের সামাজিক অবস্থানের প্রতি কবি আগ্রহী হওয়া কাহিনী গ্রন্থনা শিথিল করেছেন। ধনপতিকে দেখতে এসে নারীগণের পতিনিন্দায় ধনপতির পরবর্তী দাম্পত্য জীবনের দুর্ভোগের পূর্বাভাস দেওয়াই কবির উদ্দেশ্য হয়ে থাকবে। সেখানে দেখা যায় যে, ধনপতিকে দেখতে যেসকল নারী এসেছিল তাদের অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ উন্মোচনেই কবির বেশি আগ্রহ ছিল। কবি বলছেন — ''জুবা২ রাইহ লইয়া কিছু শুনিব বচন।''[১৯১] এই সকল যুবতী নারীরা ধনপতির মত সুন্দর পুরুষকে দেখে তাদের অন্তরগহনের মানসিক যন্ত্রণা ও বিড়ম্বনার রূপ তুলে ধরেছে। 'নারীগণের পতিনিন্দা' এই অংশটি সাধারণত মঙ্গলকাব্যের বর্ণনা রীতি অনুযায়ী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবখণ্ডে মেনকার খেদ ও শিবের মদনমোহন রূপ ধারণ করার পর বর্ণিত হয়ে থাকে। কিন্তু মানিক দত্ত তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিক খণ্ডে ধনপতির সঙ্গে খুল্লনার বিবাহের আগে তা বর্ণনা করেছেন। কবি 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশটি কাহিনী ধারায় উপস্থাপনে মঙ্গলকাব্যের প্রথানুসরণ করেছেন এবং তা বিবাহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়েছেন। কবি এই অংশে নারীর সামাজিক অবস্থানকে কাহিনী ধারায় বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন।

এ ধরনের নারীদের পতিধিক্কারের উৎস সম্ভবত কবি লোকগান ও লোকছড়া থেকে নিয়ে থাকবেন। এই অংশটিকে নারীর মনস্তাত্ত্বিক ও বিফল জীবনের প্রতিভাস বললে অত্যুক্তি হবে না। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নারীরা তাদের বুড়ো, কালা, কাশো, কুঁজো, কানা, গোদা স্বামীদের নিন্দা করেছে। কবি তাতে অত্যন্ত হাস্যকৌতুকের দ্বারা দুঃখের মেঘের মধ্যে আলোর ঝলক দেখিয়েছেন। কবি বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে —

''এক জুবতি বলে হের মোর পোড়ে হিয়া।
কেমোন য়াইল সাধুর বালা দেখি আসি গিয়া।।
*　　*　　*
আর জুবতী বলে প্রিয়া তোর নাপন ভাল।
কুজগিরির তাপে মোর শরীর কৈল কাল।।
শুইবার কালেতে কুজা শোয়ে একমনে।
চিত হৈয়া শুইতে নারে কুজের কারণে।।
মাঝিয়াত ফেলাইয়া থুইলে থাকে কাইত হৈয়া।
চিত হৈয়া থাকে কুজা খালে কুজ দিয়া।।
*　　*　　*
এক জুবতী বলে পতির নাই দরশন।
শাক সুকুটা বিনে না করে ভোজন।।
একদিন অন্নবেঞ্জন দিড় করি রান্ধি।
মারয়ে পীড়ার বাড়ি কোনে বসি কান্দি।।
আর জুতী বলে গোদা মোর পতি।
কুঞ্জরের ঐষধ আমি সদাই পাব কতি।।
পথে চলি জাইতে গোদেত লাগে ধুলি।
দুই গোদ য়াচড়ি করে শামুকের খুলি।।
তখনি কহিলাম গোদা হুতি হৈয়া শো।
গোদের চাপনে মৈল ছয়মাসের পো।''[১৯২]

তিনি যুবতীদের দুঃখের চিত্রের পাশাপাশি 'রাড়ি' বা বিধবাদের দুঃখ কষ্টের চিত্র তুলে ধরেছেন। নারীর সামাজিক অবস্থানের চিত্র বর্ণনায় সার্থক বলে মনে হলেও প্লট বা কাহিনী গ্রন্থনার দিক থেকে কাহিনীর অযথা বৃদ্ধি বা কিছু মধ্যযুগীয় তথ্যের সন্ধান ছাড়া অতিরিক্ত নয়। এই তথ্য অনুসন্ধানকে কবি সকল হৃদয়গ্রাহী পাঠকের রস-সম্পদে পরিণত করতে পারেন নি। তবে, কবি

বৃদ্ধা এয়োনারীদের মনোবাঞ্ছা পূরণের চিত্র সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। এক বৃদ্ধা বিধবা তার দুই নাতিনীকে ধনপতির কাছে বিবাহ দিয়ে নিজের সখ-আহ্লাদ ও কামনা-বাসনা পূরণ করে নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এইভাবে কবি মানিক দত্ত একে একে নারীর অন্তরের জ্বালাময় উত্তাপকে সচেতন ভাবে তুলে ধরেছেন। তার ফলে কাহিনী গ্রন্থনা অনেকটাই শিথিল হলেও নারীদের এরকম পতিনিন্দাকে পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের সমালোচনা হিসাবে দেখা যায়।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থা সর্বাধিক সঙ্কটজনক। সতীনের গৃহে রম্ভাবতী কন্যাকে বিবাহ দিতে সম্মত হলেও স্বামীগৃহের যন্ত্রণা থেকে রক্ষার জন্য তুক্‌তাকের সাহায্য নিয়েছে। সেই তুক্‌তাকের জন্য এসেছে মালিনী নামে একটি চরিত্র। স্বামীর গৃহে কন্যার যেন কোন সঙ্কট না হয়, তার জন্য পুরুষের কামনাকে তুক্‌তাক দ্বারা খুল্লনামুখী করতে চেয়েছে রম্ভাবতী। মালিনী তাকে আউশ ধানের চাল, চিলের বাসার খড়ি, খুল্লনার ব্যবহৃত চুলের তেল একত্রিত করে চাঁপা কলার মধ্যে দিয়ে খাওয়ালে তাকে স্বামী চিরকাল ভালোবাসবে। রম্ভাবতী কিন্তু সমাজপ্রবাহে অভিজ্ঞতা লাভ করার ফলেই এধরনের পূর্বসচেতনতা অবলম্বন করেছে। সমাজে এধরনের তুকতাক্ বা লোক ঔষধ করার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে কবির এই বর্ণনা হয়তো এত সুচারু হত না।

অতঃপর কবি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নির্দেশিত ভূমিকাকেই খুল্লনার ঋতুদর্শনের পূর্বেই বিবাহ বাধ্যতামূলক — সেটি কারণ হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। সেই সামাজিক অনুশাসনের সঙ্গে দেবীর স্বপ্নকে একত্রিত করে দিয়েছেন। তার পিছনেও কবি সমাজ কলঙ্কের রক্তচক্ষুর ভয়কেই কাজে লাগিয়েছেন।

"ধনপতি সাধুকে জদি কন্যা নাঞি দিবে।
অবিভাত খুলনার কলঙ্ক হইবে।।
স্বপ্ন দেখি লক্ষপতিকে ভয় লাগে।
লক্ষপতি আসি বোলে ধনপতির আগে।।"[১৯৩]

ধনপতির বিবাহে লহনার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত নারী মনস্তাত্ত্বিক বলে মনে হয়। খুল্লনা একদিকে লহনার খুড়তুতো বোন, অন্যদিকে সে তার তুলনায় সুন্দরী। সুন্দরের প্রতি পুরুষের আকর্ষণ বেশি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী কেবল যৌনভোগের সামগ্রী ও বংশ রক্ষা তথা সন্তান ধারণের যন্ত্র — একথা লহনার অজানা নয়। তার আশঙ্কা সে বিগত যৌবনা এবং বন্ধ্যা। তাই লহনার স্বামীর প্রতি একাধিপত্য অধিকার খর্ব হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমনকি, খুল্লনাকে আশির্বাদ করতে লহনাকে পাঠালেও তার নারী মননের ভিতরের রহস্য উন্মোচিত হয়। আশির্বাদে খুল্লনাকে যে সকল অলঙ্কার দেওয়া হয় তাতে অভিজাত বণিক পরিবারের পক্ষে বিস্ময়কর।

আশির্বাদের পর ইছানী নগরে খুল্লনার বিবাহে জল সাধার বিষয়টি পরিবেশিত হয়।

সেখানে কবির কাহিনী গ্রন্থনে দৃঢ়তার পরিচয় না পাওয়া গেলেও সমাজ সচেতন কবি হিসাবে তাঁকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। লক্ষণীয়, ইছানী নগর থেকে কয়েকজন এয়োনারী বা সধবা নারীকে জল সাধার জন্য উজানী নগরে পাঠানো হয় এবং কয়েকজন ইছানী নগরে জল সাধতে বের হয়। তাতে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে কাহিনীতে চরিত্রের ভীড় লক্ষ্য করা যায়। সেই সকল চরিত্রের নামে সমকালীন পুরাণ প্রভাবিত। যেমন — শিতলি, পাতলি, শাকম্ভরী, সত্যভামা, রোহিনী, দ্রৌপদী, ইমলা, বিমলা, সরস্বতী, কমলা, ইন্দুমতি ও তারা ইত্যাদি। বিবাহের সাধারণ বিষয়ের নিতান্ত বিশ্বাসযোগ্য বাস্তব ছবি কবি অঙ্কন করেছেন। কয়েকটি বাক্যে কবি তৎকালীন সমাজের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন —

"হরি হরি রাইহ জানাও প্রতি ঘরে ঘরে।
শিতলি পাতলি রাইহ সাধুর মন্দিরে জাইহ
জারে তোরা জল সাধিবারে।।
শাকম্ভরী সত্তভামা রোহিনী দ্রৌপদী রামা
সকলের মাথায়ে দুর্গার ঘটবারা।
ইমলা বিমলা সরস্বতী কমলা
ইন্দুমতি আর তারা।।"[১৯৪]

এয়োনারীদের রূপ সজ্জা, তাদের জল সাধতে যাওয়া ও সেই সঙ্গে 'দুন্দুবি' বাদ্য বাজায় লহনার ক্রন্দন, আম্র পল্লব ও কলা সমেত ঘট স্থাপন ও বাম পাশে ব্রাহ্মণের বেদ পাঠ, বিভিন্ন উচ্চশ্রেণীর গৃহে গিয়ে জল সাধা এবং ধনপতির বিবাহে যৌতুক নিয়ে বণিকশ্রেণীর মধ্যে তাদের যৌতুক নেওয়ার আধিক্যের চিত্র কবি বিস্তারিত ও পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে কাহিনী গ্রন্থনের দৃঢ়তায় ব্যাঘাত পড়লেও সামাজিক নিদর্শন হিসাবে তার মূল্য যথেষ্ট। এছাড়া বিবাহে ধনপতিকে নিয়ে খুল্লনার সাতপাক দেওয়া, ঈশ্বরের স্মরণে মালা বদল এবং যৌতুকে দুই জন দাসী প্রদান ইত্যাদি বিষয়গুলি এ বিষয়ে লক্ষণীয়।

"স্বামীকে বেড়িয়া রামা সপ্তপাক দিল।
হরিধ্বনি দিঞা মালা গলে তুলি দিল।।
বিবাহ করিল তবে সাধুর নন্দন।
দানে জৌতুকে বসিল দুইজন।।"[১৯৫]

অভাবনীয় ঘটনা পরিস্থিতির সম্মুখীন করে কবি বিবাহের পর খুল্লনাকে শ্বশুর গৃহে যাত্রার প্রাক্কালে রম্ভাবতী চরিত্র দ্বারা সাংসারিক আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এই সামাজিক তথা পারিবারিক অভিজ্ঞতা রম্ভাবতী কন্যা খুল্লনার মধ্যে সঞ্চারিত করে দেয়। কবি তাঁর তিক্ত সামাজিক

তথা পারিবারিক সংবিদকে রম্ভাবতীর মাধ্যমে এখানে উন্মোচিত করেছেন। কবি নিজে বর্ণনা দিয়ে কিছু বলেন নি, ঘটনাচক্রের মধ্যবর্তী করে সবই স্বাভাবিক ও সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলেছেন। তা রম্ভাবতীর অশ্রু সজল নয়নে কন্যাকে পিত্রালয় থেকে বিদায়ের প্রাক্ মুহূর্তে ফুটে উঠেছে। ধনপতি গৃহে ফিরে সকল জ্ঞাতিসহ অন্যান্য যুবতীদেরকে ভোজন করিয়ে সঙ্গে প্রণামি স্বরূপ অর্থ প্রদান করে। বলাবাহুল্য, এরূপ একটি সামাজিক রীতির আভাস এখানে রয়েছে বলে মনে হয়।

এরপর কাহিনীতে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। এই দ্বন্দ্বের সূচনা হয় উজানী নগরের রাজা বিক্রমকেশরের সঙ্গে ধনপতির সাক্ষাৎ করতে যাওয়াকে কেন্দ্র করে। তাতে ধনপতি রাজার ঘরের বিছানায় বসার মধ্যে, বণিক শ্রেণী ও রাজার মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা সমতুল্যের বাস্তব ছবি উঠে এসেছে। সে যাই হোক, এই দ্বন্দ্বের পূর্বসূত্র নিহিত ছিল বিক্রমকেশর কর্তৃক ধনপতিকে আঁটকুড়া অপবাদের মধ্যে। তার শ্লেষাঘাতে ধনপতির দ্বিতীয় বিবাহ। সেই সঙ্গে রাজা হিসাবে বিক্রমকেশরকে জ্ঞাত না করলে তার আত্ম অহমিকা জাগ্রত হয় এবং তাতে বিক্রমকেশর ধনপতিকে বন্দী করে।

> ''রাজা বোলে বিভা কৈলে শুন সদাগর।
> আমি রাজ্যের রাজা না পাল্যাঙ খবর।।
> বিক্রমকেশর রাজা মনে ক্রোধ হল্য।
> ধনপতি সাধুকে রাজা বন্দি করি থুল্য।।''[১৯৬]

ধনপতি ও বিক্রমকেশর চরিত্রের দ্বারা দ্বান্দ্বিক পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং কাহিনীতে গতি সঞ্চারে সাহায্য করেছে। তবে ধনপতি বন্দী হওয়ার পর কাহিনীতে লহনা ও খুল্লনা চরিত্রের হঠাৎ করে অনুপ্রবেশ ঘটে। এই অংশটুকু ধনপতির বন্দী দশার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তা সত্ত্বেও সতীন সমস্যার সামাজিক রূপটি স্বল্প পরিসরেই জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

কাহিনীর গতি মুখ পরিবর্তনের জন্য সন্নিবেশিত হয়েছে একটি উপকাহিনী। সেই জন্য হঠাৎ কৈলাশে দেবী চণ্ডী কীভাবে খুল্লনাকে দিয়ে ছাগল চরাবে সেই পরিকল্পনায় চিন্তিত। তবে এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে চিন্তা ও তার উপায় স্বরূপ শারী-শুয়া পাখির জন্ম কার্যকারণ সম্পর্ক যুক্ত বলে মনে হয়।

> ''কিরূপে চরাবে ছেলি সুন্দর খুলনা।
> এই কথা দুর্গা মাতা করিছে মন্ত্রনা।।
> পদ্মা বলে শুন মাতা করি নিবেদন।
> অখন করাহ শারী শুকের জনম।।''[১৯৭]

দেবী চণ্ডীর উদ্দেশ্য তার ব্রত প্রচার। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য খুল্লনার মর্ত্যে জন্ম গ্রহণ। সেই

উদ্দেশ্যকে সাধন করতে শারী শুকের জন্ম। শারী-শুয়া পাখিকে মূল কাহিনীর গতিমুখ ও প্রধান চরিত্রদেরকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য উপকাহিনী হিসাবে অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে।

শারী-শুয়া পাখি কীভাবে মূল কাহিনীতে এল তার জন্য কবি একটি উপকাহিনীর সৃষ্টি করেছেন। তাতে অলৌকিক ঘটনা অধিক স্থান পেলেও কাহিনীবৃত্ত কার্যকারণ সম্পর্কহীন নয়। শারী-শুয়াকে মর্ত্যে জন্মগ্রহণের জন্য কাহিনীকে মর্ত্য থেকে স্বর্গে নেওয়া হয়েছে। তার পটভূমি ঐ ইন্দ্রের রাজসভা। শারী ও শুকের পূর্বে নাম ছিল পুষ্পদত্ত ও বিদ্যামন্ত। তারা স্বর্গেই মর্তের রামগুণ গান গায়। সেই গান শুনে শচী রাণীর চিত্ত মুগ্ধ হয়ে যায় এবং হৃদয় শান্তিতে ভরে উঠে। বাঙালী বধূর মত মুগ্ধতার পরিচয় রয়েছে স্বর্গের রাণী শচীর মধ্যে। তৎকালীন মধ্যযুগে রাম নামের ব্যাপক প্রসার ও রাম দেবতা রূপে সর্বজন স্বীকৃত পায়। সেই দেবতার গুণগানে অধম পাপিষ্ঠের হাস্যকৌতূক জনিত অভিশাপ তৎকালীন লোকবিশ্বাসকে জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। রামগুণ গানের মুগ্ধতায় তাদের হাসিই অভিশাপের কারণ এবং মর্ত্যে দ্বাদশ বৎসরের জন্য পাখিরূপে জন্মগ্রহণ।

“গানে মগ্ন শচী ইন্দ্রের বুকে হস্ত দিল।
দেখিঞা নিত্তকী দুহে হাসিতে লাগিল।।
নিত্তকির হাস্য দেখি ইন্দ্র ক্রোধ হৈলো।
শচী দিল বুকে হস্ত দেখিঞা হাসিলো।।
ক্রোধে ইন্দ্র শাপ দিঞা বলে নিত্তকীরে।
শারী শুয়া পক্ষ হঞা জন্ম মর্থপুরে।।”[১৯৮]

কবি এই ঘটনাটির সঙ্গে অপর একটি কাহিনী যুক্ত করে দিয়েছেন ইন্দ্র চরিত্র সংযোগের দ্বারা। সেই কাহিনীতে পুরাণ পরিচিত কিছু ঘটনা ও চরিত্রের সন্নিবেশ হয়েছে। তার ফলে মূল কাহিনীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন নতুন উপকাহিনী ও ঘটনা ধারা সৃষ্টি হয়েছে। যে ঘটনাগুলি সমকালীন শ্রোতাদের কাছে হয়তো মুখরোচক ও মনোরঞ্জনের বিষয় হয়ে উঠেছে। তবে শিল্পের দিক থেকে তার মূল্য কম। ইন্দ্র বলেছে সেই পুরাণের শ্রীবৎস রাজার কথা। শারী-শুয়া প্রথমে শ্রীবৎসরাজার ঘরে থাকবে সেখানে কীভাবে শনির দৃষ্টিতে অরণ্যে যাবে তার বিবরণ। কবি এই পুরাণ কাহিনীর সঙ্গে লৌকিক কাহিনী যুক্ত করে দিয়েছেন। অরণ্য থেকে ব্যাধের দ্বারা রাজা বিক্রমকেশরের রাজদরবারে অবস্থান করবে। এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে তার আবার ব্যাখ্যা বিবৃত হয়েছে। শারী শুক পাখি কীভাবে শ্রীবৎস রাজার গৃহে গেল তার সূত্র কাহিনীতে বলা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে —

“শ্রীবৎস রাজার গৃহে দুই পক্ষ গেল।
পক্ষ পাঞা মহারাজা পালিতে লাগিল।।”[১৯৯]

সেখানে শনি সন্ন্যাসী রূপে ভিক্ষা করতে আসে। কিন্তু রাজা শ্রীবৎস একাদশীর কারণে শারী পক্ষকে দিয়ে ভিক্ষা প্রেরণ করে। রাজা নিজে ভিক্ষা দিতে না আসায় শনি রাজাকে কামবাণ নিক্ষেপ করলে তার একাদশীর ব্রত ভঙ্গ হয় এবং সে নারী সঙ্গম করে। কবি মানিক দত্ত শনি সম্পর্কিত লোকপ্রচলিত ধারণাকে এখানে কাজে লাগিয়েছেন। শনির দৃষ্টিতে সমস্ত ধনসম্পত্তি বিনাশ হয়ে যায় — লোকসমাজে প্রচলিত এই বিশ্বাস শ্রোতা ও পাঠকের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছে। কবি এই লোক বিশ্বাসকে রাজার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন এই ভাবে —

> ''চক্ষু তুলিয়া রাজা জেই দিগে চায়।
> রাজার পাপে ধনলক্ষ্মী ছাড়িয়া পলায়।।
> ধনলক্ষ্মী পলাইছে রাজা মনে ভাবে।
> রাজ্যে থাকিলে আমার প্রজা নষ্ট হবে।।''[২০০]

এই কারণে রাজা শ্রীবৎস ও রাণী চিন্তাবতী শারী-শুয়া পাখিসহ ধনসম্পত্তি নিয়ে রাজ্য ছেড়ে যাত্রা করে। শ্রীবৎসের এরূপ আচরণ তাকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নামিয়েছে। এবার যাত্রা পথে শনির ছলনা দ্বারা তার উদ্দেশ্য বাধা প্রাপ্ত হয়। শনি নদীর ধারে খেয়া পারাপারের মাঝির ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং তার ছলনায় রাজা সমস্ত ধন-সম্পদ হারায়। শ্রীবৎসের এই কাহিনীর সঙ্গে সুধীরচন্দ্র সরকার-এর 'পৌরাণিক অভিধান'-এর বিবৃতির মিল রয়েছে। তিনি সেখানে বলেছেন — ''একদিন শ্রীবৎস আহারের পর পাদ প্রক্ষালন করতে ভুলে গেলে, সেই রন্ধ্রের সাহায্যে শনি তাঁর দেহে প্রবেশ করেন। শনির প্রভাবে শ্রীবৎস দিন দিন দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে ক্রমে রাজ্য ভ্রষ্ট হন। অবশেষে এক কাঁথার মধ্যে রত্নরাজি বেঁধে সস্ত্রীক রাজ্য ত্যাগ করতে বাধ্য হন। পথে শনি এক মায়া-নদী সৃষ্টি করে স্বয়ং একটি জীর্ণ নৌকা নিয়ে উপস্থিত হন। নৌকাটি অতি জীর্ণ হওয়ায় এবং একটির অধিক জিনিস তাতে বহন করা সম্ভব নয় বলে শ্রীবৎস প্রথমে কাঁথায় জড়ানো রত্নরাজি নৌকায় তুলে মাঝিকে সেটি অন্য পারে রেখে আসতে বলেন। শনি সেই কাঁথা সমেত নৌকা করে কিছু দূর অগ্রসর হয়ে নৌকা সমেত অদৃশ্য হয়ে যান।''[২০১] সেই দুঃখে শ্রীবৎস শারী শুয়া পাখিদুটিকে ছেড়ে দেয়।

অর্থাৎ শারী-শুয়া পাখিদুটিকে রাজা শ্রীবৎসের ঘর থেকে বনে আনার জন্য শনি সম্পর্কিত লোক বিশ্বাসকে কাজে লাগানো হয়েছে। বন থেকে তাদেরকে উজানী নগরের রাজদরবারে পৌঁছে দেবার জন্য উতু-পাতু নামে দুই ব্যাধকে নিয়ে কাহিনীর অবতারণা ঘটানো হয়েছে। তাদের কথা বলা হয়েছে এভাবে —

> ''পক্ষকে ধরিবে ব্যাধ কথা শুন তার।।
> উতুপাতু নামে ব্যাধ দুই ব্যাধ ছিল।

পক্ষ মারিতে দুহে সাজিতে লাগিল।।"[২০২]

কাহিনী স্তিমিত প্রায় অবস্থায় উতু-পাতু ব্যাধ দ্বারা ঘটনা অগ্রসর হয়েছে। তাদের শিকার-জীবনের ছবি কবি বাস্তব জীবন থেকে তুলে এনেছেন, বলে মনে হয়। তা নিতান্তই বিশ্বাসযোগ্য। কবি তার ছবি তুলে ধরেছেন সুন্দর ভাবে —

"পক্ষ মারা ফাস নিল পক্ষ মারা নল।
নলের উপরে ব্যাধ বান্ধি দিল কল।।
পক্ষ মারা যত কল সঙ্গে করি নিল।
পক্ষ মারিতে ব্যাধ অরন্যেতে গেল।।
দুই ভাই উড়া ফাস অরন্যে পাতিল।
ফাসতে চাউল খই ছিটাইঞা দিল।।
পক্ষ সব ফাসতে আহার খাইতে আইল।
ফাসে বন্দী করি ব্যাধ পক্ষ সব ধল্য।।"[২০৩]

শারী পাখি ব্যাধের শিকার কৌশল দেখে আত্মসমর্পণ করে। শুয়া পাখি তখন ব্যাধকে রাজ-স্থানে নিয়ে যেতে বলেছে। তারপর কবি ব্যাধদ্বয়ের বিভিন্ন পাখি বিক্রয়ের মাধ্যমে বিচিত্র পাখির নাম উল্লেখিত হয়েছে। সেই পাখিগুলি নগরের অভিজাত মানুষদের কাছে সখের জিনিস আর ব্যাধের কাছে তা জীবিকা নিবারণের বস্তু মাত্র। কড়ির দ্বারা পাখি বিনিময় প্রথা সমকালের অর্থনৈতিক অবস্থা ও বিনিময় প্রথার ব্যঞ্জনা বহন করে। ব্যাধদের পাখি বিক্রয়ের সম্পর্কে আমরা নীহাররঞ্জন রায়-এর মন্তব্য তুলে ধরতে পারি — "নিম্নতম মান কড়ি সব সময়ই ছিল, এবং ছোটখাটো কেনাবেচায় ব্যবহারও হইত ...।"[২০৪] পাখি বিক্রয়ের কড়ির হিসাবের সুন্দর পরিচয় কবি মানিক দত্ত দিয়েছেন। পণ দড়ে (৪ বুড়ি = ১ পণ) ঘুঘু ১$^{১}/_{২}$ বুড়িতে, দশ গণ্ডায় (৫ গণ্ডায় = ১ বুড়ি) বক, তোতা ময়না ৪ পণে এবং ১২ গণ্ডায় সারোশ ও বালী হাস বিক্রি করে মোট কড়ি হয় সাত কাহন বা 'কর্ষ'।[২০৫] অর্থাৎ , পাখি বিক্রয় মূল্য ১১২ পণ।[২০৬] এই সকল বিনিময় প্রথার রীতি ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান।

সে যাই হোক, এরপর পৌরাণিক সংস্কার ও লোকসাহিত্যের উপাদান কাহিনী গ্রন্থনায় ফলপ্রসূ হয়েছে। ব্যাধ অন্যান্য সকল পাখি বিক্রয়ের পর শারী-শুয়া পাখি নিয়ে রাজা বিক্রমকেশরের সম্মুখে উপস্থিত হলে তাদের বাক্‌পটুতা ও নানারকম প্রহেলিকা বা শ্লোক অবলম্বনে লোকসাহিত্যের অন্যতম উপাদান উঠে এসেছে। যেমন —

(১) "মরন হুতাশে তার জীবন প্রকাশে।
হস্ত পদ নাই তার সভা মধ্যে বৈসে।।

একমুখে উগারএ আর মুখে খায়।
বুঝ২ পণ্ডিত হিয়ালি সভায়।।"[২০৭]

(২) "হস্ত নাই পদ নাই পর হস্তে চলে।
তাহাকে দেখিয়া কামিনীগণ ভুলে।।
বুকে চিয়াড় বীরের পিষ্টে আছে কুজ।
বুঝ২ পণ্ডিত হিয়ালির বুজ।।"[২০৮]

(৩) "সাগরে জনম তার নগরে বিকায়।
জন্ম অবধি তাকে নাই ছএ মাএ।।
শুন২ পণ্ডিত কথা অদ্‌ভূত।
মাএ ছোইলে তার মরি জায় পুত।।
শোলক বলিল পক্ষ বুদ্ধি প্রবন্ধ।
শোলক শুনি সকলিকে লাগি গেল ধন্দ।।"[২০৯]

এরূপ মোট আটটি শ্লোকের উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর শারী-শুয়া নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচয় প্রদান করে। ব্রাহ্মণ হত্যা ব্রহ্ম হত্যার সমান — সেই কথা মধ্যযুগের সমাজে ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর প্রাধান্য প্রবল মাত্রায় প্রকট করে। শারী-শুয়ার হত্যা প্রসঙ্গে এই কথাটি অসঙ্গত নয়। মানিক দত্ত ভারতীয় সংস্কারের ঢঙে শারী-শুকের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য করে তুলেছেন। তারা ভারতীয় সংস্কারে দ্বিজরূপে পরিচিত। প্রসঙ্গত, আমরা নির্মলেন্দু ভৌমিকের একটি মন্তব্য তুলে ধরতে পারি — "অনেক পাখিই বিদ্যা বুদ্ধির প্রশংসা অর্জন করলেও শুক-পাখিই ভারতীয় জীবনে ও সংস্কারে এ বিশেষ প্রধান স্থান নিয়েছে। ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার এদেশে দৃঢ়মূল হয়ে উঠলে সেই সংস্কারের বশে শুক পাখিকে 'দ্বিজ' বা ব্রাহ্মণরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল, 'ব্রাহ্মণ' ভারতীয় সংস্কারানুযায়ী পণ্ডিত ও বিদ্বান।"[২১০] এই পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কারকে কবি কাহিনীর গতিমুখ পরিবর্তনে কাজে লাগিয়েছেন। এছাড়াও তারা রাজাকে তাদের প্রতি বিশ্বাস ভাজনের জন্য চার যুগের সাক্ষী সম্পর্কে সম্যক পরিচয় প্রদান করেছে। সেই সঙ্গে এসে যায় সমকালের গৌড়ের মুসলমান শাসকের বাস্তব কথা। শারী শুয়ার কথায় —

"পক্ষ বলে বলি আমি চারি যুগের বানী।
রাজা বলে বল পক্ষ সেই কথা শুনি।।
রাজার কথা শুনি শুয়া বলিতে লাগিল।
শুন রাজা প্রথমতে সত্য যুগ হৈল।।
সত্য যুগে রাজা হৈল শতেক বচ্ছর।

ছত্র রাজ্যতে হৈল ছত্র নৃপবর।।
ত্রিতীয়া যুগতে রাম অবতার হৈল।
রাবণে মারিয়া রাম সীতা উধ্বারিল।।
দ্বাপর যুগতে হৈল কৃষ্ণ অবতার।
গোকুলে জন্মিল কৃষ্ণ কংস বধিবার।।
কলিযুগে হইল মেলচ অবতার।
গৌড়রের রাজা হৈল জোবন অধিকার।।
আনন্দিত হৈল রাজা পক্ষের কথা শুনি।
গাইল মানিক দত্ত ভাবিয়া ভবানী।।"[২১১]

মানিক দত্ত লোকপ্রচলিত শ্লোক প্রহেলিকা এবং সমাজসত্যকে একত্রে কাহিনীর গতিমুখ পরিবর্তনের কাজে লাগিয়েছেন।

বলাবাহুল্য, ধনপতিকে শারী-শুয়ার জন্য স্বর্ণ পিঞ্জর তৈরী করাতে গৌড়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করা কাহিনী গ্রন্থনায় ভারসাম্যহীন নয়। রাজা বিক্রমকেশর ধনপতির অনুপস্থিতিতে তার সুন্দরী নারীকে ভোগ করবে — একথা ভেবে ধনপতি তাকে অভিযোগ করা মধ্যযুগের বাতাবরণে অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু সে যে পরম পবিত্র, সৎ ও ভোগী নয় এবং অন্যের নারীর প্রতি তার অবিচল শ্রদ্ধা-সম্মান রয়েছে। একথা বোঝাতে পবিত্র রাম নাম উচ্চারণের সংস্কার ও বিশ্বাস অনিবার্য ভাবে সংযুক্ত হয়েছে। রাজার মুখে একথা শোনার পর ধনপতি গৌড়ে যেতে রাজি হয়। রাজাদেশে নববিবাহিত স্ত্রী খুল্লনাকে লহনার কাছে রেখে ধনপতির গৌড় যাত্রা — নবসংসার থেকে সে বিচ্ছিন্ন হল। এটি কাহিনী গঠনের দিক থেকে নায়কের অনুপস্থিতি বলা যেতে পারে।

ধনপতির অনুপস্থিতিতে কাহিনীতে এসেছে নতুন বিপদ। সেই বিপদ খুল্লনার। লহনা তা সৃষ্টি করে। সেই জন্য কাহিনীতে নিলাবতী নামে এক চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে। লহনা দুর্বলা দাসী দ্বারা সেই নিলাবতী ব্রাহ্মণীকে ডেকে আনে। তার কারণ খুল্লনা রূপে ও যৌবনে অটুট। তাই খুল্লনার প্রতি স্বামীর মন সম্পূর্ণ আবদ্ধ। বিগত রূপ-যৌবন নারীর কাছে রূপ-যৌবন যুক্ত নারীর প্রতি ঈর্ষা প্রদর্শনে লহনা উপযুক্ত জীবন্ত নারী চরিত্র রূপের প্রকাশ পেয়েছে। যৌবন-কামনা এবং সন্তান-কামনা — পিতৃতন্ত্রের এই দুটি দাবী পূরণে সে অসমর্থ। তাই তাকে কবি নিতান্ত সমাজ বাস্তব অভিজ্ঞতায় অঙ্কন করেছেন। সে নিলাবতীকে বলেছে —

"লহনা বলিছে সই শুন দুঃখের বাণী।
খুলনা বহিন হঞা হইল সতিনী।।
জোবন রহিল মোর রূপ হৈল হীন।

দুঃখের উপরে দুঃখ দারুণ সতীন।।
রূপহীন দেখি মোকে ছাড়িবেন পতি।
খুলনাকে নঞা সামী ভুঞ্জিবে সুরতি।।"[২১২]

এখানে খুল্লনার রূপ-যৌবনের প্রসঙ্গই বড়ো। তা লহনাকে আতঙ্কিত করে। বিগত-যৌবনা লহনা তার কামনার পুরুষকে পাওয়ার জন্য নিলাবতীর কাছে বশীকরণের উপাদান চায়। নিলাবতী বশীকরণের যেসব উপাদান সংগ্রহের জন্য বলেছে তা লোক বিশ্বাস বা তুক্‌তাক্ সম্পর্কিত। নিলাবতী লহনাকে হাট থেকে একমূল্যের বাতি, শ্মশানের সরিষা, ভরা হাটের এক মুঠি ধূলা, প্রথম হাটের গুয়া পান, প্রথম অন্ন খাওয়ার ধান, খঞ্জনা পাখির হাড় ও তার অঙ্গের মল, সাত কূপের জল, তেপথির ধূলা সমেত অন্নে খাওয়ালে স্বামী তাকে প্রাণের অধিক ভালোবাসে। শুধু স্বামী বশ করা নয়, খুল্লনার রূপ-যৌবন হরণ করার জন্যও তুক্‌তাকের বিবৃতি রয়েছে। তাতে লৌকিক জীবনে বশীকরণের কৌশল বর্ণনায় কবি সিদ্ধহস্ত। তা কাহিনীকে সজীবতা দান করেছে। মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ গবেষক অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন — "লহনা খুল্লনাকে অপদস্থ করার জন্য এবং স্বামীর হৃদয় জয় করার জন্য নানারকম তুক্‌তাকের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এই পরিবেশের মধ্যে কবি যেন অবাক বিস্ময়ে তাঁর সমকালীন মানুষকে দেখেছেন; আর তাঁর সমাজকে, সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক আচরণকে কলমের আঁচড়ে সজীব করে তুলেছেন।"[২১৩] মুকুন্দ চক্রবর্তীর সম্বন্ধে এই অভিমত মানিক দত্তের ক্ষেত্রেও সমান ভাবে প্রযোজ্য।

তারপরই মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এসেছে চিঠির উপাদান। সাধারণত হৃদয়ের কথা স্পষ্ট করে জানাতে, অনুপস্থিত চরিত্রের মনোভাব জানানোর জন্য, সংকটে পড়ে বন্ধু বা আত্মীয় স্বজনের কাছে পরামর্শের জন্য চিঠিপত্রের ব্যবহার ঘটে। কিন্তু এখানে এই চিঠি এক ষড়যন্ত্রের উপায়। নিলাবতী ও লহনা ধনপতির নাম করে মায়াপত্র দ্বারা খুল্লনাকে দিয়ে ছাগল চরাতে, খুদের চালের ভাত খেতে, রাতে ঢেঁকিশালায় শুতে ও পোড়া ভাত খেতে আদেশ দেয়। এই সকল মিথ্যা ষড়যন্ত্র হলেও মধ্যযুগে নারীদের চিঠি লেখার রীতি ও 'স্বস্তি' বা মঙ্গলকামনা করে চিঠির সূত্রপাত করার রীতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন —

"স্বস্তি য়াগে লেখিয়া লেখিল ধনপতি।
সকল মঙ্গলা লয় লহনা যুবতি।।"[২১৪]

চিঠির উপাদানের মধ্যেই চণ্ডীর পূর্ব ইচ্ছা নিহিত রয়েছে। দেবীর পূর্ব পরিকল্পিত ইচ্ছার সঙ্গে লহনা-নিলাবতীর কপটতা যুক্ত চিঠি অত্যন্ত কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত বলে মনে হয়। তবে এই কপটতা খুল্লনার কাছে ধরা পড়ে যায়। ব্যর্থ পরিকল্পনায় লহনা খুল্লনাকে মারধর করে। তা দেখতে বণিকের স্ত্রীরা এলে লহনা তাদের পুত্রের মাথা খাওয়ার অভিশাপ করে। তাই তারা চলে

যায়। তাতে গ্রাম্য একটি ছবি ভেসে ওঠে। এখানে সাধারণ জনজীবনের সতীন সমস্যার প্রত্যক্ষ ছবি লহনা কর্তৃক খুল্লনাকে দৈহিক অত্যাচারে পরিস্ফুট করা হয়েছে। এছাড়া সতীন সমস্যায় লহনা খুল্লনার সমস্ত গহনা কেড়ে নেওয়ার মধ্যে নারীর প্রতি নারীর নির্মমতার দিকটি পরিস্ফুট হয়েছে।

খুল্লনার এই ভাগ্য বিপর্যয়ে স্বাভাবিক ভাবে তার পিতা-মাতার কথা মনে পড়া কাহিনী গ্রন্থনায় কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত। সমকালের পিতা-মাতাদের কন্যার দুর্ভাগ্যে পাশে দাঁড়ানোর মত আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেও সামাজিক বন্ধন-প্রথায় তারা পেরে উঠত না। খুল্লনার কথায় তার চরম সত্যটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। লহনার অত্যাচারে খুল্লনা দুর্বলা দাসীকে প্রেরক হিসাবে পাঠালেও রম্ভাবতীর কন্যার দুঃখে দুখী হওয়া ছাড়া প্রথাভঙ্গের শক্তি তার মত নারীর ছিল না। তাই পুত্র হরিবাণ্যার দ্বারা কন্যার জন্য অলংকার বনে প্রেরণ করা হয়। কিন্ত তাদের সাহস হল না খুল্লনাকে বাপের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে বা প্রকৃত ঘটনার অনুসন্ধান করতে। বিবাহের পর নারীর একুল ওকুল দুকুল বিচ্ছিন্ন পুতুলে পরিণত হতে হয়। কবি তার দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে পাঠক ও শ্রোতাদের সহানুভূতিকে সঙ্গী করে তুলেছেন।

খুল্লনার প্রতি লহনার অত্যাচার স্বর্গ থেকে চণ্ডী লক্ষ্য করে তার সঙ্গে সে ছাগল লুকানোর ছলনা করে। খুল্লনাকে তার ব্রতদাসীতে পরিণত করার ক্ষেত্রে এই ছলনা অনিবার্য ছিল। সেই জন্য দেবী হনুমানকে দিয়ে সেজানু পর্বতে খুল্লনার সকল ছাগল লুকিয়ে রাখে। তন্দ্রাবস্থায় দেবী চণ্ডী ভ্রমরার বেশে তার কানের সামনে রাম গুণগান গায়। সে তা শুনে জেগে ওঠে। রাম গুণগানের সঙ্গে সেকালের মানুষের জীবন সম্পর্কে দ্যোতনা এখানে পাওয়া যায়। রামকথা সেকালের মানুষের সুখ-দুঃখের, হাসি-কান্নার সঙ্গে জড়িত ছিল। নিদ্রা ভঙ্গের পর স্বাভাবিক ভাবে খুল্লনার মনে হয় তার ছাগল মঙ্গলবারে হারায়। কারণ তার ছাগল কালী পূজার বলির জন্য কেউ নিয়ে গেছে, তা ভাবা সমকালীন পরিবেশে অসম্ভব নয়। খুল্লনার এই ভাবনার মধ্যে তন্ত্রের শক্তিদেবীর পূজার ইঙ্গিত রয়েছে। তন্ত্রের পাশাপাশি দেবীর ব্রতাচারের সূত্রও পাওয়া যায়। খুল্লনা যে দিকে যায় সেই দিকেই হিংস্র পশুরা তাকে দেবীর ব্রতদাসী বলে সমাদর করেছে। এমনকি দক্ষিণ দিকে ছাগল তল্লাসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় পঞ্চ বিদ্যাধরীর। এই পাঁচজন নারী বটগাছের নিচে ধূপ দীপ নানা নৈবেদ্য সহকারে দেবীর পূজা করছে এবং সেইসঙ্গে ব্রতের গান পরিবেশিত হয়েছে। এই ব্রতাচার প্রাচীন কালের। কবি তার চিত্র সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন —

''দক্ষিণে খুলনা গেল ছেলি তল্বাসিতে।
তথা দেখা হৈল পঞ্চবিদ্যাধরি সাতে।।
বটবিক্ষ তলে আল্য খুলনা সুন্দরী।

দুর্গাপূজা করে তথা পঞ্চ বিদ্যাধরী।।
ধূপ দীপ নানা দ্রব্য নবিদ্য সাজাঞা।
করিছে দুর্গার পূজা আনন্দিত হঞা।।
পূজা করি পঞ্চবিদ্যাধরী গায় গীত।
দেখি খুলনা নারীর মজি গেল চিত।।"[২১৫]

নারীদের বটবৃক্ষের নিচে এই পূজা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত বলে মনে হয়। কেননা দেবীর ব্রতদাসী বলে খুল্লনাকে কেউ অমঙ্গল করল না। আবার দেবীর ব্রত করার জন্য খুল্লনা সরোবরে স্নান করতে গেলে সেখানে জল শূন্য হয়ে যায়; কিন্তু দেবীর 'অঙ্গুরী' তথা আশীর্বাদ নিয়ে গেলে সরোবরে পূর্বের ন্যায় জল পূর্ণ হয়ে যায়। দেবীর ব্রতপালনে এইরূপ অলৌকিক মায়া প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি ব্রত পালনের ফলেই চণ্ডী তার ছাগল ফিরিয়ে দেবার জন্য মর্ত্যে ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করে আগমন করে। তার পূজায় তুষ্ট হয়ে দেবী ব্রাহ্মণী রূপ থেকে দশভূজা রূপ ধারণ করে। এখানে খুল্লনার ছাগল হারানো ও উদ্ধারে দেবীর এই মিশ্ররূপের প্রকাশ। প্রথমে সে অনার্যের তন্ত্র দেবী কালী; আবার সে হারানো প্রাণীর উদ্ধারকারিণী ও ব্রতচারিণী দেবী। এই নিম্নশ্রেণীর দেবীই আবার ব্রাহ্মণী বেশ ধারণ করে। এখানে নিম্নশ্রেণীর দেবী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে মিলনের আভাস মিলে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন — "পার্বতী উমার সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়াই ব্রাহ্মণ্যধর্মে তাঁহার দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ বলিয়া মনে হয়।"[২১৬] এই পার্বতীর সঙ্গে দেবীর মাতৃরূপ ও ভয়ঙ্কর রূপ মিলিত হল। শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন — "উমাকে প্রথমে পাইলাম কন্যারূপে — বহুশোভমানা হৈমবতী-রূপে; তাহার পরে পাইলাম শিবপ্রিয়া-রূপে — তাহার পরে পাই গণেশ-জননী ও কুমার-জননী-রূপে। তাহার পরে যখন লক্ষ্মী-সরস্বতীও তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য বর্জন করিয়া মায়ের কন্যাত্ব স্বীকার করিলেন তখন মায়ের সোনার সংসারকে পূর্ণরূপে দেখিতে পাইলাম। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এই পার্বতী উমার প্রেমময়ী পত্নীত্ব এবং অনন্ত-স্নেহময়ী মাতৃত্বের রূপই প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিয়াছে; শিবের সহিত প্রণয়-কলহ বা গৃহ-কলহ ব্যতীত মায়ের ভ্রুকুটিকুটিল মুখ কখনও বড় একটা দেখা যায় নাই — অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ ত দূরের কথা। কিন্তু মহাদেবী যখনই ভয়ঙ্করী — রণোন্মাদিনী অসুরনাশিনী — তখনই তিনি দুর্গা, চণ্ডী, কালী। মায়ের এই অসুরনাশিনী মূর্তির সহিত সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্ত হইল মায়ের চণ্ডী-রূপ। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, দেবীর এই অসুরনাশিনী চণ্ডী বা চণ্ডিকার ধারা মায়ের পার্বতী উমার ধারা হইতে একটি পৃথক্ ধারা। পরবর্তী কালে দুই ধারা নির্বিশেষে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে।"[২১৭] দেবী চণ্ডীর মিলিত সংস্কৃতি রূপই মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে পাওয়া যায়। দেবী চণ্ডীর দশভূজা-রূপ দেখানোর পর খুল্লনাকে পুনরায় সকল ছাগল ফিরিয়ে দেয়। খুল্লনার কষ্টের জন্য দেবী লহনাকে প্রাণ ভয় দেখায়। সেই ভয়ে লহনা

বন থেকে খুল্লনাকে গৃহে ফিরিয়ে আনে। লহনা খুল্লনাকে তোষামোদ করে বাঙালীর বিভিন্ন প্রিয় খাদ্যবস্তু রন্ধন করে দেয়।

পুনরায় খুল্লনা সংসারে প্রবেশ করলে কাহিনীতে প্রধান চরিত্র ধনপতির প্রয়োজন হয়। সে কারণে প্রথমে খুল্লনাকে দেবী চণ্ডী কর্তৃক ধনপতির রূপ ধারণ করে তার যৌবনাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা এবং খুল্লনার মনে স্বামীর অনুপস্থিতি অনুভব করানো হয়। খুল্লনার মনে ধনপতির প্রতি প্রেম ভাবনা জাগ্রত করার জন্য কাহিনীতে দেবী কোকিলরূপে বসন্তের মিলনোচ্ছ্বাস জাগ্রত করে। কবি তার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে —

"কোকিলের রূপ ধরি দুর্গা গান করে।
প্রিয়২ বলি গান করে উচ্চস্বরে।।
কোকিলের গান শুনি সুন্দর খুলনা।
স্বামী২ বলি কান্দে করিঞা খুলনা।।"[২১৮]

খুল্লনার বার্তা গৌড়ে ধনপতির কাছে পৌঁছে দেবার জন্য দেবীর কোকিল রূপ থেকে শ্বেত কাকে পরিণত হওয়া পরিস্থিতি সাপেক্ষ। কারণ শ্বেত কাক শুভ বার্তার পরিচায়ক। দেবী চণ্ডী খুল্লনার বধূরূপধারণ করে ধনপতিকে স্বপ্ন দেখায়। এই অলৌকিক স্বপ্ন ধনপতিকে উজানীতে আসতে বিচলিত করলেও তার মধ্যে নারীর একটি স্বতন্ত্র সামাজিক রূপ লক্ষ্য করা যায়। খুল্লনারূপী দেবী চণ্ডী ধনপতিকে হুমকী দিচ্ছে যে সে যদি দু'একদিনের মধ্যে না আসে তাহলে তার বিরুদ্ধে স্ত্রী হত্যার অপবাদ দেওয়া হবে। বিবাহের পর নারী নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের বিপক্ষে ও স্বামীর বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ বাংলা সাহিত্যে একান্ত বিরল সংযোজন বলে মনে হয়।

অতঃপর কাহিনী গ্রন্থনার পারম্পর্য অনুসারে ঘটনার সঠিক সমাবেশ রক্ষায় কবি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবে কাহিনী ধারায় ধনপতি গৌড়ের রাজা ধনেশ্বরকে 'পঞ্জর' তৈরীর জন্য অনুরোধ জানায়। পঞ্জর তৈরীর আয়োজন ও তার কাঠামো দেখে তা পাখির জন্য বলে ভ্রম হয়। মনে হয় পাখির নামে মানুষের জন্য তৈরী কোন পরিকল্পিত গৃহ। তৈরীর বর্ণনা দেখলেই তা বোঝা যায় —

"পক্ষ শুইবার ঘর ধোপ রাখে থরেথর
পক্ষের গড়িল সেতখানা।।"[২১৯]

ধনপতির যাত্রায় গৌড়েশ্বর তাকে ফিরে যেতে দিতে চাচ্ছে না। ধনপতির এতদিন গৌড়ে সংসার ছেড়ে থাকার কারণ বর্ণিত হয়েছে। ধনপতি রাজাকে বলে — "নাটগীতে আনন্দে রহিলাম গৌউড়তে।।"[২২০] তার চরিত্রানুযায়ী এরূপ কারণ নির্দেশ সঙ্গত ও স্বাভাবিক হয়েছে। তাই এখন ধনপতি তার সুন্দরী স্ত্রীর রূপে অনুরক্ত হয়ে ফিরে যেতে চাইছে। তখন অত্যন্ত কৌশলে কবি

রাজা ধনেশ্বরের মুখ দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক আর্য সমাজে চিরকালীন নারীর অবহেলিত ভোগ্য বস্তুর চিত্রটি স্পষ্ট করে তুলেছেন। কিন্তু কাহিনী ধারার অনিবার্য স্রোতে ধনপতিকে ফিরে আসতে হল উজানী নগরে। পিঞ্জরের স্পর্শে শারী-শুয়ার মুক্তি ঘটে। মর্ত্য থেকে তাদের এই মুক্তি বারো বছর সময় সীমা অতিক্রমকে চিহ্নিত করে না। এমনকি ধনপতিও গৌড়ে গিয়ে নববিবাহিত স্ত্রী খুল্লনাকে রেখে বারো বছর থাকা অস্বাভাবিক বটে। এ ধরনের অস্বাভাবিক কাহিনী মধ্যযুগের ধর্মীয় ও অলৌকিক পটভূমিকায় সহজেই বর্ণিত হতে দেখা যায়। যদিও শারী-শুয়ার মুক্তিতে রাজা বিক্রমকেশর তাকে বন্দী করতে চাইলে তাদের অনুরোধেই ধনপতি রক্ষা পায়। ধনপতির গৃহে যাত্রা ও পথে দুর্বলার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং খুল্লনাকে তার খবর দেওয়াই বর্তমান অবস্থার পরিপেক্ষিতে বিচক্ষণতার পরিচায়ক। স্বামীর আগমনে খুল্লনার রূপসজ্জা সঙ্গত। কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন — ‘‘কাব্যের নায়ককে দর্শন করিবার জন্য পুরনারীগণের ব্যাকুল উদ্‌গ্রীবতা এবং সে জন্য বেশভূষার বিপর্যয় — কাব্যের এই অঙ্গ সংস্কৃত হইতে সংক্রামিত। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বা বৎসরের পর বৎসর কোনো ব্যাপারের অনুসরণ — একটি প্রথা।’’[২২১] মানিক দত্ত এখানে সেই প্রাচীন প্রথাকে অনুসরণ করেছেন। তবে তাদের মিলন বার্তাকে প্রাকৃতিক জগতের মিলন বার্তার সঙ্গে একাত্ম করে কবি রোমান্টিক কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন। কবি লিখেছেন —

> ‘‘সোবন্ন তসর রামা করিল পত্থন।
> তাহাতে আছেন লেখা হংসাহংসীগণ।।
> মউর পেখম ধরে মউরী পিএ ঘাম।
> চোকহা চোকহি তারা বলে রাম২।।’’[২২২]

এই রোমান্টিক আবহাওয়ার মধ্যেও তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণে অভিশপ্ত চখা-চখি পাখির রামনামের আধ্যাত্মিক বাতাবরণ মিশ্রিত করে দিয়েছেন। আবার, দীর্ঘদিন বাদে রূপশ্রী খুল্লনাকে দেখে ধনপতির খাওয়ার ইচ্ছা জ্ঞাপন করা রসভঙ্গের পরিচায়ক। উদাসীন বহির্মুখী জীবন ভাবনার পর কবি ধনপতি চরিত্রটিকে একটু গৃহমুখী বাঙালী রূপে অঙ্কন করতে চেয়েছেন। তাই তাকে খাদ্য রসিক বাঙালী হিসাবে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। এমনকি ধনপতি বাঙালী ভোজন রসিকের মত খাওয়ার পর নাক ডেকে ঘুমিয়ে পড়ে। এরূপ দুঃখের ঘটনার পর কবি সুযোগ বুঝে হাসির বাতাবরণ কাব্যে সৃষ্টি করেছেন।

সেই সময় ধনপতি খুল্লনাকে আলিঙ্গন দেওয়ার ইচ্ছাকে সামনে রেখে কবি অত্যন্ত কৌশলে ‘খুল্লনার বারমাস্যা’ তুলে ধরেছেন। এভাবে কাহিনীতে এসেছে ‘খুল্লনার বারমাস্যা’। তবে তার বারমাস্যা ফুল্লরার মত সতীন কল্পিত নয়, স্বামীর কাছে ব্যক্ত; তা প্রত্যক্ষ সতীন জ্বালার তপ্ত উত্তাপের স্নিগ্ধ অভিযোগ। খুল্লনা কার্তিক মাস থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত তার ছাগল চরানোর

দুঃখ-কষ্টের কথা বলেছে ধনপতিকে। প্রশ্ন হচ্ছে, কবি খুল্লনার বারমাস্যাকে কেন কার্তিক মাস থেকে বলতে শুরু করলেন? তার কারণ কাহিনী গ্রন্থনার ক্ষেত্রে সম্পর্কযুক্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। এক হতে পারে, কবি কার্তিক তথা হেমন্ত ঋতুতে প্রাকৃতিক জগতের শূন্যতার সঙ্গে খুল্লনার হৃদয়ের শূন্যতাকে এক করে প্রকাশ করার জন্য; নতুবা তিনি ধনপতির গৌড় থেকে আশ্বিন মাসে ফিরে আসাকে লক্ষ্য করে এরূপ সঙ্গতিপূর্ণ বারমাস্যা বর্ণনা করে থাকবেন।

"আশ্বিনতে গৌড় হৈতে ঘরে আল্যা তুমি।
তোমাকে সকল দুঃখ বলিলাঙ আমি।।"[২২৩]

আশ্বিনের পর বারমাসের ক্রমান্বয় অনুযায়ী খুল্লনা কার্তিক মাসের দুঃখ কষ্ট দিয়ে তার বারমাস্যা বলে থাকবে। বারমাস্যার পর উভয়ের মিলন ঘটে। এইভাবে ধনপতি খণ্ডে এই পর্যন্ত ধনপতি, লহনা ও খুল্লনা ইত্যাদি প্রধান চরিত্র এবং তাদের কেন্দ্র করে ঘটনা আবর্তিত হয়েছে।

অতঃপর কাহিনী ধারায় পূর্ব চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অথচ ভিন্ন জীবনবৃত্তের সূচনা হয়। সেই পরিকল্পনায় কাহিনীর গতি পরিবর্তনে আসে চণ্ডী কর্তৃক মালাধর ছলনার ঘটনাটি। মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত এই ছলনার রীতিটি। মালাধর দুই নারীকে নিয়ে প্রাণত্যাগ করে এবং খুল্লনার উদরে মালাধর, সিংহলরাজ শালবানের গৃহে নিলারাণীর উদরে সুশীলা ও উজানীর রাজা বিক্রমকেশরের গৃহে জয়াবতীর জন্মাবার পরিকল্পনা হয়। চণ্ডীর এই ছলনাকে কেন্দ্র করে ধনপতি খণ্ডে আরও কয়েকটি চরিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই চরিত্রের বর্ণনার পর দ্রুত কবি কাহিনীক্রম পরিণতির দিকে অভিমুখ ফেরান। স্বভাবতই, ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধের ঘটনাটি কার্যকারণ সূত্র লঙ্ঘন করে কাহিনীতে এসেছে। ধনপতি কুল পুরোহিতকে জানিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ করেছে। তার নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সকলে তার মত বণিকশ্রেণীর; নিম্নশ্রেণীর মানুষ উচ্চশ্রেণীর গৃহে আমন্ত্রণ পাওয়ার উপযুক্ত ছিল না। এই সামাজিক বৈষম্য ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধের ঘটনায় লক্ষ্য করা যায়। সেখানে কবি যেসকল স্থান-নাম ব্যবহার করেছেন তা বাস্তব সম্মত। নিমন্ত্রিত বণিকদের নাম ও তাদের বাসস্থান পরিচয় সেই পরিচয় বহন করে। যেমন — নীলাম্বর, রাম রায়, সনাতন বণিকের বাসস্থান উল্লেখ না থাকলেও সপ্তগ্রাম থেকে বিষ্ণু দত্ত, শঙ্খ দত্ত, অন্যান্য সদাগর এবং চাপালির রাজ্য থেকে আসে চাঁদ সদাগর, ইছানি নগর থেকে লক্ষপতি প্রভৃতি স্থান থেকে অনেক বণিক আমন্ত্রিত হয়েছিল। তাদেরকে অতিথি বরণের মধ্যে বণিক শ্রেণীর ভাঙনের চিত্র ফুটে উঠে। ধনপতি যদিও প্রথাগতভাবে প্রথমে সমাজপতি হিসাবে চাঁদ সদাগরকে চন্দন ও মাল্য প্রদান করে। কিন্তু সে সময় শঙ্খ দত্ত তা নিয়ে কলহের সূচনা করে। বণিকদের মধ্যে কলহে সেকালের বণিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থার ভাঙ্গনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগরের সঙ্গে নীলাম্বর দাসের ঝগড়ায় চাঁদ সদাগর নীলাম্বর দাসকে বলেছে —

“তোর বাপ লবন বেচে চক্ষ করে টেড়া।
ফাএর কারণে লোকসনে করিত ঝগড়া।।
আপন বড়াই প্রথা কর উচ্চারন।
বিনা স্নানে তোর পিতা করিত ভোজন।।”[২২৪]

সামাজিক মান্যতা লঙ্ঘনে বণিকমহলের এই ঝগড়া কাহিনী গ্রন্থনায় তাদের সামাজিক অবনতির দিকটি ফুটে উঠেছে। সামাজিক গঞ্জনা এত ব্যাপকমাত্রায় ছিল যে, তার চেয়ে বিষ ভক্ষণ করে মৃত্যুবরণ করাও শ্রেয় ছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় উচ্চবংশজাত কুলবধূ খুল্লনার গৃহসংসার ও সমাজ থেকে বাইরে বনে ছাগল চরানো অপরাধের জন্য। ধনপতি চাঁদ সদাগরকে সর্বশ্রেষ্ঠ বণিক বলে প্রতিপন্ন করলে অন্যান্য বণিকরা সুযোগ বুঝে খুল্লনার ছাগল চরানোর ঘটনাটিকে নিয়ে তাকে সামাজিক ভাবে হেনস্থা করতে চেষ্টা করে। কিন্তু স্বামীর কুলরক্ষায় জীবনপণ প্রচেষ্টা ও তার প্রতি স্বামীর সন্দেহ লক্ষ্য করে খুল্লনা সমাজের সামনে তার সতীত্বের পরীক্ষা দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। ধনপতি সাময়িক কলঙ্কের অপবাদ এড়ানো ও স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য জ্ঞাতিদের দেওয়া কলঙ্কমোচনের চিরফাঁদে পা ফেলতে চায়। কিন্তু খুল্লনা সমাজ সচেতন ও বিচক্ষণ বঙ্গনারী। সে জ্ঞাতিদের পরিকল্পনা ও স্বামীর অস্পষ্ট সন্দেহের প্রতিবাদ করেছে। খুল্লনার এই প্রতিবাদ ও সামাজিক বিচক্ষণতাকে তার বিভিন্ন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বলা যেতে পারে। তার এই সতীত্বের পরীক্ষা পুরাণের প্রভাব জাত। রামায়ণে সীতাকে এরূপ সামাজিক কলঙ্ক মোচনের জন্য অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল। বাল্মীকির রামায়ণে সীতা আর্য রমণীর মত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে স্বীয় কলঙ্কের অপবাদ মোচন করেছে। সেখানে বাঙালী বধূর মত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়ার প্রাক্‌কালে দেহশুচির বিষয়টি অনুপস্থিত। কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণে তা রয়েছে— “শুচি হইয়া সীতা অগ্নি সাক্ষী করে।”[২২৫] মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের খুল্লনাও সীতার মত গঙ্গাজলে স্নান করে শুচি হয়ে নেয় এবং নতুন বস্ত্র পরিধান করে চণ্ডী পূজা করে নেয়। সেই প্রসঙ্গে খুল্লনার মুখে শুনতে পাই রামায়ণের রাম কর্তৃক চণ্ডী পূজার অনুরূপ ঘটনা। চণ্ডীর কৃপায় খুল্লনা একে একে সাজি, সাবল, সর্প, তুলা, ধান্য ও খুর প্রভৃতি ছয়টি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তাতেও বণিকদের বিশ্বাস হয় না। সপ্তম পরীক্ষার সময় বিষ্ণু দত্ত খুল্লনাকে অগ্নিপরীক্ষা দেওয়ার কথা বলে। সে উদাহরণ স্বরূপ সমাজের সকলের সামনে দৃষ্টান্ত স্বরূপ রামায়ণের সীতার অগ্নি পরীক্ষার কথা তুলে ধরে। রামকথা লোকসমাজের কাছে একই সঙ্গে আনন্দ ও শিক্ষার উৎস তেমনি হাসি-কান্নার, সুখ-দুঃখের সঙ্গেও এর যোগ রয়েছে। রামকথা লোকসমাজকে চলার প্রেরণা এবং কর্তব্য-অকর্তব্যের নির্দেশ দেয়। বিষ্ণু দত্তের কথায় তার প্রতিভাস রয়েছে —

“বিষ্ণু দত্ত বলে জ্ঞাতি করি নিবেদন।

একচিত্ত হঞা শুন পুন্য রামায়ন।।
দশমাস সীতা ওশক বনে ছিল।
রাবণে মারিঞা রাম সীতা উদ্ধারিল।।
রাম বলে সীতা তুমি শুনহ বচন।
অবশ্য তোমার জাতি নঞাছে রাবণ।।
রাম করি জদি সীতা তোর আছে মতি।
আনল পরীক্ষা দেহ তবে জানি সতী।।
এতেক বচন প্রভু বলে ক্রোধ করি।
জোঘর পরীক্ষা দিল সীতা সুন্দরী।।
ত্রৈলোক্যের নাথ হঞা জেবা কর্ম করে।
সেইসব কথা ভাই কে লঙ্ঘিতে পারে।।"[২২৬]

খুল্লনাকে শেষ পর্যন্ত সতীত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে চিরাচরিত আদর্শ মানতে হয়। কবি সেই ঐতিহ্যবাহী আদর্শকে খুল্লনার সতীত্ব প্রমাণের মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করেছেন। ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন — "খুল্লনার সতীত্বের বিবিধ পরীক্ষার যে বর্ণনা তা পৌরাণিক আদর্শানুগ এবং কাহিনীর মূল ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন। এর মধ্যে বণিক প্রধানদের সভামর্যাদা নিয়ে বিতর্কের অংশই কেবল কৌতুকরস সিঞ্চনে স্বাদু।"[২২৭] খুল্লনা জৌঘর পরীক্ষার পূর্বে ক্রন্দনে ধনপতির 'হরিনাম' করার মধ্যে কাব্যে বৈষ্ণবীয় প্রভাব রয়েছে বলে মনে হয়। কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন — "যে যুগে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়া হরিনাম প্রচার করিয়া মানব মাত্রেরই মুক্তির পথ দেখাইয়াছেন, সে যুগ সকল যুগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"[২২৮] স্ত্রীর মরণপণ বিপদে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করা অস্বাভাবিক নয়। এরূপ বিপদ শঙ্কুল পরিস্থিতিতে ভক্তকে রক্ষার জন্য শিব ও চণ্ডীর মধ্যে শুরু হয় লড়াই। সেই লড়াই বহুকালের। ভক্তকে নিয়ে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব কাহিনীকে সজীবতা দান করেছে। শিব অতীতের চণ্ডী কর্তৃক তার শিষ্যের প্রতি শত্রুতার প্রসঙ্গ তুলে ধরে। সেই শত্রুতেও রয়েছে রামায়ণের প্রসঙ্গ। খুল্লনাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে চণ্ডী শিবস্থানে গেলে সেখান থেকে সে বিমুখ হয়ে ফেরে একমাত্র অতীতের উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সূত্রের কারণে। শেষ পর্যন্ত শিব ও চণ্ডী মিলে ব্রহ্মার কাছে খুল্লনা রক্ষার অনুরোধ জানায়। ব্রহ্মার অলৌকিক মন্ত্রে জৌঘরের অগ্নি শীতল হয়ে যায়। খুল্লনার জৌঘর পরীক্ষার সময় মাঝখানে কবি রাজ্যের রাজাকে কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ ঘটাচ্ছেন। তার কোন নাম নেই; তাই মনে হয় সে কবির বাস্তব অভিজ্ঞতায় কল্পিত কোন রাজা চরিত্র হয়ে থাকবে। তার মধ্য দিয়ে কবি হয়তো সমকালের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর গঞ্জনাকে লাঘব এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে শাসকের দ্বারা তর্জন নির্দেশ করেছেন। কবি

হয়ত এরূপ একজন রাজার কল্পনা করেছেন যে কিনা সমস্ত নারী পুরুষের ভেদাভেদ, অত্যাচারকে মোচন করে সমাজে শান্তির বাতাবরণ বয়ে আনবে। তারই আভাস এই কাল্পনিক চরিত্রটির মধ্যে। রাজার কড়া শাসনে জৌঘর পরীক্ষার পর সকল জ্ঞাতিগণ খুল্লনার সতীত্বের কাছে নতজানু হয়ে অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়েছে। অন্যদিকে, খুল্লনার কেশ বেয়ে শ্বেত গঙ্গাজল পড়াও পবিত্রতার পরিচায়ক। তাই তার মত সতীর হাতে রান্না খেয়ে তাদের পুণ্যবাণ হওয়ার ইচ্ছা অস্বাভাবিক নয়।

"বিষ্ণু দত্ত বোলে মা চরণে দেহ স্থান।
তব হস্তের অন্ন খাব হব পুন্যবান।।"[২২৯]

খুল্লনার অলৌকিক মহিমা তথা দেবীর শক্তির প্রকাশ করাই কবির মূল উদ্দেশ্য। দেবী চণ্ডীর মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে খুল্লনাকে তিনি উপযুক্ত বাঙালী গৃহবধূ করে তুলতে পারেন নি। খুল্লনার কাছে সমস্ত জ্ঞাতিরা রান্না খেতে চাইলে তার রান্নায় অনভিজ্ঞতার পরিচয় ও দেবীর সহায়তা প্রার্থনা তার প্রমাণ। সে দেবী চণ্ডীকে বলে —

"কেমতে রন্ধন করি তাহা নাই জানি।
পার্ব্বতী বলেন বাছা না ভাবিহ তুমি।।"[২৩০]

তাই মনে হয়, চণ্ডীর অলৌকিক মহিমা দ্বারা খুল্লনাকে সতী প্রমাণ করাই কবির উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তার সতীত্ব কিংবা অলৌকিকতাকে ধনপতি বা লহনা স্বীকার করল কিনা তার পরিচয় কাব্যের কোথাও বর্ণিত হয় নি। প্রসঙ্গত, কবিশেখর কালিদাস রায়ের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে— "খুল্লনা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিলেন — তাহাতে খুল্লনাকে দেশের লোকের দেবী মনে করিয়া পূজা করিবার এবং ধনপতিরও চণ্ডীর মাহাত্ম্য ও খুল্লনার দৈবী শক্তি স্বীকার করা, খুল্লনারও লহনার দাসীত্ব স্বীকার করার কথা নয়। কিন্তু কাহিনীর প্রয়োজনে কবি সে দিকটা উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। কাব্যের গতানুগতিক প্রথা অনুসারে কতকগুলি অসম্ভব ব্যাপারের আরোপে সতীত্বের মহিমা ঘোষণা করিয়াই কবির দায়িত্ব শেষ হইয়াছে — তাহার ফলাফলের জের টানিবার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন নাই। ইহাই ছিল সে যুগের কাব্যের ধারা।"[২৩১] কবি মানিক দত্তের কাব্যেও সেই ধারাটি অনুসৃত হয়েছে।

খুল্লনার সতীত্ব পরীক্ষার পর ধনপতি উজানীর রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়। সেখান থেকে ধনপতি খণ্ডের দ্বিতীয় অংশের সূচনা। কাহিনী পুনরায় মোড় নেয়। কাহিনী পারিবারিক বৃত্ত ছাড়িয়ে সদাগরী জলযাত্রার আখ্যানে প্রবেশ করেছে। ধনপতিকে এবার চন্দন আনতে সিংহলে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। কাহিনীতে ধনপতির সিংহল যাত্রা দেবী চণ্ডীর পরিকল্পনার ফলশ্রুতি। ছোট একটি চুরির ঘটনা দ্বারা কবি কাহিনীর গতিবেগকে পরিবর্তন করলেন সুন্দর ভাবে। চণ্ডী রাজার ঘরে নেপাল নামক চোরকে দিয়ে চন্দন চুরি করতে বলে এবং রাজাকে বিষবাণ মারে।

রাজাকে বাঁচানোর জন্য সেই অবস্থায় চন্দন প্রয়োজন, তাই ধনপতির সিংহল যাত্রা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। সিংহল নগর আগর চন্দন, শঙ্খ ও চামড়া প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্যের বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। সিংহলে ধনপতির যাত্রাকে কেন্দ্র করে সমাজে নারীর অবস্থার বিষয়টি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। ধনপতির সঙ্গে খুল্লনাও সিংহলে যেতে চাইলে ধনপতির কথায় সমাজবস্থার স্বরূপটি চিহ্নিত হয়েছে। সমাজে নারীর অবস্থার সঙ্গে শাসকশ্রেণীর জৈবিক দুর্বলতা এবং সমাজে অপশাসনের পরিচয়ও সঙ্গত কারণে উঠে এসেছে। তাই খুল্লনাকে দারুণ সতীনের হাত থেকে এবার রক্ষার জন্য ধনপতি পাড়ার লোকজনকে ডেকে লহনাকে সামনে সাক্ষী করে নিয়েছে। ধনপতির যাত্রাকালে শিব স্মরণের বিষয়টি বণিক শ্রেণীর শৈবধর্মের প্রতি আস্থা প্রকাশ পায়। সে ভ্রমরা ঘাটে শিব পূজার জন্য যাত্রা করলে খুল্লনার স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় চণ্ডী পূজার বিষয়টি কাহিনীতে আসে। একই পরিবারে দুই বিপরীত দেবতার পূজা কাহিনী গ্রন্থনায় পরক্ষ ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করেছে। খুল্লনার চণ্ডী পূজার প্রারম্ভিক সূচির মধ্যে তান্ত্রিক ধর্মের সাধনার প্রকাশ রয়েছে। খুল্লনার স্নান করার সময় পূর্বদিক হয়ে সূর্য প্রণাম তার প্রমাণ দেয়।

''স্নান তর্পন করি আপনার সুখে।
সূজ্যের নামে য়র্ঘ্য ধরিল পূর্ব্বমুখে।।''[২৩২]

আত্মসুদ্ধির পর খুল্লনা দেবীকে স্মরণ করে। তার স্মরণে দেবীর মুখের তাম্বুল খসে পড়া, বাম অঙ্গ, দক্ষিণ চোখ কাঁপা, কালো পেঁচা ডাকা প্রভৃতি লৌকিক বিশ্বাসের পরিচায়ক। এই ধরনের কুসংস্কার দেবী চণ্ডীর চরিত্রে সংযুক্ত করা হয়েছে। কাহিনী গ্রন্থনায় দেবী চণ্ডী চরিত্রে লৌকিকরূপই এখানে বিধৃত রয়েছে। এই অবস্থায় প্রকৃত অমঙ্গল জানতে পদ্মার জ্যোতিষ আনয়ণ ও গণনার মধ্যেও লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার লুকিয়ে আছে। সে যাইহোক, পুথি গণনা করে চণ্ডী খুল্লনার কথা জানতে পারলে দেবী তার সামনে সিংহবাহনে পঞ্চদাসী সহ মানুষ রূপে আবির্ভূত হয়। এখানে দেবীর অলৌকিক মহিমার তুলনায় অভিজাত পরিবারের মানবিক রূপটিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। কবি বলেছেন —

''সিংহপৃষ্ঠে নারায়নী চড়িলা তখন।
পঞ্চ দাসী সঙ্গে করি উজানী গমন।।
সিংহ পীষ্ঠ ছাড়ি মাতা ঘটেত বসিল।
মানুষের রূপে মাতা খুলুনাক ডাকিল।।''[২৩৩]

গৃহের ভিতরে মনুষ্যরূপী দেবীর সঙ্গে খুল্লনার কথাবার্তা ও তাতে লহনার সন্দেহ এবং ধনপতির কাছে তার সেই বার্তা প্রেরণ কাহিনীতে স্বাভাবিক ও সত্য বলে মনে হয়। লহনার বার্তায় ধনপতির গৃহে ফিরে যাওয়ায় কাহিনীর মধ্যে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। এই দ্বন্দ্ব শিব শিষ্য ধনপতির সঙ্গে শক্তিদেবী

চণ্ডীর। তাই ধনপতির যাত্রাকালেই অমঙ্গল সংকেত রয়েছে। সে যাত্রার প্রাক্কালে ঠুটা বানর, আকাশে অমঙ্গল ধ্বনি, সম্মুখে গৃধিনী, বামে সাপ ও ডাইনে বানর দেখে। গৌড়ের ইতিহাসকার রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেছেন — "লোকের কুসংস্কার খুব ছিল। পথে গোসাপ, কচ্ছপ, শজারু, শশক দেখিলে যাত্রাভঙ্গ হইত। মাথার উপরে ডোমচিল ফিরিলে বা শুক্না ডালে কাক ডাকিলে, পথে কাঠের বোঝা দেখিলে, পায়ে হুচোট্ লাগিলে, বামে সাপ ও দক্ষিণে শিয়াল দেখিলে, মাকুন্দ চোপা পথে দেখিলে লোকে অমঙ্গল আশঙ্কা করিত। পথে তেলীকে তৈলভাণ্ডসহ দেখিলে লোকের মন উদ্বিগ্ন হইত।"[২৩৪] সমকালীন বাস্তব লোকসংস্কারকে কবি ধনপতির চরিত্রে সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। সাধারণ অল্পশিক্ষিত মানুষের মত ধনপতির মনও উদ্বিগ্ন হয়। তবে কাহিনী গ্রন্থনায় ধনপতির উদ্বিগ্নতার আগে খুল্লনার পুনরায় দেবী চণ্ডী পূজার ঘটনাটি সংযোজিত হয়। সেই পূজা তন্ত্রশাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয়। তন্ত্র শাস্ত্রের পূজার বীজমন্ত্র উচ্চারণ, ঘটপূজা, আত্মবলি দান ও ভক্তের শোণিত দানে দেবী অধিক তুষ্ট হয়। 'সপ্তশতী সমন্বিত চণ্ডী চিন্তা' গ্রন্থের সম্পাদক মহানামব্রত ব্রহ্মচারী বলেছেন — "তন্ত্রশাস্ত্রকার বলেন — নিজ দেহ হইতে রুধির দিলে দেবী সহস্রগুণ তুষ্ট হন। "সহস্রং তর্পিতা দেবী স্বদেহ-রুধিরেণবৈ।" সকল বলির শ্রেষ্ঠ বলি নিজ অহংকার-বলি। স্বদেহ-শোণিত-দান আত্মবলিদানের একটি প্রকৃষ্ট প্রতীক। অহংকার সমর্পণের ওটি স্থূলরূপ।"[২৩৫] খুল্লনার দ্বিতীয় বার চণ্ডী পূজায় তন্ত্রের পূজা পদ্ধতির পরিচয় রয়েছে।

"বীজমন্ত্র জপিয়া ঘটেতে দিল জল।
একমনে পূজে রামা সর্ব্বয়ে মঙ্গল।।
খুলুনা দেখিল দুর্গা না হৈল সদয়ে।
অবশ্য স্বামীর দেখি জীবন সংশয়ে।।
মস্তকের চুল দিয়া চামর ডুলায়ে।
পিঠের চামড়া কাটি চান্দোআ টাঙ্গায়।।
দশ আউল কাটি পাষান সাজায়।
জিভা কাটিয়া রামা সলিতা পাকায়।।
দুই কর্ন্ন কাটি রামা সাজায়ে খাবর।
কাটিল সকল মাংস রক্ত পরে ধার।।
ঘৃতে মাখিয়া দিল ঘটের উপরে।
এতেক করিল রামা স্বামীর কারণে।।
*　　　　*　　　　*
গলে কাটারি দিতে চাহে মঙ্গলচণ্ডীগণ।

হস্ত ধরি রাখিল মঙ্গলচণ্ডীগণ।।''[২৩৬]

তাতে দেবী চণ্ডীর আবির্ভাব এবং খুল্লনাকে ধনপতি যাত্রার পথে বিপদ ও বারোবছর কলিঙ্গরাজ কর্তৃক কারাগারাবদ্ধ থাকার কথা বলে। কাহিনী ধারায় এই বর্ণনা পাঠক-শ্রোতার কাছে পরবর্তী ঘটনার উদ্দীপক সংক্ষিপ্তাভাস। কাহিনীর প্রয়োজনে চণ্ডীর মুখে স্বামীর যাত্রাপথে দুর্ভোগের কথা শুনেও ধনপতিকে জানায় নি বা সচেতন করে নি। খুল্লনা ধনপতিকে জানালে হয়তো কাহিনী ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হত। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত ধারা মেনেই কবি এখানে কাহিনীতে বণিক সম্প্রদায়ের সদাগরী বাণিজ্যের ঘটনা অনুপ্রবেশ ঘটান। কাহিনীতে বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাত্রাকালীন সংকট বা আশঙ্কার আভাস রয়েছে। ধনপতি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যাত্রাকালে নানা অশুভ সংকেত লক্ষ্য করে সে শঙ্কিত হয় এবং পুথি গণনা করে পূর্বেই বিপদ ও বিপদ মুক্তির কথা জানতে পারে। একথা জানা সত্ত্বেও ধনপতি তার যাত্রা পরিবর্তন করে না। কাহিনীর দিক দিয়ে ধনপতির এই যাত্রার অপরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ। এবং পূর্বেই ধনপতির পুত্র সম্পর্কে জানা এবং সেক্ষেত্রে অপুত্রক পিতার কোন স্নেহঘন পিছুটান কাহিনীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। যেন কাহিনী চরিত্রকে জলপথে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত। বস্তুতঃ ধনপতি জানে যে, তার অনুপস্থিতিতে খুল্লনা লহনার দ্বারা পুনরায় অত্যাচারিত হতে পারে। তবু কেন ধনপতি আবার সিংহলে যাত্রা করল? কাহিনীতে ধনপতির যাত্রাই গ্রন্থনার ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা। একদিকে, সপত্নী পীড়নের ক্রিয়াকৌশলের অভিনবত্ব কাহিনীতে রস সঞ্চার করবে। অন্যদিকে, ধনপতির সঙ্গে দেবী চণ্ডীর বিরোধ নতুন মাত্রা লাভ করবে।

ধনপতি তার জীবন সংকট দেখে খুল্লনার উদ্দেশ্যে পত্র লিখে। সেই পত্রের প্রমাণ স্বরূপ সমাজ ও রাষ্ট্র আসে। কাহিনী গ্রন্থনায় এই 'জয়পত্র' নতুন আঙ্গিকের পরিচয় প্রদান করে। ধনপতির এই চিঠিতে যেমন সমাজ সচেতনতার দিকটি রয়েছে, তেমনি ঐতিহাসিক পরিচয়জ্ঞাপক রাজবংশ ও বণিক বংশের তথ্য রয়েছে। কবি ধনপতির চিঠিতে বলেছেন —

''জ্ঞাতিগণ ডাকিয়া আনিল শীঘ্রগতি।
জয়পত্র লেখে সাধু হেট করি মতি।।
হস্তে কলম করি লেখে সদাগর।
বুক বাহি পড়ে তার নঞানের জল।।
*　　　　*　　　　*
ধন্য রাজ্য বটে নগর উজানী।
সেই দেশে রাজা বৈসে চন্দ্রচূড়ামনি।।
চন্দ্রচূড়ামনি রাজা কেশোবার নাতি।

সেই রাজ্যে বৈসে বাণিয়া ভূয়াপতি।।
ভূয়াপতির পুত্রের নাম বাণিয়া গজমতি।
তাহার পুত্র বাণিয়া রসপতি।।
রসপতির পুত্রের নাম বাণিঞা রঘুপতি।
তাহার পুত্রের নাম বাণিঞা জয়েপতি।।
জয়েপতির পুত্রের নাম বাণিঞা ধনপতি।
জে কালে খুলুনার হইল গর্ভ পঞ্চমাস।
তখনে গেইলাম আমি সিংহলে পরবাস।।"[২৩৭]

উজানী নগরের বর্তমান রাজা বিক্রমকেশর। তার পিতা হল চন্দ্রচূড়ামণি। চন্দ্রচূড়ামণি রাজার পিতামহ ছিল কেশোবার। সেই রাজার আমলে বণিক ভূয়াপতি; ভূয়াপতির পুত্র গজমতি; গজমতির পুত্র রসপতি; তার পুত্রের নাম রঘুপতি; রঘুপতির পুত্র জয়েপতি; জয়েপতির পুত্র হল ধনপতি। এই ধনপতি সকল বণিক সমাজকে সাক্ষী করে যাচ্ছে সিংহলে। সে পত্রে বলে দিচ্ছে খুল্লনার পুত্র বা কন্যার নাম ও তার পড়াশুনা শেখানোর কথা। সেই সঙ্গে পিতাকে উদ্ধারে পুত্রের সিংহলে যাত্রা। কাহিনীতে এইরূপ পূর্বাভাস পাঠক সমাজকে অত্যন্ত কৌতূহলী ও আগ্রহী করে। কবি তার সঙ্গে কুলীন সমাজের বিবাহ সম্পর্কে বাস্তব সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। ধনপতি পত্রে বলে—

"কুলীন ঔরস দেখি কন্যা বিভা দিবে।
জে কিছু কহিলাম আমি অন্যথা না হবে।।
জামাতা রহিবে জদি কুলের ভাজন।
শশুরের উদ্দিশে যাবে দক্ষিন পাটন।।
পুত্র পড়িয়া জদি ঘরে অন্ন খাএ।
বাপ তার গাধা শুকুনী তার মাএ।।"[২৩৮]

এখানে ধনপতি চরিত্রে স্বল্প পরিসরেই পিতার দায়িত্ববোধ ও স্বাবলম্বী পুত্রের আশা ইত্যাদিতে সার্থক পিতার স্বরূপ ফুটে উঠেছে। এখানেই তার পুত্রের প্রতি পিতার কর্তব্যবোধ সমাপ্ত হয়।

ধনপতির যাত্রাপথে নদী উপকূল অঞ্চলের যেসকল স্থানের নাম করা হয়েছে তা অধিকাংশই কবির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে বলে মনে হয়। কবির জন্মভূমি মালদহ জেলার অন্তর্গত স্থান কাব্যে উঠে এসেছে। যেমন — আমুয়ার মুলুক, বোগাই চণ্ডী, কোদালিয়ার ঘাট, ঠিকিলাগোলা, নদীয়া শান্তিপুর, ভীমঘাট, কুমারপুর, ইত্যাদি। এই কুমারপুর যাওয়ার পর আসে মগরা। ধনপতি মগরায় আসার পরই দেবী চণ্ডী তাকে হেনস্থা করার জন্য ইন্দ্রের কাছ থেকে বজ্র বিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টির আনয়ণ করে। এখানে চণ্ডী হনুমানকে দিয়ে ধনপতির ছয় ডিঙ্গা ডুবিয়ে দেওয়া চরিত্রানুগ

হয়েছে। কাহিনীতে চণ্ডী কর্তৃক ধনপতির ক্ষতি করার জন্য উপযুক্ত মগরার খালকে নির্বাচন করা হয়েছে। এই মগরা খাল সম্পর্কে গৌড়ের ইতিহাসকার রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বলেছেন — ''ছত্রভোগ, ডায়মণ্ডহারবার উপবিভাগের অন্তর্গত।... এখন ছত্রভোগের নিকট গঙ্গার খাতের কেবল চিহ্নমাত্র আছে। প্রাচীন বাঙ্গালা বহু গ্রন্থে মগরার খালের নাম পাওয়া যায়। মগরার জলাবর্ত্তে পড়িয়া অনেক সদাগরের বাণিজ্যতরি ডুবিয়া গিয়াছিল।''[২৩৯] মগরার পর ধনপতি কালীদহে পৌঁছায়। কালীদহে দেবী চণ্ডীর স্বতন্ত্র এক রূপের প্রকাশ। সে গজ লক্ষ্মীর মূর্তি। কমল বা পদ্মের সঙ্গে তার যোগসূত্র এবং বাম হাতে একটি হাতি গলার্ধকরণ করছে ও ডান হাতে আবার তাকে উগরাচ্ছে। সে চণ্ডীর মত ছদ্মবেশী বৃদ্ধা রমণী নয়; সে কুমারী রূপবতী ও মোহিনী। কবি সেই কমলে-কামিনী রূপের বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে —

> ''মান সরবর হৈতে আনিল কমল।
> কালিদহে নানা মূর্ত্তি হইতে লাগিল।।
> কমলের ডাণ্ডি হৈল জগতের মাতা।
> মায়ারূপে হইলেন কমলের পাতা।।
> জলখাত্যে আল্য ইন্দ্রের গজরায়।
> বামহস্তে ধরি মাতা তাহাকে ফিরাএ।।
> বামহস্তে গজ লঞা দক্ষিনে গরাসে।
> ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি সাধুর তরাসে।।
> সাধু বলে শুন ভাই জতেক গাবর।
> কন্যাকে ধরিঞা তোল নোকার উপর।।
> অপূর্ব্ব দেখিএ এই কন্যা রূপবতী।
> তিলোত্তমা হএ কিবা ইন্দ্রের যুবতী।।''[২৪০]

এই গজ-লক্ষ্মীর রূপ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কাব্যময় হয়ে উঠেছে। সুকুমার সেন মনে করেন — "The story seems to be a bare fragment of an old story, and the goddess too is old, although it is not recorded in any lord Purana. The goddess (now known in Bengal as *Kamale Kamini* ('Lady-on-the lotus') presents an unknown aspect of the great goddess, the dark side of Gaja-Laksmi. In plastic art however the goddess on her lotus seat and attended by elephants is recorded as early as second century B.C. (Sanchi)."[২৪১] সুকুমার সেন মহাশয় এই কমলে কামিনীর সঙ্গে জার্মান লেখক তাকিতূস্ (Tacitus) -এর গেরমানিয়া (Germanis) গ্রন্থের কাহিনীর মিল

লক্ষ্য করে বলেছেন — "The goddess as described Tacitus has distinct affinities with Mukunda's *Kamale Kamini* as well as with Manasa as narrated in Middle Bengali Poetry. In sculpture Manasa often appears riding on an elephant. In her annual worship which is still held in pomp in some areas in the district of Burdwan, the deity is carried in procession through the village. The island of Nerthus and *Kamale Kamini* (or Gajalaksmi) Corresponds to the iron citadel (ayasi pur) of river goddess Sarasvati..."[২৪২] রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেছেন — ''গজলক্ষ্মীর পূজাও বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। কালক্রমে গজলক্ষ্মী ও মঙ্গলচণ্ডী মিশিয়া কমলে-কামিনী রূপধারণ করিয়াছেন।''[২৪৩] এই কমলে-কামিনী রূপ দর্শনের পর ধনপতি সিংহল রাজা শালবানের রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। তার নদী পথ থেকে সিংহলের রাজদরবারে প্রবেশের পূর্বে তেলী, মালী ও বিপ্র পাড়া অতিক্রম করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, সমাজে রাজ-রাজাদের নগর থেকে দূরে নিম্নশ্রেণীর বৃত্তিজীবী মানুষদের বসবাস ছিল, সেই সামাজিক অবস্থানের সূত্র কবি স্পষ্ট করে তুলেছেন। পাশাপাশি, ধনপতি রাজা শালবানকে কমলে-কামিনীর রূপ দর্শনের বিফল হলে প্রতিজ্ঞানুযায়ী সে কারারুদ্ধ হয়। তার আক্ষেপে চৈতন্য প্রবর্তিত প্রেম নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ধনপতি বলে —

''জোগী বা সন্ন্যাসী হৈব প্রেমের কেথা গলে দিব
মাগি খাইতে জাব উজয়ানি।।''[২৪৪]

বন্দী ধনপতিকে দেবী চণ্ডী প্রাণে মারতে পারে নি। কারণ ধনপতি খণ্ডের উদ্দেশ্য বিবাহিত কুলবধূদের দ্বারা দেবীর ব্রত প্রচার করা। ধনপতিকে প্রাণে মারলে তার স্ত্রী খুল্লনা দেবী চণ্ডীর বিপরীত হবে।

''পদ্মা বোলে শুন মাতা আদ্যা ভবানী।
সাধু মৈলে বাড়ি হবে সুন্দর খুলুনি।।''[২৪৫]

তাই ধনপতি চরিত্রটি কাহিনীর বেঁচে থাকে। কিন্তু তার অবস্থান হয় কারাগারে। তাকে উদ্ধারের জন্য কাহিনীতে শ্রীমন্তের জন্ম বিষয়টি গুরুত্ব পায়। সেই কারণেই কাহিনীও সিংহল থেকে উজানীর অভিমুখে গতিমুখ ফেরায়।

দেবী চণ্ডী শ্বেতকাক হয়ে উজানী নগরে আসে। সে স্বপ্নে খুল্লনাকে ধনপতির বন্দীদশার কথা জানায়। তাতে খুল্লনার আচরণ গ্রাম্য মহিলার মত বলে মনে হয়। সে স্বামীর কষ্টে গরল ভক্ষণ করে আত্মহত্যা করতে চেয়েছে। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর বৈধব্য জীবন যাত্রার বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য কাহিনীতে দেবীর অলৌকিক মায়ায় 'তিয়র' বা মৎস্যজীবী সৃজন। তারা উজানীতে এসে

খুল্লনাকে ধনপতির মৃত্যুর বার্তা দেয়। তাতে খুল্লনা তার দু'হাতের শাখা ভাঙ্গলে চণ্ডী প্রকৃত সত্য কথা বলে। সেই প্রসঙ্গে উঠে আসে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর জীবন সত্যের ঐতিহ্যবাহী নীতি কথা। সেখানে কবির কল্পনা শক্তি ও উপমা ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। কবির কথায় —

> ''দুই হাতের শঙ্খ রামা পাথরে আছারে।
> ডাকিয়া বোলেন দুর্গা স্বামী আছে তোরে।।
> পুরুষ বিনা নারীর যৌবন মরা।
> চন্দ্রবিনা উজ্জ্বল করিতে নারে তারা।।''[২৪৬]

কাহিনীতে আসে খুল্লনার সাধভক্ষণ বিষয়টি। সাধভক্ষণের জন্য দুর্বলা হাটে যাত্রা কথা পূর্বে থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তা লক্ষ্য করা যায় না। দুর্বলা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নাপিত, তেলি ও গোয়ালা নারীর বাড়ি থেকে বিভিন্ন প্রকার শাক সংগ্রহ করে। তার একটি তালিকা কবি কাহিনীতে যুক্ত করেছেন। মূলকাহিনীর সঙ্গে এর সম্বন্ধ অটুট নয়। এখানে গ্রাম বাংলায় পরিচিত শাকের একটি তালিকা পাওয়া যায়। যেমন — পালং, গীমা, হেলেঞ্চা, তিতো করলা, শীতল গীমা, পুঁই, গন্ধারি, খুরিয়া বা খুদিয়া, তেলা কুটি, কলম্বু, ভাঙ্গের ডগা, বথুয়া প্রভৃতি। এই বর্ণনার পরেই খুল্লনার সাধভক্ষণ। সাধভক্ষণের জন্য আনুষঙ্গিক রীতি-নীতির পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা কবি দেন নি। সাধভক্ষণের বর্ণনা এখানে অনেকটাই সংক্ষিপ্ত। কাহিনীতে এর নামমাত্র অবস্থান; গ্রন্থনা এখানে সজীবতা পায় নি বলে মনে হয়।

বলাবাহুল্য, এরপর কাহিনীর মোড় ফেরে। শ্রীমন্তকে কেন্দ্র করে কাহিনী নতুন পথে যাত্রা করে। তার জন্মের আগে খুল্লনার প্রসব যন্ত্রণার উল্লেখ পাওয়া যায়। এবং সাধারণ রীতি অনুযায়ী শ্রীমন্তের জন্ম হয়। জন্মের পর হিন্দুধর্মের যেসকল আট প্রকার রীতি-নীতি পালন করা হয় তা এখানে বর্ণিত হয়েছে। যেমন তীর্থের জলে স্নান, তিন দিনে ধূল বাড়ানো, পাঁচ দিনে পাঁচুটি, ছয় দিনে আইহ দ্বারা ষষ্ঠী পূজা, একমাসে নামকরণ, ছয় মাসে অন্নপ্রাশন, পাঁচ বছরে কর্ণভেদ ইত্যাদি। বণিক পরিবারের ক্ষেত্রে এরূপ বর্ণনা সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

শ্রীমন্তের বাল্য ক্রিয়া বিষয়টি মঙ্গলকাব্যের সাধারণ রীতি অনুযায়ী বর্ণিত হয়েছে এবং তা পুরাণ প্রভাবিত নয়; গ্রাম্যবালকদের খেলার প্রত্যক্ষ চিত্র কবি এখানে অঙ্কন করেছেন। তা একান্তই লৌকিক বলে মনে হয়। শ্রীমন্তের বাল্যকালে দৌরাত্ম লক্ষ্য করে মাতা খুল্লনা তাকে গুরু গৃহে শিক্ষার জন্য নিয়োজিত করে। লক্ষণীয়, এখানে পূর্ব উল্লেখিত শ্রীমন্তের শিক্ষক ধনাই পণ্ডিতের নাম নেই। এখানে তার নাম শ্রীহরি। তার কাছে শ্রীমন্ত বাল্য বয়সে শিক্ষা লাভ করেছে। তার বর্ণনা অত্যন্ত সুন্দর ও ক্রমানুক্রমিক শিক্ষার অগ্রগতির চিত্র পাওয়া যায়।

> ''দুবলা ডাকিয়া আনে পণ্ডিত শ্রীহরি।

শুভক্ষণ গণিএগ ছাল্যাকে দিল খড়ি।।
ক খ পড়েন সাধু গুরুর মন্দিরে।
বার ফলা পড়ি সাধু শাস্ত্রপাট করে।।
পিঙ্গল পড়িল আর পড়িল সুবন্ত।
অভিধান পড়িয়া শব্দের অন্ত।।
দিবসে পড়েন সাধু গুরুপাট স্থানে।
রাত্রে পড়ান দুর্গা আসিএগ আপনে।।”[২৪৭]

সমকালীন উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানরা একদিকে যেমন গুরুগৃহে শিক্ষালাভের জন্য যেত, তেমনি শিক্ষার উন্নতির জন্য গৃহশিক্ষক (Private Tutor) নিয়োজিত করা হত। লক্ষণীয়, অপার্থিব জগতের দেবীকে পার্থিব জগতের গৃহশিক্ষিকা রূপে অঙ্কন করা এবং নারীর গৃহশিক্ষকতা করা সকালীন সমাজব্যবস্থায় অত্যন্ত বিরল ও নজিরবাহী দৃষ্টান্ত বলে মনে হয়।

শিক্ষাগুরুর সঙ্গে শ্রীমন্তের দ্বন্দ্ব কাহিনীর গ্রন্থনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যময়। শ্রীমন্তের গুরুগৃহে শিক্ষা লাভ ও গুরুর সঙ্গে দ্বন্দ্ব — এই দুটি ঘটনা অলৌকিকতা দিয়ে সংযোগ সূত্র রচনা করা হয়েছে। শ্রীমন্তের হাতে খড়িতে দেবী চণ্ডী ভর দেওয়ায় তা মাটিতে পড়ে যায় এবং শ্রীমন্ত গুরুকে তা তুলতে আজ্ঞা করায় এই দ্বন্দ্বের কারণ। তাই গুরু অপমানিত হয়ে তাকে ‘জারজ’ সন্তান বলে গালাগাল দেয়। একথা শ্রবণের পর শ্রীমন্ত চরিত্রে অভিমান, সংবেদনশীলতা ও হৃদয়দংশন জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। তাই সে সকলের অজান্তে লজ্জায় ঘৃণায় গৃহের দরজা বন্ধ করে। সে জানে এই অবস্থায় সমাজের কাছে তাকে তাচ্ছিল্য, উপহাস ও গঞ্জনার পাত্র হতে হবে। সমাজে পিতৃ-পরিচয়হীন জীবনের তুলনায় মৃত্যু তার কাছে শ্রেয়। এদিকে খুল্লনা পুত্র সঠিক সময়ে না ফেরায় তার মধ্যে বাৎসল্য বোধের উৎসার ঘটে। তার এই সন্তান অদর্শনের ব্যাকুলতা ও স্নেহরস সঞ্চার যশোদার বালক কৃষ্ণ অদর্শনের অবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়। মাতার কাছে সন্তানের পিতৃ পরিচয় উদঘাটন নিয়ে উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন বিবৃত হয়েছে তা কবির বর্ণনায় অত্যন্ত নাটকীয় ও জীবন্ত রূপ পেয়েছে। কবি তার বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে —

“মাতাকে বলেন সাধু ঘরে থাকিএগ।
আমার লাগিয়া কেন ফিরিছ কান্দিএগ।।
কপাট ধরিএগ কথা বলেন শ্রীপতি।
মাতা আছ বিদ্যমান পিতা গেল কতি।।
শ্রীমন্ত বলেন মাতা না কর ক্রন্দন।
পণ্ডিতে বলিল মোকে জারুয়া বচন।।

কি হইল মোর পিতা দেহত কহিঞা।
নহিলে মরিব আমি গরল ভক্ষিয়া।।”[২৪৮]

কবির এই বর্ণনা অত্যন্ত সমাজ-বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বলে মনে হয়। কবি এখানে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই হয়তো তাঁর বর্ণনা এত সুচারু ও সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে।

শ্রীমন্তের আত্মশ্লাঘার পর কাহিনী গ্রন্থনায় অনিবার্য ফলস্বরূপ পরিচয় উদ্ঘাটন বিষয়টি এসে যায়। তাই খুল্লনা কর্তৃক ধনপতির চিঠি দান, পিতার উদ্দেশ্যে শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রার প্রস্তুতি বর্ণিত হয়েছে। কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন — “শ্রীমন্তের কাহিনীর প্রধানতঃ দুইটি ভাগ। একটি ভাগ বাস্তবরাজ্য — আর একটি ভাগ স্বপ্নরাজ্য। শ্রীমন্তের সিংহলযাত্রা হইতে স্বপ্ন জগতের সূত্রপাত।”[২৪৯] শ্রীমন্তের সিংহলে যাত্রার জন্য খুল্লনা সপ্তডিঙ্গা তৈরী করতে দেবী চণ্ডীকে অনুরোধ জানায়। খুল্লনা কর্তৃক দেবী চণ্ডী পূজায় তন্ত্রের সাধনার পূজা পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে ভূত সুদ্ধি, নানা জাতীয় দ্রব্য সামগ্রী উপাচার, আদ্য মন্ত্র স্মরণ, শত শত ছাগল-মহিষ-ভেড়া বলি, ব্রাহ্মণের মন্ত্র পাঠ, খুল্লনার নিজ বুকের রক্ত প্রদান করা হয়েছে। খুল্লনার পূজায় দেবী চণ্ডী এবং তার সঙ্গে বিশ্বকর্মা হনুমান বা মারতীর আগমন হয়। খুল্লনা দেবীকে সপ্তডিঙ্গা নির্মাণ করতে বলে। ডিঙ্গা তৈরীর জন্য কাহিনীতে বিশ্বকর্মা, হনুমান বা মারতীর মত শক্তিধর পুরাণের চরিত্রের আনয়ন ঘটেছে। কার্যক্ষেত্রে তাদেরকে সাধারণ বৃত্তিজীবী সূত্রধর সম্প্রদায়ে পরিণত করা হয়েছে। এখানে দেবতা চরিত্র কাহিনীতে মানব রস সঞ্চার করেছে। এই দেবতার মানবায়নের ক্ষেত্রে দেবী চণ্ডীর মায়া শক্তিকে প্রকাশ করা হয়েছে। লক্ষণীয়, শ্রীমন্তের সূত্রধরদের জাতি জিজ্ঞাসা করার মধ্যে হিন্দু সমাজের জাত পাতের দিকটি ফুটে ওঠে। তবে এই তিনজনের ডিঙ্গা তৈরীর বিস্তৃত বর্ণনা কবি দিয়েছেন। তারা ক্রমান্বয়ে মধুকর, জাত্রামঙ্গল, সাধু, মধু, রত্ন, চন্দনের পাট প্রভৃতি নামে ডিঙ্গা তৈরী করে। কাহিনী গ্রন্থনার ক্ষেত্রে এই ডিঙ্গা তৈরীর বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য। ডিঙ্গার নামের বৈচিত্র্যের চমক সত্যি আকর্ষণীয়। এমনকি শ্রীমন্তের বাণিজ্য যাত্রার সময় উজানীর উদ্‌বৃত্ত বাণিজ্য সামগ্রীর যে তালিকা পাওয়া যায় তা কাহিনীতে প্রাসঙ্গিক-দ্রব্যবস্তু বলে মনে হয়। কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন — “কবি বাণিজ্যের যে পণ্য বিনিময়ের তালিকা দিয়াছেন — তাহাতেও যথাযথতা রক্ষা করা হয় নাই। ... এ তালিকা একটা আলঙ্কারিকতার (Rhetorical Display) দৃষ্টান্ত মাত্র।”[২৫০] শ্রীমন্ত বাণিজ্যের জন্য নারিকেল, হলুদ, শুকুতা, আদার সুট, পিপলী, বুট, তেজপাতা, জিরা, লংকা, শ্বেত চামড়া ইত্যাদি দ্রব্য নিল। এই সকল বাণিজ্যের সামগ্রী নিয়ে যাত্রার সময় শ্রীমন্ত দেবী চণ্ডীকে প্রণাম ও ব্রাহ্মণের কাছে আশির্বাদ নেয়। কারণ ব্রাহ্মণের স্থান সমাজে সকলের উঁচুতে। শ্রীমন্তের এই আচরণের মধ্যে প্রকৃত হিন্দু রূপের প্রকাশ রয়েছে। প্রসঙ্গত, প্রখ্যাত সমালোচক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কথা স্মরণে

আসে। তিনি বলেছিলেন — ‘‘যাঁহারা মনে করেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন দেবতার পূজা হয় না, ধর্ম উপদেশ পাওয়া যায় না, তাঁহারাই হিন্দু। হিন্দুরা জাতিভেদ মানেন। এক জাতিতে জন্মিলে এ জন্মে আর উচ্চ জাতিতে পাওয়া যায় না, যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহারাই হিন্দু। ব্রাহ্মণ হিন্দুদের মধ্যে সকলের উঁচু।’’[২৫১] কবি বলেছেন —

‘‘জাত্রা সমএ তথা ব্রাহ্মণ আইল।
মস্তক ধরিএগ্রা দ্বিজে আশীর্ব্বাদ দিল।।’’[২৫২]

যাত্রাকালে খুল্লনার ক্রন্দন এবং বিপদ থেকে উত্তরণের বার্তা কাহিনী ধারার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে শ্রীমন্তের প্রতি খুল্লনার বিপদ-মুক্তির অভয়-নিদান সংগতিপূর্ণ বলে মনে হয়। সেই প্রসঙ্গে কাহিনীতে ‘ব্যাধ খণ্ড’-এর ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। খুল্লনা শ্রীমন্তকে বলেছে —

‘‘দুর্গা পূজা করি বাছা পাএগ্রাছিলাঙ তোক।
নিদান পড়িলে বাছা স্মরিবে চণ্ডীক।।
সুরথ নামেত ছিল কলিঙ্গের রাজা।
নানা উপহারে সেহ চণ্ডীর করে পূজা।।
কালকেতু নামে এক ব্যাধের নন্দন।
একচিত্ত হএগ্রা সেই করিত সেবন।।
চণ্ডীর সেবনে বীর দৃঢ় কল্য মন।
প্রসন্ন হইএগ্রা তাকে চণ্ডী দিল ধন।।
ধন পাএগ্রা মহাবীর করিলেক পূজা।
চণ্ডীর কৃপাতে সেই গুজরাটের রাজা।।’’[২৫৩]

সেই পূর্ব ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে অভয়দাত্রী, অসীম ক্ষমতা ও অলৌকিক শক্তিশালিনী দেবী চণ্ডীর স্বরূপকেই স্পষ্ট করে তোলা হচ্ছে পাঠক বা শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে। মধ্যযুগের ধর্মভাবনার বাতানুকূলে কবির এই ধরনের বর্ণনা হয়তো স্বাভাবিক।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিক খণ্ডের কাহিনী গ্রন্থনায় সমাজ সচেতনতা সমকালীন পরিবেশে সামঞ্জস্য বলে মনে হয়। কুলবধূর আত্মসম্মান বিনষ্টি হিন্দু সমাজের কাছে ভয়াবহ যন্ত্রণার ছিল। সামান্য চারিত্রিক দোষে সমাজ তাকে ত্রাসে, গঞ্জনায় বিদ্ধ করত। স্বল্প বয়সে শ্রীমন্ত সমাজের এই স্বরূপটি উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তার বাল্য বয়সের জীবনাভিজ্ঞতা তার প্রমাণ দেয়। কবি শ্রীমন্ত চরিত্রটিকে সমাজের মুখপত্র রূপে অঙ্কন করেছেন। তাই খুল্লনার জয়পত্র নিয়ে শ্রীমন্ত সিংহলে যাত্রার সময় মাকে সে কথা স্মরণ করে দিয়েছে। স্ত্রীজাতির কাছে স্বামীই একমাত্র

অবলম্বন এই চিরন্তনের সুর ধ্বনিত হয়েছে। স্বামী ভিন্ন নারীর জগৎ অন্ধকার। সেকথা একটি নীতি কথা দ্বারা কাহিনীতে উঠে এসেছে। কবি যেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বন্ধন নীতিকে তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে বার বার সুযোগ বুঝে তুলে ধরেছেন। কবি যেন শ্রোতা-সমাজের কাছে সমাজের এই বন্ধন নীতির কথা লোকসাংবাদিকতা করেছেন। তার পরিচয় কবি দিয়েছেন এইভাবে —

"মাতা পিতা ভাই বন্ধু কার কেহু লয়।
সকল জানিবা মাত্র পথের পরিচয়।।
স্বামী ইষ্ট স্বামী মিত্র স্বামী বন্ধুজন।
স্বামী বিনা অন্ধকার এ তিন ভুবন।।
সতী নারীর স্বামী নারায়ন সমতুল।
পরার পুরুষ দেখে শিমলির ফুল।।"[২৫৪]

সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে বলার আগে কবি পাঠককে পরবর্তী ঘটনার একটি কৌতূহলোদ্দীপক সংক্ষিপ্ত পূর্বাভাস দিয়েছেন। দেবী চণ্ডী শ্বেত মাছি রূপ ধারণ করে খুল্লনাকে শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রার পরবর্তী ঘটনার কথা উল্লেখ করা এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। দেবী চণ্ডী নিজেই শ্রীমন্তের যাত্রা পথের কাণ্ডারী হয়েছে। তার যাত্রা কালে যে শুভ সংকেতের নির্দেশ পাওয়া যায়, তা লোকবিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত। মধ্যযুগের সাধারণ মানুষ সহ উচ্চবিত্তের শিক্ষিতরাও এই লোকবিশ্বাস দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত হয়েছিল। শ্রীমন্ত তার যাত্রাকালে কাক, শকুন, কোকিলের ডাক শোনা এবং সুন্দর গোয়ালিনীর মাথার দুধের পসার নিয়ে আগ বাড়িয়ে যাওয়াকে শুভ মনে করে। কবি তার পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে —

"শ্রীমন্ত জাত্রাকালে কাক ডাকে কুতূহলে
শুকুনি ডাকে ডালে বসিয়া।
শুন্যে থাকি পদ্মা ভবানীর তরে বোলে
মাহেন্দ্রক্ষণ জায় বহিয়া।।
শ্রীমন্তের জাত্রাকালে কাক ডাকে কুতূহলে
কোকিল ডাকে ডালে বসিয়া।
সুন্দর গোয়ালিনী মাথে দধির পসার
জাইছে শ্রীমন্তের আগ বাড়িয়া।।"[২৫৫]

শ্রীমন্ত যেসকল ডিঙ্গা নিয়ে যাত্রা করেছে তার সঙ্গে পূর্বের সপ্তডিঙ্গার নামের কোন মিল নেই। এখানে কর্ণ, উদরতারা, চন্দ্রখোলা, শাশিয়া, ধুমকুরা, যাত্রা সিদ্, হরিহরা প্রভৃতি সপ্তডিঙ্গার নামের

উল্লেখ রয়েছে। সপ্তডিঙ্গা নিয়ে শ্রীমন্তের যাত্রাপথের একটি সুন্দর ভৌগোলিক পরিচয় পাওয়া যায়। যাত্রা পথে নদীয়ার কথার প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যের হরিনামের উল্লেখ রয়েছে। তবে সুনীলকুমার ওঝা এই অংশটিকে প্রক্ষিপ্ত বলেছেন। তিনি মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পাদটীকায় বলেছেন— ‘‘প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়।’’[২৫৬] এই প্রক্ষিপ্ত অংশের পর শ্রীমন্তের তিন দিন নদীয়ায় অপেক্ষা করার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে অংশটি কাব্যের প্রক্ষিপ্ত নয়। এখানে এসে শ্রীমন্ত সিংহলে বন্দী পিতার কথা বিস্মৃত হয়। যদিও আমরা লক্ষ্য করি খুল্লনা শ্রীমন্তকে পিতার সম্বন্ধে সমস্ত বৃত্তান্ত দিয়ে দেয়। তাই মনে হয়, শ্রীমন্ত চরিত্রটি যতটা আত্মশ্লাঘা নিয়ে সিংহলে পিতা উদ্ধারের জন্য রওনা হয়েছিল নদীয়ায় এসে তার মনে সেই ইচ্ছা তত তীব্র থাকে নি।

তবে শ্রীমন্তের দ্বারা দেবী চণ্ডীর পূজায় তন্ত্রের দেবীর পূজা পদ্ধতির রীতিগুলিকে মান্য করা হয়েছে। এভাবে শ্রীমন্ত মগরায় এসে উপস্থিত হলে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সাধারণ রীতি অনুয়ায়ী দেবীর ছলনার বিষয়টির আগমন ঘটে। সেই সূত্রে দেবী চণ্ডীর ইন্দ্রের সভায় মেঘ আনয়নের জন্য যাত্রা। তাই কাহিনী মর্ত্য ভূমি থেকে সামান্য সময়ের জন্য স্বর্গে স্থানান্তরিত হয়েছে। তবে স্বর্গের দেব-দেবীদের আচরণকে মর্ত্যের তথা গ্রাম্য পরিবেশে স্থাপন করা হয়েছে। দেবতা চরিত্র গ্রাম্য সাধারণ মানুষ হয়ে উঠেছে। মর্ত্যের ধূলি-ধূসরিত জীবনে ইন্দ্র চরিত্রটি হয়ে উঠেছে আমাদের পরিচিত জগতের কোন এক জমিদার মানুষের প্রতিভূ। চণ্ডী ইন্দ্রের কাছে মেঘ চায় এবং সে সময় ইন্দ্রের প্রকাশ ভঙ্গি তার পরিচয় বহন করে। ইন্দ্রের আজ্ঞায় বিচিত্র প্রকার মেঘের আগমন এবং তাদের প্রকাশভঙ্গি কাহিনীকে সজীবতা দান করেছে। সরস হাস্য রসিকতার উদ্রেক ঘটেছে এখানে। তাদের গর্জনে বর্ষণে শ্রীমন্তের প্রাণপণ অবস্থা। সে বিপদ শঙ্কুল অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য অনিবার্য কারণ বশত দেবীর উদ্দেশ্যে চৌতিশা বর্ণিত হয়েছে। এখানে দেবী চণ্ডীকে শক্তির আধার, কালি, ছত্রিশ নয়ান, চৌষট্টি যোগিনী ও প্রকৃতি ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত দেবীর প্রকৃতি রূপ সম্পর্কে বলেছেন — “We find that the primordial Lord (Adi-deva) was thinking of creation in the void, and when he was thus pondering on, Prakrti came out of his body, and Prekrti, who was the manifestation of the power (Sakti) of the Adi-deva, was called the Adi-devi.”[২৫৭] তন্ত্রে এই আদি দেবীকে প্রকৃতিরূপিনী বলা হয়ে থাকে। সে যাইহোক, নায়ক সম্মুখ বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য দেবীর উদ্দেশ্যে এই চৌতিশা মঙ্গলকাব্যের একটি সাধারণ রীতি। মগরায় শ্রীমন্তের চণ্ডী স্মরণেও শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের সমাধাসূত্র পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে কাব্যের এই অংশটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয়। কবি বলেছেন —

‘‘আন২ অহে কণ্ডার আদ্যের তুলসী।

এই গয়া এই গঙ্গা এই বাণারসী।।
শ্রীদুর্গার নাম কিছু করিল স্মরণ।
জন্মের সাফল হবে শুনহ বচন।।
তুলসীর মাল্য সাধু গলায় পহ্রিল।
শ্রীবিষ্ণু বলিএগ্রা জল মুখে তুল্যা দিল।।"[২৫৮]

শ্রীমন্ত বিপদ থেকে মুক্তির জন্য দুর্গা বা চণ্ডীর নাম স্মরণ করার পাশাপাশি গলায় তুলসীর মালা প্রদান করে বিষ্ণু নাম করার মধ্যে শাক্ত-বৈষ্ণবধর্মের মিলনকে প্রকাশ করে। কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন — "বৈষ্ণব সাধক-কবিগণই প্রথম কলিযুগের গুণ-কীর্তন করেন। সে যুগে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়া হরিনাম প্রচার করিয়া মানব মাত্রেরই মুক্তির পথ দেখাইয়াছেন, সে যুগ সকল যুগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ... চণ্ডীর মুখে হরিনামের মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়া তেমনি শাক্ত-বৈষ্ণব দ্বন্দ্বেরও মীমাংসা করিয়াছেন।"[২৫৯] তবে এখানে চণ্ডীকে নয়, সাধক বা ভক্ত শ্রীমন্তের মুখে বিষ্ণু নাম স্মরণ করতে দেখি। ভক্ত শ্রীমন্ত এখানে স্বভাবাচরণে একান্তই বাঙালী। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে আমরণ জীবনযুদ্ধ পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শ; বাঙালী সেখানে অবস্থার সঙ্গে সমঝোতা করে পালিয়ে বেড়ায়। শ্রীমন্ত চরিত্রটিও তেমনি বাঙালী মানসের অন্তরের প্রকাশ। সে মগরার সংকটে পড়ে পিতা, মাতা, দুর্বলা দাসীর উদ্দেশ্যে তর্পণ করে শেষে নিজেকে জলে সমর্পণ করে দিয়েছে। সে সময় চণ্ডী তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করে। দেবী চণ্ডীর মাতৃ স্বরূপটি এখানে স্পষ্ট। দেবী চণ্ডীর উগ্রমূর্তির পাশাপাশি স্নেহের বা বাৎসল্যের রসধারা সঠিক সময়ে ঝরে পড়েছে। দেবী চণ্ডীর শ্রীমন্তের প্রতি এত স্নেহ মাতা খুল্লনার মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় না। শ্রীমন্ত দেবীর নিদান লাভ করে পুনরায় যাত্রা শুরু করে। সেই পথে সাপাদহ, কড়িদহ, শঙ্খদহ, কাকড়াদহ, জকদহ, হাতিদহ, কুম্ভীরদহ প্রভৃতি এক একটির বিস্তৃত বিবরণ কাহিনীর গতিকে ভারাক্রান্ত করে।

অতঃপর কাহিনীর স্বাভাবিক ধারানুযায়ী কালিদহের কথা আসে। সেখানে মঙ্গলকাব্যের সাধারণ রীতি অনুযায়ী শ্রীমন্তের কমলে কামিনী দর্শন বিষয়টির আগমন ঘটে। সেখানে বলা হয়েছে —

"দুর্গার মায়াতে কাল কালিদহের জল।
কালিদহতে রূপি দিলেন কমল।।
কমলের পত্রে বসি দুর্গা কায়া কৈল।
কমলের নবীন ডাণ্ডি অকস্মাৎ হৈল।।
জোগিনীকে আজ্ঞা কৈল আদ্যা ভবানী।
কমলের নবীন পত্র হইল জোগিনী।।

মায়াতে কমল ফুল হৈল বিপরীত।
জলতে কমল হৈল অতি সুশোভিত।।
জলতে হইল হস্তী দুর্গার মায়াতে।
মায়াহস্তী জলে আল্য জল খাইতে।।
অতি ভয়ঙ্কর হস্তী হৈল মায়া বলে।
পর্ব্বত সমান হস্তী শুণ্ড দিল জলে।।

*　　　*　　　*

নবীন কামিনী বেযে　　　মায়া করি ঘন হাসে
রূপ দেখি মুনিগণ ভুলে।।
বছর ষোড়শা নারী　　　সেই প্রায় রূপ ধরি
গজকে ধরিঞা করি গ্রাস।''২৬০

অনুরূপ দৃশ্য ধনপতিও কালিদহে দেখেছিল। সেই সম্পর্কে শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন — ''চণ্ডী-মঙ্গল-বর্ণিত এই কমলে কামিনী উপাখ্যান গজ-লক্ষ্মীর কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই গজ-লক্ষ্মীর মূর্তি অতি প্রাচীন; ... বাণিজ্যসূত্রে ভারতের দক্ষিণ উপকূলে গিয়া বাঙালীগণ এই গজ-লক্ষ্মীর সহিত পরিচিত হইয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহারই কাব্যময় রূপ চণ্ডী-মঙ্গলের এই 'কমলে কামিনী'। এই শ্রী বা লক্ষ্মী সৃষ্টিরূপিণী; সর্বদেশেই পদ্ম সৃজনীশক্তির প্রতীক-রূপে গৃহীত।''২৬১ দেবী চণ্ডীর গজ লক্ষ্মীর পদ্মে অবস্থান ও পদ্মের সঙ্গে সম্বন্ধ এবং হাতির তাতে জল প্রদান করার মধ্যে উর্বরতা বা সৃষ্টি কাল্টের আভাস রয়েছে বলে মনে হয়। তবে এই উর্বরতার দেবী স্বরূপত দেবী চণ্ডীর তুলনায় স্বতন্ত্র। তার বহু রঙ রূপের কথা কবি দ্বিতীয় বার বলে কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করেছেন। কাহিনী ধারা থেকে দেবীর বিচিত্ররূপের দৃশ্য সরিয়ে নিলেও কাহিনীর মধ্যে সংযোগসুত্র বা ধারাবাহিকতা বিনষ্টি হবে না, অনুমান করা যায়।

কালিদহের এই অলৌকিক দৃশ্যের পর কাহিনী বাস্তবে পদার্পণ করে। শ্রীমন্ত কালিদহের থেকে রত্নমালার ঘাটে উপস্থিত হয়। জলপথে শ্রীমন্তের আগমনে সিংহল রাজা শালবান শঙ্কিত হয়েছে। রাজার এই শঙ্কায় মধ্যযুগে জলদস্যুদের আক্রমণের প্রেক্ষাপটে অসম্ভবের কিছু নয়। কিন্তু শ্রীমন্ত অপরিচিত জল দস্যু বা আগ্রাসী কোন ব্যক্তি ছিল না। সে সিংহলে বানিজ্য করতে এসেছে, তবে মূল উদ্দেশ্য পিতার অনুসন্ধান করা। কিন্তু কোতাল তাকে সিংহল আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে পরিস্থিতি বুঝে চন্দন কেনার কথা বলে। আপাত মনে হতে পারে, শ্রীমন্তের উত্তর তার আগমনের মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। তবে কোতালদের কাছে তার পদার্পণের মূল উদ্দেশ্য গোপন করার মধ্যে শ্রীমন্ত চরিত্রের বিচক্ষণতা ও পরিস্থিতির সঙ্গে তার বক্তব্যের সামঞ্জস্য রক্ষা হয়েছে।

শ্রীমন্তের সিংহল রাজার সঙ্গে সাক্ষাতে যে সকল ভেট-জাত দ্রব্যের উল্লেখ আছে তা কবি উত্তরবঙ্গ তথা মালদহ জেলার উপযোগী করে বিবৃত করেছেন। সেখানে বারোমাসের আম ও তালের কথা রয়েছে। এই ভেট-জাত খাদ্য সামগ্রী প্রসঙ্গে মালদহের বিখ্যাত আম ও তালের কথা মনে আসে। তবে নারিকেল নিয়ে রাজা শালবানের অপরিচিত শ্রীমন্তের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস সমকালীন ক্ষণপরিবর্তনশীল, পুনঃ পুনঃ ক্ষমতা হস্তান্তরের রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং আগন্তুকের দ্বারা সাম্রাজ্যগ্রাসের অবিশ্বাসের দিকটির সঙ্গে ঐক্য রয়েছে। তাই সমকালীন প্রেক্ষাপটে নবপরিচিত আগন্তুক ব্যক্তির সঙ্গে রাজার এই আচরণ খুব স্বাভাবিক।

এই রকম হালকা পরিচয় পর্ব অতিক্রম করে কাহিনী মূল পরিচয় পর্বে প্রবেশ করে। শ্রীমন্তের বাণিজ্য দ্রব্যের আদান প্রদানের পরই দেবী চণ্ডীর পূর্বোল্লেখিত পিতার সঙ্গে পুত্র সাক্ষাৎ এবং সুশীলার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিবাহের কথা মনে আসা স্বাভাবিক। সে সময় চণ্ডী সিংহল-রাজ শালবানকে শ্রীমন্তের প্রতি সন্দেহভাজন স্বপ্ন দেখবার বিষয়টি আবশ্যক হয়ে পড়ে। এই অলৌকিক স্বপ্নই কাহিনীকে মূল পথে নিয়ে যায়। দেবীর এই স্বপ্ন বা অলৌকিকতা শালবান ও শ্রীমন্ত চরিত্রকে পরিচালিত করেছে। তাতে উভয়ের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। দেবীর সন্দেহ জাগ্রতকারী স্বপ্নে রাজা শালবান শ্রীমন্তকে যখন ধরে আনে তখন শ্রীমন্ত তার পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ বংশ ও রাজ্যের পরিচয় প্রদান করে। এই পরিচয় প্রসঙ্গান্তরে কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ শ্রীমন্তের কালিদহের কমলে-কামিনীর ঘটনা উত্থাপন এবং কমলে-কামিনী মিথ্যা প্রমাণ হলে তার বন্দী ও সপ্তডিঙ্গা বাজেয়াপ্ত করার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। শালবান তাকে মশানে কাটার ও সপ্তডিঙ্গা বাজেয়াপ্তের ঘটনাকে প্রমাণ পত্রে লিখে নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত শ্রীমন্ত কমলে-কামিনী দেখাতে না পারায় সাক্ষী চরিত্র হিসাবে কর্ণধার রাজাকে বলে —

> ''সত্য সম ধর্ম্ম নাঞি লেখ্যাছে পুরাণে।
> মিথ্যার সমান পাপ নাঞি ত্রিভুবনে।।
> সাক্ষী হএগা জেবাজন মিথ্যা কথা চলে।
> সপ্ত পুরুষ তার নরকতে চলে।।''[২৬২]

কাণ্ডারের মুখে এই নীতিকথা সমাজকে সতর্কীকরণ ও সত্যের পথে চলার বার্তা বহন করে। বিপরীতে শ্রীমন্তের মিথ্যা কথায় তাকে মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। মশানে মৃত্যুর আগে সে গঙ্গার জলে স্নান করে পূণ্য সঞ্চয় করতে চেয়েছে এবং সকল আত্মীয়-পরিজনদেরকে একে একে তর্পণ করেছে। তবে লক্ষণীয়, আত্মীয়-পরিজনদের তর্পণের আগে সূর্যকে সে প্রথম তর্পণ করেছে। এটি হিন্দু সমাজেরই রীতি। এই তর্পণ একটু দীর্ঘ ও বিস্তৃত। তর্পণের পালা অতিক্রম করে শ্রীমন্ত দেবী চণ্ডীর উদ্দেশ্যে চৌতিশা উচ্চারণ করে। এই অংশে শ্রীমন্ত নায়কের ভূমিকা পালন করেছে।

মশানে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধারের জন্য দেবীর উদ্দেশ্যে তার এই চৌতিশা স্তব উচ্চারণ। এই চৌতিশায় দেবীকে প্রথমেই কমলা কালী, বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তাতে চণ্ডীর কমলা, কালী, গিরিজা কালী, ভবানী, ভৈরবী, মাহেশ্বরী প্রভৃতি নামের উল্লেখ পাই। এই নামগুলিতে শক্তির বা তন্ত্রের দেবী নামের সাযুজ্য পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের একটি মন্তব্য আমরা উদ্ধৃত করতে পারি — ''শাক্তের প্রধান উপাস্য দেবতা দশ মহাবিদ্যা। কালী, তারা, যোড়শী (ত্রিপুর-সুন্দরী বা শ্রীবিদ্যা), ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশ দেবতা সাধারণত মহাবিদ্যা নামে পরিচিত।''[২৬৩] শিব ও শক্তির একদেহে অবস্থান তন্ত্র ধর্মের ছায়াপাত পড়েছে। অন্যদিকে, এই চণ্ডীকেই ডাকা হচ্ছে নারায়ণী, বারাহি ও বৈষ্ণবী নামে। দেবী চণ্ডীর নামে বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে শাক্ত ধর্মের দেব-দেবীর নাম মিলে গেছে। প্রসঙ্গত, চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর কথা স্মরণে আসে — ''তন্ত্রে একই দেবতার ও তাহার বিভিন্ন রূপের উপাসনায় অল্পবিস্তর বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করিবার ব্যবস্থা আছে। রাম কৃষ্ণ শিব কালী প্রভৃতি দেবতার বিভিন্ন মন্ত্র, ধ্যান ও উপাসনাপদ্ধতি তন্ত্রগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। আবার বৈষ্ণব দেবতা হিসাবে বিষ্ণু বা নারায়ণ, কৃষ্ণ, রাম, বাসুদেব, বালগোপাল, দধিবামন, লক্ষ্মীনারায়ণ, নৃসিংহ, বরাহ প্রভৃতি; ... শাক্ত দেবতা হিসাবে কালী, তারা, ভৈরবী প্রভৃতি বহু দেবতার নাম ও পূজার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।''[২৬৪] অর্থাৎ শ্রীমন্তের চৌতিশা সম্পর্কে সুধীভূষণ ভট্টাচার্যের কথায় বলা যায় — ''চৌতিশা মূলতঃ বর্ণমালা-গঠিত এই বাগ্‌দেবতারই বর্ণনা বলিয়া মনে হয়। চণ্ডীমঙ্গলের চৌতিশা দুইটিই সমধিক প্রসিদ্ধ। সেজন্য মনে হয়, চণ্ডীমঙ্গলের দেবীকে বর্ণমালা-গঠিত বাগ্‌দেবতা কল্পনা করিয়াই চৌতিশা দ্বারা তাঁহার বন্দনা করার রীতি এই মঙ্গলগানে প্রচলিত হইয়াছিল।''[২৬৫] সুধীভূষণ ভট্টাচার্য দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' গ্রন্থে এই বাগ্‌দেবীকেই তন্ত্রের দেবী বলেছেন। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চৌতিশায় দেবী চণ্ডীর মধ্যে তন্ত্রের শক্তিরূপিনী দেবী ও বৈষ্ণব ধর্মের মিলন ঘটেছে পরিস্থিতি অনুযায়ী আবশ্যক বলে মনে হয়।

শ্রীমন্তের চৌতিশার স্তবে দেবী চণ্ডী জাগরণ ঘটেছে কয়েকটি লৌকিক বিশ্বাসের দ্বারা। স্বর্গের দেবী চণ্ডীকে লোক সমাজে অবস্থিত সাধারণ নর-নারীর পটভূমিকায় অঙ্কন করা হয়েছে। চরিত্র এখানে লোক বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত। স্বর্গে চণ্ডীর কপালে টনক পড়া, ডান চোখ নাচা, দাঁতে জিহ্বা কামড় পড়া, চলতে নখে হোঁচট লাগা ও পেঁচা-কাকে মুখোমুখী কথা বলা ইত্যাদিকে অশুভ বলে মনে হয়েছে। চণ্ডী এই অশুভ সংকেতের পর চণ্ডী পদ্মাকে দিয়ে গণিয়ে প্রকৃত ঘটনা জানতে পারে। নিজ ভক্তকে উদ্ধারের জন্য তথা চণ্ডীর পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য কালীর মত রণ সজ্জায় সজ্জিত হয়। খর্গ, খাপর, বাণ, শিবের শিব কর্তৃক প্রাপ্ত ত্রিশূল, যম কর্তৃক প্রাপ্ত যমদণ্ড এবং ইন্দ্র কর্তৃক প্রাপ্ত রণ-সজ্জা পরিধান করে দেবী যুদ্ধে বের হয়। এই শক্তিরূপিণী দেবীও যুদ্ধ

যাত্রার সময় বাঙালী নারীর মত 'রাম' বা দেবতার নাম স্মরণ করে। কবির কথায় — ''রাম নাম জপি দুর্গা রথে চড়ে গিএগ।''[২৬৬] পরিবেশ অনুযায়ী তার রূপসজ্জা সমঞ্জস্যপূর্ণ হলেও পরিস্থিতি অনুযায়ী তার এই সংস্কার বোধ তাকে সাধারণ মানবীতে পরিণত করেছে। সে মশানে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়। ছদ্মবেশে দেবীর কোতালদের সম্মুখে বেদ পাঠ তার পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক এবং সেই পাণ্ডিত্যের প্রতিদানে শ্রীমন্তকে চাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কোতাল তাতে নারাজ হয়। তাই চণ্ডী একাদশীর ব্রত পালনের জন্য অল্প খাদ্য বস্তু চায়। সেই খাদ্য বস্তু হল এক লক্ষ ছাগল, ভেড়া এবং এক লক্ষ মহিষ। কাহিনীতে দেবীর মনুষ্যরূপের মাঝেই স্ফুরিত হয়েছে অলৌকিক দেবী স্বরূপটি। ভক্তকে উদ্ধারের জন্য এই স্বরূপ পরিবর্তন দেবী চণ্ডীর পক্ষে অনিবার্য ছিল। তবে ব্রাহ্মণী ছদ্মবেশী দেবীর এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে কোতাল যে কথা বলে তা সমাজ অভিজ্ঞতার ফসল। কবি সমকালীন ব্রাহ্মণদের প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই হয়তো তার অঙ্কিত কোতাল চরিত্রটি ব্রাহ্মণ স্বরূপিণী দেবীকে পাপিষ্ঠা বলতে পেরেছিল। সমকালীন সমাজে ব্রাহ্মণদের মাংস খাওয়া পাপ বলে বিবেচিত হত বলে বোধ হয় তার এরূপ মন্তব্য। তাহলে তারা সমাজের কাছে রাক্ষসী ও ডাইনী নামে পরিচিত হত। কিন্তু কোতালের এই ডাইনী অপবাদই তার ভয়ঙ্কর ও উগ্র মূর্তি প্রদর্শনের কারণ। এই উগ্রমূর্তি দেখে কোতালগণ ভীত হয় এবং দেবী শ্রীমন্তকে প্রতিদানে চায়। তারপরই কাহিনীতে শ্রীমন্তের বালকোচিত অবস্থান স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সেই বালক শ্রীমন্তকে দেবী চণ্ডী কোলে তুলে নেয়। এখানে চণ্ডীর উগ্ররূপের পাশাপাশি শান্ত মাতৃত্বের স্বরূপটি চিত্রিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, সুধীভূষণ ভট্টাচার্য বলেছেন — ''তন্ত্রে মঙ্গলচণ্ডীর নাম বহু স্থলে পাওয়া না গেলেও মঙ্গলচণ্ডীর অনুরূপ বহু শান্তোগ্র দেবতার কথা তন্ত্রে পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে একটিকে মঙ্গলচণ্ডীর তান্ত্রিক রূপ বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয় না।''[২৬৭] দেবী চণ্ডীর মাতৃত্ব স্বরূপের সঙ্গে মানবিকরূপটি কাহিনীতে স্পষ্ট। দেবী চণ্ডী কোতালগণকে শ্রীমন্ত উদ্ধারের জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু তারা দেবীকে চুল ধরে ফেলে দেয়, শ্রীমন্তের সঙ্গে তাকেও প্রহার করে। ফলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। তখন দেবী চণ্ডী তার অলৌকিক শক্তির প্রকাশে কোতালদের সমস্ত অস্ত্র বিনাশ করে দেয়। অরবিন্দ পোদ্দারের ভাষায় বলা যায় — ''... এমন শক্তির অধিকারী হ'লে মানুষ যা করত চণ্ডী তা-ই করছেন — সমস্ত অবাঞ্ছিত বিপদ ও অকল্যাণকে দূর করে কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করছেন।''[২৬৮] তাই তার চামুণ্ডা উগ্র মূর্তিই যুদ্ধের পটভূমিকায় সামঞ্জস্য বলে মনে হয়।

''চামুণ্ডার বেষে জুঝ সঙ্গে নএগ দানা।
মুণ্ডমালা পহ্রু গলে জত রাজসেনা।।''[২৬৯]

দেবী চামুণ্ডা রূপ ধারণ করে দানাগণকে, বলবীর হনুমান ও জমের পুত্র মঙ্গলাকে স্মরণ করে। সে

তাদের নিয়ে যুদ্ধে যাত্রা করে। লক্ষণীয়, জমের পুত্র মঙ্গলার কথা বলতে গিয়ে মূল কাহিনী বহির্ভূত তার শক্তি সম্পর্কে অতিকথন কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করেছে। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণনাভঙ্গিতে এরূপ মূলকাহিনীর প্রসঙ্গে আগত বর্ণনীয় বিষয়ে বহুবিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া কাহিনীতে নতুন নতুন চরিত্রের সংযোগ ঘটেছে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের সমাবেশ কাহিনীর জটিলতা বৃদ্ধি করেছে। যেমন, চণ্ডীর দানাগণের নাম কালবাণ ও জলেশ্বর; অপরপক্ষে রাজা শালবানের সেনা রামানন্দ, রঘুবীর, মানসিংহ, কালুদণ্ড, ভীম ও সাম প্রভৃতি চরিত্র। উভয়পক্ষের যুদ্ধ বিস্তৃত লৌকিক ঝগড়ার মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্ত লাভ করে। তবে দেবী চণ্ডীর চণ্ডালরূপটিই এখানে অধিক স্পষ্ট। বিশেষ করে, তন্ত্রে কালীর উগ্রমূর্তিই বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। শালবান রাজা ও দেবী চণ্ডীর যুদ্ধ অলৌকিক আবহাওয়ায় বর্ণিত হয়েছে। শেষপর্যন্ত শালবানের সকল সেনাপতি সহ সৈন্যের মৃত্যু হয়। তাতে তার আচরণ বাল্য সুলভ। বাধ্য হয়ে শালবানকে দেবীর স্তব করতে হয়েছে। রাজা দেবীর পরিচয় জানতে চাইলে সে অত্যন্ত সুন্দর অভিনব ভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করে। কাহিনী গ্রন্থনায় দেবী চণ্ডীর শালবান রাজার কাছে পরিচয় স্বতন্ত্র সংযোজন বলা যেতে পারে। এরূপ পরিচয় প্রদান ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের দেবী অন্নদাও পাটনীকে দিয়েছিল। চণ্ডী বলে —

"পরিচয় শুন তুমি সর্ব্বস্থানে থাকি আমি
গোড় দামুদরে এক ধাম।
নদিয়াতে নঘড়ি সেইস্থানে দুইবাড়ি
উড়স্যাতে মুনিকট নাম।
* * *
সর্ব্বতীর্থ আছে জথা দুই বাড়ি আছে তথা
তথা নাম আদ্যাভবানী।।
থাকি আমি স্বর্গপুর স্বামী মোর মহেশ্বর
নিত্য স্নান করি গঙ্গাতীরে।"[২৭০]

এই পরিচয় জ্ঞাপক উদ্ধৃতিতে দেবীর পরিচয়ের সঙ্গে মিশে আছে মালদহের আঞ্চলিক সংযোগ সূত্রটি। এইভাবে পরিচয় পত্র দিয়ে মশানের পালা সমাপ্ত করে।

তারপরই দেবী শালবানকে কমলে কামিনী রূপ দর্শন করায়। এই কমলে কামিনী রূপ কোথায় দেখানো হয়েছে তার সদুত্তর কাহিনীর মধ্যে মেলে না। কবি অতিপ্রাকৃত ভাবনাকে কাহিনীতে বেশি স্থান দিয়েছেন। তাই রাজা শালবান কমলে কামিনী রূপ দর্শনের পরই শ্রীমন্ত বিবাহ করতে চাইলে নীলারানীর শত সৈন্যের প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি সামনে আসে। এই

সময় শ্রীমন্ত দেবীকে একলক্ষ ছাগ বলি দেওয়ার পর সৈন্যদের বাঁচিয়ে দিতে বলে। এখানে দেবীর সঙ্গে শ্রীমন্তের ব্যবধান ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবে দেবীর সঙ্গে মানব চরিত্রের কথোপকথন মঙ্গলকাব্যগুলির স্বাভাবিক রীতি। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ক্ষেত্রে তার অন্যথা হয়নি। কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন — "সকল মঙ্গলকাব্যের মতো চণ্ডীমঙ্গলেও দেবতা ও মানুষের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান রাখা হয় নাই। বরং দেব ও মানবের মধ্যে সহজ স্বাভাবিক পরিচয় ও ভাবের আদান-প্রদান দেখানো হইয়াছে। ... দেবমানবের এই প্রকারের সম্পর্কস্থলে তাহা অস্বাভাবিক একেবারেই নয়। তাহাতে কাব্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার কথা নয়। কিন্তু সেই ঘটনার মধ্যেও একটা রসশৃঙ্খলা থাকা চাই।"[২৭১] সেই রস শৃঙ্খলা এই কাব্যে রয়েছে। শ্রীমন্তের কথায় চণ্ডী হনুমান কর্তৃক শালবানের সমস্ত সৈন্যদেরকে যমালয় থেকে আনার মধ্যে সেই শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে। তাতেই সিংহলে রাজা শালবান কর্তৃক চণ্ডী পূজা প্রচলন হল। চণ্ডীপূজার পরিধি বর্দ্ধিত হল। সিংহলে দেবীর পূজা প্রচলন পর্যন্ত শ্রীমন্তের জীবন অলৌকিকতা দ্বারা প্রভাবিত। কাহিনী এই পর্যন্ত অতিপ্রাকৃতের আলো-ছায়ায় প্রবাহিত হয়।

এরপর কাহিনী গ্রন্থনায় বাংলার গৃহ সংসারের ছোঁওয়া পায়। বঙ্গদেশের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি শ্রীমন্তের জীবনকে দোলা দিয়ে যায়। শ্রীমন্তের সঙ্গে পূর্ব-শর্তানুযায়ী সিংহল-রাজ শালবানের কন্যা সুশীলার বিবাহ বিষয়টি উপস্থিত হয়। বিবাহের জলসাধার অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ দিয়ে পুথি পড়ে প্রথমে গণপতির পূজার পর দুর্গার স্তব করা হয়। এখানে চণ্ডী ব্রাহ্মণ দ্বারা উচ্চ হিন্দু গৃহে পূজা পেল। পূজার পর নীলারানীর ধান দুর্বা মাথায় দিয়ে বর বরণ করে নেওয়ার প্রথা পালন বর্ণিত হয়েছে। এদিকে সুশীলার সজ্জা চলছে। সাধারণত আমাদের বাঙালী গৃহে যা হয় তাই এখানে পরিলক্ষিত হয়েছে। বিবাহের শুভক্ষণ দেখে, বরবরণ, মধুপর্ক, পিতার কোলে বিবাহ মণ্ডপে আসা, শ্রীমন্তের সঙ্গে সুশীলার সপ্তবার প্রদক্ষিণ, মালাবদল এবং বিবাহে বিভিন্ন দানসামগ্রী দান প্রভৃতি ছাড়াও আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক দানের দ্রব্য সামগ্রী প্রদান সেকালে আশ্চর্যের বিষয়। সেই সঙ্গে ঋতুদর্শনের পূর্বে বালিকা কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার রীতি উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও প্রচলিত ছিল। সে যাইহোক, সকলে দান প্রদান করলেও শ্রীমন্ত দানস্বরূপ বন্দীঘর চায়। সে পিতাকে সনাক্তকরণের পরিচয় পত্র দ্বারা বুঝতে পারে। সেই সনাক্তকরণের বর্ণনা ধনপতির মত বণিকের ক্ষেত্রে হাস্যরসাত্মক বলে মনে হয়। কবি লিখেছেন —

"বুকতে লেখিঞা ছিল সাত গোটা তিল।
কপালের দক্ষিনে আছে একটা আচিল।।
মোর পিতা লঙ্ঘিল চণ্ডীর খটখানি।
বাম পাএ গোদ দক্ষিন চক্ষে ছানি।।

পত্র অনুসারে সাধু পিতাকে চিহ্নিল।
জত্ন করিঞা সাধু বন্দীকে রাখিল।।"[২৭২]

বন্দী পিতার প্রতি পুত্রের রুচিশীলতার পরিচয় রয়েছে। শ্রীমন্ত পিতা ধনপতিকে নাপিত এনে শুদ্ধ করে। পিতা-পুত্রের মিলনের পূর্বে উভয়ের সম্পূর্ণ ব্যক্তি পরিচয় ও অতীতের ঘটনা অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে প্রকাশ করে। শ্রীমন্ত তার এই রাজ্যে আগমণের কারণ বলতে গিয়ে চণ্ডীর সহায়তা ও প্রশংসা করে এবং সে বলে মাতা খুল্লনা চণ্ডীর পরমভক্ত। তার জন্যে মশানে দেবী চণ্ডী তার প্রতি সহায় হয়। একথা শ্রবণে ধনপতি তার কোন প্রতিক্রিয়া দেখায় নি। এমনকি, একই গৃহে খুল্লনা শাক্তধর্মের আচার পালন করে আর ধনপতি সেখানে বিপরীত শৈব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। এই বিপরীত ধর্মের দ্বন্দ্ব এখানে সম্ভাব্য ও অনিবার্য ছিল। কিন্তু তা হয়নি। ফলে কাহিনী এখানে অনেকটা সহজ-সরল।

এই সহজ-সরলকাহিনীতে লক্ষ্য করা যায় যে, শ্রীমন্ত সুশীলাকে নিয়ে শয্যায় যাওয়ার ঘটনাটি। সেই সঙ্গে আসে কাহিনীতে গতিপরিবর্তনের ঝড়। যখন কাহিনীতে চরিত্ররা সুখের গৃহ-সংসার করতে আরম্ভ করে সেই মুহূর্তেই দেবী চণ্ডীর আগমন ঘটে। দেবী চণ্ডী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বদ্ধ জীবনকে নাড়া দিয়ে যায়। তার ফলে কাহিনী গ্রন্থনায় দেবী চণ্ডীর অলৌকিকতা ঘটনা, চরিত্র ও পটভূমি পরিবর্তনের সহায়ক। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অতিপ্রাকৃত ঘটনার দ্বারা চরিত্র, ঘটনা ও পটভূমি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তাঁর কাব্যে এটা কাহিনী গ্রন্থনার দিক থেকে সাধারণ লক্ষণ বলা যেতে পারে। এখানে শ্রীমন্ত সুশীলার সঙ্গে সিংহলে বিবাহ জীবন সূত্রপাত করলে সেই সময় চণ্ডী খুল্লনার রূপে তাকে স্বপ্ন দেখায়। এই স্বপ্নই শ্রীমন্তকে বিচলিত করে এবং নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে মনস্থির করে। সে উজানীতে যেতে চায় এবং সুশীলা স্বামীর প্রতি প্রীতিবশত বারমাসের দুঃখ-কষ্টের যন্ত্রণাকে বারমাস্যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছে। সুশীলার এই বারমাস্যা বর্ণনার পিছনে কোন কঠোর সামাজিক সমস্যার পটভূমি ছিল না। স্বাভাবিক কাহিনীর ধারায় তা বর্ণিত হয়েছে। তবে, এই বারমাস্যা নর-নারীর অদর্শনে নারী কণ্ঠে উচ্চারিত বেদনাতুর দীর্ঘশ্বাস। শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য বলেছেন — "একদিকে বারমাস্যার শাশ্বত নারীচরিত্রের এই প্রেম-প্রীতির দিক যেমন উদ্ভাসিত, অপরদিকে নারীচরিত্রের অজস্র বিশ্বাস, সংস্কারের দিকটিও বারমাস্যার মধ্যে চির-উজ্জ্বল হয়ে আছে।"[২৭৩] এখানে সুশীলার বারমাস্যায় প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তার জীবনের সংযোগ, উচ্চবিত্তের পাশা খেলা, ব্রাহ্মণ দিয়ে দুর্গাপূজা করা এবং নবান্ন উৎসব পালনের অনবদ্য আলেখ্য মূর্ত হয়ে উঠেছে। এছাড়া সুশীলার বারমাস্যা নারী জীবনের অপূর্ব পাতিব্রত্য, আত্মবিস্মৃতিমূলক সেবা ও শুশ্রূষার মধ্যে এর সাহিত্য মূল্য রয়েছে। শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের ভাষায় বলা যায় — "প্রকৃতির সংগে, আকাশ-বাতাস, জল-মাটির সঙ্গে সেদিনের মানুষের সম্বন্ধ ছিল

পরম আত্মীয় অন্তরঙ্গের সম্বন্ধ। প্রকৃতি রাজ্যের বিচিত্র শব্দ ও স্পর্শ, রূপ ও রস মানবমনে জাগাতো বিচিত্র ভাব ও সুর। বর্ষা-বসন্ত-শরতাদি ঋতু প্রকৃতির বিচিত্র ধ্বনি ও রূপলীলা মানুষের কাছে ছিল শোকে সান্ত্বনা, বিপদে আশা ও আশ্বাস এবং উৎসবে, সম্পদে আনন্দ ও উল্লাসের অনন্য উৎস। তাই বারমাস্যা সাহিত্যের নরনারীর ভাষা মানুষ ও প্রকৃতির সহজ মিলন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাপ্রসূত অন্তর্গাঢ় প্রাণরস সিঞ্চিত সহজ ভাষা। এদের ভাষা, শিল্পবোধ, সারস্বত ধ্যান-চর্চা-সঞ্জাত নয়, অনায়াস জাত, প্রেমসিক্ত চিত্তের সহজ ও অনিবার্য ধ্বনিময় অভিব্যক্তি।"[২৭৪] সুশীলা বারমাস্যায় এই প্রাকৃতিক জগতের বিচিত্র ধ্বনি স্বামীর প্রতি তার আশ্বাস ও আনন্দে, উল্লাসে অতিবাহিত করার উপায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাই সুশীলা স্বামী শ্রীমন্তের উদ্দেশ্যে বলে —

"চৈত্রমাসে একস্থানে থাকিব শুইঞা।
সুশীলার তরে প্রভু না জাবে ছাড়িঞা।।
বৈশাখের কথা শুন সাধুর নন্দন।
কুমকুম কস্তুরী দিব আগর চন্দন।।
জ্যৈষ্ঠ মাসতে প্রভু প্রচণ্ড তপন।
দলিচা ফেলিয়া প্রভু করিব শয়ন।।
*　　　　*　　　　*
আশিনে দুর্গার পূজা শুনহ বচন।
ব্রাহ্মণে লইঞা সাথে করিহ পূজন।।
কার্ত্তিক মাসের কথা শুন একবারে।
আনাব তোমার মাতা সিংহল নগরে।।
অগ্রাহন মাসে হবে হেমন্ত ধান্য।
নানা সুখ ভোগে প্রভু করিহ নবান্ন।।"[২৭৫]

তার বারমাস্যায় অন্তর্জগতের শূন্যতাকে উচ্চবিত্তের বিভিন্ন উৎসবের আনন্দ সিঞ্চন দ্বারা অতিবাহিত করার ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে। সুশীলার দুঃখ-কষ্ট প্রকৃতি রাজ্যের সঙ্গে এবং বিভিন্ন আনন্দ-উৎসবের সঙ্গে জীবনের সংযোগ সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা চিরস্মরণীয় বলে মনে হয়।

শেষ পর্যন্ত, শ্রীমন্তকে সুশীলার বারমাস্যার ইচ্ছাকে অতিক্রম করে উজানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হয়। তার যাত্রায় সিংহলের সকলের শোক অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত বলে মনে হয়। পিতা-মাতা, ভাই, বান্ধব ও আত্মীয় পরিজন জামাতার অদর্শনজনিত হৃদয়ের টানে তাদের শোকে আচ্ছন্ন করতে পারে তা স্বাভাবিক। কিন্তু রাজার পাত্র-মিত্রসহ সিংহলবাসীর শ্রীমন্তের ফিরে যাওয়ার জন্য কান্নায় ভেঙে পড়ার মধ্যে কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সম্ভবত

রাম-সীতার বনবাস যাত্রার ছায়া এখানে পড়ে থাকবে। এরপর শ্রীমন্ত পিতা ও স্ত্রীকে নিয়ে নিজ দেশে যাত্রা করে। যাত্রা পথে মগরার বিবরণে অকস্মাৎ ধনপতির বাক্‌স্ফূর্তি আমাদের হতচকিত করে। কাহিনীতে আমরা লক্ষ্য করি যে, শ্রীমন্তের সিংহল আগমন পিতা ধনপতিকে উদ্ধারের জন্য, কিন্তু কাহিনীতে সেই সময় থেকে ধনপতির কোন স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায় না। মগরার বিবরণে তার বাক্‌স্ফূর্তি সত্যিই অবাক ও আশ্চর্যের বিষয়। সমাজপতি হিসাবে ধনপতির জবাবদিহি ও দায়িত্ববোধের প্রকাশ সঙ্গত। তার এই কথায় সুশীলার চণ্ডীর পূজার ঘটনা বিবৃত হয়েছে। দেবী পূজায় তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব পাওয়া যায়। রজো গুণের অধিকারী জবা ফুল ও আদ্যের মন্ত্র দ্বারা দেবী চণ্ডীর পূজার বিবরণ তার স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। কবি বলেছেন —

"পূজার জতেক দব্য করিল সাজন।
জবা পুষ্প দিঞা পূজে দুর্গার চরণ।।
আদ্য মন্ত্রে সুশীলা চণ্ডীকে স্মরিল।
আসিঞা জগত মাতা দরশন দিল।।"[২৭৬]

সুশীলার পূজায় তুষ্ট চণ্ডী ধনপতির সপ্ত ডিঙ্গাসহ সকলকে উদ্ধার করে। কাহিনী গ্রন্থনায় এখানে রামায়ণের প্রভাব রয়েছে বলে মনে হয়। চণ্ডী গরুড় দ্বারা মগরায় হারানো সম্পদ ধনপতিকে ফিরিয়ে দিল। পুত্র-পুত্রবধূসহ পিতা ধনপতি উজানীতে ফিরে এল। তাদের প্রত্যাবর্তনের ঘটনা জানতে পেয়ে খুল্লনা এয়োগণকে নিয়ে 'বহিত' বা নৌকা পূজা করতে যায়। এয়োরা কাহিনীতে চরিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে এবং খুল্লনা পুত্রবধূকে বরণ করে নিল। এদিকে ধনপতি আগর চন্দন, প্রবাল, চামড়া ও শঙ্খ নিয়ে উজানীর রাজা বিক্রমকেশরকে ভেট দিতে যায়। কিন্তু কেন যায় তার কোন কার্যকারণ সূত্র মেলে না। দীর্ঘদিন পর দেশে আসার পর সংসারের প্রতি তার কোন গভীর আকর্ষণ দৃষ্ট হয় না। আসলে ধনপতিকে সমগ্র কাহিনীতে কোথাও সংসারানুরাগী বাঙালী গৃহকর্তার আচরণের অভিব্যক্তি মেলে না। তাই এখানে দীর্ঘ বারবছর পরেও তার সংসারে প্রবেশের তুলনায় রাজদরবারে ভেট দেওয়াই বড় হয়ে দাঁড়ায়। কাহিনীর গতিমুখ অনুযায়ী চরিত্রটি পরিচালিত হয়েছে। তাই চরিত্রটি কাহিনী গ্রন্থনায় ব্যক্তি স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে পারে নি।

কিন্তু বিক্রমকেশর চরিত্রটি মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রাজাকে ভেট দেওয়ার সময় ধনপতির মাধ্যমে সে সমস্ত পূর্বঘটনা শ্রবণ করে। তাই সিংহল রাজা শালবানের প্রতি তার অনুরূপ ভাবে অন্তরে হিংসাত্মক মনোভাবনা জাগ্রত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিক্রমকেশর চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। সেই ঈর্ষার ফলস্বরূপ সে ধনপতিকে বন্দী করে। সেই সময় শ্রীমন্ত পিতাকে সন্ধান করতে উজানী নগরের রাজ দরবারে যায়। রাজা বিক্রমকেশর সিংহল রাজার ন্যায় কন্যা জয়াবতীকে শ্রীমন্তের সঙ্গে বিবাহ এবং রাজ্যের অর্ধাংশ দান করে।

খুল্লনার এই বিবাহে সহমত দেওয়া অস্বাভাবিক ঠেকে। খুল্লনা নিজে সতীন সমস্যায় হৃদয়ের যন্ত্রণা এবং যার পর নাই শাস্তি ভোগ করেও পুত্রের দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দেওয়া তার চরিত্র অঙ্কনের পরিকল্পনায় অসংগতি বলে মনে হয়। কবির কথায় —

"খুলনা বলেন বাছা শুনহ বচন।
হস্তে পাইলে চন্দ্র ছাড়ে কুনজন।।"[২৭৭]

কিন্তু সুশীলা শ্রীমন্তের বিবাহ বার্তা শুনেই হাতের শাঁখা ভেঙে ফেলার মধ্যে। তার মধ্যে সত্যাসত্য বিচার করার অবকাশ দেখা যায় না। কিন্তু বিবাহের পূর্বে শ্রীমন্ত জয়াবতীকে সুশীলার দাস করে রাখবার প্রবোধবচন শুনিয়ে যায়। বিবাহের পর সংসার ধর্মের বা সংসার জীবনের কোন আভাস পর্যন্ত নেই। কাহিনীর মূল উদ্দেশ্য দেবীর পূজার প্রচার। সেই কারণে পূজা প্রচারের দিকে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবন অঙ্কনে বিরলতা লক্ষ্য করা যায়। তাই চার রাজ্যের চার নারীর দ্বারা দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচার করাই মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মূল অভিসন্ধি ছিল। কবি লিখেছেন —

"চারিরাজ্যের চারিজন একত্র হইল।
দুর্গাকে পূজিতে সভে একচিত্ত কৈল।।"[২৭৮]

শ্রীমন্ত কর্তৃক পিতার সম্মুখে একে একে চার যুগে চণ্ডীর পূজা ও তার ফলশ্রুতি তুলে ধরলে ধনপতি দেবী চণ্ডীর পূজা করে এবং ষষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করে। পূজা করার পর দেবীর বরে তার গোদ ও চোখের ছানি দূর হয়। ধনপতির সম্মুখে দেবী চণ্ডী স্বীয় পরিচয় প্রদান কালে তার দ্বারা শিব পূজার কথা বলে। "ত্রিতীয় প্রহরে জাঙ্ শিব পুজিবারে।।"[২৭৯] এখানে শিব ভক্ত ধনপতি শক্তি দেবীর পূজা এবং শক্তিদেবীর শিব পূজার মধ্যে দুই ধর্মের সমন্বয়বাণী ধ্বনিত হয়েছে বলে মনে হয়। এভাবে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সমন্বয়ের এক সুর ধ্বনিত করে কাহিনী সমাপ্তির দিকে যাত্রা করেছে।

এবার কাহিনীতে স্বর্গ যাত্রার পালা আসে। তাই দেবী চণ্ডীর ব্রতানুষ্ঠান সম্পন্ন হলে খুল্লনা, শ্রীমন্ত, জয়া ও সুশীলাকে নিয়ে স্বর্গে যাত্রা করে। এখানে মর্ত্য সংসার ত্যাগ করে যাওয়ার তারা কষ্ট অনুভব করে না। কেবল খুল্লনা স্বামীর জন্য একটু কষ্ট প্রকাশ করে এবং লহনার কাছে তার সমস্ত ভার দিয়ে যায়। লক্ষণীয়, ধনপতি ও লহনাকে চণ্ডী মর্ত্যভূমি থেকে উদ্ধার করে নি। তারা মর্ত্যেই থেকে যায়। কেন করেন নি তার কোন সুস্পষ্ট জবাব কবি কাব্যে দেন নি। তা কাহিনী গ্রন্থনায় অত্যন্ত রহস্যজনক বটে। কাব্যের শেষে তথা ধনপতি খণ্ডে এরূপ রহস্য রেখেই কবির ব্রতকথার প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। আখেটিক খণ্ড বা ব্যাধ খণ্ডের শেষে কোন ব্রতকথার উল্লেখ পাওয়া যায় না। সেখানে কালকেতু নামক এক ব্যাধের দ্বারা দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচার পায়।

আর ধনপতি বা বণিক খণ্ডে নারীর দ্বারা দেবীর পূজা প্রচার বিস্তার লাভ করেছে। লক্ষণীয় যে, মানিক দত্তের কাব্যের শেষে 'ব্রতকথা' বলে একটি অংশই রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে —

> "সোমবারে সর্ব্বলোক পূজিহ আপুনি।
> মনের বাসনা পূর্ন করিবে ভবানী।।
> পূজার নিয়ম কথা শুন সর্ব্বজন।
> করিহ দুর্গার পূজা হবে পুত্রধন।।
> ব্রতকথা শুনি সভে করহ প্রনতি।
> গাইল মানিক দত্ত মধুর ভারতী।।"[২৮০]

অর্থাৎ, ব্রতকথা পালন করলে মনের বাসনা পূর্ণ হবে। সেই বাসনা হল পুত্র সন্তান। যা পারিবারিক সুখ-শান্তির জন্য একান্ত প্রয়োজন। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সেই উদ্দেশ্যকে সমানে রেখে রচিত হয়েছে বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত, মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে ব্রতকথার পার্থক্য বলতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য ব্রতকথার কয়েকটি লক্ষণ তুলে ধরেছেন — "ব্রতকথার ভিতর দিয়া নারীজীবনের ব্যক্তিগত নানা ঐহিক কামনার অভিব্যক্তি দেখা যায় — মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে বৃহত্তর সমাজ-চেতনা রূপলাভ করে। ব্রতকথার আবৃত্তি পারিবারিক অনুষ্ঠান মাত্র, কিন্তু মঙ্গলগান বৃহত্তর সামাজিক অনুষ্ঠান।... একটির ভিতর দিয়া পারিবারিক জীবন ও অপরটির ভিতর দিয়া গোষ্ঠীজীবন প্রতিফলিত হইয়া থাকে।"[২৮১] সমগ্র চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীকে এখানে ব্রতকথার মধ্য দিয়ে সংক্ষিপ্ত রূপে পরিস্ফুট করে তোলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন — "ব্রতকথার প্রধান ধর্ম সংক্ষিপ্ততা, বর্ণনার বাহুল্য ইহাতে সাধারণত পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। ইহা মৌখিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য; কারণ, সংক্ষিপ্ততা স্মরণ করিয়া রাখিবার পক্ষে সহায়ক হইয়া থাকে।"[২৮২] তাঁর কাব্যে ব্রতকথার এই বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে। এই কাব্যটি মৌখিক সাহিত্যের ন্যায় অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ। কাহিনী গ্রন্থনা অনেকাংশে লোকপ্রত্যয়, লোকবিশ্বাস, লোকগল্প দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, হরিপদ চক্রবর্তী সুনীলকুমার ওঝার সম্পাদিত মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'কবি মানিকদত্ত প্রসঙ্গে' অংশে বলেছেন — "কাহিনী বিন্যাসে প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে যে রূপকথা, লৌকিক কাহিনী, লোকায়ত প্রত্যয়ের মিশ্র প্রকাশ আছে তা অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গলে বিরল। অর্থাৎ মঙ্গলকাব্য-ধারায় প্রাচীন রূপটি ইহার মধ্যে অধিকতরভাবে বিদ্যমান।"[২৮৩] যার ফলে কবি প্রথম চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাঠামো তৈরী করার জন্য মূল কাহিনী অতিক্রম করে কখন কখন দেবীর অলৌকিক মহিমা ও স্বরূপের প্রতি বেশি দৃষ্টিপাত করেছেন। তিনি অযথা কাহিনীতে অতিরিক্ত চরিত্রের বাহুল্য এনেছেন। তাতে ঘটনা বিস্তারিত হয়েছে। তার ফলে কখন কখন সেই সকল অতিরিক্ত চরিত্রগুলি নিয়ে ছোট ছোট উপকাহিনীর সৃষ্টি হয়ে যায়। এছাড়া পুরাণ অবলম্বনে ঘটনা ও

চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সেই ক্ষেত্রে চরিত্রগুলি অলৌকিক ঘটনা দ্বারা অচ্ছন্ন হওয়ায় তাদের প্রকৃত মানবিক বিকাশে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হয়তো কবি সামাজিক সতর্কীকরণ, লোক সমাজের আকর্ষণের প্রতি এবং লোকমানসে দেবতার প্রভাবের উপর অধিক দৃষ্টিপাত করার জন্য কাহিনীর বাস্তব জীবনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক (Clossness of reallife) অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তাতে ঘটনা ও বিষয়বস্তু তাঁর কাব্যের লক্ষ্য হয়েছে, উপলক্ষ্য হয়েছে ব্যক্তি ও সমাজ। তবে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ সম্পর্কিত রীতি-নীতি-আচারগুলি বাস্তব সম্মত বলে মনে হয়। সতীন সমস্যার দৃঢ়বাস্তব ঘটনারও বর্ণনা কবি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করেছেন। প্রথম খণ্ডে কবি কাহিনীকে পূর্ণ বৃত্তাকারে সম্পন্ন করতে না পারলেও শেষের খণ্ডে শ্রীমন্তের দ্বারা তা পূর্ণ করেছেন। মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের কবি মানিক দত্ত তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী গ্রন্থনায় অনেকাংশে গতিশীলতা লাঘব, অনিবার্যতা লঙ্ঘন, অসম্ভব ঘটনার সংস্থান করেছেন বটে। তবে এই কাহিনী গ্রন্থনা পাঠককে অত্যন্ত কৌতূহলী ও গঠনকৌশল সম্পর্কে জিজ্ঞাসু করে তুলেছে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এই কাহিনী গ্রন্থনার স্তম্ভ হল চরিত্র। চরিত্র ছাড়া প্লট বর্ণিত হতে পারে না। তাই কাহিনীর মুখ্য উপজীব্য চরিত্র। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সেই চরিত্র বিশ্লেষিত হবে পরবর্তী অধ্যায়ে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। Aristotle; Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art, S. H. Butcher's translation, Kalyani publisheers, New Delhi, reprinted, 2001, chap I, p. 7.

২। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৩৬৯, পৃ. ১১-১২।

৩। J. A. Curddon; Dictionary of Literary Terms & Literary Theory, Penguin Publishers, 1999, p. 676.

৪। Aristotle; Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art, S. H. Butcher's translation, Kalyani publisheers, New Delhi, reprinted, 2001, chap VII, p. 31-33.

৫। Id; Chap VIII, p. 33-35.

৬। Id; chap XXIII, p. 89 .

৭। E.M. Forster; Aspects of the Novel, Penguin Books, Reprinted 1963, 1964, p. 93-94.

৮। Id.

৯। Id; p. 95.

১০। শ্যামাপ্রসাদ সরদার; প্লট, সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, অলোক রায় সম্পাদিত, সাহিত্যলোক, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৬৭, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ, আগষ্ট, ২০০৬, পৃ. ১৫০।

১১। অলোক রায়; সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, অলোক রায় সম্পাদিত, সাহিত্যলোক, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৬৭, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ, আগষ্ট, ২০০৬, পৃ. ৭২।

১২। Aristotle; Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art, S. H. Butcher's translation, Kalyani publisheers, New Delhi, reprinted, 2001, chap X, p. 39.

১৩। Id; p. 39-41.

১৪। শ্যামাপ্রসাদ সরদার; প্লট, সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, অলোক রায় সম্পাদিত, সাহিত্যলোক, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৬৭, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ, আগষ্ট, ২০০৬, পৃ. ১৫২।

১৫। কুন্তল চট্টোপাধ্যায়; সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট, ১৯৯৫, পঞ্চম মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০০৩, পৃ. ১৪৯।

১৬। তদেব।

১৭। তদেব।

১৮। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৮৭।

১৯। রজনীকান্ত চক্রবর্তী; মানিকদত্তের মঙ্গলচণ্ডী, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু, একাদশ ভাগ, প্রথম সংখ্যা, ১৩১১, পৃ. ৩৫।

২০। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১।

২১। তদেব।

২২। ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক; রামাই পণ্ডিত বিরচিত শূন্যপুরাণ, ফার্মা কে.এল.এম. প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৭, পৃ. ৬৯-৭১।

২৩। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২

২৪। তদেব; পৃ. ৩।

২৫। তদেব; পৃ. ৪।

২৬। ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত; রামাই পণ্ডিত বিরচিত শূন্যপুরাণ, ফার্মা কে.এল.এম. প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৭, পৃ. ৮৩।

২৭। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৫।

২৮। তদেব; পৃ. ৭।

২৯। তদেব; পৃ. ৮।

৩০। তদেব; পৃ. ১০।

৩১। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত বিষ্ণুপুরাণম্, দ্বিতীয়াংশ, অষ্টম অধ্যায়, নবভারত পাবলিশার্স, প্রথম নবভারত সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৩৯০, পৃ. ১৪৭।

৩২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১০।

৩৩। সুকুমার সেন সম্পাদিত; বিপ্রদাসের মনসাবিজয়, এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৩৮, পৃ.৫।

৩৪। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; পদ্মপুরাণ (সৃষ্টিখণ্ড), ৫৬ অধ্যায়, বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন যন্ত্রে নটবর চক্রবর্তীর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ, ১৩২৬ সাল, পৃ. ৬৯৭।

৩৫। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৪।

৩৬। নীহাররঞ্জন রায়; বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৬, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৪, পৃ. ৭১৪।

৩৭। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৬।

৩৮। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (? — ষোড়শ শতাব্দী), আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪০, অষ্টম আনন্দ মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ. ১১২।

৩৯। তদেব; পৃ. ৪৫৭।

৪০। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৬।

৪১। তদেব; পৃ. ১৭।

৪২। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৮৮।

৪৩। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৭।

৪৪। শম্ভুনাথ কুণ্ডু; প্রাচীন বঙ্গে পৌরাণিক ধর্ম ও দেবভাবনা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি,

১৯৯৬, পৃ. ৩৪৩-৪৪।

৪৫। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৭।

৪৬। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত; কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৬৪, পুনর্মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯০, পৃ. ৩৫-৩৬।

৪৭। শম্ভুনাথ কুণ্ডু; প্রাচীন বঙ্গে পৌরাণিক ধর্ম ও দেবভাবনা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৪৪।

৪৮। Alige Getty; Ganesa (A monograph on the Elephant Faced God), Munshiram Monoharlal, New Delhi, First Published in 1936, Second edition, December, 1971, p. 1.

৪৯। শম্ভুনাথ কুণ্ডু; প্রাচীন বঙ্গে পৌরাণিক ধর্ম ও দেবভাবনা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৮৫-৮৬।

৫০। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৮।

৫১। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত; মহাভারতম্ (জন্মশতবার্ষিক-সংস্করণম্), কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীতম্, বনপর্ব্ব, ১০ অধ্যায়, বিশ্ববাণী প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় (বিশ্ববাণী) সংস্করণ, মাঘ ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৯৩৪-৩৫।

৫২। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; স্কন্দ-পুরাণম্, মাহেশ্বর খণ্ডম — কেদার খণ্ডম্, ২৭ অধ্যায়, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস বিরচিতম, অনুবাদক তারাকান্ত দেবশর্মা কাব্যতীর্থ, বঙ্গবাসী-ইলেকটো-মেশিন-প্রেসে নটবর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩১৮ সাল, পৃ. ১৬২।

৫৩। রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত; কালীদাসের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, দশম সর্গ, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বিশেষ পরিবর্ধিত-পরিশোধিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, চতুর্থ সংস্করণ হতে পুনর্মুদ্রণ, দশম সংস্করণ, ১৩৫৭, পৃ. ১৭৩।

৫৪। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৮-১৯।

৫৫। তদেব; পৃ. ১৯।

৫৬। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; মার্কণ্ডেয়পুরাণম্, মহর্ষি দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত, জীব ন্যায়তীর্থ পরিশোধিত, নবভারত পাবলিশার্স, প্রথম নবভারত সংস্করণ, ৮১ অধ্যায়, আষাঢ়, ১৩৯০, পৃ. ৩২৫।

৫৭। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; দেবী-ভাগবত (বঙ্গানুবাদ), তৃতীয় সংস্করণ, বঙ্গবাসী ইলেকট্রো মেসিন

মন্ত্রে, নটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩৩১ সাল, প্রথম স্কন্দ, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১৫)।

৫৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২০।

৫৯। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; মার্কণ্ডেয়পুরাণম্, ৮২ অধ্যায়, মহর্ষি দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত, জীব ন্যায়তীর্থ পরিশোধিত, নবভারত পাবলিশার্স, প্রথম নবভারত সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৯০, পৃ. ৩২৯।

৬০। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২১।

৬১। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; মার্কণ্ডেয়পুরাণম্, ৮৭ অধ্যায়, মহর্ষি দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীত, ড. জীব ন্যায়তীর্থ পরিশোধিত, নবভারত পাবলিশার্স, প্রথম নবভারত সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৯০, পৃ. ৩৪৮।

৬২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২২।

৬৩। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; মার্কণ্ডেয়পুরাণম্, ৮৮ অধ্যায়, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত, জীব ন্যায়তীর্থ পরিশোধিত, নবভারত পাবলিশার্স, প্রথম নবভারত সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৯০, পৃ. ৩৫২-৫৩।

৬৪। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২২।

৬৫। সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত; পৌরাণিক অভিধান, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লি:, প্রথম সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৬৫, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৬৯, পৃ. ১০৮-০৯)।

৬৬। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২২-২৩।

৬৭। তদেব; পৃ. ২৫।

৬৮। তদেব; পৃ. ২৬।

৬৯। তদেব; পৃ. ২৭।

৭০। তদেব; পৃ. ২৮।

৭১। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; মার্কণ্ডেয়পুরাণম্, দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত, জীব ন্যায়তীর্থ পরিশোধিত, নবভারত পাবলিশার্স, প্রথম নবভারত সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৯০, ৮৬ অধ্যায়, পৃ. ৩৪৬।

৭২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩০।

৭৩। তদেব; পৃ. ৩৩।

৭৪। তদেব; পৃ. ৩৭।

৭৫। তদেব; পৃ. ৪০।

৭৬। তদেব; পৃ. ৪৩।

৭৭। তদেব; পৃ. ৪৬।

৭৮। তদেব।

৭৯। তদেব।

৮০। তদেব; পৃ. ৪৭।

৮১। অরবিন্দ পোদ্দার; মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত), অক্টোবর, ১৯৫৮, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৯৯৯, পৃ. ৭৪।

৮২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৪৯।

৮৩। তদেব; পৃ. ৫০-৫১।

৮৪। তদেব; পৃ. ৫২।

৮৫। তদেব; পৃ. ৫৫।

৮৬। তদেব; পৃ. ৫৭।

৮৭। আশিস্‌কুমার দে; মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য : ভাষাপট ও ভাবকথা, প্রথম খণ্ড, শৈলী, প্রথম প্রকাশ, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭, পৃ. ৩৬।

৮৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৬২।

৮৯। তদেব; পৃ. ৬৫।

৯০। তদেব; পৃ. ৬৭।

৯১। তদেব; পৃ. ৬৯।

৯২। রজনীকান্ত চক্রবর্তী; গৌড়ের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), সম্পাদক মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৩১১।

৯৩। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৭০।

৯৪। সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা ও ভূমিকা; রামায়ণ, কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিরচিত, ভারবি, ভারবি দ্বারা প্রথম প্রকাশিত, পৌষ, ১৩৮৭, পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৪১৮, পৃ. ৪৭১।

৯৫। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন

পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৭০।

৯৬। তদেব; পৃ. ৭২।

৯৭। তদেব।

৯৮। তদেব; পৃ. ৭৩।

৯৯। তদেব; পৃ. ৭৬-৭৭

১০০। তদেব; পৃ. ৭৭।

১০১। তদেব।

১০২। তদেব; পৃ. ৭৮।

১০৩। তদেব; পৃ. ৭৯।

১০৪। তদেব।

১০৫। সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা ও ভূমিকা; সুন্দর কাণ্ড; রামায়ণ, কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিরচিত, ভারবি, ভারবি দ্বারা প্রথম প্রকাশিত, পৌষ, ১৩৮৭, পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৪১৮, পৃ. ২৯৮।

১০৬। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৮৭-৮৮।

১০৭। সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা ও ভূমিকা; রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড, কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিরচিত, ভারবি, ভারবি দ্বারা প্রথম প্রকাশিত, পৌষ, ১৩৮৭, পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৪১৮, পৃ. ২১০-২১১।

১০৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৯২।

১০৯। তদেব; পৃ. ৯৬।

১১০। তদেব।

১১১। তদেব; পৃ. ৯৭।

১১২। তদেব।

১১৩। তদেব।

১১৪। তদেব; পৃ. ৯৮।

১১৫। তদেব; পৃ. ৯৯।

১১৬। তদেব।

১১৭। তদেব; পৃ. ১০০।

১১৮। তদেব; পৃ. ১০১-১০২।

১১৯। তদেব; পৃ. ১০৭।

১২০। John Woodroffe; sakti and sakta, Ganesh & Co. (Madras) Private LTD., Madras 17, fifth edition, 1959, p. 10.

১২১। শশিভূষণ দাশগুপ্ত; ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৩৬৭, অষ্টম মুদ্রণ, কার্তিক ১৪১৬, পৃ. ৬৩।

১২২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১০৯।

১২৩। শশিভূষণ দাশগুপ্ত; ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৩৬৭, অষ্টম মুদ্রণ, কার্তিক, ১৪১৬, পৃ. ৭০।

১২৪। Pronab Bandyopadhy; The Goddess of Tantra, Punthi Pustak, Calcutta, First published, 1988, Revised Enlarged Second Edition, 1990, p. 2.

১২৫। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১০৯।

১২৬। ভবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী; মানিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী, প্রতিভা, সম্পাদক অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার, ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কার্য্যালয় থেকে প্রকাশিত, অগ্রহায়ণ - পৌষ সংখ্যা, তৃতীয়বর্ষ, ১৩২০, পৃ. ২৯৪।

১২৭। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; দেবী পুরাণম্ মূল ও বঙ্গানুবাদ, ২৭ অধ্যায়, বেদব্যাস-বিরচিতম্, দ্বিতীয় সংস্করণ, বঙ্গবাসী ইলেকট্রো মেসিন যন্ত্রে নটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩৩৪ সাল, পৃ. ১৩৮।

১২৮। সুকুমার সেন; শিব-ঠাকুর ও সম্পর্কিত নারী-দেবী, প্রবন্ধাবলী (১ম খণ্ড — বিচিত্র-দেবতা), এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৪, পৃ. ১৫৬।

১২৯। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১১৩।

১৩০। তদেব; পৃ. ১১৫।

১৩১। তদেব; পৃ. ১১৫-১১৬।

১৩২। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত; দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫২, পৃ.   ।

১৩৩। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১১৬।

১৩৪। চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; তন্ত্রকথা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬২, পৃ. ৫৩।

১৩৫। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন

পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১১৮-১১৯।

১৩৬। তদেব; পৃ. ১২০।

১৩৭। আহমদ শরীফ; মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য, আগামী প্রকাশনী, প্রথম আগামী প্রকাশ, ২০০১, পৃ. ৩৬।

১৩৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১২১।

১৩৯। তদেব; পৃ. ১২২।

১৪০। অরবিন্দ পোদ্দার; মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত), অক্টোবর, ১৯৫৮, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৫৯।

১৪১। তদেব; পৃ. ৫০।

১৪২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৩০।

১৪৩। অরবিন্দ পোদ্দার; মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত), অক্টোবর, ১৯৫৮, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৫১।

১৪৪। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; কবিকঙ্কণ চণ্ডী (ভূমিকা), শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, নূতন সংস্করণ, ১৯৫২, পুনর্মুদ্রিত, ১৯৯৬, পৃ. ৩৬।

১৪৫। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৩১।

১৪৬। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; কবিকঙ্কণ চণ্ডী (ভূমিকা), প্রথম ভাগ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, নূতন সংস্করণ, ১৯৫২, পুনর্মুদ্রিত ১৯৯৬, পৃ. ৩৭।

১৪৭। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৩২-১৩৩।

১৪৮। অরবিন্দ পোদ্দার; মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত), অক্টোবর, ১৯৫৮, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৫৮।

১৪৯। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৩৭।

১৫০। তদেব; পৃ. ১৩৯।

১৫১। তদেব; পৃ. ১৪১।

১৫২। তদেব; পৃ. ১৪৩।

১৫৩। তদেব; পৃ. ১৫০।

১৫৪। তদেব; পৃ. ১৫১।

১৫৫। ক্ষেত্র গুপ্ত; প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৬, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৮, পৃ. ১৬৭।

১৫৬। শশিভূষণ দাশগুপ্ত; ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৭, অষ্টম মুদ্রণ, ১৪১৬, পৃ. ২।

১৫৭। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৫৫।

১৫৮। তদেব।

১৫৯। তদেব; পৃ. ১৫৭।

১৬০। ক্ষেত্র গুপ্ত; প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৬, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৮, পৃ. ১৬৬-১৬৭।

১৬১। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৫৫।

১৬২। তদেব; পৃ. ১৬৮।

১৬৩। সুকুমার সেন; 'দুর্গাপূজায় বোধন কেন' প্রবন্ধ, প্রবন্ধাবলী (বিচিত্র দেবতা — ১ম খণ্ড), এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৪, পৃ. ৯২।

১৬৪। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৭০।

১৬৫। তদেব।

১৬৬। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৮৫।

১৬৭। সুকুমার সেন সম্পাদিত; কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৫, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ. ১৫।

১৬৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৭০।

১৬৯। তদেব; পৃ. ১৭১।

১৭০। তদেব; পৃ. ১৭২-১৭৩।

১৭১। তদেব; পৃ. ১৭৬।

১৭২। তদেব; পৃ. ১৭৭।

১৭৩। নির্মলেন্দু ভৌমিক; বিহঙ্গচারণা, বর্ণালী, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৮৫, পৃ. ২৬৪।

১৭৪। শশিভূষণ দাশগুপ্ত; ভারতীয় সাধনার ঐক্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৩৫২, পুনর্মুদ্রণ, ১৪০৭, পৃ. ২৩।

১৭৫। কবিশেখর কালিদাস রায়; প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য (অখণ্ড সংস্করণ), অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, অর্পণা সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ৩১৬-১৭।

১৭৬। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৭৮।

১৭৭। তদেব; পৃ. ১৮১।

১৭৮। তদেব।

১৭৯। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৮৫।

১৮০। অতুল সুর; বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৪ পৃ. ২৫৮।

১৮১। E. M. Forster; Aspects of the Novel, Penguin Books, First Published, 1927, Reprinted, 1963, 1964, P. 93.

১৮২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৮৫।

১৮৩। তদেব; পৃ. ১৯১-১৯২।

১৮৪। তদেব; পৃ. ১৯৩।

১৮৫। তদেব; পৃ. ১৯৪।

১৮৬। তদেব; পৃ. ১৯৫।

১৮৭। তদেব; পৃ. ১৯৯।

১৮৮। তদেব।

১৮৯। তদেব; পৃ. ২০০।

১৯০। তদেব।

১৯১। তদেব।

১৯২। তদেব; পৃ. ২০০-২০১।

১৯৩। তদেব; পৃ. ২০৩-২০৪।

১৯৪। তদেব; পৃ. ২০৬।

১৯৫। তদেব; পৃ. ২০৯।

১৯৬। তদেব; পৃ. ২১২।

১৯৭। তদেব।

১৯৮। তদেব; পৃ. ২১৩।

১৯৯। তদেব।

২০০। তদেব; পৃ. ২১৪।

২০১। সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত; পৌরাণিক অভিধান, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি., পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৬৯, পৃ. ৫২৬।

২০২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২১৫।

২০৩। তদেব।

২০৪। নীহাররঞ্জন রায়; বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৬, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৪, পৃ. ১৬২।

২০৫। ''কড়ির হিসাব তখন যেমন ছিল এখনও (অর্থাৎ আধুনিক কালেও) তেমনই। ৪ কপর্দ (আধুনিক ''কড়ি'' < কপর্দিক) = ১ গণ্ডক (আধুনিক ''গণ্ডা''); ৫ গণ্ডক = ১ বোড়ী (আধুনিক ''বুড়ি''); ৪ বোড়ী = ১ পণ (আধুনিক ''পোণ'')। ... ''বোড়ী'' উল্লিখিত আছে একটি চর্যাগানে (''কড়ি ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করেই'' — অর্থাৎ ''নাবিক কড়িও নেয় না বুড়িও নেয় না, ভালো ভাবে পার করে দেয়)।'' — সুকুমার সেন ; বঙ্গভূমিকা (খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০-১২৫০ খ্রীষ্টপর), ইষ্টার্ন পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, পৃ. ২৮৪।

২০৬। '' 'পুরাণ' মানে প্রাচীন মূল্যমান, অর্থাৎ 'কর্ষ' (কাহন)। ১৬ পণে এক 'কর্ষ', আর ৮০ কপর্দকে ১ 'পণ'। সুতরাং 'পুরাণ-কপর্দক' = ১২৮০ কড়া কড়ি।'' — সুকুমার সেন; পাদটীকা, বঙ্গভূমিকা (খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০-১২৫০ খ্রীষ্টপর), ইষ্টার্ন পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, পৃ. ২৮৪।

২০৭। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২১৮।

২০৮। তদেব।

২০৯। তদেব।

২১০। নির্মলেন্দু ভৌমিক; বিহঙ্গচারণা, বর্ণালী, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৮৫, পৃ. ২৫৮।

২১১। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২১৯।

২১২। তদেব; পৃ. ২২২।

২১৩। অরবিন্দ পোদ্দার; মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত), অক্টোবর, ১৯৫৮, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৯৯৯, পৃ. ৭২।

২১৪। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২২৩।

২১৫। তদেব; পৃ. ২৩০।

২১৬। শশিভূষণ দাশগুপ্ত; ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৭, অষ্টম মুদ্রণ, ১৪১৬, পৃ. ৪৯।

২১৭। তদেব; পৃ. ৪৯-৫০।

২১৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৩৭।

২১৯। তদেব; পৃ. ২৩৯।

২২০। তদেব; পৃ. ২৪০।

২২১। কবিশেখর কালিদাস রায়; প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য (অখণ্ড সংস্করণ), অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, অপর্ণা সংস্করণ, ২০০৮, পৃ. ৩১৪।

২২২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৪৩।

২২৩। তদেব; পৃ. ২৪৪।

২২৪। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৪৭।

২২৫। সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা ও ভূমিকা; লঙ্কাকাণ্ড, রামায়ণ, কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিরচিত, ভারবি, পুনর্মুদ্রণ, ২০১১, পৃ. ৪৫৩।

২২৬। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৫৩।

২২৭। ক্ষেত্র গুপ্ত; প্রাচীন কাব্য ঃ সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, পুস্তক বিপণি, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৮, পৃ. ১৭৩।

২২৮। কবিশেখর কালিদাস রায়; প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য (অখণ্ড সংস্করণ), অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, অপর্ণা সংস্করণ, ২০০৮, পৃ. ৩১৬।

২২৯। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন

পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৫৬।

২৩০। তদেব।

২৩১। কবিশেখর কালিদাস রায়; প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য (অখণ্ড সংস্করণ), অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, অপর্ণা সংস্করণ, ২০০৮, পৃ. ৩১৯।

২৩২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৬৩।

২৩৩। তদেব; পৃ. ২৬৪।

২৩৪। রজনীকান্ত চক্রবর্তী; গৌড়ের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), সম্পাদক - মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৩১২।

২৩৫। মহানামব্রত ব্রহ্মচারী; সপ্তশতী সমন্বিত চণ্ডী চিন্তা, শ্রীহরি প্রকাশনী, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃ. ১১০।

২৩৬। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৬৬।

২৩৭। তদেব; পৃ. ২৬৮।

২৩৮। তদেব; পৃ. ২৬৯।

২৩৯। রজনীকান্ত চক্রবর্তী; গৌড়ের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), সম্পাদক - মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৩১১।

২৪০। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৭৪।

২৪১। Sukumar Sen; The Great Goddess in Indic Tradition, Papyrus, Published, 1 August 1983, p. 51.

২৪২। Id; 52-53.

২৪৩। রজনীকান্ত চক্রবর্তী; গৌড়ের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), সম্পাদক - মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ১৩৪।

২৪৪। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৭৮।

২৪৫। তদেব; পৃ. ২৮০।

২৪৬। তদেব; পৃ. ২৮২।

২৪৭। তদেব; পৃ. ২৮৬-২৮৭।

২৪৮। তদেব; পৃ. ২৮৮।

২৪৯। কবিশেখর কালিদাস রায়; প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য (অখণ্ড সংস্করণ), অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, অপর্ণা সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০০৮, পৃ. ৩৩৫।

২৫০। তদেব; পৃ. ৩১৯।

২৫১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; বাংলার বৌদ্ধ সমাজ : হিন্দু ও বৌদ্ধ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ (তৃতীয় খণ্ড), সম্পাদক - সত্যজিৎ চৌধুরী, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৮৪, পৃ. ৫৭৯।

২৫২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৯৩।

২৫৩। তদেব।

২৫৪। তদেব; পৃ. ২৯৫।

২৫৫। তদেব; পৃ. ২৯৬-২৯৭।

২৫৬। তদেব; পৃ. ৩০০।

২৫৭। Shashibhusan Das Gupta; Obscure Religious Cults, Firma KLM Private Limited, Third Edition, 1967, Reprint, 1995, p. 318.

২৫৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩০৮।

২৫৯। কবিশেখর কালিদাস রায়; প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য (অখণ্ড সংস্করণ), অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, অপর্ণা সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ৩১৬-১৭।

২৬০। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩১২-৩১৩।

২৬১। শশিভূষণ দাশগুপ্ত; ভারতে শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৩৬৭, অষ্টম মুদ্রণ, ১৪১৬, পৃ. ১৮৮-১৮৯।

২৬২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩২২।

২৬৩। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী; তন্ত্রকথা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬২, পৃ. ৫২।

২৬৪। তদেব; পৃ. ৫১-৫২।

২৬৫। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত; ভূমিকা, দ্বিজমাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫, পৃ. ৪৯।

২৬৬। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন

পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩৩৪।

২৬৭। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত; দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫, পৃ.   ।

২৬৮। অরবিন্দ পোদ্দার; মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত), অক্টোবর, ১৯৫৮, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৭৫।

২৬৯। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩৩৯।

২৭০। তদেব; পৃ. ৩৫২।

২৭১। কবিশেখর কালিদাস রায়; প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য (অখণ্ড সংস্করণ), অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, অপর্ণা সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ৩০৮।

২৭২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯।

২৭৩। শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য; ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৯, পৃ. ৯৩।

২৭৪। তদেব; পৃ. ৯৬।

২৭৫। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩৬২।

২৭৬। তদেব; পৃ. ৩৬৩।

২৭৭। তদেব; পৃ. ৩৬৬।

২৭৮। তদেব; পৃ. ৩৬৭।

২৭৯। তদেব; পৃ. ৩৬৮।

২৮০। তদেব; পৃ. ৩৭৬।

২৮১। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৮৭।

২৮২। তদেব; পৃ. ৮৮।

২৮৩। হরিপদ চক্রবর্তী; 'কবি মানিকদত্ত প্রসঙ্গে' প্রবন্ধ, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, সম্পাদক সুনীলকুমার ওঝা, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ.   ।

——oo——

চতুর্থ অধ্যায়

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল : চরিত্র নির্মাণ

সাহিত্যকে প্রাণবন্ত করে চরিত্র। মধ্যযুগে সৃষ্ট আখ্যান কাব্যগুলির ক্ষেত্রে একথা একেবারে অমান্য করা চলে না। এই সময়ের আখ্যান কাব্যগুলি হল — মনসামঙ্গল কাব্য, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, ধর্মমঙ্গল কাব্য ও শিবমঙ্গল কাব্য প্রভৃতি। তাতে পৌরাণিক ও লৌকিক সংস্কৃতির সংযুক্তি ও সমন্বয়ে গঠিত চরিত্রের অন্তর্গহনে দুটি সংস্কৃতির স্বর অনুভব করা যায়। পুরাণ কাহিনীতে বর্ণিত পুরাণ চরিত্রে মানব জীবনের ধূলো মিশ্রিত এবং মানব চরিত্রে লৌকিক জীবনের আস্বাদ পাওয়া যায়। মঙ্গল কাব্যগুলিতে বর্ণিত চরিত্রের মধ্যে উভয় সংস্কৃতির সমন্বয় ও দ্বন্দ্বের প্রকাশ পাওয়া যাবে। তাতে চরিত্রগুলি দ্বন্দ্বমুখর এবং জীবন্ত হয়ে প্রকাশ পাবে বলে আশা করা যায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে সৃষ্ট মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলি মধ্যযুগের ধর্মীয় আবহাওয়ায় ও পৌরাণিক আবহমণ্ডলে অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রূঢ় ও ক্রূর প্রকৃতির। প্রবল অলৌকিক ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী করে অঙ্কন করার সামাজিক-ধর্মীয় প্রয়োজন কবিরা অনুভব করেছিলেন। মানব সমাজে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী চরিত্রের সঙ্গে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেব-দেবী চরিত্রের দ্বন্দ্ব স্থাপন করে মানবের পরাজয় উন্মোচন করা কাব্যগুলির প্রথাগত রীতি ছিল। এতে মানব চরিত্রের পরাজয় ঘটলেও তাদের প্রবল ব্যক্তি সত্তার প্রকাশ জলাঞ্জলি হত না। পাশাপাশি অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে মধ্যযুগের বাঙালী সমাজের ও পরিবার ধর্মের রীতি-নীতি, আদর্শ ও সতীত্বের ধারণাগুলি বজায় রাখা হত। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর ধারাবাহিকতা নিয়ন্ত্রণে, অন্যান্য চরিত্রের মানস পরিবর্তনের, কাহিনীর মধ্যে যোগসূত্র সৃজনে, চরিত্রের মধ্যে আন্তঃপরিচয় ঘটাতে, মধ্যযুগের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক বাতাবরণ প্রকাশে, সামাজিক বন্ধন সম্পর্কে সচেতন করতে ও রীতি-নীতি উন্মোচনে চরিত্রগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। E. M. Forster তাঁর 'Aspects of the Novel' গ্রন্থে উপন্যাসের চরিত্র-প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যা বলেছেন তা এখানে প্রযোজ্য বলে মনে হয় — "We are concerned with the characters in their relation to other aspects of the novels; to a plot, a moral, their fellow characters, atmosphere, etc. They will have to adapt themselves to other requirements of their creator."[১] চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ধারার প্রথম কবি মানিক দত্ত ছিলেন গায়েন। তিনি মুকুন্দ চক্রবর্তীর মতো শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ও প্রতিভাধর স্রষ্টা নন। তাঁর কাব্যে লোক-আকাঙ্ক্ষা, জনমানসের আকর্ষণ, সামাজিক প্রয়োজনীয়তা, সামাজিক বন্ধননীতি চরিত্র চিত্রণে অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হয়।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্র চিত্রণের আগে আমরা চরিত্রের শ্রেণীবিভাগ করে নিতে পারি। টাইপ চরিত্র (Flat Character) ও জটিল চরিত্র (Round Character)। E. M. Forster তাঁর 'Aspects of the Novel' গ্রন্থে বলেছেন — "We may divide character into flat and round. Flat characters were called 'humours' in the seventeenth century, and are sometimes called types, and sometimes caricatures. In their purest form, they are constructed round a single idia or quality : when there is more than one factor in them, we get the beginning of the curve towards the round."[২] Flat চরিত্রকে 'টাইপ' চরিত্রও বলা হয়। আসলে এই সকল চরিত্ররা সরল। যে সকল চরিত্র পেশা ও সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে কেউ ধনী, কেউ গরীব, কেউ রাজা ইত্যাদি অবস্থার পরিচয় বহন করে, সেই পরিচয়ের বাইরে স্বতন্ত্র কোন বিশিষ্টতা প্রকাশ পায় না, তাদের বলা হয় টাইপ বা ফ্ল্যাট চরিত্র। পাশাপাশি যে সকল চরিত্র তার সামাজিক বৃত্তি বা অবস্থানের মধ্যেও কখনো কখনো বিপরীত বা স্বতন্ত্র পরিচয় বহন করে, তাদের বলা যায় Round Character বা জটিল চরিত্র বা Individual Character। এই শ্রেণীর চরিত্ররা তাদের টাইপের উপর দাঁড়িয়ে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা বহন করে। লক্ষণীয়, যে সকল টাইপ চরিত্র সর্বদাই ঘটনা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের চারিত্রিক পরিচয় অপরিবর্তিত রাখে সেই সকল টাইপ চরিত্র স্থির। চরিত্রটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার চারিত্রিক গুণাবলী ধরে থাকে। অন্যপক্ষে Round Character অবস্থা বা ঘটনা বা পরিবেশ পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার চরিত্রের বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, সেই সকল Round Character হল গতিশীল। এই দুই শ্রেণীর চরিত্রের লক্ষণ মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গ ল কাব্যের চরিত্র বিচারের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা হবে।

পাশাপাশি মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্র বিচারের ক্ষেত্রে কয়েকটি পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করব। প্রসঙ্গত, অ্যারিস্টটলের কথায় আসা যাক্। তিনি তাঁর 'Poetics' গ্রন্থে চরিত্র বিচারের কয়েকটি মানদণ্ডের কথা বলেছেন। সেগুলি তাঁর কথায় —

(ক) "First, and most important it must be good. Now any speech or action that manifests moral purpose of any kind will be expressive character : the character will be good if the purpose is good."[৩]

(খ) "The Second thing to aim at is propriety."[৪]

(গ) "Thirdly, character must be true to life : for this is a distinct thing from goodness and propriety, as here described."[৫] এবং

(ঘ) "The fourth point is consistency :"[৬]

তাঁর এই চরিত্র সম্পর্কিত ব্যাখ্যা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটির ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের পরিচয়, চরিত্রের কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে খুঁজে নিতে হবে। কাহিনীর পরিবর্তনের সঙ্গে তার আচরণ কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, অথবা চরিত্রটিকে ঘটনা কীভাবে প্রভাবিত করছে সেই দিকটিও চরিত্র বিচারের ক্ষেত্রে আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হবে। আবার পরিবেশ, পরিস্থিতি, অবস্থান এবং অন্য চরিত্রের সহাবস্থানকে সামনে রেখে চরিত্রটির হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবলোকন করতে হবে। তবে মধ্যযুগের তথা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে আর একটি দিক লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যে সকল চরিত্র পুরাণ - প্রভাবিত, সেই সকল চরিত্র পুরাণকে কতটা মেনে সৃষ্টি হয়েছে তা লক্ষ্য করা হবে। চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চরিত্রের অভিব্যক্তি ঘটবে; বাইরে থেকে অলৌকিক ঘটনা বা দৈবী ঘটনার উপস্থাপনা ঘটলে চরিত্রের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি শিল্পসম্মত হয়ে ওঠে না। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্র চিত্রণে শিল্পের এই দিকগুলি থেকে উদাসীন থাকলে চলবে না।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'দেবখণ্ড' (আলাদা নয়), 'আখেটিক খণ্ড' ও 'বণিক খণ্ড'-এর চরিত্রগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত, পুরাণ নির্ভর দেব-দেবী চরিত্র; দ্বিতীয়ত, লোকজীবন নির্ভর মানব চরিত্র। এদের মধ্যে আবার রয়েছে প্রধান ও অপ্রধান পুরুষ এবং নারী চরিত্র। দেব-দেবী চরিত্রের মধ্যে প্রধান পুরুষ চরিত্র **শিব** হলেও প্রথমে প্রধান নারী চরিত্র **চণ্ডী**-র স্বরূপই বিশ্লেষণে আসব। কারণ এই গ্রন্থের নাম ও সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু হল সে। তারপর শিব চরিত্রের আলোচনায় আসব। এরপর একে একে অপ্রধান পুরুষ চরিত্র **ধর্ম, নারদ, উলুক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হিমালয়, শান্তনু, ভীম, গণেশ, কার্তিক, শনি, হনুমান, বিশ্বকর্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, চিত্রগোবিন্দ, ডাক, ডেউর, মালাধর, জয়ধর, পুষ্প দত্ত, বিদ্যামন্ত** ও অন্যান্য এবং নারী চরিত্র **পদ্মা, মেনকা, গঙ্গা, কালী, ইমলা, বিমলা, জয়া, বিজয়া, শচী, রত্নমালা, উলুবা** ও **দুলুবা** ইত্যাদি চরিত্রের আলোচনায় আসব। প্রসঙ্গত, এই সকল প্রধান ও অপ্রধান দেব-দেবীর চরিত্রের আলোচনা তিনটি খণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব। কারণ, অধিকাংশ দেব-দেবী চরিত্র পুরাণ আশ্রিত ও তাদের অবস্থান এই কাব্যে স্বর্গে। সেই দিক থেকে কাব্যে তাদের প্রকাশ আখেটিক ও ধনপতি খণ্ডে হলেও অবস্থান ও স্বরূপের দিক থেকে তারা দেব-দেবী চরিত্রের আলোচনায় প্রথম স্থান পাবে। এরপর আলাদা আলাদা ভাবে আখেটিক ও ধনপতি খণ্ডের প্রধান ও প্রধান চরিত্রের আলোচনায় আসা হবে। আখেটিক খণ্ডের প্রধান পুরুষ মানব চরিত্র **কালকেতু** এবং নারী চরিত্র **ফুল্লরা**। আর অপ্রধান পুরুষ চরিত্র হল **ভাঁড়ু দত্ত, পুরাই দত্ত , সুরথ, ধর্মকেতু, নিশানকেতু, বেনিয়া** ও অন্যান্য এবং নারী চরিত্র হল **নিদয়া, কমলা, দয়াবতী, ফুল্লরার মাসিমা** ও অন্যান্য। অন্যদিকে, ধনপতি খণ্ডের প্রধান পুরুষ মানব চরিত্রের মধ্যে রয়েছে **ধনপতি** ও **শ্রীমন্ত** এবং নারী

চরিত্রের মধ্যে **লহনা** ও **খুল্লনা**। অপ্রধান পুরুষ চরিত্রগুলি হলো **জয়পতি, নিধুপতি, জনার্দন ওঝা, হরিয়া ছুতার, কাণ্ডার বুলন, লক্ষপতি, বিক্রমকেশর, শ্রীবৎস, উতু, পাতু, হরিবাণ্যা, ধনেশ্বর, গোপাল, ভোলা, শ্রীহরি, শালবাণ** ও অন্যান্য এবং নারী চরিত্রগুলি হল **দুর্বলা, সুশীলা, নিলাবতী, উর্বশী, রম্ভাবতী, নিলারানী** ও অন্যান্য। এবার চরিত্রগুলি বিশ্লেষণে আসা যাক্।

মঙ্গলকাব্যে তথা মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রধান ও কেন্দ্রীয় চরিত্র দেবী **চণ্ডী**। অন্যান্য দেব-দেবীদের চরিত্র-পরিকল্পনার মধ্যে তার শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। একাব্যে দেবী অন্যায় ও ভয়ঙ্কর কাজ করলেও তার মধ্যে ইতরতা নেই। মনসার মত সে হীন ও নিষ্ঠুর নয়। কালকেতুকে স্বীয় ইচ্ছায় ধন দান, খুল্লনাকে বর দান, শ্রীমন্তকে রক্ষার সময় তার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই সে নেপথ্যচারিণী শক্তিরূপে বিরাজ করেছে। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বত্র যে চণ্ডীদেবীকে দেখা যায়, তা একই দেবী মনে করলে ভুল হবে। এই কাব্যে সেই দেবী আদ্যা, চণ্ডী, গৌরী ও দুর্গা নামে পরিচিত। দেবখণ্ডে সে পৌরাণিক দেবী। আর ব্যাধ ও ধনপতি খণ্ডে তার পৌরাণিক রূপের সঙ্গে লৌকিক স্বরূপটি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। দেবী চণ্ডীর বিভিন্ন স্বরূপ বৈশিষ্ট্য আমরা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লক্ষ্য করব।

তার পূর্বে, আমরা 'চণ্ডী' নামের উৎস সন্ধানে মনোনিবেশ ঘটাব। 'চণ্ডী' বা 'চণ্ডিকা' নামের অর্থ হল প্রচণ্ড শক্তিশালী, শত্রুনিধনে পারদর্শী প্রচণ্ড শক্তিধারিণী, শক্তিমত্তা ও প্রচণ্ডতা সম্পন্ন ইত্যাদি। কল্কি পূজার প্রবর্তক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক স্বামী জগদীশ্বরানন্দ (১৯০৯—১৯৭৮) বলেছেন — ''চণ্ডী = চণ্ড + (স্ত্রী লিঙ্গে) ঈপ্ = পরব্রহ্মমহিষী বা ব্রহ্মশক্তি। চণ্ড শব্দের অর্থ দেশকালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরব্রহ্ম। .... ব্রহ্মশক্তিই চণ্ডী। সৃজনোন্মুখ ব্রহ্মের ঈশাণাদি সমস্ত ধর্মকে লক্ষ্য করিয়া চণ্ডী, আদ্যাশক্তি, মহামায়া প্রভৃতি নাম প্রযুক্ত হইয়াছে। .... জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া — এই শক্তিত্রয়ের সমষ্টিভূতা ব্রহ্মাভিন্না তুরীয়া দেবীই চণ্ডী বা চণ্ডিকা নামে প্রসিদ্ধা।''[৭] তবে এই চণ্ডীর সঙ্গে অনার্য চাণ্ডীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করে মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন — '' চণ্ডী শব্দটি অর্বাচীন সংস্কৃত, অর্থাৎ কোনও অনার্য ভাষা হইতে পরবর্তী কালে সংস্কৃত শব্দকোষে স্থান লাভ করিয়াছে। চণ্ডী শব্দটি সম্ভবত অস্ট্রিক কিংবা দ্রাবিড় ভাষা হইতে আগত। দ্রাবিড় ভাষাভাষী দৃশ্যত আদি-অস্ত্রাল (Proto-Australoid) জাতীয় ছোট নাগপুরের অধিবাসী ওরাওঁ নামক উপজাতির মধ্যে 'চাণ্ডী' নামে এক শক্তিদেবীর পরিচয় লাভ করা যায়।''[৮] ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময় ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফলে স্বরূপত দুর্গা, তন্ত্রের চণ্ডিকা এবং ওরাওঁ সম্প্রদায়ের চাণ্ডী বর্তমানে 'চণ্ডী' নামে পরিণত হয়েছে। কবিরা এই মিশ্র ধর্মের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা চণ্ডীকে এড়াতে পারেন নি। তাই 'চণ্ডী' নামটির কোন এক সূত্র থেকে নয়, বহুধারার একীভূতিকরণে 'চণ্ডী' নামটি হয়েছে।

প্রকৃত চণ্ডীর স্বরূপ নির্ণয় বা সন্ধান সত্যিই ধান ভানতে শিবের গীত করা। প্রথমেই শশিভূষণ দাশগুপ্তের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন — ''ধর্ম্মমতের ক্রমাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেবলই চলিতে থাকে সমন্বয় ও স্বীকরণ; ফলে বহু দিন পরে কোনও একটি ক্ষণে দাঁড়াইয়া আমরা যখন বিচার-বিশ্লেষণ করিতে বসি, তখন কোন্‌টি যে মূলধারা, আর কোন্‌গুলি যে উপধারা তাহা স্পষ্ট চেনা শক্ত হইয়া ওঠে।''[৯] এই কথা মনে রেখে আমরা দেবী চণ্ডীর স্বরূপ ও উৎস সন্ধানে যাত্রা করব। প্রসঙ্গত আমরা তিনটি ধারায় তার সূত্র নির্দেশ করব। (১) বৈদিক সাহিত্যে (২) মহাকাব্যে এবং (৩) পুরাণ পরিমণ্ডলে।

খ্রীষ্ট পূর্ব ১২০০ অব্দ থেকে খ্রীষ্ট পূর্ব ৯০০ অব্দে লেখা 'ঋগ্বেদ-সংহিতা'-র দশম মণ্ডলে বলা হয়েছে —

''অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ বা প্রেব নশ্যসি। ...
আঞ্জনগন্ধিং সুরভিং বহ্বন্নমকৃষীবলাম্।
প্রাহং মৃগাণাং মারতমরণ্যানিমলংসিষম্।।''[১০]

অর্থাৎ ''হে অরণ্যানি! (বৃহৎ বন)। ... মৃগনাভির ন্যায় অরণ্যানীর সৌরভ কত, আহার সেখানে বিদ্যমান আছে, সেখানে কৃষক লোক অদৌ নেই। অরণ্যানী হরিণদের জননী স্বরূপা। এরূপে আমি অরণ্যানীর বর্ণনা করিলাম।''[১০] অরণ্যাধি দেবতা অরণ্য পালনকারীর প্রতি দয়াবান। এই গ্রন্থের 'দেবী সূক্ত'-এ বলা হয়েছে —

''অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।। ১।।''[১১]

অর্থাৎ ''(বাগ্দেবীর উক্তি) আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি, আমি আদিত্যদের সঙ্গে এবং সকল দেবতাদের সঙ্গে থাকি, আমি মিত্র ও বরুণ এ উভয়কে ধারণ করি, আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং দু অশ্বিদ্বয়কে অবলম্বন করি।''[১১] এখানে বর্ণিতা আরাধিতা দেবী হলো 'বাক্'। সুকুমার সেন বলেছেন — ''ঋগ্‌বেদে রুদ্রের ক্রোধকে কিয়ৎ পরিমাণে মূর্ত করিয়া তাহাকে 'মনা' বলা হইয়াছে। ইহাই চণ্ডিকা বা চণ্ডী কল্পনার বীজ বলিয়া মনে হয়।''[১২]

অতঃপর খ্রীষ্ট পূর্ব ৫ম অথবা ৪র্থ থেকে খ্রীষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতকে মহাভারতের 'বিরাট পর্ব' (ষষ্ঠ অধ্যায়)-এ যুধিষ্ঠির একটি 'দুর্গাস্তব' বলেছে। 'ভীষ্ম পর্বে' (২৩ তম অধ্যায়) শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র মহাসমরে বিজয় লাভের জন্য অর্জুনকে দেবী দুর্গার নিকট বর প্রার্থনা এবং তার উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাতে বলে। অর্জুনের 'দুর্গাস্তব' —

''নমস্তে সিদ্ধসেনানি! আর্য্যে! মন্দরবাসিনী!।
কুমারি! কালি! কাপালি! কপিলে! কৃষ্ণপিঙ্গলে!।। ৪।।

ভদ্রকালি! নমস্তুভ্যং মহাকালি! নমোহস্তু তে।

চণ্ডি! চণ্ডে! নমস্তুভ্যং তারিণি! বরবর্ণিনি!।। ৫।।"[১৩]

অর্থাৎ, "সিদ্ধসেনানি! আর্য্যে! মন্দরবাসিনী! কুমারী! কালি! কাপালি! কপিলে! কৃষ্ণপিঙ্গলে। আপনাকে নমস্কার করি।। ৪।। ভদ্রকালি! আপনাকে নমস্কার, মহাকালি! আপনাকে নমস্কার, চণ্ডি! চণ্ডে! তারিণি! বরবর্ণিনি! আপনাকে নমস্কার্।। ৫।।"[১৩] এখানে দেবীর কালী, কাপালী, মহাকালী, উমা ইত্যাদির বিভিন্ন মাতৃকা নামের সঙ্গে চণ্ডী নামও ছিল। তার সঙ্গে মন্দরবাসিনী তথা দুর্গা নামের আভাস রয়েছে।

এই দুর্গা 'মার্কণ্ডেয়পুরাণ' (সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ৪র্থ—৫ম শতক) গ্রন্থের ৮১ তম থেকে ৯৩ তম অধ্যায় পর্যন্ত ১৩টি অধ্যায়ে 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' নামে সুপরিচিতা। এই গ্রন্থে দেবী ধূম্রাসুরকে বলে যে শুম্ভ পাঠিয়েছে তাকে হত্যা করতে। তখন ধূম্রাসুর —

"ইত্যুক্তঃ সোহভ্যধাবৎ তামসুরো ধূম্রলোচনঃ

হুঙ্কারেণৈব তং ভস্ম সা চকারাম্বিকা ততঃ।।" ৯[১৪]

অর্থাৎ, "দেবী এই কথা বলিবা মাত্র সেই ধূম্রলোচন নামক অসুর তাহার প্রতি ধাবিত হইল। তখন অম্বিকা হুঙ্কার দ্বারা সেই অসুরকে ভস্মীভূত করিল।"[১৪] আবার —

"অথ মুণ্ডোহপ্যধাবৎ তাং দৃষ্টবা চণ্ডং নিপাতিতম্

তমপ্যপাতয়দ্ভূমৌ সা খড়্গাভিহতং রুষা।।" ২০[১৫]

অর্থাৎ, "চণ্ডীকে নিপাতিত দেখিয়া মুণ্ড, দেবীর প্রতি ধাবিত হইল তখন দেবী ক্রোধে তাহাকেও খড়্গাঘাত দ্বারা ধরাশায়ী করিলেন।"[১৫]

শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ সম্পর্কে বলা হয়েছে —

"ততঃ সা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা শূলেনাভিজখান তম্।

স তদাভিহতো ভূমৌ মূৰ্চ্ছিতো নিপপাত হ।। ২৬

*   *   *

শূলহস্তং সমায়াস্তং নিশুম্ভসমরার্দ্দনম্।

হৃদি বিব্যাধ শূলেন বেগাবিদ্ধেন চণ্ডিকা।।" ৩২[১৬]

অর্থাৎ, "অনন্তর সেই চণ্ডিকা দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া শূল দ্বারা শুম্ভাসুরকে আঘাত করিলেন শূলাহত শুম্ভাসুর মূৰ্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। ... অনন্তর শূল গ্রহণ করবার সম্মুখে আগতিত নিশুম্ভাসুরকে দেবী অতিবেগে প্রক্ষিপ্ত নিজ শূল দ্বারা হৃদয়ে বিদ্ধ করিলেন।"[১৬] এখানে দেবী চণ্ডীর প্রচণ্ডা রূপটি পাওয়া যায়। তার প্রকৃত নাম এখানে চণ্ডিকা।

সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ৭ম শতক থেকে ৮ম শতকের মধ্যে রচিত 'অগ্নিপুরাণ'-এ দেবীর স্বরূপ

সম্পর্কে বলা হয়েছে —

‘‘চণ্ডী বিংশতিবাহুঃ স্যাদ্বিভ্রতী দক্ষিণৈঃ করৈঃ।
শূলাসিশক্তিচক্রাণি পাশং খেটায়ুধাভয়ম্।। ১
ডমরুং শক্তিকাং বামৈর্নাগপাশঞ্চ খেটকম্।
কুঠারাঙ্কুশচাপাংশ্চ ঘন্টাধ্বজগদাংস্তথা।। ২
আদর্শমুদগরান্ হস্তৈশ্চণ্ডী বা দশবাহুকা।
তদধো মহিষশ্ছিন্নমূর্দ্ধা পাতিতমস্তকঃ।। ৩
* * *
অদৌ মধ্যে তথেন্দ্রাদৌ নবতত্ত্বাত্মভিঃ ক্রমাৎ।
অষ্টাদহভূজৈকা তু দক্ষে মুণ্ডঞ্চ খেটমক।। ৭
* * *
ডমরুং তর্জ্জনীং ত্যক্ত্বা রুদ্রচণ্ডাদয়ো নব।
রুদ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।। ১০
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা।
উগ্রচণ্ডা চ মধ্যস্থা রোচনাভারুণাসিতা।। ১১
নীলা শুক্লা ধূম্রিকা পীতা শ্বেতা চ সিংহগাঃ।
মহিষোত্থঃ পুমান্ শস্ত্রী তৎকচগ্রহমুষ্টিকাঃ।। ১২
* * *
আলীঢ়া নব দুর্গাঃ স্যুঃ স্থাপ্যাঃ পুত্রাদিবৃদ্ধয়ে।’’[১৭]

অর্থাৎ, ‘‘চণ্ডীর বিংশতি বাহু। তন্মধ্যে দক্ষিণ হস্তসমূহে শূল, অসি, শক্তি, চক্র, প্রাস, খেট (চর্ম), অস্ত্রবিশেষ, অভয়, ডমরু, শক্তি এবং বাম করসমুহে নাগপাশ, খেটক, কুঠার, অঙ্কুশ, ধনু, ঘন্টা, ধ্বজা, গদা আদর্শ (আরসি) ও মুদগর (মগুর)। অথবা চণ্ডীর দশবাহু তাহার অধোভাগে ছিন্নমুণ্ড ও মহিষের ছিন্ন মস্তক পতিত থাকিবে। ... প্রথমে বিংশতি হস্ত মধ্যে দশ হস্ত ও তারপরে নরভূজা, অষ্টাদশভূজা, মূর্তির পূজা কর্তব্য। চণ্ডীর আর এক মূর্তির অষ্টাদশ বাহু। রুদ্রচণ্ডাদিময় মূর্তির হস্তে ডমরু ও তর্জনী ভিন্ন উল্লিখিত সমস্ত অস্ত্রই বিরাজমান থাকবে রুদ্রচণ্ডা শব্দে। রুদ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডোনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডাবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডীকা ও উগ্র চণ্ডা; এদের বর্ণ যথাক্রমে (রাচনাহ, অরুণ, অসিত, নীল, শুক্ল, ধূম্র, পিত ও শ্বেত) এরা সকলেই সিংহের উপর আরোহন করে আলীঢ় আসনে অস্ত্র যুক্ত হয়ে, মুষ্ঠি দ্বারা মহিষ ও তার গ্রীবা সম্ভূত পুরুষের কেশ ধারণ করে। একে নব দূর্গা বলে।’’[১৭]

'দেবী-ভাগবত' (খ্রীষ্টীয় ১১ শতক — ১২ শতক)-এ ব্যাসদেব দেবী সম্পর্কে বলেছেন — "ভগবান বিষ্ণু এইরূপ কহিবামাত্র ব্রহ্মার বদন মণ্ডল হইতে স্বতই অতীব অসহনীয় তেজঃপুঞ্জ উদ্ভুত হইল। উহার বর্ণ পদ্মরাগবৎ লোহিত উহা কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ এবং মরীচিমালায় মণ্ডিত থাকায় দেখিতে অতি সুন্দর! হে মহারাজ! অমিত বিক্রমশালী মহাত্মা হরি ও হর ব্রহ্মমুখনিঃসৃত সেই তেজমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। অতঃপর শঙ্করের শরীর হইতে রৌপ্যবর্ণ, দুনিরাক্ষ্য অতি তীব্র, দৈত্যগণের জয়প্রদ অসুরগণের বিস্ময়কর, পর্ব্বতোপম অপর তমোগুণ সদৃশ ভয়ঙ্কর পরমাদ্ভুত দারুণ তেজঃ নির্গত হইল। অনন্তর ভগবান বিষ্ণুর শরীর হইতে নীলকান্তি সত্ত্বগুণময় মহাপ্রভাশালী অপর তেজোরাশি প্রাদুর্ভূত হইল। তৎপরে দেবরাজের শরীর হইতে যে তেজঃ নির্গত হইলো, উহা দেখিতে পরম মনোহর, সর্ব্বগুণময়, বিচিত্র বর্ণ ও দুঃসহনীয় অনন্তর ক্রমে কুবের, যম, অগ্নি, বরুণ ও অন্যান্য দেবগণের শরীর হইতে দেদীপ্যমান মহৎ তেজঃ নির্গত হইল ... দেখিতে দেখিতে দেবগণের সমক্ষেই সেই তেজঃপুঞ্জ, বিস্ময়কর অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী রমণী রূপে পরিণত হইল। ... সেই দেবী অদ্যাশক্তি, সহস্র সহস্র বাহুশালীনি হইতেই তৎকালে অসুরের সংহারার্থ সুরগণের তেজঃপুঞ্জ হইতে অষ্টাদশ ভূজা হইয়া সমুদ্ভুতা হইলেন।"[১৮]

সুতরাং চণ্ডী শক্তিদেবীর অনেক রূপ ও বহুমূলের একীভূতরূপ। ঋগ্বেদে তাকে শক্তিরূপিনী, সৃষ্টিরূপিনী, অরণ্যানী রূপে অঙ্কন করা হয়েছে। সেখানে তার দ্বিভুজা মূর্তি। মহাভারতে অর্জুন সঙ্কট থেকে মুক্তির জন্য দেবীর স্তব করে। সেই দিক থেকে মহাভারতে সে অভয়দায়িনী। তাকে মন্দরবাসিনী বা পর্বতবাসিনী, কালী, কপালি, কপিলে, মহাকালী, চণ্ডী, অভয়তারিনী বলা হয়েছে। এই চণ্ডী নামটি প্রথম পাওয়া যায় মহাভারতে। তার অবস্থান দুর্গমগীরিতে তথা পর্বতে। তাই সে দুর্গা। তবে দুর্গা নামটির উল্লেখ এখানে পাওয়া যায় না। তার আভাস পাওয়া যায় মাত্র। সুকুমার সেন বলেছেন — "দুর্গা (ইহার রূপান্তর দুর্গি) নাম প্রথম পাওয়া যায় তৈত্তিরীয় আরণ্যকে। দুর্গা (দুর্গি) নামের আসল অর্থ ছিল দুর্গম স্থানে অধিষ্ঠাত্রী। পরে এর অর্থ হয়েছে দুর্গে অর্থাৎ ত্রাণকর্ত্রী।"[১৯] মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই দুর্গার অরণ্যানী চণ্ডীর মাহাত্ম্য দৃষ্টিত হয়েছে। যেখানে তার নাম অভয়া চণ্ডী। চণ্ডী বিন্ধ্যবাসিনী (অরণ্য নিবাসিনী) এবং এর বাহন (ও প্রতীক) গোধা। সুকুমার সেন বলেছেন — "সেখানে ইঁহার বিশিষ্ট নাম অভয়া (অর্থাং অভয়াদায়িনী) চণ্ডী। ইনি বিন্ধ্যবাসিনী (অর্থাৎ অরণ্যনিবাসিনী) এবং ইঁহার বাহন (ও প্রতীক) গোধা।"[২০] ঋগ্‌বেদে সৃষ্টিরূপিনী, অরণ্যানী ও অভয়াদায়িনী মহাভারতে চণ্ডী নামে চিহ্নিত হয়েছে। উভয়ই অভয়াদায়িনী ও চণ্ডী স্বরূপত একই। তবে মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবী চণ্ডীর প্রচণ্ডা রূপটি পাওয়া যায়। সেখানে তার নাম চণ্ডিকা। সুকুমার সেন বলেছেন — "চণ্ডিকা বা চণ্ডীর অর্থ প্রচণ্ডা দেবী।"[২১] সে শুম্ভ-নিশুম্ভ দলনী মহিষাসুরমর্দিনী ও দশভূজা। এই দেবী চণ্ডীর সঙ্গে ঋগ্বেদের ও মহাভারতের অভয়াদায়িনীর স্বরূপ

পৃথক। অগ্নিপুরাণে চণ্ডী মহিষমর্দিনী দুর্গায় পরিণত হয়েছে। প্রসঙ্গত, সুকুমার সেন বলেছেন — "দুর্গা আসলে দুর্গম পন্থায় অভয়দায়িনী দেবী, ঋগ্‌বেদের অরণ্যানী। তার সঙ্গে মিশে গেছে মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর কাহিনী। চণ্ডী দুর্গার নামান্তর।"[২২] সম্ভবত দশম-একাদশ শতাব্দীতে এই দশভুজা চণ্ডীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেবী ভাগবত-এর শিব প্রমুখ দেবতার দেহ থেকে নিষ্কাশিত তেজপিণ্ড রূপ। এই গ্রন্থে দেবী অষ্টভুজা। তার বাহন সিংহ। শিবের দেহের তেজ থেকে জন্ম বলে চণ্ডীকে শিব গৃহিণী রূপে রূপান্তরিত করা হয়। প্রসঙ্গত, সুকুমার সেন বলেছেন — "পুরাণে দুর্গা-চণ্ডী সরাসরি দেহ হইতে নিষ্কাশিত তেজের পিণ্ডীভূত রূপ।"[২৩] এভাবে পৌরাণিক প্রচণ্ডা চণ্ডীর সঙ্গে রক্ত-মাংসে গড়া লৌকিক চণ্ডীর সংমিশ্রণ ঘটে। তাই মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যে দেবী চণ্ডীর স্বরূপে কোথাও শিব গৃহিণীর গার্হস্থ্য জীবন, কোথাও সৃষ্টিরূপিণী, কোথাও অরণ্যানী, কোথাও নারী সমাজে গৃহকল্যাণের জন্য মঙ্গলচণ্ডী, কোথাও অভয়দায়িনী রূপ পরিস্ফুট হয়েছে। আবার মুসলমান অধিকারের পরই শক্তিসাধক বাঙালী অন্যতম গ্রন্থ 'কালিকাপুরাণ' রচনা করে ঘনায়মান অন্ধকারে একমাত্র আশা ও ভরসার শক্তিময়ী দেবীরূপে কালী বাঙালীর চিত্ত অধিকার করে ফেলেছিল। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের পর থেকে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সাধনায় তান্ত্রিক ধর্মের প্রাধান্য বা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শ্মশান কালীই চণ্ডীতে পরিণত হল। বাঙালী ইতিহাসকার নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন — "ত্রয়োদশ -চতুর্দশ শতকে বাঙালীর অন্যতম শ্মশানে কালীর উপাসনা করিয়াই ভয়-ভাবনার কিছুটা ঊর্ধ্বে উঠিতে, চিত্তে একটু সাহস ও শক্তি সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই কালীই তাহা চণ্ডী, বেং সমস্ত মধ্যপর্বে চণ্ডীর প্রতাপ দুর্জয়!"[২৪]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি এই দেবী চণ্ডীকে কেন্দ্র করে নামকরণ এবং তাকে মধ্যমণি করেই কাব্যের কাহিনীর ক্রমবিকাশ।পুরাণ, লৌকিক ও তন্ত্রভাবনা দ্বারা চণ্ডী চরিত্রটি বিন্যস্ত হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের কবি মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 'চণ্ডী' দেবী চরিত্র। সাধারণ মর্ত্যের মানুষের মত নারী-পুরুষের মিলন জনিত বীর্যে বা মাতৃগর্ভে তার জন্ম হয় নি। তার জন্ম হয় আদি-ধর্ম বা আদি-বুদ্ধের 'হাম্বি' বা হাই থেকে। তাই তার নাম আদ্যা। এখানে তার মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব রয়েছে। সে পৃথিবীতে জীব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়। ধর্ম আদ্যার যৌবন সম্ভোগ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে আদ্যা বলে — "জন্ম দিএগ বল কৈলে ধর্ম্ম নাশ হয়।।"[২৫] আদ্যার কথায় ধর্ম তার নিজ প্রবৃত্তি সংবরণ করে। আদ্যাকে শিবের সঙ্গে বিবাহ করার জন্য সপ্তবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। সর্বশেষে হিমালয় গৃহে গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পর গৌরী পিতার আজ্ঞায় শিব পূজায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে। শৈশবকাল থেকে গৌরী পিতার অনুশাসনে বড় হয়েছে। শিবের জন্য সে গ্রীষ্মের দাবদাহে অগ্নি জ্বালিয়ে ধ্যান মগ্ন থেকেছে। কেনোনা, মানিক দত্তের কাব্যে আদ্যাকে সাতবার মরতে এবং কঠোর তপস্যা করতে হয়েছিল এই শিবকে পাওয়ার

জন্য। কারণ শিব বৃদ্ধ ও দরিদ্র হলেও সমাজে তার সম্মান ও প্রতিষ্ঠা রয়েছে। গৌরী সে সম্পর্কে সচেতন। তাই শিবের কথায় গৌরী বলেছে —

"দুর্গা বোলে শিব ঠাকুর কেন ভাণ্ড মোকে।
কে বলে দারিদ্র তুমাক পুজে দেবলোকে।।"[২৬]

বলাবাহুল্য, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আদ্যাই গৌরী, গৌরীই দুর্গা বা চণ্ডী নামে পরিবর্তিত হয়েছে। এই কাব্যে চণ্ডী নামের তুলনায় দুর্গা নামের ব্যবহার বেশি। দুর্গার বিবাহ হয় অতি শৈশব বেলায়। তার বিবাহে সমাজের বাল্যবিবাহের দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিবের অতিবৃদ্ধ ও বাদিয়া রূপ দেখে মেনকা কন্যাকে কোলে করে কাঁদে এবং বিবাহ সভায় হিমালয় কন্যাকে কোলে নিয়ে সাতবার প্রদক্ষিণ করে। যেমন — (১) "কান্দেন মেনকা রাণী গৌরী করি কোলে।"[২৭] (২) "পিতার কোলে চড়ি দুর্গা শিব স্থানে আল্য।"[২৮] গৌরীর বিবাহের পর মাতৃরূপ প্রকাশ পায়। সে তার গায়ে মলি বা গাত্রমল দিয়ে মানবরূপী পুতুল তৈরী করে। সেই মলির পুতুল থেকে গণেশের জন্ম হয়। তবে শিবের রেত কর্তৃক চণ্ডীর মাতৃগর্ভ থেকে কার্তিকের জন্ম হয়। এই পর্যন্ত তার লৌকিক স্বরূপটি স্পষ্ট।

এরপর তার পৌরাণিক প্রচণ্ডা রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। এদিকে সকল দেবতার অস্ত্র সহযোগে দুর্গা অসুরদের নিধন করতে রণক্ষেত্রে যাত্রা করে। রণক্ষেত্রে দুর্গার ভয়ঙ্করী রূপ লক্ষ্য করা যায়। তার রক্তবীজ, মহাবীজ, মহিষাসুর, মহীধর, শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি অসুর বিনাশের মধ্যে পুরাণ স্বরূপটি স্পষ্ট।

"ক্রোধিত হঞা দুর্গা মাতা মুখ মেলিল।
সারথি সহিতে তাকে গিলিঞা ফেলিল।।"[২৯]

দেবী দুর্গা ভয়ঙ্করী রূপ থেকে চামুণ্ডা রূপ ধারণ করেছে। সে অসুরদের কেটে তার রক্ত পান করেছে এবং তার মুণ্ড মালা গলায় ধারণ করেছে। রণক্ষেত্রে দুর্গার ঘাম থেকে চামুণ্ডা কালীর জন্ম হয়। কবি দুর্গাকে কালীতে রূপান্তরিত করেছেন। কালীর অসুর দলনী প্রচণ্ডা মূর্তি লক্ষ্য করে দেবতাগণ স্তম্ভিত হয়ে যায়। সৃষ্টি রক্ষার জন্য কালীর পদতলে স্বামী শিব অবস্থান করে। তাতে তার লজ্জাবোধ হয়।

"পদ তলে শিবকে দেখি লজ্জা বড় পাল্য।
দন্তে জিহ্বা ধরি কালী ক্রোধ নিবারিল।।"[৩০]

এই ভাবে কালীর ক্রোধকে নিবারণ করা হয়।

অতঃপর দেবীর লৌকিক স্বরূপটি উঠে এসেছে। দেবী পুত্র পালনের জন্য ইন্দ্রপুর থেকে পঞ্চদাসী নিয়ে কৈলাসে ফিরে আসে। শিবের পঞ্চ দাসীকে দেখে মন উচাটন হয়। দেবী তারই

সাক্ষাতে স্বামী শিবের এমন হৃদয় বিদারক আচরণে ব্যথিত হয়। এই অবস্থায় পঞ্চদাসীকে তার পিছনে আড়াল করা ছাড়া উপায় নেই। নারী হয়েও সে প্রতিবাদ করতে পারছে না। পারিপার্শ্বিক সামাজিক পরিস্থিতি তার প্রতিকূল। সেই অবস্থা তার মনে তীব্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। তার হৃদয়ে এক, বাইরে আর এক।

"জোড় করে বলে দুর্গা মধুর বচন।
পুত্র পালন হেতু দাশী পঞ্চজন।।"[৩১]

কবি মানিক দত্ত দেবীকে পুরাণ কথিত দেবত্ব হারিয়ে একেবারে রক্ত মাংসের নারীতে পরিণত করেছেন। কিন্তু দুর্গাকে শেষ পর্যন্ত নারীত্বের লড়াইয়ে পারিপার্শ্বিক সমাজ পরিস্থিতির কাছে হার মানতে হয়েছে। শিব বলেছে — "জে জন পালন করে সে জন জননী।।"[৩২] সমাজ কথিত এই বাণী দ্বারা শিব স্ত্রী দুর্গাকে স্তব্ধ করে দেয়। আর চণ্ডী অসহায় ভাবে স্বামীর অশ্লীল আচরণকে মানতে বাধ্য হয়েছে। তাই সে বলে —

"দুর্গা বলে ক্ষেমা কর দেব শূলপাণি।
তোমার সাক্ষাতে দাসী আনি তবে আমি।।"[৩৩]

পুত্রদের দাসীর কাছে রেখে দেবী মর্ত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য কলিঙ্গ রাজ্যে দোহরা স্থাপন করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন — "ধর্মের প্রেস্টিজের জন্যে চণ্ডীর খেয়াল নেই, তাঁর প্রেস্টিজ হচ্ছে ক্ষমতার প্রেস্টিজ। অতএব মারের পর মার, মারের পর মার!"[৩৪] কলিঙ্গে প্রজা সকল তাকে ছাগল মহিষ বলি দিয়ে দশভুজার পূজা করে। এখানে কবি দুর্গা ভাবনার সঙ্গে কালী সাধনা যুক্ত করে চণ্ডীর স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন। এই মিশ্র দেবী-ভাবনার সঙ্গে সহজ-সরল লৌকিক ভাবনাও চণ্ডীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। কলিঙ্গে তার পূজা প্রচার হলেও পৃথিবীর সর্বত্র তার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য পদ্মার কাছে পরামর্শ নিয়েছে। তার মত এরূপ শক্তিশালী জগৎ-মাতার কাছে এইরূপ বুদ্ধির দ্বারস্থ হওয়া চরিত্রানুগ অসঙ্গতি ঠেকে।

"দুর্গা বোলে পদ্মা বাছা শুনহ বচন।
সুযুক্তি দেহ বাছা করিব কেমন।।"[৩৫]

পদ্মার পরামর্শে চণ্ডী প্রফুল্লনগরের কানা খোঁড়া মানিক দত্তকে দিয়ে কলিঙ্গে তার মাহাত্ম্য প্রচারের নির্দেশ দেয়। দেবীর অদ্ভুত মাহাত্ম্য কথা শুনে প্রজাসকল মোহিত। কলিঙ্গ রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে কবি মানিক দত্তকে কারারুদ্ধ করল। ভক্ত বৎসল দেবী মানিক দত্তকে উদ্ধারের জন্য কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নে তার ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখায় এবং রাজা তাকে সসম্মানে ছেড়ে দেয়। দেবী ভক্তের প্রতি এখানে অভয়দাত্রী।

মানিক দত্তের কাব্যে দেবী চণ্ডীর গৃহিণী রূপ বা দাম্পত্য জীবন যৎসামান্য। তাও কলহ

মুখর। তার সূত্রপাত দেবীর পূজা প্রচারের জন্য পশুসৃজনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তাদের বসবাস ও আহারের ব্যবস্থা করেনি। কারণ দুরবস্থায় পড়ে পশুরা তার শরণাপন্ন হবে। তবে শিব তার উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে দেয়। তারপর দেবী শিব-তপস্যায় রত ইন্দ্রকে ছলনা করতে বৃদ্ধা যোগিনীর বেশ ধারণ করে। তার তপস্যা ভঙ্গ করে তাকে বলে —

"শিবের সেবা ছাড় দুর্গার সেবা কর
পুত্র দিবেন নারায়ণী।।"[৩৬]

তার কথার মধ্যে দেবী চণ্ডীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সুর রয়েছে। সেই সঙ্গে শিব ও শক্তির দ্বন্দ্ব তথা শিবের সঙ্গে চণ্ডীর দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছে। লক্ষণীয়, চণ্ডী তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ইন্দ্রকে পুত্র বর দিতে চেয়েছে। সেই স্থানে ইন্দ্রের পিতৃ হৃদয় শূন্য। প্রসঙ্গত, সুকুমার সেন মহাশয় সঙ্গত কারণেই বলেছেন — "কাহিনীর তলায় তলায় শিব-দুর্গার দাম্পত্য ঘটিত নয়, নিজ নিজ পূজাঘটিত — দ্বন্দ্বের একটি প্রচ্ছন্ন প্রবাহ আছে। নীলাম্বরের সম্পর্কে তাহা দেখিয়াছি।"[৩৭] নীলাম্বরকে সে ইন্দ্রের পুত্র হিসাবে বর প্রদান করে।

অতঃপর তার দাম্পত্য জীবনের চিত্রটি উঠে আসে। একই সঙ্গে দেবী চণ্ডী স্বামীর প্রতি রুষ্ট হয়ে বাঙালী গৃহবধূর মত বাপের বাড়ি যেতে পিছপা হয়নি।

"কন্দল করিঞা দুর্গা বলে নাইহরতে।
পশ্চাতে চলিল শিব দুর্গাকে ফিরাত্যে।।"[৩৮]

এই লৌকিক গৃহবধূর রূপের পাশাপাশি দেবীর পৌরাণিক রুদ্র রূপটিও একাকার হয়ে গেছে। এই দ্বন্দ্ব আরো দৃঢ় রূপ পায় নীলাম্বরের অধিকারকে নিয়ে। দেবী চণ্ডী —

"শিবকে দেখিঞা দুর্গা চক্র নৈল হাতে।
চক্র নঞা ডাণ্ডাইল শিবের সাক্ষাতে।।
অতি ক্রোধ হঞা দুর্গা চক্র ছাড়ি দিল।
চক্রের আনলে শিব ঘামিতে লাগিল।।"[৩৯]

শিবের দেহ নিষিক্ত ঘর্ম থেকে ধর্মকেতু ও নিশানকেতু নামে দুই ব্যাধের জন্ম হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে চণ্ডী তার বস্ত্র নিষিক্ত জল থেকে নিদয়া ও কমলা নামে দুই ব্যাধিনীর সৃষ্টি করে। চণ্ডীর নিষ্ঠুর ও উগ্র রূপটি এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি মন্তব্য মনে আসে। সেটি হল — "... শিবের পূজাকে হতমান করিয়াই নিজের পূজা প্রচার করা দেবীর চেষ্টা। শিব তাঁহার স্বামী বটেন, কিন্তু তাহাতে কোন সংকোচ নাই। শিবের সহিত শক্তির এই লড়াই। এই লড়াইয়ে পদে পদে দয়ামায়া বা ন্যায়-অন্যায় পর্যন্ত উপেক্ষিত হইয়াছে।"[৪০] চিরাচরিত ঐতিহ্য অনুসারে শিব নীলাম্বরকে অধিকার করলে তাতে তার প্রবল প্রতিবাদ, এমনকি স্বামীর প্রাণনাশ করতে সে

পিছপা হয়নি।

চণ্ডী শুধু নিষ্ঠুর নয়, সে ছলনাময়ীও বটে। সে নীলাম্বরকে ধর্মকেতু ও নিশানকেতু কর্তৃক ছলনা করে। এই দুই ব্যাধের মর্ত্যভূমিতে মুক্ত স্বাধীন জীবন দেখে পরাধীন নিয়ম শৃঙ্খলের গণ্ডীতে বাঁধা নীলাম্বর মর্ত্যভূমির প্রতি আকৃষ্ট হয়। শুধু তাই নয়, ছলনা করে ফুলের ভিতরে কীটরূপে লুকিয়ে থাকে দেবী চণ্ডী, যাতে শিব পূজার সময় নীলাম্বরের অসচেতনতা ও অন্যমনস্কতার জন্য তাকে অভিশপ্ত করে। নীলাম্বর মর্ত্যে ব্যাধ কালকেতু নামে জন্মগ্রহণ করে। তার অত্যাচারে পশুকুল অস্তিত্ব-সংকটাপন্ন বোধ করে এবং আত্মরক্ষার জন্য বনদেবী অভয়ার কাছে আসে। অভয়া তাদের,

"সভাকারে বর দিল সর্ব্বমঙ্গল।
পশু বর দিল মাতা মঙ্গলচণ্ডীগণ।।"[৪১]

এখানে দেবী চণ্ডী স্বরূপত অরণ্যানী। দেবী চণ্ডী পশুদের বর দেওয়ার পাশাপাশি কালকেতুর শিকার থেকে বিরত রাখতে গোধিকা রূপ ধারণ করে। কালকেতুর কাছে সে বন্দী হয়। তার বন্ধনে দেবী অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকে।

"গোধিকা বান্ধিল বীর ধনুকের হুলে।
পৃষ্ঠের বন্ধনে বুক চড় ২ করে।।
আঝর নএগ্রানে কান্দে ভকত বৎসল।
সকরুনে কান্দে দেবী চক্ষের মোছে জল।।"[৪২]

তার এরূপ আচরণ দেবী-স্বভাবসুলভ নয়। দেবী হয়ে এইরূপ আচরণ হাস্যকর বলে মনে হয়। দেবীর মধ্যে সঙ্কটাপন্ন মানবের গুণ বর্তমান। সাধারণ মানুষের মত সে সন্তান বৎসল এবং সমাজ বা পরিবার বন্ধন ছিন্ন হবার আশঙ্কায় চিন্তিত। তাতে তার চরিত্রে মাতৃসত্তার দিকটি প্রবল। তাই সে বলে —

"পদ্মা আর কি কৈলাশে জাব কার্ত্তিক গনাই কোলে নব
কার্ত্তিক মাওড় হইল মোরে।।
পদ্মা নারদে দেখিতে পাইলে শিবের আগে কৈহা দিবে
শুনিলে প্রভু না লইবে ঘরে।"[৪৩]

নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ কর্তৃক দেবী বন্দী। পুরুষতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও গার্হস্থ্য জীবনে নারীর কলঙ্ক রটনার আশঙ্কা প্রবল। তা নারী জীবনে কঠিন বিপত্তির সৃষ্টি করে। সেরূপ নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ গৃহে আবদ্ধ উচ্চবর্ণের কুলবধূ চণ্ডীর আশঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক।

ফুল্লরা সংসারে দেবী চণ্ডী অন্যের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উপস্থিত হয়। ফুল্লরার দুঃখের

সংসার। উপরন্তু সে সন্তানহীনা। এই মতাবস্থায় দেবী তার দুর্বল স্থানটি অধিকার করার অভিলাষী। সে বলে — ''কেবল পুত্রের কারণ এহি আমার আশ।।''[৪৪] একথা শুনে ফুল্লরার অন্তর দগ্ধ হয়ে যায়। আবার দেবী সুন্দরী রমণী। তাই সে ব্যাধ-কর্ম করেও সমস্ত সুখ ভোগে তার প্রাধান্য থাকবে, তা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়। ফুল্লরার মানসিক যন্ত্রণা এখানেই। তাই সে বারমাসের দুঃখ বেদনার কথা দেবীর সম্মুখে অকপটে ব্যক্ত করে। দেবীর কাছে ফুল্লরার চাতুরী সহজে ধরা পড়ে। একথা শুনে ফুল্লরা প্রচণ্ড রেগে যায়। সেই অবস্থা থেকে রক্ষার জন্য দেবী অত্যন্ত চতুরতার পরিচয় দেয়। এখানে দেবী স্ব-ইচ্ছায় আসেনি। সে বলে —

''দিয়া আপনার ধন দুঃখ নেবারিব।।
কালু হবে মহারাজা তুমি হবে রানী।
*   *   *   *   *
আমি অপুত্রের পুত্র দেই নির্দ্ধনের ধন।
অন্ধে চক্ষুদান দেই বন্দী বিমোচন।।''[৪৫]

দেবীর এখানে ধনদাত্রী ও বরদায়িনী রূপটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে, চণ্ডীর মানবী ও চামুণ্ডা রূপটিও স্পষ্ট। ফুল্লরা দেবীকে গৃহে রেখে কালকেতুর কাছে যায়। গৃহে ফিরে কালকেতু দেবীকে দেখে নতজানু হয়ে প্রণাম করে। তাতে চণ্ডীর পরিচয়ে দেবত্বের দিকটি স্পষ্ট হলেও সাধারণ মানুষের ন্যায় সে মৃত্যু ভয়ে ভীত। কালকেতু রাজদণ্ডের ভয়ে তাকে গৃহ ত্যাগ করতে বলে। দেবী তাতে অস্বীকার করলে কালকেতু তাকে ধনুকের ভয় দেখায়। তখন দেবী — ''ভয়ে ভবানীর গাও কাঁপে থর থর।।''[৪৬] পরক্ষণে, সে অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়েছে। কালকেতুর বাণ ধনুকেই আটকে যায় এবং সে নিরস্ত্র হয়। অতঃপর দেবী কালকেতুকে স্বীয় অঙ্গুরী প্রদান করে। কিন্তু কালকেতু দেবীর স্বরূপ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে। দেবী তখন তার শবের উপর অধিষ্ঠিতা ভয়ঙ্কর চামুণ্ডা রূপ ধারণ করে।

''জিহ্বা হৈল লহ ২ মুখ ঘোরতর।
দেখিতে ২ ঐরি জায়ে যম ঘর।।
হইয়া লাঙ্গুট দারা কমরে ঘাগর।
বামে শোভিত খাণ্ডা দক্ষিণে খাপর।।
*   *   *
হস্তে মুণ্ড পাএ মুণ্ড কমরে হাতের মাল।
শ্যামার পদভরে নড়ে সপ্ত পাতাল।।''[৪৭]

দেবী চণ্ডীর সঙ্গে কালীর ভাবনা একত্রিত হয়ে গেছে। দেবীর এই স্বরূপ শব বা মৃতের উপর প্রাণ

প্রতিষ্ঠার প্রতীক। তার এই রূপ দেখে কালকেতু মূর্ছিত হয়ে যায়। চণ্ডী তাকে কোলে তুলে নেয়।

"প্রাণ পুত্র বলিয়া তুলিআ লৈল কোলে।
শ্যামার কোলে কালকেতু পড়িল নিদ্রাভোলে।।
আপনার পাদপদ্ম বীরের মাথে দিল।
মূর্ছাগত ছিল কেতু চৈতন্য পাইল।।"[৪৮]

মূর্ছাগত কালকেতুকে দেবী কোলে তুলে নেওয়ার মধ্যে তার মাতৃকারূপ পরিস্ফুট হয়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন — "বাঙ্গালীর বিশিষ্ট মানসগঠন সর্বভারতীয় আদর্শ হইতে স্বাতন্ত্র্যে তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তখনই দৈবশক্তিকে মাতৃরূপে পরিকল্পনা করা ইহার স্বভাবধর্ম হইয়া দাঁড়াইল। চণ্ডী এই স্বভাবধর্মের অনুকূল ও পরিপোষকরূপে শীঘ্রই বাঙালীর ধর্ম-সংস্কারের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভয়ঙ্কর রূপকে আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার দয়াময়ী অন্নপূর্ণামূর্তি প্রবল হইয়া উঠিল।"[৪৯] পাশাপাশি দেবী কর্তৃক প্রাণ প্রতিষ্ঠা বা সৃষ্টি রক্ষার আভাস পাই। মানিক দত্তের চণ্ডী কেবল ভক্তবৎসল নয়; সে মাতৃরূপিনী ও সৃষ্টি রক্ষাকর্ত্রীও বটে। ক্ষুদিরাম দাসও 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' গ্রন্থের ভূমিকা অংশে মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডী সম্পর্কে যে কথাটি বলেছেন সে কথাটি মানিক দত্তের চণ্ডী প্রসঙ্গেও খাটে। তিনি বলেছেন — "কবির লেখনীগুণে দেবতাও ছলনাময়ী ও কদাচিৎ স্নেহবৎসলা মানবীতে রূপান্তরিত হয়েছে এইটিই লক্ষণীয় বিষয়।"[৫০] এই স্নেহবৎসলা দেবী আবার তার স্বরূপ সম্পর্কে কালকেতুকে বলেছে —

"আমি পুরূষ প্রকৃতি বটি কহিলাঙ তোমারে।
গোপ্ত কথা আর জানি পুছহ আমারে।।"[৫১]

তার রূপে পুরুষ মহাদেব শব রূপে সৃষ্টি সংহার কর্তা, আর প্রকৃতি তার উপর অধিষ্ঠিতা দেবী সৃষ্টিকারিণী। তার মূর্তিতে শবস্থানে প্রাণের প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। তাই দেবীর কথায় মনে হয় তন্ত্রের কালী বা চামুণ্ডাই মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডীর স্বরূপের সঙ্গে মিশে গেছে।

স্নেহবৎসল দেবী ভক্তের জন্য সকল প্রকার বিপদে রক্ষার অভয় দান করে। দরিদ্র কালকেতুর এত ধন দেখলে লোকজন রাজা-স্থানে জানালে রাজা তাকে দুষ্কৃতি সন্দেহে দণ্ড দিবে। সেই ভয়ে বীর ভীত। তখন চণ্ডী তাকে বলে —

"আমি দুর্গা আছি তোর শিয়রের উপর
কি করিবে দণ্ডের ঈশ্বর।।"[৫২]

অতঃপর কালকেতু দেবীর অঙ্গুরী পুরাই দত্তের কাছে বিক্রি করে কোদাল খনতা কেনে। এই খনতা কোদাল কৃষি সভ্যতাকে নির্দেশ করেছে। তা দিয়ে কালকেতু দেবীর নির্দেশে মাটি থেকে সাত ঘড়া ধন প্রাপ্ত হয়। সেই সাত ঘড়া ধন দিয়ে দেবী কালকেতু কর্তৃক গুজরাট নগর স্থাপন

করবে। দেবীর এই আচরণের মধ্য দিয়ে কৃষি সভ্যতার হাত ধরে নগরায়নের উত্তরণের দিকটি নির্দেশ করে। কৃষি কাজের দুরবস্থা কবির কথায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কলিঙ্গ নগর ভাঙ্গনের সময় বাঙলার কৃষি ভেসে যাচ্ছে গুজরাট নগর পত্তনের জন্য। কবির কথায় —

"ছাগল ভেড়া মনিষ্য ঘোড়া গোরু পালে পাল।
জোয়াল নাঙ্গল ভাসে কোদালি আর ফাল।।"[৫৩]

কৃষি কার্যে দুরবস্থায় এরূপ নগরায়ন ভাবনা অস্বাভাবিক নয়। যা কবি দেবী চণ্ডীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চণ্ডী কেবল কালী, চামুণ্ডা, দুর্গা, অভয়া, বনদেবী নয়, সে লক্ষ্মী রূপও বটে। সে কালকেতুকে ধন দান করেছে। সেই ধন গৃহে স্থাপনের জন্য দেবী কালকেতুকে ধন পূজা করতে বলেছে। ধন পূজার সঙ্গে কালকেতু তাকেও পূজা দেয়। ধনদেবী লক্ষ্মী যেন এখানে চণ্ডীতে পরিণত হয়েছে।

"জঙ্গলের পুষ্প তুলি আনিল বিস্তর।
ধন পূজা করে বীর অক্ষটী কুঙর।।
এক অঞ্জলি পুষ্প তুলিল হৃদয়ে।
আস্থা করি দিল পুষ্প চামুণ্ডার পায়ে।।"[৫৪]

এই ধনলক্ষ্মীরূপী চণ্ডীর সঙ্গে শিবের দ্বন্দ্ব মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে প্রকট হয়েছে। যার সূত্রপাত হয়েছিল বীজুবন সৃষ্টি ও নীলাম্বর অধিকার নিয়ে, তা প্রবল রূপে প্রকাশ পায় শিব ভক্ত ভাঁড়ুর সঙ্গে চণ্ডীর দ্বন্দ্বে। চণ্ডী তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করার জন্য উপস্থিত হয়েছে গঙ্গার পুত্র ডাক ও ডেউরের রাজদরবারে। তাদের অবস্থান সান্তাল পর্বতে। তাদেরকে নিম্নশ্রেণীর অন্ত্যজ বলে মনে হয়। এই অন্ত্যজদের নিয়ে দেবী চণ্ডীর বিদ্রোহ। বিদ্রোহ তার উচ্চশ্রেণীর প্রতিনিধি ভাঁড়ু দত্তের সঙ্গে। ভাঁড়ু সমাজে প্রতিষ্ঠিত দেবতা শিবের উপাসক। তাই দেবী চণ্ডী ভাঁড়ুকে তার ঐতিহ্যবাহী অটল ভক্তি ভাবনাকে পরিবর্তন করতে ডাক ও ডেউর কর্তৃক কলিঙ্গ নগরে বন্যার সূচনা করে। কিন্তু তাতেও ভাঁড়ু দত্ত দেবীকে মেনে নেয় না। বরং ভাঁড়ু দত্ত শিব-মন্ত্র উচ্চারণ করে নিজের আত্মবলকে দৃঢ় করেছে। সেই কারণে দেবী চণ্ডী তাকে বন্যায় ভাসিয়েছে। আত্মরক্ষার ঘর পর্যন্ত ইঁদুর দ্বারা ফুটো করে জলে পূর্ণ করেছে। ভাঁড়ু দত্তের সমস্ত স্বজনকে প্রাণ রক্ষার জন্য উঁচু স্থানে উঠতে হয়েছে। এমনকি সেখানেও ঘরে টঙ্ পর্যন্ত বন্যায় প্লাবিত করেছে চণ্ডী। শেষপর্যন্ত নারদের অনুরোধে সে ভাঁড়ু দত্তকে প্রাণে রক্ষা করে। ভাঁড়ু দত্তের সঙ্গে দেবী চণ্ডীর লড়াইয়ে আর্য-অনার্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইটি সুস্পষ্ট বলে মনে হয়।

অতঃপর ভাঁড়ুদত্ত গুজরাট নগরে চণ্ডীর অনুগত ভক্ত কালকেতু কর্তৃক অপমানের প্রতিশোধ

নেবার জন্য কলিঙ্গরাজ সুরথকে উস্কে দেয়। শিব ভক্ত সুরথরাজ কালকেতুকে বন্দী করে। দেবী চণ্ডী তার কারারুদ্ধ ভক্তকে উদ্ধারের জন্য অলৌকিক 'হিড়িমকসের চাল' প্রদান করে। সেই চালে দেবীর চার অবতারের পরিচয় পাই। তাতে চণ্ডীর স্বরূপে লৌকিক ভাবনার মিশ্রণ ঘটেছে। আদিম অনার্য জাতির মধ্যে পশুশিকার ও পশুপালন এবং ভূতপ্রেত থেকে একটি মানসিক সম্পর্ক স্থাপন হয়। তারা এই সকল পশুপাখি শিকারের পিছনে অলৌকিক শক্তির কল্পনা করত। পশুপাখি ও ভূতপ্রেতের সঙ্গে অলৌকিক শক্তির সম্পর্ক নিবিড়। তাই অনার্যরা পশু-পাখি ও ভূতপ্রেতকে দেবদেবীর অলৌকিক কল্পনায় মিলিয়ে ফেলেছে। সঙ্গত কারণেই পল্লব সেনগুপ্ত বলেছেন — "এই পর্বে পশু ও মানুষের মিশ্রিত মূর্তিতে দেবতাদের কল্পনা করা হয়েছে, ...।"[৫৫] এই লৌকিক ভাবনা দেবী চণ্ডীর চার অবতারে মিশ্রিত অবস্থায় রয়েছে। সেই চারটি অবতার হল — শৃগাল, শকুন, সিংহ ও প্রেত অবতার। তবে সিংহ বাহন চণ্ডীকে পুরাণে পাই। শৃগাল সহ চণ্ডীর মূর্তি পাই বর্ধমানের কলমপুরে। মিহির চৌধুরী কামিল্যা বলেছেন — "শিয়ালে চড়া নারী মূর্তিও চণ্ডী হয়ে গেছেন কালক্রমে।"[৫৬] চণ্ডীর এই চারটি অবতারে পৌরাণিক রূপের সঙ্গে বর্তমানে লৌকিক ভাবনাও যুক্ত হয়ে আছে।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডী স্বীয় পূজা পাওয়ার জন্য অত্যন্ত লোভী ও স্বার্থপর চরিত্রের পরিচয় দেয়। সে তার ভক্তকে যেমন সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে তেমনি প্রতিপক্ষ তার পূজা করলে তখন নিজ ভক্তকেও বিপদে ফেলতে তার বাধে না। কালকেতু দেবীর প্রধান ভক্ত। কিন্তু কলিঙ্গরাজ সুরথ তার পূজা করলে তার কাছে ফিরে যেতে তার দ্বিধা নেই।

"দুর্গা বলে কালকেতু শুন মোর বানী।
শোধিলাম তোমার বাদ গৃহে জাহ তুমি।।
ভবানী হৈল বাম কুবুদ্ধি লাগিল।
বিদায় হৈয়া বাক্য বীর তখনি বলিল।।
বিদায় দিলেন মাতা বিদায় হৈলাম আমি।
কেতুর কন্ধ ছাড়িয়া চলিলা নারায়নী।।
জেখানে করএ পূজা সুরথ রাজন।
ঘটে বসিয়া তথা পূজাতে দিল মন।।"[৫৭]

নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কালকেতুকে সে প্রয়োজনে কাজে লাগিয়েছে। গুজরাট নগরে তার পূজা প্রচার হলে তাকে সে বিদায় দিয়েছে এবং কলিঙ্গ দেশের প্রতি সে মনোনিবেশ ঘটিয়েছে। মানিক দত্তের চণ্ডীর পূজা প্রচার মূল উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য পূরণে যতটা স্বার্থের চরম পর্যায়ে

নামতে হয় ততটাই সে করেছে। তার পুত্রবৎ সন্তানের ভবিষ্যৎ করুণ অবস্থার জন্য বিবেক দংশন হয়নি। উপরন্তু সে বলেছে —

"আইস বাছা সুরথ রাজা তোকে দিলাম বর।
ছাড়িলাম বীরের কন্ধ জাইয়া বন্দি কর।।"[৫৮]

দেবী চণ্ডীর এরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ, ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান শূন্য, উদ্দেশ্য কায়েমী, লোভী ও স্বার্থপর চরিত্র। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন — "এই শক্তির প্রসন্ন মুখ মাতা, এই শক্তির অপ্রসন্ন মুখ চণ্ডী। ইঁহারই 'প্রসাদোহপি ভয়ংকরঃ;' সেইজন্য সর্বদাই করজোড়ে বসিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু যতক্ষণ ইনি যাহাকে প্রশ্রয় দেন ততক্ষণ তাহার সাত-খুন মাপ; যতক্ষণ সে প্রিয়পাত্র ততক্ষণ তাহার সংগত-অসংগত সকল আবদারই অনায়াসে পূর্ণ হয়।"[৫৯] সুরথ রাজের জবানীতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে বন্দী কালকেতুকে বলেছে — "কার ভরসাএ ভাঙ্গ আমার শাসন।"[৬০] অর্থাৎ কালকেতু যার ভরসায় কলিঙ্গ ভেঙে গুজরাট স্থাপন করেছে, সে তো ভরসাহীন প্রয়োজনসিদ্ধ চরিত্র।

স্বার্থ-সর্বস্ব ও প্রয়োজনসিদ্ধ দেবী চণ্ডীর মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা আমাদের অবাক করে। কালকেতু গোধিকা ভ্রমে তাকে বন্দী করে। দেবীর সেই ব্যথার প্রতিশোধ মনুষ্য ব্যাধ কালকেতুর উপর বর্তেছে। দেবী পদ্মাকে বলে —

"দেবি বোলে পদ্মা মুঞি বোলো তোমারে।
গোধিকারূপে গিয়াছিলাম ধন দিবার তরে।।
কিবা মাগিব ধন মুখে বন্দী করে।
সেহিত বন্ধনে প্রাণ চড়চড় করে।।
সেহি দুঃখ ভূঞ্জিব বীর ধুলিয়া কোঠরে।।"[৬১]

পরে এই কালকেতুর বন্দী দশা দেখে চণ্ডীর মানসিক প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় কবি দেবীর দেবত্ব ক্ষুণ্ণ করেছেন। নরের সঙ্গে দেবীর প্রতিশোধ ভাবনা তাকে মনুষ্যকুলের প্রতিনিধি সারিতে এনে দাঁড় করিয়েছে।

দেবী চণ্ডী কালকেতুকে উদ্ধার করে। পরকালের চিন্তায় কালকেতু ও ফুল্লরা বংশরক্ষার জন্য জাহ্নবীর তীরে চণ্ডী পূজা করতে যায়। এরূপ ইন্দ্রও নদীর ধারে পুত্র সন্তানের জন্য তপস্যা করে। প্রজনন বা উর্বরতার সঙ্গে জল বা নদীর একটি সম্পর্ক রয়েছে। 'দেবখণ্ড'-এ চণ্ডী ইন্দ্রকে ছলনা করতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশে জলে জলকেলী করে; আর আখেটিক খণ্ডে কালকেতুকে ছলনা করতে গ্রাম্য গৃহবধূ বা 'বৌহারি' বেশে জলকেলী করে। তার পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রকে পুত্র বর দেয় আর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে কালকেতু ও ফুল্লরাকে পুত্র বর থেকে বঞ্চিত করে। এখানেও

তার স্বার্থসর্বস্ব রূপটি স্পষ্ট —

“বৌহারি মূর্ত্তি ধরি   মলিন বসন পরি
কলসী কাখেত লইল।।
দেবী জলভরে   জলক্রীড়া করে
ডাকিয়া বীরেক বলিল ভবানী।
ছাড়িয়া গৃহবাস   ধরিছ পুত্রের আস
সে পুত্র না দিব নারায়নী।।”[৬২]

লক্ষণীয়, কবি চণ্ডীকে দেব খণ্ডে ব্রাহ্মণী রূপে এবং ব্যাধ খণ্ডে গ্রাম্য গৃহবধূ রূপে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন অত্যন্ত সচেতন ভাবে। এখানে ছলনাময়ী চণ্ডীর লৌকিক স্বরূপটি অধিকতর উজ্জ্বল।

‘ধনপতি খণ্ড’-এ চণ্ডী পুনরায় আরো চারদিনের পূজা প্রচারে চিন্তিত। তার চিন্তার উপায় করল নারদ মুনি। সে কর্ণমুনিকে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামাবার কথা উত্থাপন করে। চণ্ডী কর্ণমুনিকে ছলনার জন্য প্রথমে তার গুরু শিবকে ছলনার কৌশল অবলম্বন করে। শিবের কামুকতাকে কাজে লাগানোর কল্পে দেবী ষোল বৎসরে মোহনীয় রমণীর বেশ ধারণ করে। শিব স্থানে এসে তার কামাকুল চিত্তকে ধাবিত তথা আকর্ষণ করার জন্য দেবী একবার সামনে এসেছে, আর একবার পিছিয়ে গেছে। চণ্ডীর এইরূপ চিত্তহরণ কৌশল অত্যন্ত নাটকীয়। কবি লিখেছেন —

“জৌবন দেখাইয়া দুর্গা পাছাইয়া রহিল।
হস্ত তুলিয়া শিব ডাকিতে লাগিল।।
হাসিতে হাসিতে দুর্গা ক্ষেনেক আগুয়ায়ে।
আপনার বেশ দেখায়ে ক্ষেনেক পাছয়ায়ে।।”[৬৩]

শিব তার মোহনরূপ দেখে যৌবন সম্ভোগে ব্যাকুল হয়। সেই সুযোগে সে প্রচলিত একটি প্রবাদ বলে — “সাধিলে আপন কার্য্য কার কেহু নয়ে।”[৬৪] গভীর তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে দেবী চণ্ডী শিবকে তার কন্যা মনসার মর্ত্যে পূজা প্রচারের কথা উল্লেখ করে। একথা শুনে শিব তার উদ্দেশ্যের দিকে মনোনিবেশ করবে। সত্যিই তাই হয়। সেই সুযোগে দেবী চণ্ডী শিবের সঙ্গে পাশা খেলায় কর্ণমুনিকে সাক্ষী রাখে এবং শর্ত করে — “জদি হারিবে প্রভু দেব ত্রিলোচন।/ ইহ সাক্ষী দিলে হবে নরকে গমন।।”[৬৫] পাশা খেলায় শিব জয় লাভ করে। তা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য চণ্ডী কর্ণমুনিকে দিয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে প্ররোচনা করে। মিথ্যা সাক্ষী দিতে অনিচ্ছুক কর্ণমুনিকে দেবী তার পূর্ব সুকীর্তিকে লোভনীয় রূপে উদাহরণ স্বরূপ তার সম্মুখে পরিবেশন করে। যাতে কর্ণমুনি গুরুর বিপক্ষে সাক্ষী দিতে ও মর্ত্যে যেতে রাজী হয়। চণ্ডী কর্ণমুনিকে বলে —

“সেবক করিয়া জদি চিন্তা থাকে তারে।/ পুত্র হেতু তপস্যা করে কামনা সাগরে।।

মৎস বাসা করিয়াছিল উরাথ ভিতরে।/ নানা মত ক্লেশ পায়ে দেব শরীরে।।

দেখিয়া তাহার দুঃখ ধরাইতে নারিনু।/ ইন্দ্রেক ছলিয়া তাক পুত্র বর দিনু।।

ইন্দ্রের ঘরে পুত্র হইল নাম নীলাম্বর।/ শিব তাকে শাপ দিল বড় দুরাক্ষর।।

শিবের শাপে জন্ম তার চাম দড়িয়ার ঘরে।/ আমি তারে বাড়াইলাম গুজরাট নগরে।।

রাজ বৈভোগ করি মৃত্যু হৈল তারে।/ তাহা হৈতে চারিদিনের ব্রত হৈল মোরে।।''[৬৬]

চণ্ডী তাকে এই সকল কথায় ভুলিয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে বাধ্য করেছে। সেই সঙ্গে দেবী তাকে অর্থধন-কুলগৌরবের লোভ দেখিয়েছে। সেবক হয়ে কর্ণমুনির মনে এই লোভনীয় আকাঙ্ক্ষাগুলি সুপ্ত থাকা স্বাভাবিক। সেই সুপ্ত বাসনাকে চণ্ডী কাজে লাগিয়েছে। শেষ পর্যন্ত কর্ণমুনি মিথ্যা সাক্ষী দিলে শিব কর্তৃক অভিশপ্ত হয়। দেবী চণ্ডীর উদ্দেশ্য সফল হয়। এখানে চণ্ডীর বুদ্ধিমত্তা এবং চরিত্রের দুর্বল চিত্তের মনোবাঞ্ছাকে নিজের উদ্দেশ্যের অনুকূলে করে নিয়েছে। এখানে তাকে আধুনিক কৌশলী মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র বলে মনে হয়। মধ্যযুগে দাঁড়িয়েও মানিক দত্তের চণ্ডী চরিত্রটি বর্তমানে প্রশংসার দাবী রাখে।

চণ্ডী ক্রুদ্ধ চরিত্র বটে। তবে দেবীর আশির্বাদে ধনপতি ও লহনা মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করল। লহনা বাল্য বয়স থেকে ভালো ঘর, বর, কুল পাওয়ার জন্য দেবীর পূজা করে। তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে দেবীর কথা ভুলে যায়। চণ্ডী তাকে নিঃসন্তান ও সতীন জ্বালার অভিশাপ দেয়।

''কোপ দৃষ্টে শাপ দিল ত্রিপুরা ভবানী।

আমার শাপে হউক তোর দারুণ সতিনী।।

তোর কোলে জেন না হয়ে বংশধর।

বাঞ্ঝা হৈয়া থাক তুমি পৃথিবী ভিতর।।''[৬৭]

দেবী চণ্ডী তার ভক্তকেও একটু তোষামোদের অভাব ঘটলে ছাড়েনি। তাকে অন্যের দ্বারা লাঞ্ছিত করিয়ে ছেড়েছে। সে লহনাকেও সেই পথে ঠেলে দিয়েছে।

লহনার দ্বারা পূজা প্রচার ব্যর্থ হলে চণ্ডী চিন্তিত হয়। নারদের পরামর্শে স্বর্গের রত্নমালাকে ইন্দ্র কর্তৃক অভিশপ্ত করায়। রত্নমালার মর্ত্যে খুল্লনা নামে জন্ম হয়। তাকে দিয়ে পূজা প্রচারের জন্য রাজা বিক্রমকেশরকে স্বপ্ন দেখায়। যাতে রাজা আটকুড়া অপবাদে ধনপতিকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে বাধ্য করে। দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশে রাজা ধনপতিকে বন্দী করে। দেবী তখন চিন্তিত হয়ে বলে —

''কিরূপে গৌড়ে জাবে সাধু ধনপতি।।

কিরূপে চরাবে ছেলি সুন্দর খুলনা।

এই কথা দুর্গা মাতা করিছে মন্ত্রনা।।''[৬৮]

অতঃপর পদ্মার কথায় সে শারী ও শুকের জন্ম করায়। শারী-শুকের পিঞ্জরের জন্য ধনপতি গৌড়ে যাত্রা করে। এই সুযোগে লহনা সতীনের উপর অত্যাচার করার জন্য এবং নিজের বিগত যৌবন লক্ষ্য করে সুন্দরী খুল্লনাকে ছাগল চরাতে পাঠায়। সেই ছাগলকে চণ্ডী সেজানু পর্বতে লুকিয়ে রাখে। নিদ্রা থেকে জেগে খুল্লনা ছাগল না পেয়ে হতাশ চিত্তে বনে ঘুরে বেড়ায়। সেই দুঃখে সে নিজেকে বনের বাঘ ও ভাল্লুকের কাছে জীবন সমর্পণ করতে চেয়েছে। কিন্তু তারা চণ্ডীর ব্রতদাসী বলে তাকে ভক্ষণ করে না। সেই মুহূর্তে খুল্লনা পঞ্চবিদ্যাধরীদের দেখে বটবৃক্ষের তলে চণ্ডীপূজা করে। খুল্লনা দেবীর স্থানে স্বীয় দুঃখ জানায়। চণ্ডী তার দুঃখের কথা শুনে ভাবতে থাকে। শেষে ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে দুর্গা তার সম্মুখে উপস্থিত হয়। এখানে সে অরণ্যদেবী।

> ''ব্রাহ্মণীর রূপে দুর্গা আল্য মর্থলোকে।
> অরন্যে আসিয়া কথা বলে খুলনাকে।।''[৬৯]

ছদ্মবেশী দেবী চণ্ডী চতুর। সে খুল্লনার মনকে পরখ করে নিয়েছে। তার প্রতি খুল্লনার ভক্তি ও নিষ্ঠা কতখানি তা পরখ করতে সে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের পূজার কথা বলে। একথা শুনে খুল্লনা তার প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও ভক্তি প্রকাশ করে। তাতে সে তুষ্ট হয়। তাকে সমস্ত ছাগল ফিরিয়ে দেয়। সে বাঘ, ভাল্লুক, সর্প, ছাগল প্রভৃতি পশু জীবের দেবী। ব্যাধ খণ্ডে তাকে এমন ভাবে পশুদের সঙ্গে একাত্ম হতে দেখা যায় নি। কিন্তু 'ধনপতি খণ্ড'-এ তার এই স্বরূপ তাকে অরণ্যানী ও পশুদেবী রূপেই পরিচয় প্রদান করে। তার স্বরূপ খুল্লনা ও পশুদের কথায় বোঝা যায় —

> ''ছেলির প্রসাদে আমি দেখিলাঙ দুর্গাকে।।
> *   *   *
> বাঘ ভালুক সর্প বোলে জদি আজ্ঞা পাই।
> লহনা বাঞ্জির মুণ্ড শীঘ্র ছিণ্ডি খাই।।''[৭০]

দেবী চণ্ডী নিজেই ভক্তের মঙ্গল উদ্দেশ্যে লহনাকে প্রাণ নাশের হুমকী দিয়েছে। খুল্লনা ও ধনপতিকে মিলনের জন্য সে তাদের মন চঞ্চল করেছে। প্রথমে খুল্লনার কাছে শ্বেত কোকিল রূপে যৌবন জ্বালা জাগ্রত করেছে এবং পরক্ষণে শ্বেত কাক রূপে খুল্লনার দুঃখ বেদনা গৌড়ে ধনপতির কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

দেবী চণ্ডী কতটা ভক্তবৎসল তার পরিচয় পাই খুল্লনার 'জৌঘর' পরীক্ষার সময়। তবে কবি তাকে দেবীত্বগুণ থেকে একেবারে ছিন্ন করেছেন। তাকে সঙ্কটাপন্ন সন্তান রক্ষায় ব্যাকুলা মাতা রূপে অঙ্কন করা হয়েছে। চণ্ডী-ভক্ত খুল্লনার মরণাপন্ন অবস্থা দেখে শোকাকুলা মাতার ন্যায় কাঁদতে কাঁদতে চণ্ডী প্রতিদ্বন্দ্বী শিবের স্থানে আসতে বাধ্য হয়।

"রক্ষা করিতে মাতা চলিল ত্বরিতে।
ঘরে না জাইতে পারে অগ্নির জ্বালাতে।।
পরীক্ষা ছাড়িএগ মাতা গমন করিল।
কান্দিতে ২ মাতা শিব স্থানে গেল।।
অগ্নিতে পুড়িয়া মরে সুন্দর খুলনী।
আমার দাসীর প্রাণ রাখ শূলপাণি।।"[৭১]

শুধু তাই নয়, ধনপতির সিংহল যাত্রার প্রাক্কালে খুল্লনা তার স্মরণে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। সে ভক্তের বিপদ আশঙ্কায় চিন্তিত হয়। সত্ত্বর পঞ্চদাসী সহ তার কাছে উপস্থিত হয়। সুতরাং চণ্ডী এখানে ভক্তবাৎসল্যের সঙ্গে মাতৃবাৎসল্যে পরিপূর্ণ চরিত্র।

কিন্তু মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধনপতির সিংহল যাত্রা পথে মগরাতে চণ্ডীর 'কমলে কামিনী' রূপ স্বতন্ত্র মাত্রা দান করেছে। সে ধনপতিকে ছলনা করার জন্য কমলের বা পদ্মের ডালে ও পদ্ম পাতায় রূপান্তরিত হয়। সেই সঙ্গে সে হাতি বা গজ খাচ্ছে এবং সেটাকে উগরে ফেলছে। চণ্ডী তার রূপের দ্বারা ধনপতিকে আকর্ষিত করিয়েছে। কবির বর্ণনায় —

"কমলের ডাণ্ডি হৈল জগতের মাতা।/ মায়ারূপে হইলেন কমলের পাতা।।
জলখাত্যে আল্য ইন্দ্রের গজরায়।/ বামহস্তে ধরি মাতা তাহাকে ফিরাএ।।
বামহস্তে গজ লএগ দক্ষিনে গরাসে।/ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি সাধুর তরাসে।।
সাধু বলে শুন ভাই জতেক গাবর।/ কন্যাকে ধরিএগ তোল নোকার উপর।।
অপূর্ব্ব দেখিএ এই কন্যা রূপবতী।/ তিলোত্তমা হএ কিবা ইন্দ্রের যুবতী।।
কামিনী কমল গজ দেখ সর্ব্বজন।/ কহিবে রাজার স্থানে এই বিবরণ।।
চাকর নফর কহে ভাণ্ডারি কণ্ডারি।/ আমরা না দেখি গজ কমল কুমারি।।"[৭২]

মানিক দত্তের চণ্ডীর এই রূপ দেখে সমালোচক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মের সৃষ্টির সঙ্গে দেবীর 'কমলে কামিনী' রূপের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে — "ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে যে কমলে-কামিনীর গজ গ্রাস ও বমনের ব্যাপার আছে তাহা ধর্ম্ম-ঠাকুরের সৃষ্টিলীলার রূপান্তর মাত্র। ধর্ম্ম হইতেছেন বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্যতম; বৌদ্ধশাস্ত্রের মতে ধর্ম্ম আদিদেব এবং সৃষ্টিকর্ত্তা; মোঙ্গলদেশের প্রভাবে ধর্ম্ম স্ত্রীমূর্ত্তিতে পূজিত হইয়া আদ্যাশক্তিরূপে গণ্য হইতে থাকেন। ... সমুদ্রে কমলাসনা দেবীর মুখ হইতে গজ নির্গত হওয়ার ব্যাপারে ধর্ম্ম কর্ত্তৃক সৃষ্টিকার্য্যের ও কমলে কামিনী আবির্ভাবের সমান ঘটনা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী পৌরাণিক চণ্ডী নহেন, তিনি বৌদ্ধ দেবতার রূপান্তর মাত্র।"[৭৩] তিনি ধর্মের পদ্মফুল সৃষ্টির সঙ্গে দেবীর কমলের ডাণ্ডি ও কমল পাতায় পরিণত হওয়ার, ধর্মের গজ মূর্তিরূপ ধারণ করার সঙ্গে দেবীর গজ গেলা

ও উগরানোর সঙ্গে সাদৃশ্য রচনা করে ধর্মকেই বৌদ্ধ চণ্ডীর কস্তুরী রূপান্তর বলেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় দেবী চণ্ডীর কমলে কামিনী রূপ লক্ষ্মী মনসার মিলিত স্বতন্ত্র রূপ। প্রথমত, ধর্মের পদ্মফুল সৃষ্টি এবং দেবীর কমলের ডাণ্ডি ও পাতায় পরিণত এক বিষয় নয়। ধর্ম পদ্ম ফুল সৃষ্টি করেছিল পৃথিবীতে মৃত্তিকা সৃষ্টি করার জন্য। আর কমলে কামিনী রূপ ধারণ করেছিল ধনপতির মন হরণ করার জন্য। অর্থাৎ দেবীর সৌন্দর্যে বা রূপে মোহিত করাই উদ্দেশ্য ছিল। তবে উদ্দেশ্যগত দিক থেকে ধর্ম ও দেবীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তুলনায় দেবীর এই রূপের সঙ্গে শ্রী বা লক্ষ্মীর মিল রয়েছে বেশি। এই কাব্যে অন্য স্থানে চণ্ডীর বৃদ্ধা রূপ পাই। কিন্তু এখানে সে যুবতী কন্যা। সুকুমার সেন সঙ্গত কারণেই বলেছেন — ‘‘কমলে-কামিনী-কুঞ্জর দেবতার সঙ্গে বুড়ী অভয়া চণ্ডীর কোন দিকেই তো কোন মিল নেই। কমলে-কামিনী-কুঞ্জর হলেন মোহিনী দেবতা শ্রীমতী। শ্রীর প্রতীক পদ্ম তাঁর আলয়। ফাঁদ পাতা ওঁর পুরুষের জন্যেই।’’[৭৪] দেবীর মোহিনী রূপের পরিচয় ধনপতির কথায় স্পষ্ট হয়। দ্বিতীয়ত, ধর্মের গজরূপ ধারণের সঙ্গে দেবীর গজ গেলা ও উগরানোর কোন সাদৃশ্য নেই। কেননা, বৌদ্ধ স্থাপত্যে জলের মধ্যে পদ্মাসীনা নারীমূর্তির মাথার উপর হাতি জল ঢালছে — এ ধরনের মূর্তি পাওয়া যায়। এই দেবী পরে গজলক্ষ্মী নামে পূজিত হয়। সুকুমার সেনের মতে — ‘‘গজলক্ষ্মী মূর্তি কমলে-কামিনী-কুঞ্জরে মূর্তির শোভন সংস্করণ ...।’’[৭৫] এবং রোমান লেখক তাকিতূস্ (Tacitus)-এর ‘গের্‌মানিয়া’ (Germania) বইয়ে বর্ণিত দেবীর সঙ্গে মানিক দত্তের কমলে কামিনীর সাদৃশ্য রয়েছে। সেই দেবীর অধিষ্ঠান সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপে। সেখানে রয়েছে মনোরম কুঞ্জবন। এই দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে মনসার মিল আছে। মনসার উৎপত্তি জলমধ্যে পদ্মনালে, তাই তার আর এক নাম পদ্মা। আবার লক্ষ্মীর উৎপত্তি সাগরে, অধিষ্ঠান পদ্মের উপরে, তাই তারও নামান্তর পদ্মা। এছাড়া দেবীর গজ বা হাতি গেলা উগরানো অস্বাভাবিক। তাই সাপ গেলা ও উগরে ফেলা অনেক সহজ ও সরল প্রক্রিয়া। তাই মনে হয় দেবীর কমলে কামিনী রূপ মনসা ও লক্ষ্মীর মিলিত স্বতন্ত্র মূর্তি। সুকুমার সেনের মতে — ‘‘খুল্লনার পতি ও পুত্র সমুদ্রে বাণিজ্যযাত্রা-পথে কালিদহে যে কমলে-কামিনী দেবীকে দেখিয়াছিল তিনি দুর্গা-চণ্ডী-অভয়া নহেন। তিনি দেবীর প্রাচীনতর রূপভেদ দুর্গা-মনসা-কমলার বেশান্তর।’’[৭৬]

অতঃপর চণ্ডী চরিত্রের তেমন সক্রিয় ভূমিকা নেই। কবি তাকে কাহিনী অগ্রগতির ও যোগসূত্র রচনার জন্য এনেছেন। যেমন, শ্রীমন্ত সিংহল রাজের কাছে যখন বাণিজ্য দ্রব্য বিনিময় করে তখন তার আবির্ভাব, কারণ তার মনে হয়েছে শ্রীমন্তের বাণিজ্য করে চলে গেলে কীভাবে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং সুশীলার সঙ্গে বিবাহ হবে। এই জন্য দেবী চণ্ডী রাজা শালবানকে স্বপ্ন দেখায় মিথ্যা শ্রীমন্তের কপটতা বিষয়ে। তাহলে শ্রীমন্ত বন্দী হবে এবং দেবী চণ্ডীর উদ্দেশ্য পূরণ

হবে। বন্দী শ্রীমন্তকে মশানে মুণ্ডচ্ছেদন করতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন দেবী চণ্ডী কোতালের কাছ থেকে তাকে দান স্বরূপ নিয়েছে। এখানে তার স্নেহবৎসলরূপটি পরিস্ফুট হয়েছে।

"শ্রীমন্ত বসিঞা ছিল বকুলের তলে।
নাতি বলি দুর্গা শ্রীমন্ত লৈল কোলে।।"[৭৭]

দেবীর কৃপায় শ্রীমন্ত শর্তে জয়লাভ করে। সে সময় শ্রীমন্তের হাত ধরে রাখে। শ্রীমন্ত স্বর্গে চলে গেলে তার ব্রত সম্পন্ন হবে না। এখানেও তার শ্রীমন্তের প্রতি আচরণ স্নেহের ও প্রীতিসম্পন্ন।

"গলে তুলে দেএ সাধু নবসান কাতি।
সাধুর হস্ত ধরি রাখে অভয় পার্ব্বতী।।"[৭৮]

এখানে দেবী চণ্ডীর দেবত্বের তুলনায় স্নেহবৎসল নারী স্বরূপটি বেশি স্পষ্ট। কবি চণ্ডীকে কেবল দেবী করেই রেখেছেন দেবখণ্ডে। এখানে তার পুরাণ স্বভাবটি বড় হয়ে উঠেছে। তবে ব্যাধ ও বণিক খণ্ডে সে মূলত মানবী। স্বীয় পূজা প্রচারের উপলক্ষ্যে মাঝে মাঝে তার ভয়ঙ্কর রূপ প্রদর্শনের প্রয়োজন হলেও ভক্তের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্নেহময়ী নারীর মত।

এই দেবী চণ্ডীর স্বামী **শিব**। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম দেব চরিত্র হিসাবে সে অন্যতম। কাব্যের মূল উদ্দেশ্য চণ্ডীকে নিয়ে আবর্তিত হলেও কাহিনীর দ্বন্দ্ব ও সজীবতা সৃষ্টিতে শিব চরিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতীয় সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে শিব এতটাই জনপ্রিয় দেবতা যে তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেব-ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে পৌরাণিক ও লৌকিক শিবের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যাবে। সেই দিক দিয়ে শিব চরিত্রটি মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রাসঙ্গিক।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিব প্রধান পুরুষ দেবতা। কাহিনী ধারায় তার বেশি উপস্থিতি দেবখণ্ডে। আদি দেব নিরঞ্জনের বীর্য হতে তার জন্ম হয়েছে। প্রসঙ্গত, সে আদি দেবতা নয়। তবে তার জন্ম সাধারণ মানবের মত কোন নারীর গর্ভ হতে নয়; দেবতা বলেই তার জন্মে অলৌকিক ভাবনার সঞ্চার ঘটেছে।

"তিন ভাগ করি বির্জ্জ তিন ঠাই থুইল।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনের জন্ম হৈল।।"[৭৯]

শিব কঠোর যোগী-তপস্বী; পিতা ধর্মের মৃত দেহরূপ ছদ্মবেশ ধারণ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু চিনতে না পারলেও ধ্যানরত শিব চিনতে পেরেছিল। পিতার ও উলুকের কথা মত সে আদ্যাকে বিবাহ করে। পিত্রাদেশ ও পিতার প্রতি কর্তব্য এড়ানোর তার উপায় ছিল না। শিব তার উরুতে নিয়ে পিতাকে দাহন করে। সে পিতার ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মা-বিষ্ণুর মত 'মাতা' বলে পিত্রাদেশ এড়িয়ে যেতে পারে নি। তবে সে আদ্যার সপ্তবার মৃত্যুর এবং প্রমাণ স্বরূপ একটি করে হাড় গলায়

পরিধানে ইচ্ছা ব্যক্ত করে।

"সাতবার মরিব সাতখান হার লব
হাড়মালা গলএ পড়িব
আদ্যা দেহা ছাড়িএগ পুনুজন্ম লও গিএগ
তবে তাকে বিবাহ করিবো।"[৮০]

শিব মাতা আদ্যার পুনঃজন্মকে বিবাহের ক্ষেত্রে মেনে নেয়। তা সত্ত্বেও, আদ্যা রূপে গৌরীর জন্ম লাভের পরেও তাকে শিবের কাছে কঠোর তপস্যার পরীক্ষা দিতে হয়েছে। এখানে গৌরীর হর-প্রাপ্তির প্রচলিত কাহিনীকে শিব চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। তার ফলে শিব এখানে হৃদয়হীন কঠোর চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

অতঃপর অসুরবর্গের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য দেবতাগণ শিবের সঙ্গে গৌরীর বিবাহের পরিকল্পনা করে। তাদের পুত্র কার্তিক সেই অসুরদের বিনাশ করবে। এই পরিকল্পনা সাফল্য করতে ও ধ্যানস্থ শিবকে জাগ্রত করতে কামদেবকে পাঠানো হয়। কামদেবের কামবানে তার ধ্যান ভঙ্গ হয়। তাতে শিব অত্যন্ত রুদ্র মূর্তি ধারণ করে ও ক্রোধে কামদেবকে ভস্ম করে।

"ধ্যানভঙ্গ হএগ শিব চক্ষু তুলি দেখিল।
শিবের ক্রোধে কামদেব ভস্ম হৈএগ গেল।।"[৮১]

শিবের এই রুদ্র ও ক্রোধী চরিত্রের পাশে সে কৌতুকপ্রবণ এবং আত্মগুণগান অন্যের মুখে শুনতে উৎসাহী। শিব গৌরীর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে যেকোন বর দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। তার একথা শুনে দুর্গা স্বামীরূপে তাকে পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। সেই সময় শিব তাকে স্বামী বর দিয়েও অত্যন্ত কৌতুকে ও আত্মসন্তুষ্টির জন্য নিজ গুণগান শুনে এবং বলে —

"ভিক্ষা করি খাই দারিদ্র বোলে লোকে।
কুনগুণে স্বামী করিতে চাহ মোকে।।"[৮২]

যখন দুর্গা তাকে সকল দেবতার উর্দ্ধে স্থাপন করে বলে — "কে বলে দারিদ্র তুমাক পুজে দেবলোকে।"[৮৩] সে ভিখারী নয়; সে সর্বোচ্চ দেবতা। দুর্গার দ্বারা এই মহত্ত্ব প্রতিপন্ন করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। অল্প প্রসংশায় তার মন টলে যায়। আত্মগৌরবে আনন্দ অনুভবকারী শিব দেব-মানবের চরিত্রগুণে একাকার হয়ে গেছে।

আবার শিবের বিবাহ বিষয়ে কবি তাকে লৌকিক সাধারণ মানুষ রূপে এঁকেছেন। গৌরীর কাছ থেকে দেবাধিপতি রূপে জানলেও বিবাহ বিষয়ে শিব সাধারণ দরিদ্র মানুষের পর্যায়ে নেমে এসেছে। তার বিবাহে নিমন্ত্রিত হয়েছে দেবসমাজ। সেই দেবসমাজ তার বিবাহে এসেছে অথচ সে

ভূত-প্রেত নিয়ে সর্বদা শ্মশানে থাকায় সকলে অন্নজল গ্রহণ করতে নারাজ।

"সকল দেবতাগণ মন্ত্রনা করিল।
শিবের আগে দেবগণ বলিতে লাগিল।।
প্রেত ভূত লঞা শিব থাক শ্মশানতে।
অন্নজল কে খাইবে তুমার গৃহতে।।"[৮৪]

শিবের চরিত্রে উচ্চবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর সংমিশ্রণ খুব সুন্দর ভাবে কবি করেছেন। সেই সঙ্গে চরিত্রটির দ্বারা সেকালের সমাজাভাস পাওয়া যায়। তার বিবাহে দেবী গঙ্গাকে দিয়ে রন্ধন করলে তবেই দেবতারা অন্ন গ্রহণ করবে। তাই সে গঙ্গাকে শান্তনুর কাছ থেকে একরাতের জন্য শর্ত করে আনে। কিন্তু নারদ কর্তৃক ঝগড়ার জন্য বিবাহ সভায় তাকে হেনস্তা হতে হয়। স্বভাবতই, শর্ত ভঙ্গ হলে, শান্তনু গঙ্গাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। সমাজ তথা স্বামী কর্তৃক গঙ্গা অস্বীকৃত হলে তার মত নারীর নীরব ক্রন্দনে চোখ ভেজানো ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। এই রূপ অবস্থার কাছে শিব অসহায়। দেবশ্রেণীর কূটচক্রের সে শিকার। অন্যদিকে, অসহায়, গৃহচ্যুত নারীর বেদনা তার হৃদয় স্পর্শ করে। তাই সে দুর্গাকে বিবাহের পূর্বেই অন্যের স্ত্রী গঙ্গাকে শিরে স্থাপন করতে বাধ্য হয়।

"কথা শুনি কান্দে গঙ্গা মুনির সাক্ষাতে।
শিব বোলে গঙ্গা তোকে থুব আমি মাথে।।"[৮৫]

গঙ্গাকে কৈলাসে নিয়ে আসার পর সে অধিবাসের দ্রব্য সামগ্রী নারদ কর্তৃক প্রেরণ করে। এদিকে মেনকা "বিধি করে বেদ মতে"[৮৬] বিবাহের আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত ঘটিয়েছে। আর শিব বিবাহ করতে যাবার জন্য বৃষ সাজাতে বলেছে। সে গলায় হাড় মালা, শিরে সর্প, তার মাঝে গঙ্গা, শিঙ্গা বেণুসহ লক্ষ লক্ষ ভূত প্রেত নিয়ে বিবাহে রওনা দেয়। শিবের এই রূপ অত্যন্ত কৌতুককর। তাকে আপাত দৃষ্টিতে অনার্য শ্রেণীর চরিত্র বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি মন্তব্য মনে আসে — "আমাদের দেশে শিব এবং শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে দুটি ধারা দেখতে পাই। তার মধ্যে একটিকে শাস্ত্রিক এবং আর একটিকে লৌকিক বলা যেতে পারে। শাস্ত্রিক শিব যতী-বৈরাগী। লৌকিক শিব উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল। বাংলা মঙ্গলকাব্যে এই লৌকিক শিবেরই বর্ণনা দেখতে পাই।"[৮৭] ষাঁড় নিয়ে, সর্প মাথায় ও ভূত-প্রেতসহ শিব এই পরিচয় ব্যক্ত করে। তবে লক্ষণীয়, মেনকার বিবাহ আয়োজনে আর্য রীতির কথা উল্লেখ করেছেন স্পষ্ট ভাবে 'বেদ মতে'। তাহলে কবি কী শিব চরিত্রের অঙ্কনে এখানে বিপরীত সংস্কৃতির মিলন দেখাতে চেয়েছেন? কাব্যের দিকে লক্ষ্য রেখে চরিত্রটিকে একটু অন্য ভাবে বিশ্লেষণ করলে কবির অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় বুঝতে পারব। তার পূর্বে কবির কথা শুনে নেওয়া যাক্ —

"শিব বলে নন্দীরে সাজাহ বৃষের তরে
বৃষকে সাজাহ ভালমতে।।
নন্দী শিবের আজ্ঞা পাল্য বৃষের সাজন কৈল
বৃষ দিল শিবের সাক্ষাতে।
শিব সাজে বিবাহতে হাড় মালা গলাতে
সর্প্প য়াছে শিবের জটাতে।।
গঙ্গা য়াছে জটা মাঝে নানা মতে শিব সাজে
কুণ্ডল পহ্রিল গলাতে।
শিঙ্গা বেনু হাতে নিল বৃষ পৃষ্ঠে চড়িল
সকলিকে কহিল সাজিতে।।
দানা সাজে লক্ষজন প্রেত ভূত জনে জন
দেব আদি সাজে মুনিগণ।"[৮৮]

বেদের যুগে শিব রুদ্র। তাই রুদ্র শিবের বাহন বৃষঞ বা বৃষ। পুরাণ দেব-দেবী গবেষক হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য বলেছেন — "বৃষ কেবল শিবের বাহন নয়, বৃষ শিবের প্রতীকও।"[৮৯] কালিদাস তাঁর 'কুমারসম্ভব' কাব্যে বলেছেন — "তস্থৌ বৃষভাঙ্কাগমনপ্রতীক্ষা।"[৯০] অর্থাৎ "বৃষাঙ্কের আগমনে (শিব) প্রতীক্ষা করে রইল।"[৯০] সর্প শিবের জটাতে। 'সৃপ্' শব্দ থেকে সর্প কথাটি এসেছে। যার অর্থ গমন বা গতি বোঝানো হয়। শিবের বিবাহ যাত্রায় এই রূপটি যথাযথ। সর্প তার জটা বন্ধন রজ্জু "ভুজঙ্গমোন্নদ্ধ-জটাকলাপঃ"[৯১] অর্থাৎ, "তাহার জটাজূট কালসর্পের দ্বারা চূড়ার মত উন্নত করিয়া আবদ্ধ।"[৯১] অন্যদিকে, শিব সকল জীবের অধিপতি এবং সর্বজীবে সে বিরাজমান, সে সকল জীবের উদ্ভব। তাই সে ভূতপতি ভূতনাথ। সে সর্বভূতের অধিপতি হওয়ায় সে ছোট- বড়-বৃদ্ধ-তস্কর-প্রবঞ্চক প্রভৃতি সকল ভূতের অধিপতি। লক্ষণীয়, যদি তার অনার্য রীতিতে বিবাহ হত তাহলে সেকালের সমাজ শিবের বিবাহে 'দেব আদি সাজে মুনিগণ' যেত না। সুতরাং বিবাহ সজ্জায় শিবকে কবি আর্য-ভাবনার সংস্কৃতির সঙ্গে অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রিত দেবতা রূপেই অঙ্কণ করেছেন।

বিবাহ সভায় শিবের আচরণ শিশুসুলভ। সকলের সামনে উলঙ্গ হওয়া তার অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও কৌতুকপ্রবণতার পরিচয়। তার মাথায় সর্প, হাতে ডমরু, চারিদিকে ভূত-প্রেত, গলায় হাড়-মালা এবং কথা বলতে তার দাঁত নড়ে — এই রূপ শিবকে বৃদ্ধ বাদিয়া বলে মনে হয়।

"এতেক নাঙ্গটা শিব মাথে সাপের জটা।
বর নহে এই শিব বাদিয়ার বেটা।।

শিবকে দেখি নারীগণ দূরতে পলায়।
শাশুড়ের আগে শিব ডমরূ বাজায়।।
বুড়ার বেশ হএগ্র শিব হাসি২ পড়ে।
কথা কহিতে শিবের দন্ত গোলা নড়ে।।
প্রেত ভূত সঙ্গে শিব নাচে চারিপাশে।
শিবের চরিত্র দেখি সকলিএ হাসে।।''[৯২]

এখানে শিব লৌকিক মানুষ। প্রসঙ্গত, শশিভূষণ দাশগুপ্ত কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল কাব্য'-এর শিব চরিত্রের স্বরূপ সম্পর্কে যা বলেছেন তা বোধ হয় মানিক দত্তের শিব চরিত্রের ক্ষেত্রে বেশি প্রণিধানযোগ্য — ''মাথায় জটা ও ফণী, গলায় মালা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, গায়ে মাখা ছাই — এমন একটি ভিখারীর রূপ দেখিয়াছি আমরা আমাদের সমাজে কোথায় ? — একটি বেদিয়ার ভিতরে।''[৯৩] মেনকার কথায় তাকে বাদিয়া বলে মনে হয়। মেনকা কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তায় অধীর ও অঝোর ধারায় ক্রন্দন করছে। শাশুড়ি মেনকা শিবের অদ্ভুত রূপ সম্পর্কে নিন্দা করলে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। লজ্জায় শিব সম্পূর্ণ বিপরীত যুবক রূপ ধারণ করে। এখানে শিব আদি দেবতা; তাই সে অতিবৃদ্ধ ও চিরনতুন। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের মন্তব্য এবিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। তিনি সূর্যাগ্নির সঙ্গে তার রূপের তুলনা করে বলেছেন — ''বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে বর্তমান থাকায় সূর্যাগ্নি যেমন সকলের জ্যেষ্ঠ, তেমনি প্রতিদিন নূতনরূপে জন্ম নেওয়ায় তরুণও। শিব তাই কখনও বৃদ্ধ — কখনও তরুণ।''[৯৪] ব্রাহ্মণ পিতৃপুরুষের নাম জিজ্ঞাসা করলে তার আচরণে তাকে দেবাদিদেব মহাদেব বলে মনে হয়।

''শিবের পিতৃগণের নাম জিজ্ঞাসিল।
ব্রহ্মার পানে চাএগ্র শিব হাসিতে লাগিল।''[৯৫]

তার বিপরীত রূপ ধারণে কবি তাকে দেব রূপে অঙ্কন করেছেন। তাতে মনে হয়, কবি চরিত্রটির পরিবর্তনের সঙ্গে তার সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন।

কবি তার চরিত্রকে কামুক রূপে চিত্রিত করেছেন। সে ইন্দ্রিয়-দুর্বল চরিত্র। দুর্গা পুত্রদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাঁচজন দাসী আনলে তাদের দেখে শিবের কাম জাগ্রত হয়।

''জেন মাত্র মহাদেব দাসীকে দেখিল।
মদনে বিভোর হৈএগ্র সাক্ষাতে আইল।।''[৯৬]

কামোত্তেজিত শিবকে আত্মস্থ করতে দুর্গা দেবসমাজের ভয় দেখায়। তবুও শিব যেনতেন প্রকারেণ দাসীদেরকে নিজের ভোগের সামগ্রী করেছে।

তা সত্ত্বেও, সে স্ত্রী পরায়ণ। স্ত্রীর সম্মুখ বিপদে সে শঙ্কিত। অপরাক্রমশীল অসুর

ধূম্রলোচনের সঙ্গে স্ত্রী দুর্গার যুদ্ধের খবর পেয়ে সে চক্র ও বাণ নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছায় এবং স্ত্রীকে বিপদ থেকে রক্ষা করে। স্ত্রী পরায়ণতার সঙ্গে শিব পশুপতি। দুর্গা তার পূজা প্রচারের জন্য পশুদের বসবাস ও খাদ্যের প্রতিকূল পরিবেশ তৈরী করে। শিব মর্ত্য ভূমিতে যাওয়ার সময় অনাথ পশুদের করুণ অবস্থা লক্ষ্য করে। তাদের কল্যাণের জন্য সে অত্যন্ত সচেতন ও চিন্তিত। প্রসঙ্গত, সুকুমার সেন মহাশয় বলেছেন — ''শিব নামের অর্থ হল কল্যাণকারী, ...।''[৯৭] সেই প্রকল্পে শিব বলি রাজার থেকে বীজ নিয়ে নিজেই তা ছিটিয়েছে ও রোপন করেছে। শিবকে এখানে কৃষক বলে মনে হয়। কৃষক শিব প্রয়োজনে সংসারের দৈন্য ঘোঁচাতে ভিক্ষা বৃত্তিতে যায়।

''গৃহেত সম্বল নাই মনে কৈল গোসাই
ভিক্ষারূপে বিদেশে কৈল মতি।।''[৯৮]

সে কোচবধূ, গোপগণ, সূত্রধর গৃহ থেকে ভিক্ষা করে গৃহে ফেরে। বেলা দুই প্রহরে গৃহে ফিরে পুত্রদের মুখ দেখলে তার পিতৃ হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। উদারন্নের জন্য দুই ভাই কোন্দলে ব্যস্ত হয়। সেই সময় শিব গৌরীকেও জানিয়ে দেয় —

''শিব বোলে রিশীর ঝি পুত্রেক প্রবোধিব কী
কন্দল করএ কি কারণ।
পুত্রেক প্রবোধ করি রন্ধন চড়ান গৌরী
সুখে আজি করিব ভোজন।।''[৯৯]

স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তার গৃহীরূপ খুব ক্ষণস্থায়ী। তারপর কাহিনী সংসার জীবন থেকে পূজা প্রচারের দিকে মোড় নেয়। শুণু হয় শিব-দুর্গার দ্বন্দ্ব। দুর্গা তার পূজা প্রচারের জন্য শিবের শিষ্য ইন্দ্রকে ছলনা করে পুত্রবর দেয়। সে ইন্দ্রকে বলে —

''শিবের সেবা ছাড় দুর্গার সেবা কর
পুত্র দিবেন নারায়নী।।''[১০০]

ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে নিয়ে উভয়ের লড়াই শুরু হয়। প্রসঙ্গত, নিজের স্বার্থে শিব নীলাম্বর চরিত্রকে একটি পুতুলে পরিণত করেছে। এইরূপ স্বাথার্ন্বেষী চরিত্র শিব।

বস্তুত, শিবকে কবি পুরাণ ও লৌকিক তথা আর্য-অনার্য সংস্কৃতির প্রতিভূ রূপে আঁকতে চেয়েছেন। কখনো কবি পুরাণকে প্রাধান্য দেবার জন্য চরিত্রটিকে অপরিকল্পিত ভাবে ঘটনার আবর্তে ফেলে দিয়েছেন। ফলে চরিত্রটি ঘটনার মুখাপেক্ষী চরিত্রে পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি শিবের পুরাণ গুণের সঙ্গে তার শরীরে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের মাটির গন্ধ। তবে কোথাও কোথাও চরিত্রটির সঙ্গে ঘটনার বা পরিস্থিতির সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেন নি। যেমন, বিবাহের পূর্বে শিব কর্তৃক শ্বশুর বাড়িতে প্রেরিত দ্রব্যাদি লক্ষ্য করলে তাকে অতি ধনী ব্যক্তি

বলে মনে হয়। সেই শিব বিবাহ সভায় অতি বৃদ্ধ, অতি দরিদ্র বাদিয়ায় পরিণত হয়েছে। শিব বাঙালী সমাজে গুরুগম্ভীর চরিত্র হিসাবে উপস্থিত হয়নি। প্রসঙ্গত, মধ্যযুগের সাহিত্য গবেষক ক্ষেত্র গুপ্ত মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শিব চরিত্র সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা মানিক দত্তের শিব চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয় — "বাংলা কাব্যে শিব 'সিরিয়াস' নয়, কিন্তু মধ্যযুগের সাহিত্য সমাজের ভাঁড় রূপেও তাঁকে চিহ্নিত করা যায় না।"[১০১] তার ফলে মানিক দত্তের শিব চরিত্র একটি মিশ্র সামাজিক সংস্কৃতির প্রতিভূ রূপে পরিণত হয়েছে। অনুকূল অবস্থার বা পরিস্থিতির বৈপরীত্যে নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠার শক্তি কবি তার ব্যক্তিত্বে সঞ্চার করতে পারেন নি।

শিবের পিতা **ধর্ম**। সে দেবখণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য অপ্রধান দেব-চরিত্র। এই কাব্যে তার অবস্থান খুব সামান্য পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে এই চরিত্রটির দ্বারা কবি এই কাব্যের মূল ধর্ম নীতির একটি ধারার শুভ বীজ বপন করেছেন। সেটি হল — বৌদ্ধ তান্ত্রিকধর্মের ধারা। ধর্ম চরিত্রের মধ্য দিয়ে কবি তাঁর কাব্যের দুই ধর্মের তথা আর্য ও অনার্য ধর্মের সংমিশ্রণ দেখিয়েছেন। সেই কারণে চরিত্রটিকে কবির দৃষ্টিভঙ্গির দিকে লক্ষ্য রেখে বিচার করতে হবে। চরিত্রটির মধ্যে যুক্তি-তর্কের দিকটি খুঁজতে হলে আমাদের ব্যর্থ হতে হবে। কাজেই ধর্ম চরিত্রকে ঘটনার স্রোতে বা কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। তাহলে, কাহিনীর সঙ্গে চরিত্রের সামঞ্জস্য পর্যবেক্ষণ করা যাবে।

ধর্মের অপর নাম নিরঞ্জন। 'নির' ও 'অঞ্জন' সংযোগে নিরঞ্জন; যার অর্থ হল কালিমাশূন্য। ধর্ম কথাটি এসেছে 'ধৃ' ধাতু থেকে। যার অর্থ হল ধারণ করা। শূন্যপুরাণের নিরঞ্জনের সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলের ধর্মের সাদৃশ্য রয়েছে। সে আদিতে নিরাকার ও শূন্যরূপী ছিল। তাই সুকুমার সেন বলেছেন — "ধর্ম-ঠাকুরের ধ্যানে তাঁকে শূন্যমূর্তি বলা হয়েছে। ... এখানে শূন্য মানে নিষ্কলঙ্ক, শুভ্র। ধর্ম-দেবতা নিষ্কলঙ্ক সর্বশ্বেত, তাঁর বাহন উলুক বা উল্লুক হচ্ছে সাদা প্যাঁচা বা সাদা কাক।"[১০২] কবি তার পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে —

"বাপের বিজ্জ জন্ম নইল না ধরিল মাএ।
শূন্যতে জন্মিল ধর্ম্ম মাংস পিণ্ডকায়।।"[১০৩]

জন্মের পূর্বে তার হাত, পা, কাঁধ কিছু ছিল না। বৌদ্ধ ধর্মমতে আদি দেব বুদ্ধও নিরাকার ছিল। তার অবস্থান ছিল শূন্যে। হঠাৎ সে গোলকের দিকে ধাবমান হল। সেই হতে তার হাত, পা, স্কন্ধ হল। অতঃপর ধর্ম জলের উপর যোগ নিদ্রায় চোদ্দ বছর কাটিয়ে দেয়। ধর্মের জলের উপর অবস্থানের সঙ্গে জগৎ-স্রষ্টা ব্রহ্মার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিশিষ্ট গবেষক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন — "বৈদিক দেবতা

পুরুষ কালে আপনার স্বাতন্ত্র্য ও প্রাধান্য হারাইয়া ফেলিলে তাঁর পদবী একদিকে বৌদ্ধ দেবতা আদিবুদ্ধ ও অপর দিকে পৌরাণিক দেবতা ব্রহ্মা দখল করিয়া জগৎ স্রষ্টা হইয়া পড়িলেন।"[১০৪] ধর্ম উলুক নামে পাখির কাছ থেকে তার চোদ্দ বছর ব্রহ্ম জ্ঞানের কথা জানল। তার কথায় ধর্ম জগতের প্রতি করুণা বর্ষণ করে এবং জগৎ সংসার সৃষ্টিতে মনোযোগী হয়। 'সৃষ্টি' কাজে নিজেকে নিযুক্ত করে ধর্ম প্রথমে স্বীয় নাম-মন্ত্র জপ করে। মন্ত্রের দ্বারা সে কমল বা পদ্মফুল সৃষ্টি করে। সেই পদ্মফুলে বসে আদ্যমূল জপ করে পাতালে প্রবেশ করে। মন্ত্র পাঠ ও পদ্মের উপর অধিষ্ঠিত ধর্ম তন্ত্রের মন্ত্র ও আদি বুদ্ধকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অতঃপর ধর্ম পাতাল থেকে মাটি এনে নখের চাপে তিনভাগ করে কোথায় রাখবে ভাবতে থাকে। সে পরম পবিত্র নখের চাপে মৃত্তিকা সৃজন করে পৃথিবীকে পূর্ণ পবিত্র করে তুলতে চেয়েছিল। সেই পূর্ণ পবিত্র পৃথিবীকে স্থাপনার ব্যাপারে সে চিন্তিত। শেষে নিজেই বরাহ অবতার হয়ে দন্তের উপর পৃথিবীকে স্থাপন করে। এরপর গজ, কুর্মরূপ ধারণ করে তার উপর পৃথিবী স্থাপনের চেষ্টা করলেও সে ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ ধর্ম ধৈয্য রক্ষা করতে না পেরে স্বীয় কনকের পৈতা ছিঁড়ে ফেলে। তাতে সপ্তমস্তকযুক্ত সর্প বাসুকীর সৃষ্টি হয় এবং তাকে সে অমর বর দেয়। তার উপর সে পৃথিবী রক্ষার ভার অর্পণ করে।

ধর্ম পৃথিবী সৃষ্টি করে সেখানে বসবাসের জন্য প্রাণীকুলের প্রয়োজন বোধ করে। তাই ধর্ম এক নারী সৃষ্টি করল — নাম দেবী আদ্যা। আদ্যার জন্ম তাঁর হাই বা হাম্বি থেকে। কারণ হয়তো— (এক) দেবতা বলে মনুষ্য জন্মের প্রক্রিয়া পরিত্যাগ করেছে। (দুই) প্রচলিত ধারণা যে শ্বাসবায়ুর মধ্য দিয়ে মানুষের প্রাণ সর্বদা যাতায়াত করে। তাই শ্বাসবায়ু প্রাণ স্বরূপ। সেই শ্বাসবায়ু দ্বারা আদ্যাকে সৃষ্টি করে। তবে এখানে দেবতা সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষের ধারণার সঙ্গে কবির ধারণা একাত্মতা লাভ করেছে। তবে ধর্মের অলৌকিক জীবন রহস্যের সঙ্গে মানব জীবনের সাদৃশ্য নেই।

"মনতে ভাবিঞা ধর্ম্ম হাম্বি ছারিল।
ধর্ম্মের হাম্বিতে আদ্যা তখনি জন্মিল।।"[১০৫]

সে দেবীর উরুতে নখের রেখা দিয়ে তা থেকে সংসারে স্ত্রী- শ্রেণীর উদ্ভব ঘটায়; এরপর গাছপালা, সর্গ-মর্ত্য-পাতালের সৃষ্টি করে। অতঃপর ধর্ম যোগ ধ্যানে থাকে। ধ্যান থেকে জাগ্রত হয়ে ধর্মের এক নতুন পরিচয় পাওয়া যায়। সে এক লৌকিক পুরুষ। আদ্যার প্রতি তার কামুক, উচ্ছৃঙ্খল ও লম্পট চরিত্রের প্রকাশ পায়। পুনরায় অঘোর রূপে মোহগ্রস্ত হয়।

"আদ্যারূপ দেখি কাম চেষ্টা হৈল।
আদ্যা দেবীকে ধর্ম্ম ধরিবারে গেল।।"[১০৬]

কামুক ধর্মের কন্যা স্বরূপা নারীর প্রতি মোহগ্রস্ততা অশোভনীয় ও লজ্জাজনক। সেই লজ্জার অনুভূতিটি তার মধ্যে রয়েছে। এই সময় তার রেত পাত হয়। তা থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের

জন্ম হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের তপস্যার প্রকৃত পরীক্ষা করার জন্য সে শব দেহরূপে নদী তীরে উপস্থিত হয়। কিন্তু ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়ে তাদের তপস্যার বলে পিতাকে চিনতে পারেনি। তারা শবদেহের পচা গন্ধে দূরে চলে যায়। তাদের কাছে পিতা যেন জলে ভেসে যাওয়া মৃতদেহ। কিন্তু মহেশ্বরের তপস্যার বলে পিতাকে চিনতে অসুবিধা হয়নি। শিব কর্তৃক সে নিরামিষ ঘাটে উরুস্থলে দাহকৃত হয়। সে দাহকৃত হলেও জগৎ রক্ষার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন। তাই সে সৃষ্টিরক্ষা ও পৃথিবী পালনের জন্য শিবকে আদ্যা বিবাহ করার উপদেশ দিল এবং সে শূন্যে ফিরে গেল। অন্যদিকে, ধর্ম নিজ পুত্রকেই শুধু নয়, আদ্যাকেও তার কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তার কর্তব্যপরায়ণ রূপ পরিকল্পনায় ও ভাবনায় ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের নারদীয় সূক্তের প্রভাব রয়েছে —

''তম আসীত্তমসা গূহ্লমগ্রেহপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যাদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্।। ৩।।''[১০৭]

অর্থাৎ, ''সর্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিকে জলময় ছিল (৩)। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সে সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সে এক বস্তু জন্মিলেন।''[১০৮] বেদে আছে যে, প্রথমে জগৎ জলময় ছিল ও তা অন্ধকার শূন্য দ্বারা বেষ্টিত ছিল। তার মধ্যে 'এক' উৎপন্ন হলে 'কাম'-এর জন্ম হল। এটাই 'মনস্' সৃষ্টির প্রথম বীজ। মানিক দত্তে ধর্মের স্বরূপে তা লক্ষ্য করা যায়। পুত্রদের তপস্যার প্রকৃতি পরীক্ষা ও আদ্যার রূপে মুগ্ধ হওয়া প্রভৃতিতে ধর্ম মানবিক গুণ সম্পন্ন চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

অন্যদিকে, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অপর একটি অপ্রধান পুরুষ চরিত্র হল **নারদ**। চরিত্রটি পৌরাণিক কল্পনা থেকে বাংলা মঙ্গলকাব্যের মাটিতে এসেছে। পুরাণে নারদের দুটি রূপ — (এক) পরম বৈষ্ণব দেবর্ষি এবং (দুই) তিনি কলহের দেবতা। চরিত্রটি খুব অল্প পরিসরে কাব্যের ঘটনাকে ত্বরান্বিত করেছে। তবে সম্পর্ক স্থাপনে, কলহে, মিলনে ও পরামর্শ দানে বাংলা সাহিত্যে তথা মঙ্গলকাব্যে তার জুড়ি মেলা ভার।

বস্তুত, 'সরল বাঙ্গালা অভিধান' গ্রন্থের সংকলক সুবলচন্দ্র মিত্র নারদ চরিত্র সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন — ''নার (নর সমূহ) - দা (দেওয়া) + ড কর্তৃ; যিনি জনগণকে যথার্থ উপদেশ প্রদান করেন।''[১০৯] চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী' গ্রন্থে বর্ণিত নারদের জন্ম পরিচয় সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্ম খণ্ডের ২১-২২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে — ''অনাবৃষ্ট্যবশেষে চ কালে বালো বভূব হ।/ নারং দদৌ জন্মকালে তেনায়ং নারদাভিধঃ।।/ দদাতি নারং জ্ঞানঞ্চ বালকেভ্যশ্চ বালকঃ।/ জাতিস্মরো মহাজ্ঞানী তেনায়ং নারদাভিধঃ/ বীর্য্যেণ নারদস্যৈব বভূব বালকো মুনে।/ মুনীন্দ্রস্য বরেণৈব তেনায়ং নারদাভিধঃ।।/

কল্পান্তরে ব্রহ্মকণ্ঠাদ্ বভূবুর্ বহবো নরাঃ।/ নারদ্ দদৌ তৎ কণ্ঠঞ্চ তেন তেন্ নারদঃ স্মৃতঃ/ ততো বভূব কালশ্চ নারদাৎ কণ্ঠদেশতঃ/ততো ব্রহ্মা নাম চক্রে নারদশ্চেতি মঙ্গলম্।।/মরীচিমিশ্রৈর্ মুনিভিঃ সার্দ্ধং কণ্ঠাদ্ বভূব সঃ/নারদশ্চেতি বিখ্যাতো মুনীন্দ্রস্ তেন হেতুনা।।"[১১০] অর্থাৎ, "ঐ বালক অনাবৃষ্টির শেষে জন্মলাভ করিবা মাত্র নার (জল) দান করিয়াছিলেন বলে তাঁর নাম নারদ; জাতিস্মর মহাজ্ঞানী বালক অপর বালকদিগকে নার (জ্ঞান) দান করিতেন বলিয়া তাঁর নাম নারদ; নারদ নামক মুনীন্দ্রের ঔরসে জন্ম বলিয়া নাম নারদ; ধর্ম্মের পুত্র নর নামে মুনির বরে এই পুত্র জন্মিয়াছিলেন বলিয়া নাম নারদ; কল্পান্তরে ব্রহ্মার কণ্ঠ হইতে বহু নরের উৎপত্তি হয় বলিয়া ব্রহ্মার কণ্ঠকে নরদ বলে, নরদ হইতে জন্ম বলিয়া নাম নারদ।"[১১০]

তবে, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নারদের কোন জন্ম বৃত্তান্ত উল্লেখ নেই। শিবের বিবাহকে কেন্দ্র করে তার কাব্যে প্রথম উপস্থিতি। প্রসঙ্গত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — "শিব-বিবাহের ঘটক নারদ — ইহা প্রায় সকল পুরাণেই আছে।"[১১১] শিবের পরামর্শে সে সকল দেবতাদের নিমন্ত্রণ করে আসে। সে শিবের অনুগত। দেবতাগণ গঙ্গার হাতে রান্না খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তাই শিব শান্তনুর স্ত্রী গঙ্গাকে একরাতের জন্য শর্ত করে নিয়ে আসে। এইরূপ অবস্থায় বিবাহ সভায় নারদের কুচক্রান্তে গঙ্গার সত্যভঙ্গ হয়। তাই গঙ্গাকে শিব শিরে স্থাপন করতে বাধ্য হল। শিবের এই অসহায়ত্বের পিছনে নারদ অনুঘটকের মত কাজ করেছে।

নারদ শিবের অনুগত হলেও তার আত্মসম্মান ও আত্মাভিমান মাটিতে মিশে যায়নি। শিব অধিবাসের দ্রব্য সামগ্রী নারদকে দিয়ে শ্বশুর হিমালয়-এর গৃহে পৌঁছে দিতে বললে সে —

"ভীমবীরের কন্ধে ভার তুলি দিল।
ভীমকে সঙ্গে করি নারদ চলিল।।"[১১২]

তার চরিত্রটি মধ্যবিত্ত ভাবনা জাত। একদিকে শিবের কথা শুনলেও সে নিজে দ্রব্য সামগ্রীর ভার তুলে নেয়নি। সে ভীমকে দিয়ে তা বহন করিয়েছে। এমনকি তার আঁতে ঘা লাগায় শিবের মান-সম্মান নষ্ট করার পরিকল্পনা করেছে। তার আত্মসম্মানবোধের প্রকাশ ঘটেছে যে ভাষায় তা লক্ষণীয়। সে ভীমকে যাত্রাপথে বলেছে —

"শিবের বাপের নহি চাকর নফর।
সকল দ্রব্য বাস্যা খাবো পথের উপর।।"[১১৩]

অতঃপর সকল খাদ্য খেয়ে তার স্থলে সমুদ্রের কাদা, বালি, জল পূর্ণ করে। তা ভীমের কাঁধে তুলে দেয়। এমনতর কাজ করেও নারদ শিবের শ্বশুর হিমালয়কে গিয়ে আলিঙ্গন করেছে। এদিকে মেনকা অধিবাসের ভারে অখাদ্য দ্রব্য দেখে ক্রুদ্ধ হয়। সেই মুহূর্তে নারদ সম্মুখ বিপদ এড়ানোর জন্য কৌশলে মিথ্যে কথা বলে —

"নারদ বোলে মেনকাকে কেন কর রোষ।
ভার বান্ধি দিঞাছে শিব মোর নাই দোষ।।"[১১৪]

নারদ মিথ্যা কথায় পারদর্শী চরিত্র। পাশাপাশি নারীদের শ্লীলতাহানিতে তার মত দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। কবির কথায় — "নারদ নারীগণের বস্ত্র কাড়ি নিল।/ বস্ত্র বিনে নারীগণ লজ্জিত হইল।।"[১১৫] এমনকি, মামা শিবকেও সে শ্লীলতাহানির হাত থেকে রক্ষা করেনি। তার কথায় শিব বিবাহ সভায় উলঙ্গ হয়ে যায়। শিবের মত জ্ঞানী চরিত্রকে সে শিশুসুলভ আচরণ করিয়েছে। নারদ শিবের মনোরথকে পরিচালনা করেছে।

আবার দুর্গার ইন্দ্রপুরে যাত্রাকালে সে সহচরের ভূমিকা পালন করেছে। দুর্গার সঙ্গে অসুরদের প্রবল যুদ্ধের প্রাঙ্গণ থেকে সে ভয়ে পলায়ণ করে। পথে সে শিবকে দুর্গার বিপদের কথাটি জানিয়ে দেয়। শিব গিয়ে দুর্গাকে বাণ দিয়ে অসুর নিধনের কথা বলে ঘটনাকে প্রভাবিত করেছে। আবার নারদ শিবের সঙ্গে মর্ত্যভূমিতে যাওয়ার সময় অনাহারক্লিষ্ট পশুদের লক্ষ্য করে। শিবের কাছে সে জানিয়ে দেয় — অভয়া কর্তৃক পশু সৃজন এবং তাদের বসবাস ও খাদ্যের প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টির কথা। পশুদের অনাহারে দেখে চিন্তিত শিবকে নারদ সুপরামর্শ দেয়। শিব নারদের কথানুযায়ী বীজ বপন করে বনের সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে অভয়ার পরিকল্পনার বিপক্ষে সে শিবকে পরিচালনা করেছে। শিবের পশুদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়কে সে যথা সময়ে কাজে লাগিয়েছে। তার ফলে সে পশুদের নিয়ে দুই বিপরীত ভাবনার জাগরণ ঘটিয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে নীলাম্বরের পূজার অধিকার নিয়ে শিব-দুর্গার লড়াইয়ের বীজ বপন করে দিয়েছে।

অন্যদিকে, 'ইন্দ্রের প্রতি নারদ' অংশটি মানিক দত্তের কাব্যে এসেছে ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বরের বিরাট নগরের চন্দ্রমুনির কন্যা ছায়ার সঙ্গে বিবাহ প্রসঙ্গে। নারদ তার বাহন ঢেঁকি করে বিরাট নগরে চন্দ্রের বাড়ি যায়। চন্দ্রমুনি অত্যন্ত সমাদর আপ্যায়ন সহকারে নারদকে অভ্যর্থনা জানায়। সে বলে — "রাশি বর্গ বিচারিয়া আইলাম আমি।"[১১৬] সেকালে যে রাশি বর্গ নির্বাচন করে সমাজে বিবাহ সম্পন্ন হত তা নারদের কথায় স্পষ্ট। এ দিকে নারদ ইন্দ্র গৃহে এসে দেখে নীলাম্বর বিবাহ করতে বিরাট নগরে চলে গেছে এবং ইন্দ্রগৃহে বিবাহের বাদ্য বাজনা বাজছে। উপরন্তু শচী গৃহে বসে ধর্ম পূজা করেছে। নারদের অজান্তে সকল কাজ হয়ে গেলে, তাতে তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। শচী তাকে প্রবোধ দিতে পান আনতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। তখন অপমানিত হয়ে নারদ শচীকে জানিয়ে দেয় — "মস্তক মুড়িয়া পিছে হাতে দেহ পান।।"[১১৭] সে অপমানবোধের প্রতিশোধ স্পৃহা প্রকাশ করেছে বিরাট নগরে বিবাহ সভায় কোন্দলের সূত্রপাতের মাধ্যমে। এই অবস্থায় সে চিন্তিত ইন্দ্রকে বাধ্য করে তার কাছে উপনীত হতে। এবং সকলের সামনে অত্যন্ত বিনয় ও বিনম্রতার সঙ্গে তার কাছে অসম্মান করার জন্য ইন্দ্র কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়ে নেয়।

এখানে নারদ কেবল প্রতিহিংসা পরায়ণ নয়, সমকাল, সমাজ ও অন্যান্য চরিত্রের অন্তর রহস্য তার চরিত্রের প্রেক্ষিতে উঠে এসেছে। স্বামী শিবের অজান্তে দুর্গা সুন্দর কাঁচুলি পরিধান করে কালকেতুকে ধন দিতে রওনা হওয়ার সময় পথে নারদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। তার মনোমোহিনী রূপ দেখে নারদের উক্তিতে শিব চরিত্রের নিজ প্রবৃত্তির স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে দেবীকে বলে —

"ই হেন মোহন বেশ জদি আছে তোরে।

তবে কেন মামা জায়ে হীরা কোচের ঘরে।।"[১১৮]

তেমনি স্বামীর অলক্ষ্যে দেবী চণ্ডীর মত নারীর বাইরে বেরিয়ে পড়ার গোপনীয়তা রক্ষার অনুরোধ জানানো হয়েছে তার কাছে। এখানে নারদ চরিত্রকে কেন্দ্র করে শিব ও দুর্গার দাম্পত্য জীবন আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

আবার দেখা যায় যে, নারদ দেবী চণ্ডীর সংকটে পরামর্শ দাতা চরিত্র রূপে এসেছে। প্রসঙ্গত, দেবী পূজা প্রচারের জন্য কলিঙ্গ ভেঙে গুজরাট রাজ্য স্থাপন করার পরিকল্পনা করলেও প্রজাকুল দিয়ে পূর্ণ হয় না। সেখানে বসতি স্থাপনে একমাত্র বাধা আসে ভাঁড়ুর কাছ থেকে। তাই নারদ ভাঁড়ুকে বিড়ম্বিত করতে দেবীকে মেঘ আনার পরামর্শ দেয়। নারদই এর জন্য দেবীকে ইন্দ্র-সভায় তথা উপযুক্ত স্থানে নিয়ে যায়। তবে নারদের লক্ষ্য ছিল ভাঁড়ুকে দেবীর দ্বারা লাঞ্ছনা দেওয়া। ভাঁড়ু ব্যতীত অন্যান্য প্রজাদের লাঞ্ছনায় সে মর্মাহত হয়। সে দেবীকে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গ ত ভাবে বলে — "ভাঁড়ুসনে ঐরি বাদ প্রজা মরে কেনি।।"[১১৯] তা সত্ত্বেও দেবী শিব-ভক্ত ভাঁড়ুকে নত করতে পারে না। উদ্দেশ্য বিফল হওয়ায় চণ্ডী চিন্তায় মগ্ন হয়। এই অবস্থায় নারদ তাকে সান্তালী পর্বতে গঙ্গার কাছে যেতে নির্দেশ দেয়। গঙ্গা চণ্ডীকে সাহায্য করতে নারাজ হয়। তাই ডাক-ডেউরের দ্বারা চণ্ডী ভাঁড়ুকে যারপর নাই শাস্তি দেয়। এখানে চণ্ডী তার উদ্দেশ্যের কথা ভুলে ভাঁড়ুকেই বিড়ম্বনায় ফেলা ও তার প্রচণ্ডতা প্রকাশে ব্যস্ত। নারদ দেবীকে ব্রত প্রচারের জন্য ভাঁড়ুর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে দেয়। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় সচেতন নারদ অপ্রকৃতিস্থ দেবীর চেতনা ফেরাতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

কবি মানিক দত্ত তাকে শুধু কোন্দল সৃষ্টিকারী, সম্বন্ধ স্থাপনকারী, পরামর্শদাতা রূপে অঙ্কন করেন নি, তিনি চরিত্রটিকে একটি বিশেষ মর্যাদায় উপস্থাপন করেছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ব্যাধ খণ্ডের সমাপ্তি এবং ধনপতি খণ্ডের কাহিনী ধারা বিবর্তনের যোগসূত্র রচনা করা হয়েছে নারদ চরিত্রের মধ্য দিয়ে। কালকেতু উপাখ্যানে চারদিনের ব্রতকথা সমাপ্ত করে দেবী চণ্ডী চিন্তিত হয় এবং ধনপতি খণ্ডের কাহিনী ধারার বিবর্তনের পথ তার দ্বারা উন্মোচন হয়। এই খণ্ডে শিব শিষ্য কর্ণমুনিকে ছলনার জন্য দেবী ও নারদ পরামর্শ করে। নারদ চণ্ডীকে পাশা খেলায় ছলনার

দ্বারা কর্ণমুনিকে মর্ত্যে নামাবার পরিকল্পনার কথা বলে।

এই ভাবে মানিক দত্ত নারদ চরিত্রকে তাঁর কাব্যে ব্যাধ খণ্ডে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। ধনপতি খণ্ডের শুরু করে তবেই তার ভূমিকা লোপ পেয়েছে। এরপর সেই ভূমিকা পালন করে চণ্ডীর সখী পদ্মা। তবু এই অল্প পরিসরেই কবি পুরাণ পরিচিত নারদকে সম্বন্ধ-স্থাপনকারী, কলহকারী, আবার পরামর্শদাতা রূপে অঙ্কন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন — "... ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে দ্বন্দ্ব ও মিলন ঘটিতেছে। বিষ্ণু আর্য আর মহেশ্বর অনার্য দেবতা। তাই বিষ্ণুভক্ত নারদ সর্বদা শক্তি দেবী চণ্ডীর সঙ্গে মিল।"[১২০] কবি কাব্যের প্রয়োজনে নারদ চরিত্রটিকে সমাজ চিত্র উন্মোচনে, প্রধান চরিত্রের মনোরথ পরিবর্তনে, কাহিনী ত্বরান্বিত করতে ও যোগসূত্র স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা হিসাবে পালন করিয়েছেন। লক্ষণীয়, বিষ্ণুভক্ত নারদ চরিত্রটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শিবের প্রতিপক্ষ রূপে কাজ করেছে। নারদের দ্বারা কবি বৈষ্ণব ধর্ম ও শৈব ধর্মের বিরোধ প্রকাশ করেছেন। এই দিক থেকে নারদ চরিত্রকে স্থির বা Type চরিত্র বলে মনে হয়। কিন্তু অধিবাসের দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে যাত্রা পথে, নীলাম্বরের বিবাহ সভায় তার আত্মসম্মানবোধ ও বিবাহ সম্বন্ধ ভঙ্গের পরিকল্পনায়, কলিঙ্গ প্রজাদের প্রতি হৃদয় বিগলিত হওয়া প্রভৃতি ঘটনার মধ্যে বৈপরীত্য চরিত্রের উদ্‌ভাস তাকে Type চরিত্র থেকে Individual চরিত্রে সমুন্নত করেছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অপর একটি দেবখণ্ডের অপ্রধান দেবতা চরিত্র **উলুক**। সে এক প্রকার সাদা পেঁচা। মহাভারতে তার উল্লেখ রয়েছে। যেখানে সে শকুনির পুত্র এবং পাণ্ডবদের সঙ্গে সে যুদ্ধ করে মৃত্যু বরণ করে। কিন্তু, এখানে ধর্ম কর্তৃক দৃষ্ট প্রথম জীব। তার কাছ থেকে ধর্ম তার দীর্ঘ চোদ্দ বছর ব্যাপি ধ্যান সম্পর্কে জ্ঞাত হয়। তার অনুরোধে ধর্মের জগৎ-সংসার সৃষ্টির ভাবনা জাগ্রত হয়। এখানে জগৎ-সংসার সৃষ্টির তত্ত্বসারৎসারী হিসাবে তার ভূমিকা অকৃত্রিম।

ধর্ম জগৎ সৃষ্টির পর তার রক্ষার জন্য **বাসুকি** অবতার হয়। বাসুকি মহাভারত ও রামায়ণের উল্লেখযোগ্য চরিত্র। রামায়ণে সমুদ্রমন্থণ হয় তাকে কেন্দ্র করে এবং মহাভারতে তার পরিচয় নাগরাজ হিসাবে। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও তার পরিচয় নাগরাজ রূপেই। ধর্মের কনকের পৈতা থেকে তার জন্ম। এখানে তার সাত মাথা রয়েছে এবং তার উপরই পৃথিবীর ভার অর্পণ করা হয়। ধর্মের অপর একটি অবতার হল **বরাহ**। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে সে বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। ধর্মের পুত্র **ব্রহ্মা** ও **বিষ্ণু**। তারা ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের ভণ্ড তপস্বী। পিতার শব-দেহ তারা চিহ্নিত করতে পারে না। বরং তার গন্ধে দূরে সরে যায়। পিতা ধর্ম তাদের জগৎ-সংসার রক্ষার ভার এবং আদ্যাকে গ্রহণ করতে বললেও তারা পিত্রাদেশ অমান্য করে। উভয়ে আদ্যাকে মাতৃ-জ্ঞান করে কর্তব্য থেকে সরে দাঁড়ায়। অতঃপর আদ্যাকে বিবাহ করে শিব। আদ্যার সপ্তজন্মের প্রসঙ্গে **ভৃগু**

মুনি, দক্ষ, হরি, হিমালয় প্রভৃতির নাম আসে। এরা সকলেই পুরাণ পরিচিত চরিত্র। তবে এখানে এরা সকলে আদ্যার পিতৃ পরিচয়ে ভাস্বর। প্রসঙ্গত, হিমালয় সন্তানহীন। হিমালয়ের তপস্যার ফল স্বরূপ আদ্যাকে কন্যা রূপে পায়। নাম রাখা হয় গৌরী। শৈশবে গৌরীকে সে শিব আরাধনার মন্ত্রণা দেয়। এবং বাল্য বয়সে পিতা হিমালয় কন্যাকে অতি বৃদ্ধ শিবের সঙ্গে বিবাহ ঠিক করে। বৃদ্ধ পাত্রের হাতে কন্যাকে সম্পাদন করাতে তার কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। সম্ভবত, প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য সমাজের কৌলিন্য প্রথায় বিশ্বাসী সে।

আবার দেব সমাজে পুরাণ পরিচিত অপর একটি পুরুষ চরিত্র **শান্তনু**। মহাভারতের আদি খণ্ডে শান্তনুর উল্লেখ রয়েছে। সেখানে কুরুবংশীয় রাজা প্রতীপের পুত্র এবং মহাবীর ভীষ্মের পিতা। আম তার স্ত্রী গঙ্গা। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মহাভারতের এই চরিত্রটির আগমন ঘটেছে দেব সমাজের একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। সেটি হল শিবের বিবাহে রন্ধন কার্যের জন্য শান্তনুর স্ত্রী গঙ্গাকে প্রয়োজন হয়। কারণ গঙ্গা রন্ধন না করলে শিব গৃহে দেবসমাজের কেউ অন্নগ্রহণ করবে না। তাই শিব শান্তনু মুনির কাছ থেকে তার স্ত্রী গঙ্গাকে শর্ত করে নিয়ে যায়। শর্ত হল — সেই রাতেই গঙ্গাকে গৃহে ফিরিয়ে দিতে হবে। স্ত্রী গঙ্গার কোন সেক্ষেত্রে মতামত নেই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ শান্তনু মুনি। তার শর্ত ভঙ্গ করলে গঙ্গাকে সে পরিত্যাগ করে। পরগৃহে গঙ্গা রাত্রি যাপন করায় শান্তনু আর তাকে গ্রহণ করেনি। তাদের দাম্পত্য জীবনে সত্যাসত্য অনুসন্ধান ও সহৃদয়তার তুলনায় মধ্যযুগের নারীর অন্যত্র রাত্রি যাপনই বড় হয়েছে পুরুষ প্রধান সমাজে।

শিবের বিবাহকে অবলম্বন করে **ভীম** চরিত্রটির উল্লেখ। মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে তার পূর্ব পরিচয় নেই। তার একমাত্র পরিচয় সে বীর নারদের সহায়ক। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্য শিবায়ন কাব্যের ভীম চরিত্রের যে অবদানের কথা বলেছেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য — "ভীম নাম মহাভারত হইতেই আসিয়াছে। সাধারণ শারীরিক শক্তির অধিকারী রূপে কৃষক শিবের কৃষিকার্যের সহায়করূপে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে।"[১২১] মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিবের বিবাহের সময় শ্বশুর বাড়ির জন্য প্রেরিত দ্রব্য সামগ্রী নারদ তাকে দিয়ে বহন করিয়েছে। তার পরিচয় সে বলশালী ও বাহক। তারা শিবের প্রেরিত খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করে তার স্থানে কাদা, জল ও বালিতে পূর্ণ করে। তার এই কীর্তিতে হাস্যরসের উদ্রেক হয়েছে। দেবখণ্ড ছাড়াও তার চরিত্রের উল্লেখ ধনপতি খণ্ডেও রয়েছে। সেখানে সে দেবী চণ্ডীর সারথী। এখানে তার পুরাণ বহির্ভূত স্বতন্ত্র পরিচয় পাওয়া যায়।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে গৌরীর দুই পুত্র **গণেশ, কার্তিক** এবং **শনি** চরিত্র উল্লেখযোগ্য। গণেশ গৌরীর উদরস্থ সন্তান নয়। পুরাণ কথিত গৌরীর গাত্র মল থেকে গণেশের জন্ম রহস্য

মানিক দত্ত তাঁর কাব্যের ক্ষেত্রে অনুকরণ করেছেন। এখানে গৌরী তার গাত্র মল দিয়ে গণেশ স্বরূপ পুতুল তৈরী করে এবং পিতা শিব তাতে প্রাণ দান করে। গৌরীর মাতৃসত্তার জাগরণ ও গণেশ সৃষ্টির মিথ এখানে স্বকীয়। গণেশের আশ্চর্য জন্ম দেখতে অন্যান্য দেবতার মত শনিও আসে। তার দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ডুচ্ছেদ হয়। প্রসঙ্গত, বণিক খণ্ডে শনি চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সে রাজা শ্রীবৎসকে ছলনা করে। তার একাদশীর ব্রত শনি সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে ভঙ্গ করে। এমনকি, নৌকার বাহক ছদ্মবেশে রাজার সমস্ত ধন হরণ করে। তখন রাজা বাধ্য হয় তার প্রিয় শারী-শুয়া পাখিদ্বয়কে ছেড়ে দিতে। সে যাই হোক, ইন্দ্রের হস্তীর মুণ্ডুচ্ছেদন করে গণেশের মাথায় স্থাপন করা হয়। তাতে সে পুনর্জীবিত হয়। তার মুসিক বাহনের কথাও এখানে উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর কার্তিকের জন্ম। কার্তিক পিতা শিবের বীর্য থেকে জন্ম লাভ করে। তবে মাতৃগর্ভ থেকে হয়নি। সে শৈশবে চন্দ্রের ছয় নারী দ্বারা প্রতিপালিত হয়। তার অপর নাম ষড়ানন এবং তার ময়ূর বাহন রয়েছে। পিতার ভিক্ষাজাত খাদ্য দ্রব্যের জন্য অধীর অপেক্ষা এবং তা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া আমাদের হতদরিদ্র গার্হস্থ্য জীবন-চিত্রের মুখোমুখি করে দেয়।

দেব চরিত্রের সঙ্গে অসুর চরিত্রগুলি মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উপেক্ষা করার নয়। চণ্ডীর সঙ্গে অসুরদের লড়াই এবং পুরাণ প্রসঙ্গ উত্থাপনের ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব রয়েছে। প্রসঙ্গত, ঋগ্‌বেদের যুগে ভয়ের দেবতাকে অসুর ও ভক্তির দেবতাকে বলা হত দেব। তাই ভয়ের দেবতা বরুণ 'অসুর' এবং ভক্তির দেবতা বিষ্ণু 'দেব'। 'অসুর' শব্দটি কালক্রমে হীনার্থক হয়ে দেব-বিরোধী অর্থে বোঝাতে লাগল। যেসব অসুরদের কথা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত হয়েছে, তারা হল **মধুকৈটভ, মহিষাসুর, মহাবীজ, রক্তবীজ, মহীধর, শুম্ভ, নিশুম্ভ , ধূম্রলোচন** প্রভৃতি। এরা অধিকাংশই মহাভারত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ-এর বহু পরিচিত চরিত্র। মধুকৈটভ চরিত্রটির জন্ম বিষ্ণুর কর্ণমূল থেকে। তার থেকে প্রচুর এবং প্রচণ্ড অসুরের সৃষ্টি হয়। তাতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকুণ্ডে আত্মগোপন করে। তারা বিষ্ণুর সঙ্গে সহস্র বছর যুদ্ধ করে। যুদ্ধে যত অসুর মরে, তাদের রক্তে ততধিক অসুর পুনরায় জন্ম হয়। এই বিপদ শঙ্কুল অবস্থায় দেবগণ ভীত। অতঃপর দেবী দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধে মহাবীজ ও রক্তবীজ নামে দুই ভাইয়ের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে তারা মৃত্যু বরণ করে। তা দেখে মহীধর নামে এক অসুর ক্রোধিত হয়। তার মৃত্যুর পর শুম্ভ-নিশুম্ভ নামে দুই অসুরের রণাঙ্গণে আগমন ঘটে। তারা অত্যন্ত পরাক্রম যোদ্ধা। তাদের সঙ্গে যুদ্ধে চণ্ডী ঘেমে যায়। সেই ঘর্মনিষিক্ত জল থেকে কালীর জন্ম হয়। কালী কর্তৃক তারা দুই ভাই নিহত হয়। আবার ধূম্রলোচন নামক অসুরের ভয়ে ভীত দেবতারা, সে মর্ত্যপুরের অধিবাসী। দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচারের একমাত্র বাধা স্বরূপ সে। তার ত্রাসে মুনিরা মর্ত্যে অতিষ্ঠ। এই অত্যাচারী ধূম্রাসুরকে দেবী চণ্ডী নিহত করে এবং মর্ত্যে তার পূজা প্রচারের পথ সুগম করে। দক্ষিণ পাটনের

সঙ্গে দেবী চণ্ডীর যুদ্ধে অনেক দৈত্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তারা সকলেই দেবীর পক্ষে যুদ্ধ করে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য **মঙ্গলা, জলেশ্বর, ধণ্ডা, তালজঙ্গ, হিঙ্গ, ভিঙ্গপাল, মহা, কালবাণ** প্রভৃতি। মঙ্গলা জমের পুত্র। তার সম্বন্ধে বলা হয়েছে — ‘‘আল্য জমের পুত্র মঙ্গলা জমকাল।’’[১২২] তার দাঁতগুলি বৃহদাকার ও ভয়ঙ্কর। জলেশ্বর এতটা শক্তিশালী যে, রণক্ষেত্রে একলক্ষ কোতাল সম্মুখে সে একাই লড়াই করতে পারে। ধণ্ডা নামক মহাদানা দাঁত দিয়ে লোহার মুদ্গর চূর্ণ করতে সক্ষম। তালজঙ্গ বারমাস সর্বক্ষণ যুদ্ধ করতে সক্ষম। তার সঙ্গে প্রথম দক্ষিণ পাটনের সেনা রামানন্দের যুদ্ধ হয়। কালবাণ দৈত্যদের রাজা। একলক্ষ হাতি তার প্রাতঃ ভোজনের সামগ্রী। এমনকি, সে হাতি, ঘোড়া রথারথি সহ সব গ্রাস করতে সক্ষম। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী দৈত্যদের এখানে চণ্ডীর ক্ষমতার প্রকাশে এবং রণক্ষেত্রের ভয়াবহতা উল্লেখ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে বোধ হয়।

মর্ত্যে দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচারের জন্য দোহরা নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই সূত্রে **বিশ্বকর্মা, ভীম** ও **অর্জুন** প্রভৃতি চরিত্রের প্রসঙ্গ আসে। এরা সকলে মহাভারতের খ্যাতনামা চরিত্র এবং বীর যোদ্ধা। কিন্তু মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তাদের পরিচয় ভিন্ন। সেখানে তারা নিম্নশ্রেণীর ছুতোর। চণ্ডীর অনুরোধে তারা কলিঙ্গে দোহরা নির্মান করতে উপস্থিত হয়। সেক্ষেত্রে বলশালী **হনুমান**-এর আগমন। মঙ্গলকাব্যে হনুমান চরিত্রের সম্বন্ধে বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন — ‘‘হনুমান নাম রামায়ণ হইতেই মঙ্গলকাব্যে আসিয়াছে। মঙ্গলকাব্যের উপর ইহা রামায়ণের ব্যাপক প্রভাবেরই পরিচায়ক। অসম্ভব বীরত্ব এবং সাহসিকতাপূর্ণ কাজ মাত্রই হনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। সেই সূত্রে হনুমান কখনও মনসার, কখনও ধর্মঠাকুরের, কখনও চণ্ডীর দুঃসাধ্য কার্যের সহায়ক।’’[১২৩] সে পবন নন্দন এবং সে ধ্যানী। দেবীর স্মরণে তার ধ্যান ভঙ্গ হয়। তার প্রকাণ্ড দেহ এবং বলশালীর ভারে বসুমতী কম্পিত। তবে সে বিশ্বকর্মার সহায়ক কর্মী। এছাড়া ভীম ও অর্জুনও মজুর হিসাবে কাজ করেছে। দোহরা নির্মাণে তারা কাঠ কাটতে আসে। বৃত্তিতে তারা সমাজে নিম্নশ্রেণীর পরিচয় বহন করে। কবির কথায় —

‘‘ভীম অর্জ্জুন আমি করাতে দিল টান।
বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া করে দেহরা নির্ম্মান।।’’[১২৪]

এমনকি, ধনপতি খণ্ডে শ্রীমন্তের ডিঙ্গা তৈরীর জন্যও দেবী চণ্ডী বিশ্বকর্মা, হনুমানের আগমন ঘটে। মঙ্গলকাব্যে বিশ্বকর্মা চরিত্রের ভূমিকা সম্বন্ধে বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন — ‘‘দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার নাম পুরাণ হইতে আসিয়াছে, তবে পৌরাণিক কোন ক্রিয়া তিনি মঙ্গলকাব্যে সম্পন্ন করেন নাই। তিনি প্রধানতঃ কাঁচুলি নির্মাণ করিয়াছে, নৌকা গঠন করিয়াছে, কিংবা পার্থিব জীবনের ব্যাবহারের জন্য আরও অনুরূপ দুই একটি কাজ করিয়াছেন

মাত্র।"[১২৫] এখানে তারা দেব মায়ার বলে 'কামিলা' বা দিনমজুরের ছদ্মবেশ ধারণ করে। পরিচয় তাদের ব্যক্তিতে নয়, বৃত্তিতে। নিম্নশ্রেণীর ছুতোরের কর্মে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত, শ্রীমন্ত তাদের প্রথম জাতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তাদের কাছে কোন অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি না দেখলে তারা বলে —

"মিথ্যা না কহিব শুন সাধুর নন্দন।
অস্ত্র বান্ধা দিএগ কৈলাঙ উদর পালন।।"[১২৬]

গাছ কেটে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমান করে অত্যন্ত কৌশলে সপ্তডিঙ্গা নির্মাণ করে। সেগুলি হল মধুকর, যাত্রামঙ্গল, সাধু মধু, রত্ন, চন্দনের পাট ইত্যাদি। এধরনের সদাগরী নৌকা তারা তৈরী করে।

অন্যদিকে, **ইন্দ্র** চরিত্রটির পরিচয় উচ্চবর্ণের আলোকে। ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা সে। এছাড়া রামায়ণ, মহাভারত, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে তার উল্লেখ রয়েছে। সেখানে সে পুরাণ পরিচিত দেবরাজ। স্ত্রী শচী ও পুত্র জয়ন্ত। কিন্তু মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তার স্ত্রী শচী হলেও পুত্রের নাম নীলাম্বর। এমনকি, এখানে তাকে দেবরাজ রূপে পাইনা। দেবী চণ্ডী তার সমস্ত সমস্যায় তার দ্বারস্থ হয়েছে। সে দেবী চণ্ডীর পুত্রদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পঞ্চ দাসী এবং মর্ত্যে পূজা প্রচারের উপায় সম্বন্ধে লিখিত পুথির সন্ধান দিয়েছে। এমনকি, ভাঁড়ু দত্তকে হেনস্থা করতে প্রথম ঝড় বৃষ্টির জন্য দেবী চণ্ডী তার কাছে উপস্থিত হয়। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন — "ইন্দ্রও দেবরাজ রূপে মঙ্গলকাব্যে স্থান পান নাই। তিনি কেবলমাত্র ঝড় বৃষ্টির কারক রূপেই ইহাতে মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন। যখনই ঝড় বৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ উৎপাদনের প্রয়োজন হইয়াছে তখনই তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে।"[১২৭] সেই দিক থেকে ইন্দ্রের সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। সে শৈব। তার শৈব ভক্তির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে তার ধ্যানে ইন্দ্র মগ্ন ও ধ্যানস্থ। চণ্ডী ইন্দ্রের ক্ষমতা ও প্রভুত্ব সম্বন্ধে অবগত করতে চাইলে সে প্রথমত তার পরিকল্পনায় সাড়া দেয়নি। ইন্দ্র তাকে শিব ভক্তির নিষ্ঠা প্রকাশ করে। সে দেবীকে বলে —

"শিবের আশীর্ব্বাদে ইন্দ্র পদ মোর
পুত্র হবে কোনমন কথা।।"[১২৮]

সে শিবের অনুগত। অন্যদিকে, সে নিঃসন্তান। দাম্পত্য জীবনে সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা তার ছিল। এই অবস্থায় চণ্ডী তাকে পুত্রবর প্রদান করতে চাইলে তার মন টলে। তবে ইন্দ্র সমাজে দেবীর আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে পরখ করে নিয়েছে। তার প্রতি প্রত্যয় জন্মাবার পর তাকে পুত্রবর দান করা হয়। তার স্ত্রী শচীর গর্ভে নীলাম্বরের জন্ম হয়। অতঃপর তার মধ্যে পিতৃসত্তা জাগ্রত হয়। সে পুত্রের বিবাহের জন্য সমসামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন বিরাট নগরের চন্দ্রের কন্যার কথা উত্থাপন

করে। লক্ষণীয় স্বর্গের দেবতার মর্ত্যের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন স্বর্গ-মর্ত্যের যোগসূত্র স্থাপন বলে মনে হয়। পুত্রের বিবাহে নারদকে আপ্যায়ণে অবহেলা করলে বিবাহ সভায় কোন্দল বাঁধিয়ে দেয়। এই সমস্যা শঙ্কুল অবস্থার সম্মুখীন হয় পিতা ইন্দ্র। সে সকলের সামনে নারদের কাছে স্বভাব সুলভ বিনয়ের সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ইন্দ্র তাকে বলে —

"আর যদি কোন কর্ম্ম করি ইন্দ্রপুরে।
সভার আগে নিমন্ত্রণ দিমু তোমার তরে।।"[১২৯]

এই কথায় তার বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলী বক্তা হিসাবে পরিচয় পাওয়া যায়। তার বলার কৌশলে নারদ অত্যন্ত লজ্জিত হয়। বন্যা দ্বারা পর্যুদুস্থ করলে ভাঁড়ু দত্ত শিব ভক্ত ইন্দ্রের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে। তাতেও সে লজ্জিত হয় এবং সমস্ত মেঘ ও বাতাসকে নিয়ে ফিরে যায়।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে **চন্দ্র** ইন্দ্রের সম্পর্কে বিয়াই। বিষ্ণুপুরাণ কালিকাপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে চন্দ্রের উল্লেখ রয়েছে। সেখানে গুরু-পত্নী তারার সঙ্গে চন্দ্রের সম্পর্কের কথাই প্রাধান্য লাভ করেছে। সেখানে তার কোন সন্তানের উল্লেখ নেই। কিন্তু গুরু-পত্নী তারার গর্ভে তার পুত্রসন্তান বুধকে সে নিজের সন্তান বলে গ্রহণ করে। কিন্তু মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তার কন্যার কথা উল্লেখ রয়েছে। তার নাম ছায়াবতী। তার কন্যার সঙ্গে নীলাম্বরের বিবাহ স্থির হয়। সেই বিবাহ ঠিক করে নারদ। নারদ মুনির আগমণে চন্দ্র মুনির আতিথেয়তা অত্যন্ত সম্মানজনক। সে নারদকে পা ধোওয়ার জন্য জল প্রদান করে। এমনকি, নারদের বিশ্বস্ততায় সে কন্যার বিবাহ নীলাম্বরের সঙ্গে দিতে সম্মতি জানায়। বিবাহে বিভিন্ন মূল্যবান দ্রব্যের সঙ্গে দু'জন দাসী যৌতুক স্বরূপ দান করা হয়। উচ্চবর্ণের মানুষরা কন্যার বিবাহে তার সুখ শান্তি লক্ষ্য করে এইরূপ যৌতুক প্রদান করত। কবির ভাষায় —

"দানে জোতুকে তুশীল দুইজন।
ভাণ্ডার ভাঙ্গীয়া দিল রজত কাঞ্চন।।
মুক্তা প্রবাল দিল বহুমূল্য ধন।
বিভা করিয়া আইলা আপন ভুবন।।"[১৩০]

উচ্চবর্ণের বিবাহরীতি ও কর্তব্যপরায়ণ পিতা চন্দ্রের সুন্দর বর্ণনা রয়েছে।

চণ্ডীর 'কালকেতু ছলনা' অংশটি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেক্ষেত্রে **চিত্রগোবিন্দ**-এর নাম পাওয়া যায়। পুরাণে এই নামে কোন ব্যক্তির উল্লেখ নেই। সেখানে চিত্রলেখা নামে একজনের নাম পাওয়া যায়। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডী তাকে কাঁচুলি নির্মাণের জন্য স্মরণ করে। পুরাণে চিত্রলেখা চরিত্রের মত তারও একই পরিচয় রয়েছে। সে চণ্ডীর কালকেতুকে ছলনার জন্য চারপ্রকার বিচিত্র কাঁচুলি নির্মাণ করে। সেই কাঁচুলি অলৌকিক গুণসম্পন্ন।

দেবতাযোগে দেব-কাঁচুলি, পুষ্প সহযোগে পুষ্প-কাঁচুলি, মৎস্য সহযোগে মৎস-কাঁচুলি এবং পক্ষ সহযোগে পক্ষ-কাঁচুলি তৈরি করে। এই কার্যে তার পৌরাণিক ও লৌকিক ভাবনার পরিচয় রয়েছে। পুরাণ প্রসঙ্গে **ব্রহ্মা**, **পঞ্চানন**, **গরুড়**, **নারায়ণ**, **ত্রিলোচন**, **ভগবতী**, **গণপতি**, **কার্তিক**, **জলধর**, **পুরন্দর**, **শমন**, **পবন**, **গঙ্গা**, **কালিকা গোসানী**, **সরস্বতী**, **লক্ষ্মী**, **নারদমুনি**, **ষষ্ঠী দেবী**, **আকাশ কামিনী**, **পাতাল নাগিনী** প্রভৃতি দেবতা ছাড়াও মহাভারতের **বাসুদেব**, **ভীম**, **অর্জুন**, **মহাদেব**, **চন্দ্র** ও **সূর্য** প্রভৃতির নাম এসেছে। এরা চিত্রগোবিন্দের নির্মিত কাঁচুলির চিত্রলেখার নাম তালিকা মাত্র। এক্ষেত্রে তারা ঘটনা ও কাহিনী পরিবর্তনে কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে নি।

তবে, ভাঁড়ু দত্তের সঙ্গে দেবী চণ্ডীর দ্বন্দ্বে যেসকল চরিত্রের কথা উল্লেখ রয়েছে তারা ঘটনা ও কাহিনীতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। মূলতঃ তারা এসেছে ভাঁড়ু দত্তকে শায়েস্তা করতে। পরিচয়ে তারা ইন্দ্রের সভাগত বিভিন্ন মেঘ। তাদের নাম হল **হুরুকা**, **দুরুকা**, **আবর্ত**, **সামর্ত**, **পুষ্করা**, **কালাপাহাড়**, **আন্ধারিয়া** ও **সিন্ধুরিয়া** প্রভৃতি। এদের মধ্যে পুরাণ পরিচিত পুষ্করা। সে বরুণের পুত্র মেঘ। আর কালাপাহাড় ইতিহাসের অত্যাচারী, প্রথানাশক কিংবদন্তি চরিত্র। কিন্তু এখানে সকলেই ইন্দ্রের রাজসভায় পালিত প্রজা ও দেবী চণ্ডী তাদের মুখাপেক্ষী। তারা দেবী চণ্ডীর কাছে নিজেদের অসম্ভব ক্ষমতার ও অলৌকিক শক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু চণ্ডীর কাছে তারা সহানুভূতি অর্জন করতে চেয়েছে। 'নাল মাহিনা' অর্থাৎ বেতনের পরিবর্তে চাষের জমি ভোগ করে তারা। কবি তাদের আত্মপ্রচারের কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন —

> "মেঘের কথা শুনিয়া ভবানীর হৈল হাস।
> অন্ধকার পৃথিবী জেন চন্দ্রের প্রকাশ।।
> দুর্গা বলে এত মেঘ নাল মাহিনা খাও।
> সকল মেঘ বিদায় দিয়া তোমরা দুই ভাই জাও।।"[১৩১]

শেষপর্যন্ত, দেবী এদের ব্যতীত পবনদেবতাকে নিয়ে যায়। সেও ভাঁড়ু দত্তের দৃঢ় মনোবলকে টলাতে ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ মনের হয়ে চণ্ডী গঙ্গার কাছে গেলেও তাকে বিমুখ হয়ে ফিরতে হয়। এই অবস্থায় ইন্দ্রের কথায় গঙ্গার দুই পুত্রের কাছে দেবী উপস্থিত হল। সে দুই পুত্র হল **ডাক** ও **ডেউর**। মহাভারতে ভীষ্ম ছাড়া গঙ্গার এনামে কোন পুত্র নেই। গঙ্গার এই পুত্র সান্তালী পর্বতে বাস করে। সাধারণ লোকালয় থেকে তাদের অবস্থান বহুদূরে পাহাড়-পর্বতে। অন্তপুরে তাদের কাছে চণ্ডীর আগমন বার্তা চাকর মারফৎ পৌঁছায়। তাতে তারা খুব আনন্দিত হয় এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে গলায় বসন দিয়ে অতিথি বরণ করে। কবির ভাষায় —

> "একজন পূরে জাইয়া বাত্রা জানাইল।
> নারদ সহিতে দ্বারে ভবানী আইল।।

ভবানীর নাম শুনি আনন্দিত মন।
শীঘ্রগতি দুই ভাই দিল দরশন।।
গলাতে বসন বান্ধে করে নিবেদন।
কুন কর্ম্মে হৈল মাতা তোমার আগমন।।"[১৩২]

তারা দেবীর সমস্যার কথা শুনে তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। লক্ষ লক্ষ বন্যাকে ডেকে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ডাক-ডেউর রাজশঙ্খ ও জয় ঘন্টা বাজিয়ে আঠারো প্রকারের বন্যাকে একত্রিত করে।

"রাজশঙ্খ জএ ঘন্টা তাড়াতড়ি দিল।
আঠার জোয়ারের বন্যা একত্র হৈল।।"[১৩৩]

এখানে ডাক-ডেউর সামাজিক পরিচয়ে অন্ত্যজ; কিন্তু তাদের সমাজে তারা রাজপরিবারের অধিকর্তা। দেবী চণ্ডী সেই নিম্নশ্রেণীর কাছেই দ্বারস্থ হয়েছে। যুদ্ধে আগত আঠারো প্রকারের বন্যা আঠারো প্রকারের সৈন্য দল বলে মনে হয়। ডাক-ডেউর ও চণ্ডী সহ ভাঁড়ু দত্তের সঙ্গে লড়াই, উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই বলে মনে করলে অত্যুক্তি হয় না। ভাঁড়ুদত্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত শিব-ভক্ত ও উচ্চশ্রেণীর প্রতিনিধি। তাই ভাঁড়ুর সঙ্গে ডাক-ডেউরের লড়াই উচ্চবর্ণের সঙ্গে অন্ত্যজ শ্রেণীর লড়াই বলে বোধ হয়।

আবার কখনও উচ্চ পদাধিকারী দেব সমাজের কাছে নিম্ন পদাধিকারী দেবতারাও নিপীড়িত হয়েছে। দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচারের জন্য ইন্দ্রের রাজসভায় নর্তকী রত্নমালা অভিশপ্ত হয়েছে মর্ত্যে মানবজন্মের জন্য। সেই স্বজন-হারা বেদনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে **মালাধর ও জয়ধর** চরিত্র দুটি। মালাধর রত্নমালার পুত্র জয়ধর তার স্বামী। মালাধর মাতৃবিয়োগে অধীর। তার দুই স্ত্রী — উলুবা ও দুলুবা। মধ্যযুগের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বহুবিবাহের অনুগামী মালাধর। তারা সকলেই ইন্দ্রের সভায় নর্তক। নৃত্যের তালভঙ্গ জনিত কারণে মালাধরের মাতা রত্নমালার ভয়াবহ বিপদ। সেই বিপদ হল মর্ত্যে মানব জন্ম গ্রহণ করা। তার ফলে মাতৃবিচ্ছেদের বেদনায় পুত্র মালাধর মাটিতে পড়ে ব্যাকুল ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ে।

"কান্দে মালাধর ধুলায় ধূসর
ধরিয়া জননীর চরণ।
মুণ্ডে দিয়া দুই হাত বুকে জেন বজ্রাঘাত
হেট মাথে করিছে রোদন।"[১৩৪]

মাতার এই পরিণতির জন্য তার প্রতিবাদের ভাষা নেই। বিধির উপর দোষারোপ ছাড়া তার কোন উপায় নেই। এরূপ অবস্থায় পরিবারের সকলের ক্রন্দন লক্ষ্য করে সর্বশেষে গৃহকর্তা জয়ধর

সেখানে উপস্থিত হয়। সে সমাজ অভিজ্ঞ ও প্রকৃত গৃহকর্তা। সকলের মত সে ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়েনি। কীভাবে এই বিপদ থেকে স্ত্রীকে রক্ষা করা যায় তার উপায় খোঁজে। তাই সে ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত হয় এবং বহুবার অত্যন্ত করুণার সঙ্গে অনুরোধ জানায়। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। এভাবে উচ্চশ্রেণীর রাজাদের দ্বারা মালাধরের পরিবারের মতো সামান্য নিম্নশ্রেণীর মানুষরা প্রতারিত ও লাঞ্ছিত হত। তাদের ন্যায় বিচারের জন্য প্রতিবাদের কোন স্থান ছিল না। সেই অবহেলিত নিম্নশ্রেণীর প্রজা তারা।

এরূপ অবস্থার শিকার ধনপতি খণ্ডের **পুষ্পদত্ত** ও **বিদ্যামন্ত** নামে দুই দেবচরিত্র। তারা দু'জনেই ইন্দ্রের রাজসভার নর্তক। মাতুলি নামক আজ্ঞাপ্রেরকের কথায় পুষ্পদত্ত ও বিদ্যামন্ত ইন্দ্রের সভায় নাচতে আসে। নাচে সঙ্গে তারা মধুরকণ্ঠে রামগুণগান করে। তা শুনে ইন্দ্রের স্ত্রী শচী মগ্ন চিত্তে স্বামী ইন্দ্রের বুকে হাত দেয়। তা দেখে পুষ্পদত্ত ও বিদ্যামন্তের হাসির উদ্রেক ঘটে। এই সামান্য ভুলে ইন্দ্র তাদের দুই জনকে চরম অভিশাপ দেয়। সেই অভিশাপে তারা শারী ও শুক নামক পাখিতে পরিণত হয়। প্রথমে মর্ত্যে তারা রাজা শ্রীবৎসের দরবারে পালিত হয়। সেখানে ব্যাধ কর্তৃক বন্দী হয় এবং উজানীর রাজা বিক্রমকেশরের কাছে এসে উপস্থিত হয়। রাজদরবারে তারা বিভিন্ন প্রহেলিকার দ্বারা অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দেয় এবং রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে রাজসভায় শারী ও শুকের ভিন্ন পরিচয় প্রদান কৌতূহল জাগ্রত করে। ইন্দ্রের সভায় নর্তক পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিল এবং গুরুগৃহে তারা শিক্ষা লাভ করত। তাদের দোষে গুরু কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে পক্ষিতে পরিণত হয়। তাই তারা বলে —

> "ব্রহ্ম বংশেতে জন্ম শুন বিবরণ।
> পূর্ব্বজন্মে দুই ভাই আছিলাঙ ব্রাহ্মণ।।
> নিত্য শিখিতাঙ বিদ্যা গুরু বিদ্যমান।
> দুরজোগে গুরুক আসি করিলাঙ লঙ্ঘন।।
> দোষ দেখি দুই ভাইকে গুরু শাপ দিল।
> গুরুর শাপতে পক্ষ কুলে জন্ম হৈল।।"[১৩৫]

সমাজে ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-সম। তাদের হত্যা করা ব্রহ্ম হত্যার সমান। তারা সমাজে ক্ষমতায় ও শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে ছিল। তার উজ্জ্বল চিত্র শারী ও শুকের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

পুরুষ অপ্রধান চরিত্রের মত **পদ্মা** নারী অপ্রধান চরিত্র হিসাবে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এসেছে। সে চণ্ডীর সহচরী ও পরামর্শ দাত্রী অপ্রধান নারী চরিত্র। তার অপর নাম বাহুড়ী। কাহিনী ধারায় তার আবির্ভাব বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন ক্ষণে। পদ্মা এখানে শুধু চণ্ডীর সহচরী ও পরামর্শ দাত্রী, সমস্যা সমাধানকারী চরিত্র হিসেবে নয়, কাহিনীর

যোগ সূত্রকারী, চরিত্রের মনকে নিয়ন্ত্রণে এবং সঞ্চালিকা চরিত্র হিসেবে তার গুরুত্ব অপরিসীম।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সহচরীপদ্মা চণ্ডীর পূজা প্রচারের ব্যাপারে সমস্ত প্রকার সাহস ও উৎসাহ জুগিয়েছে। দুর্গা পদ্মাকে কাছে জানায় যে, মর্ত্যে সকল দেবতার পূজা হলেও তার পূজা হয় না কেন ? পদ্মা তার পূজা প্রচারের একমাত্র উপায় স্বরূপ অসুর ধূম্রলোচন বধের কথা উত্থাপন করে। সে দেবীর পূজা প্রচারের মন্ত্রণা শক্তি। তার পরামর্শে মর্ত্যে চণ্ডী বহুল পূজা প্রচারের জন্য ফুলফুল্যানগরের কানা খোঁড়া মানিক দত্তের কাছে উপনীত হয়। চণ্ডী এই উদ্দেশ্যে ইন্দ্রের কাছ থেকে পুথি আনে এবং মানিক দত্তকে মর্ত্যে গীত প্রচারের আদেশ দেয়। এমনকি চণ্ডীর যে-কোন সমস্যায় পদ্মা তাকে উপদেশ বা পরামর্শ দিয়ে সঠিক পথে চালনা করেছে।

প্রসঙ্গত, পদ্মাই দেবীকে মর্ত্যে পশু সৃজন করতে বলে। পশুকুল কালকেতুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ। তাই দেবী তাকে ধন দেবার জন্য গোধিকারূপ ধারণ করে। ব্যাধ কালকেতু দেবীকে বন্দী করে। বন্দী দেবী অসহায়। স্বামী শিবের অজ্ঞাতে দেবীর অন্য পুরুষের কাছে বন্ধন জানতে পারলে তাকে গৃহে তোলা হবে না — এই ভয়ে দেবী ভীত সন্ত্রস্ত আসন্ন বিপদে দেবী চণ্ডীকে পদ্মা প্রবোধ দিতে কালকেতুর ভবিষ্যতে একই দুঃখের কথা জ্ঞাত করে। সাধারন তুচ্ছ জীব কালকেতু কর্তৃক দেবী চণ্ডীর অসহায় অবস্থা পদ্মার কাছে বলেছে এভাবে —

"পদ্মা দেবতা হৈয়া বন্দি থাকে   দেবতা না বলি তাকে
মোর কলঙ্ক রহিল দেবলোকে।।"[১৩৬]

পদ্মা তাকে বলে যে, আহার হয়ে ক্ষুধার্ত কালকেতুর সম্মুখে আসা তার নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। তাই সে দক্ষ জুহুরির মতো কালকেতুর পুরুষ মনস্তত্ত্ব উপলব্ধি করে এবং দেবীকে কাঁচুলি পরিধান করে তাকে ধন প্রদান করার কথা উত্থাপন করে। সেই সঙ্গে পদ্মা চণ্ডীকে জানিয়ে দেয় যে, গরীবকে ধন দিলে জগতে তার খ্যাতি প্রচার হবে।

"পদ্মা বলে সুখী জনেক ধন দিলে দেওল প্রমাণ।
দরিদ্রকে ধন দিলে জগতে বাখান।।"[১৩৭]

অতঃপর পদ্মার সঙ্গে চণ্ডী কালকেতুর গৃহে ধন দেবার জন্য উপস্থিত হয়। সেখানে কালকেতু দেবীর প্রকৃত রূপ দেখে মূর্ছিত হয়। পদ্মার কথায় দেবী তাকে দয়ার দৃষ্টিতে বাঁচিয়ে তোলে। দেবী তাকে ধন দান করে গুজরাটের রাজায় পরিণত করে। স্বভাবতই, কলিঙ্গ রাজের সঙ্গে যুদ্ধে কালকেতু বন্দী হয়। দেবী পূর্বের বন্দীদশার জন্য কালকেতুকে প্রতিপক্ষ ভেবে প্রতিশোধ নিতে চায়। সে সময় দেবীকে পদ্মা ব্যাধের সামনে তার গোধিকা রূপ ধারণ করে যাওয়ার ভুল উত্থাপন করে। অর্থাৎ পদ্মা চণ্ডীর সহচরী, পরামর্শদাত্রী।

পাশাপাশি ধনপতি খণ্ডে পদ্মার ভিন্ন রূপ লক্ষ্য করা যায়। ইন্দ্র-সভায় রত্নমালাকে ছলনা

করতে যাওয়ার সময় যাত্রাপথে পদ্মা চণ্ডীর সারথি। কবি তার পরিচয় দিয়েছেন এই ভাবে —

"পদ্মার চলান রথ জেন চলে বাউপথ
জথা আছে সহস্র নয়ান।"[১৩৮]

এইরূপেপদ্মা দক্ষিণ পাটনে যুদ্ধে দেবীর যাত্রার সময় সারথির ভূমিকা পালন করেছে। ধনপতি ও খুল্লনার মর্ত্যে জন্মের পর চণ্ডী ধনপতিকে গৌড়ে পাঠানোর জন্য চিন্তিত হয়। এই সময় তার সঠিক মন্ত্রণাদাত্রী হয় পদ্মা। সে শারী-শুকের কথা বলে। সেই শারী-শুকের স্বর্ণখাঁচার জন্য রাজা বিক্রমকেশর তাকে গৌড়ে পাঠাবে। তাহলে ধনপতির গৌড়ে যাবার পিছনে কারণ হল পদ্মা। তাই মনে হয়, পদ্মা চণ্ডীমঙ্গল কাহিনী ধারায় একটি অনুঘটক।

এছাড়া দ্বিতীয়বার ধনপতিকে দক্ষিণ পাটনে চন্দন আনতে এবং রাজার ঘর থেকে চন্দন চুরির পরামর্শ, স্বামীকে বিপদ থেকে রক্ষার জন্য খুল্লনার দেবী চণ্ডীর পূজা ও তাতে স্বর্গ কম্পন, পদ্মাকে দিয়ে পুথিগণনা করে খুল্লনার কথা জানা, কালিদহে ধনপতিকে কমলবন দেখানো ও তাকে রাজঘরে বন্দী করার পরামর্শ পদ্মা দেয়।

"পদ্মা বলে শুন মাতা আমার বচন।
সাধুকে দেখাহ এথা কমলের বন।।
ছলন করহ মাতা অভয়া পার্ব্বতী।
রাজঘরে বন্দী জাতে হএ ধনপতি।।"[১৩৯]

চণ্ডী তার কথা মত সকল কথা শুনে। পদ্মাই যেন তার কর্ম সকল চণ্ডীর দ্বারা করিয়ে নিয়েছে।

শ্রীমন্ত চণ্ডীর ভক্ত। সে শুভ সময়ে দক্ষিণপাটনে যাত্রা করে। শ্রীমন্ত দক্ষিণ পাটনে গিয়ে পিতাকে না পেলে সে জীবন ত্যাগ করবে। তাহলে দেবীর ব্রত পূর্ণ হবে না। সেই কথা দেবীকে স্মরণ করিয়ে দেয় পদ্মা।

"পিতা শোগে মরিবে শ্রীমন্ত সদাগর।
ব্রতপুন্ন না হবে তোমার অবনী ভিতর।।"[১৪০]

তাই দেবী শ্রীমন্তকে স্বপ্নে পিতার ঠিকানা জানিয়ে দেয়। পদ্মাই দক্ষিণ পাটনের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় দেবীকে দানাগণকে আনবার পরামর্শ দেয়।

এই ভাবে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পদ্মা চরিত্র সামান্য কয়েকটি চারিত্রিক গুণ বহন করেছে মাত্র। তার পরিচয় পরামর্শ দাত্রী, সমস্যা সমাধানকারী, সারথি, মনোরথ সঞ্চালনকারী রূপে। চরিত্রটি আগাগোড়া একই। চরিত্রটি একটি গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং ঘটনার প্রবাহ দ্বারা কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কবি তার আগমন ঘটিয়েছেন। ফলে চরিত্রটি নিজস্ব ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুটন করতে পারেনি। তবে তার চরিত্র গুণাবলীর কাছে বা ভূমিকার কাছে চণ্ডীমঙ্গলের প্রধান চরিত্র

চণ্ডীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

এই কাব্যে চণ্ডীর পালিতা মাতা **মেনকা**। তার স্বামী হিমালয়। মহাভারতে তার একই পরিচয় আছে। সে সন্তান হীনা এবং সমাজের চোখে সে আঁটকুড়া। আর পাঁচজন নারীর মত সে বন্ধ্যা গৃহবধূ। সমাজের গঞ্জনা থেকে মুক্তির জন্য সে বুদ্ধির কৌশল ফাঁদে। তার পেটে দন স্বরূপ কিছু বেঁধে মানুষের বিশ্বাস জয় করে নেয়। কবির ভাষায় তার স্বরূপটি ফুটে উঠেছে —

"কন্যা পাঞা মেনকা নানা বুদ্ধি বাটে।
আটকুর দাএ ঘুচাত্যে দন বান্ধে পেটে।।
দন পেটে বান্ধি রানি নগরে চলিল।
লোকে বোলেন রানি গর্ভবতি হৈল।।"[১৪১]

তার চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজে আটকুড়া তথা বন্ধ্যা নারীর আত্মগোপনের সচেতনতার পরিচয় পাই। চরিত্রটি এই সামান্য মাতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে বৃহত্তর জগতের সমস্যা তুলে ধরেছে। বৃদ্ধ পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহে মাতা মেনকার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। তার মনে হয়েছে শিব বাদিয়ার পুত্র। তার গলায় সাপ, হাতে ডমরু, ভূত-প্রেত তার চার পাশে। এমনকি, শিব এতটাই বৃদ্ধ যে হাসতে গেলে তার দাঁত নড়ে। এরূপ পাত্রের হাতে গৌরী প্রদানের জন্য মেনকা স্বামী হিমালয়ের উপর ক্রোধ-বাণ নিক্ষেপ করেছে। কারণ কৌলিন্য প্রথার যূপকাষ্ঠে নারীকে বলি হতে মাতা মেনকা প্রত্যক্ষ করেছে। মাতা হয়ে কন্যাকে এই আসন্ন বিপদের মুখে ঠেলে দিতে আপোশ করেনি। বরং স্বামীর সঙ্গে সে বাক্‌যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এমনকি, শিবের সঙ্গে স্বামীকেও পাগল বলতে বাধেনি। এরূপ পাত্রের কাছে গৌরী সম্পাদন না করে তার মৃত্যু শ্রেয় বলে মনে হয়েছে। কবির কথায় —

"মেনকা বলেন রাজা তবে বলি আমি।
জেমন পাগল শিব সেই রূপ তুমি।।
কান্দিয়া মেনকা বলে গৌরী করি কোলে।
গৌরীকে লইয়া আমি ঝাপ দিব জলে।।[১৪২]

মধ্যযুগের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তাদের অনুকূলে সৃষ্ট প্রথার চাপে নারী কেবল বলি হয়েছে। মেনকার মাতৃত্বের স্নেহময়ী রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

মেনকার মতই নারী **গঙ্গা**। তার অবস্থান দেব ও ব্যাধ খণ্ডে। সে শান্তনু মুনির স্ত্রী। মহাভারত, হরিবংশ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতিতে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাণের গঙ্গার সঙ্গে মানিক দত্ত লৌকিক ধারণার প্রলেপ দিয়েছেন। শিব তাকে তার স্বামীর কাছ থেকে শর্ত করে বিবাহ সভায় রন্ধন করতে নিয়ে আসে। সে বাঙালী গৃহবধূ। কিন্তু শিব কর্তৃক শর্তভঙ্গ হলে তার

জীবনে নেমে আসে অভাবনীয় চরম পরিণতি। স্বামী কর্তৃক সে পরিত্যক্ত হয়। দাম্পত্য জীবনে নারীর করুণ পরিণতি তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। নিরুপায় আশ্রয়হীনা অবলা নারী গঙ্গা বাধ্য হয় শিবকে অবলম্বন করে আশ্রয় নিতে। মানিক দত্তের কাব্যে গঙ্গার সেই অবলম্বনও স্থায়ী হয়নি। তার আশ্রয় হয়েছে পরিচিত লোকালয় থেকে বহুদূরে সান্তালী পর্বতে। তার এই পরিচয়ে নিম্নশ্রেণীর সামাজিক অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভাঁড়ু দত্তকে বিড়ম্বনা করতে তার কাছে শিব পত্নী চণ্ডীর সমাগম হয়। গঙ্গা অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গীতে চণ্ডীকে তার মনোবাঞ্ছার ক্রোধ ও অনিচ্ছা প্রকাশ করে। গঙ্গা বলেছে —

“জে দিনে আসিয়াছ তুমি কথা বন্যা পাব আমি
শুকাইয়া মরে ই মছ্য মগর।”[১৪৩]

তাতে উভয়ের মধ্যে কোন্দলের সৃষ্টি হয়। গঙ্গা সেখানে চণ্ডীকে অশ্লীল ও অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে। উভয়ের কোন্দল সতীন সমস্যাজাত। তাতে গঙ্গা চরিত্রে দেবত্বের গুণাবলী অতিক্রম করে গ্রাম্য অসংস্কৃত নারীতে পরিণত হয়েছে।

তবে, **কালী** চরিত্রটি গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট নয়। তার অবস্থান দেবখণ্ডে এবং জন্ম অলৌকিক রহস্যজাত। চণ্ডীর দেহ নিষিক্ত ঘর্ম থেকে তার জন্ম। সে চণ্ডীর অন্য রূপ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে তার জন্ম সম্পর্কে একই কথা বলা হয়েছে —

“শরীরকোষাদ্‌ষৎ তস্যাঃ পার্ব্বত্যা নিঃসৃতাম্বিকা
কৌষিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে।।
তস্যাং বিনির্গতায়ান্তু কৃষ্ণাভুৎ সাপি পার্ব্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া।” ৪১[১৪৪]

অর্থাৎ , “অম্বিকা সেই পার্ব্বতীর শরীরকোষ হইতে উৎপত্তি লাভ করেন, এইজন্য সমস্ত ভুবনে তিনি ‘কৌষিকী’ বলে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সেই কৌষিকী দেবী, শরীর হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলে পর, পার্ব্বতী দেবী কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিলেন। তদবধি তিনি কালিকা নামে কীর্ত্তিতা হইয়া হিমাচলে অবস্থিতি করিলেন।”[১৪৪] তার প্রচণ্ড সংহার রূপটি এখানে বড় হয়ে উঠেছে। অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে তার পরাক্রমী সংহারকারিণী রূপ স্পষ্ট। তার ক্রোধান্বিত চেহারা লক্ষ্য করে শিব সৃষ্টি রক্ষার জন্য চিন্তিত। তাই সে তার পদতলে শবরূপে পতিত হয়। পদতলে স্বামীকে দেখে তার লজ্জায় জিহ্বা দণ্ডে চাপা দেয় এবং ক্রোধ নিবারণ করে। কবির ভাষায় —

“পদ তলে শিবকে দেখি লজ্জা বড় পাল্য।
দন্তে জিহ্বা ধরি কালী ক্রোধ নিবারিল।।”[১৪৫]

কালীর এইরূপে শিব ও শক্তির মহিমা ভাস্বর হয়ে ওঠে।

দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচার অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজে সন্তানদের লালন পালনের জন্য ইন্দ্র সভার থেকে পাঁচ জন নারীকে আনা হয়। তাদের দ্বারা সমাজের আর্থ-সামাজিক দিক উদ্‌ভাসিত হয়। তারা হল **হারা, তারা, সত্যা, কমলা** ও **পদ্মা**। এরা সকলে বৃত্তিতে দাসী। তাদের কাজ সন্তান লালন পালন করা। সেই সঙ্গে এই শ্রেণীর নারীরা উচ্চবিত্তের কাছে ভোগের সামগ্রীতে পরিণত হত। প্রসঙ্গত, অতুল সুর বলেছেন — ‘‘হিন্দুসমাজে দাসদাসী কেনা ও রাখা যে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবন্ধ ছিল, তা নয়। ... অনেকে আবার যৌনলিপ্সা চরিতার্থ করবার জন্য দাসীদের ব্যবহার করত।’’[১৪৬] শিবের এই দাসীদের প্রতি কাম মনোভাব প্রকাশ উক্ত বক্তব্যের যুক্তিযুক্ততাকে প্রমাণ করে। কবির ভাষায় —

‘‘হারা তারা আইলা আর আইলা সত্যা।
কমলাকে সাথ করি আইলা পদ্যা।।
*　　　*　　　*
জেন মাত্র মহাদেব দাশীকে দেখিল।
মদনে বিভোর হৈঞা সাক্ষাতে আইল।।’’[১৪৭]

দেবী চণ্ডী তাদের উপর গৃহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে কালকেতু ছলনার জন্য যায়। নারীদের দাসী বৃত্তি ছাড়াও রথ চালনার পরিচয় পাওয়া যায়। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চণ্ডীর মর্ত্যভূমিতে যাত্রা পথে তারা সারথির ভূমিকা পালন করেছে। তারা হল **ইমলা** ও **বিমলা**। এরা চণ্ডীর পথ প্রদর্শক। দেব সমাজে এদের অবস্থান সর্বনিম্নে বলে মনে হয়। এই বৃত্তিতে নারীর সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। নিম্নশ্রেণীর নারীদের সমাজে অর্থের প্রয়োজনে শ্রম করতে বাধা ছিল না। এমনকি তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার স্পষ্ট ধারণা মেলে।

শিবের সঙ্গে চণ্ডীর গার্হস্থ্য জীবন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাদের গার্হস্থ্য জীবনে **জয়া** ও **বিজয়া** নামে দু’জন পরিচায়িকার উল্লেখ রয়েছে। ‘দেবী-ভাগবত’-এ জয়া-বিজয়া দেবীর অপর নাম। সেখানে বলা হয়েছে — ‘‘আপনিই জয়া, বিজয়া, ধাত্রী, লজ্জা, কীর্ত্তি, ইচ্ছা ও দয়ারূপে অবিস্থিতি করিতেছেন।’’[১৪৮] আর মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দুটি দাসীর নাম জয়া বিজয়া। এখানে বলা হয়েছে —

‘‘শিবের বচন শুনি　　　তুষ্ট হৈল নারায়ণী
জয়া বিজয়া রন্ধন সাজ করে।’’[১৪৯]

শিব ও চণ্ডীর গার্হস্থ্য জীবনের পাশাপাশি ইন্দ্র ও শচীর গার্হস্থ্য জীবনও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ক্ষেত্রে জীবন্ত। চণ্ডীর পূজা প্রচারের জন্য ইন্দ্রকে বর দান এবং ঘটনা দ্বারা ব্যাধ খণ্ডের বীজ সুপ্তের পরিকল্পনা। সেই ইন্দ্রের স্ত্রী **শচী**। উল্লেখ্য ইন্দ্র শৈব। পুত্র নীলাম্বরকে শচী স্বীয় গর্ভে ধারণ

করে। ঋগ্বেদে তার উল্লেখ আছে। পুরাণে তার স্বামী ইন্দ্র। তার পুত্র জয়ন্ত ও কন্যা জয়ন্তীর নাম পাওয়া যায়। সেখানে শচীর নীলাম্বর নামে কোন পুত্রের উল্লেখ নেই। এখানে শচীর পুত্র নীলাম্বর; তার জন্মের পর নানরকম শুভানুষ্ঠান ও পুত্রের বিবাহ যাত্রার সময় কল্যাণ কামনা করা বাঙালী মাতার গুণাবলী বহন করে। এমনকি, পুত্রের কল্যাণে সে গৃহে দেবী চণ্ডীর ঘটপূজা করে। তার মত গৃহবধূর দেবী চণ্ডীর প্রতি বিশ্বাস একটি দ্বান্দ্বিক আভাস দেয়। প্রসঙ্গত, তারই একই গৃহের স্বামী, পুত্র ও নারদ শৈব ধর্মের প্রতি আস্থাবান। দেবী চণ্ডীর ভক্ত শচী তার পুত্রকে হারাল তার অভিশাপেই। পুত্র নীলাম্বরের বিচ্ছেদ ভাবনায় তার মাতৃহৃদয় ব্যাকুল। এই বিচ্ছেদ ভাবনা স্বর্গপুরে শোকের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

বণিক খণ্ডে রত্নমালার অভিশাপ প্রাপ্তি অংশটিও গুরুত্বপূর্ণ। **রত্নমালা** ইন্দ্রের সভার নর্তকী। তার স্বামী জয়ধর ও পুত্র মালাধর। পুত্র বধূ **উলুবা** ও **দুলুবা**। রত্নমালার সঙ্গে পাঁচজন নর্তকী রয়েছে। তাদের নৃত্য দেখতে ইন্দ্র সভায় উপস্থিত হয় চণ্ডী। সেকারণে বার্তা প্রেরক মাতুলিকে দিয়ে পুনরায় তাদের ডেকে পাঠানো হয়। মাতুলি চরিত্রটি সংবাদ প্রেরক ও ইন্দ্রের আজ্ঞাবহ দাসী। চণ্ডীর আগমন বার্তা সে রত্নমালাকে জানায়। কিন্তু রত্নমালা ও তার নৃত্যসঙ্গীরা একবার নৃত্য করে পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত। পুনরায় সপ্তসরাতে নৃত্যের কথা শুনে তারা আক্ষেপ করে। কবির কথায় —

> ‘‘মহা পরিশ্রম করি বসিছে পঞ্চজন।
> শুনিয়া বিফল হৈল নিত্যের কথন।।
> এহি দণ্ডে নিত্য করি মোরা আইলাম ঘরে।
> পাছে ২ আইলা তুমি ডাকিবার তরে।।’’[১৫০]

ইন্দ্রের রাজসভায় রত্নমালা ও পাঁচজন নামহীন নর্তকী কায়িক শ্রমের দ্বারা অত্যাচারিত, শোষিত ও লাঞ্ছিত। তাদের মত নিম্নবর্ণের নর্তকীদের পরিশ্রম ও মানসিক অবস্থার মূল্য উচ্চবর্ণের রাজাদের কাছে নেই। তারা তাদের কাছে আমোদ-প্রমোদের সামগ্রী মাত্র। তারা সেই নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্রতিভূ। তারা কেবল উচ্চবর্ণের জন্য নিজেদের সখ-আহ্লাদকে বিসর্জন দিয়েছে, কিন্তু প্রতিদানে কিছু পায়নি। তাই তারা নিজেদের মধ্যে বলতে বাধ্য হয় যে, ইন্দ্রের সভা ত্যাগ করে শিবস্থানে যেতে। কিন্তু সমসাময়িক পরিস্থিতি ও আর্থিক অবস্থার জন্য ক্ষমতার কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের ইন্দ্রস্থানে চণ্ডীর সম্মুখে না গিয়ে শিবস্থানে যাওয়ার কথা উত্থাপনের মধ্যে শিব ও শক্তির দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত তারা দেবী চণ্ডীর সামনে নৃত্য করতে বাধ্য হয়। নৃত্যাঙ্গনে যাত্রা পথে রত্নমালা অমঙ্গল ও অকুশলতার আভাস পায় —

> ‘‘জাত্রা করি রত্নমালা গমন করিল।

অমঙ্গল অকুশল পথেত দেখিল।।"[১৫১]

লক্ষণীয় যে, মূল রাজসভা থেকে তাদের মত নিম্নবর্ণের নর্তকীদের অবস্থান অনেকটা দূরে ছিল বলে মনে হয়। রত্নমালার যাত্রায় কবি তার আভাস দিয়েছেন। রত্নমালা নৃত্যে তার পুত্র বধূরা উলুবা-দুলুবা গানের রাগ ধরে। উলুবা-দুলুবা গানের সঙ্গে করতালি দ্বারা সভায় উপস্থিত সকলের মনোরঞ্জন করতে চেষ্টা করেছে। প্রথমে তারা 'শ্রীগন্ধা' রাগে গান করে। তাতে শাশুড়ী রত্নমালা নৃত্য করে। প্রথমবার তার নৃত্যে তালভঙ্গ হয়। তাই দ্বিতীয়বার নৃত্য করতে তার মনে সাহস জাগে না। তার মন অভিশাপের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। এই দ্বিধাগ্রস্ততায় রত্নমালা দ্বিতীয়বার নৃত্যে তালভঙ্গ করে বসে। এবং তাকে মর্ত্যে মানব উদরে জন্ম গ্রহণের অভিশাপ দেয়। রত্নমালা অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়। তাতে পরিবার ভাঙ্গনের বিচ্ছেদ-বেদনায় বিধুর।

ইন্দ্রের রাজ সভায় অপর একটি উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র **মাতুলী**। পুরাণে তার পরিচয় ইন্দ্রের সারথি ও সখী হিসাবে। রামায়ণে ইন্দ্রের আদেশে সে রামের জন্য রথ নিয়ে উপস্থিত হয়। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তার ভূমিকা স্বতন্ত্র। সে এখানে কেবল সংবাদপ্রেরক। মানিক দত্তের কথায় — "মাতলী বোলেন ইন্দ্র দ্বারেত ভবানী।"[১৫২] মাতুলী ইন্দ্রকে চণ্ডীর আগমন বার্তা ইন্দ্রদ্বারে প্রেরণ করে।

এবার আমরা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ব্যাধ খণ্ডের প্রধান পুরুষ ও নারী চরিত্র নিয়ে আলোচনায় আসব।

আখেটিক খণ্ডের একটি অন্যতম প্রধান পুরুষ চরিত্র **কালকেতু**। জীবিকায় সে ব্যাধ ও পরিচয়ে ব্যাধ সম্প্রদায়। তার পিতা ধর্মকেতু ও মাতা নিদয়া। তার স্ত্রী ফুল্লরা। দেবীর কৃপায় সে বিবাহের পরে গুজরাট রাজ্যের রাজা হয়। তার চরিত্রের এই পরিবর্তন কতটা স্বাভাবিক ও সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে তা পর্যবেক্ষণের বিষয়। এক্ষেত্রে আমরা তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কাহিনী ধারাকে চিহ্নিত করে তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব।

বস্তুতঃ কালকেতুর জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কাহিনীকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। ক) বিবাহের প্রাক্কালে কালকেতু, খ) সংসারী কালকেতু, গ) ধন লাভের পর কালকেতু, ঘ) রাজা কালকেতু এবং ঙ)অন্তিম জীবনে রাজ্যভার-ত্যাগী কালকেতু। এই পাঁচটি ভাগে আমরা কালকেতুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ঘটনার পরিবর্তনের সঙ্গে চরিত্রের সঙ্গতি কতটা তা লক্ষ্য করব।

ব্যাধ খণ্ডে কালকেতুর প্রথম পরিচয় হল সে স্বর্গের অভিশপ্ত নীলাম্বর। সে শিব ভক্ত। দেবীর উদ্দেশ্য পূরণে সে শিকারে পরিণত হয়েছে। তার চিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। মর্ত্য মানুষের ন্যায় সে তার স্বাধীনতা ব্যক্ত করতে পারে না। দেবীর ছলনায় তার জীবনে নেমে আসে করুণ পরিণতি। শিব পূজার জন্য ফুল তুলতে গিয়ে সে মর্ত্যে

স্বাধীন মুক্ত ব্যাধের জীবন পর্যবেক্ষণ করে। সেই জীবন লক্ষ্য করে সে গণ্ডীবদ্ধ প্রথাগত নিয়মমাফিক জীবনের প্রতি অনীহা অনুভব করে। স্বাধীন ব্যাধ জীবনের প্রচ্ছন্ন মুক্তির চাঞ্চল্য তার মনকে দোলা দিয়ে যায়। তাই সে মনে মনে বলে —

"ব্যাধকে দেখিয়া নীলাম্বর ভাবে মনে।
বৃথাই ইন্দ্রের পুত্র হৈলাঙ অকারণে।।
খুধাএ দুঃখ পাইঞা অরণ্যে বেড়াই।
শিব পূজা না করিলে খাত্যে নাই পাই।।
নীলাম্বর বলে বৃথা ফুল তুলি ফিরি।
ব্যাধ জন্ম হৈলে আমি খাত্যাঙ পশু মারি।।"[১৫৩]

এই মুক্ত ভাবনায় ডুবে থাকায় সে অসচেতনতার কাজ করে বসে। সে শিবপূজার জন্য ছদ্মবেশী দেবীর কীটযুক্ত ফুল তুলে আনে । সেই কীট শিবকে দংশন করে। সে অকপটে ভালো-মন্দ বিচার না করে সহজ সরল ভাবে সত্য কথা বলে। সে কথা শুনে ক্রোধান্বিত শিব তাকে মর্ত্যে ব্যাধগৃহে জন্মাবার অভিশাপ দেয়। শিবের অভিশাপে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। সাধারণ নির্যাতিত অসহায় মানুষগুলি কীভাবে সামান্য ভুলে কঠোর শাস্তি পেত এবং প্রভু বা ক্ষমতাবানের কাছে তারা নত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ত, কিন্তু প্রতিবাদের মুখ খুঁজে পেত না তার উজ্জ্বল প্রতিভূ নীলাম্বর চরিত্র।

অতঃপর অভিশপ্ত নীলাম্বর মর্ত্যে ধর্মকেতু ও নিদয়ার পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে। বাল্যকালে সে অত্যন্ত শক্তিশালী ও পশু-পাখি শিকারে পারদর্শী ছিল। তার পরিচয় এরূপ —

"পানির মদ্ধে উদ্‌ভেলা তাখে বিন্ধে শরে।।
মালসাট মারি ছাইলা হস্তে লোফে শেল।
সরিষা চাপিয়া গায়েত মাখে তেল।।
হাটুয়াত ভাঙ্গে নারিকেল।
মুকুটিয়া ভাঙ্গে বেল।।
ইটা গোটা মারে পড়ে সমুদ্রের পার।
পাথর গোটা মারে পড়ে লঙ্কার দ্বার।।
পুত্রের বিক্রম দেখি পিতার আনন্দ।
বৈরাট নগরে কৈল পুত্রের সমন্ধ।।"[১৫৪]

বিবাহের প্রাক্‌কালে কালকেতু অশিক্ষিত, সংস্কারহীন, বীর ও বর্বর। ক্ষেত্র গুপ্ত মুকুন্দ চক্রবর্তীর কালকেতু সম্বন্ধে যা বলেছেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয় — "কালকেতু বীর শিক্ষা-

সংস্কারহীন বর্বর। এই বর্বরতা তার বীরত্বেরও বিশেষণ।''[১৫৫] ব্যাধ সন্তান রূপে অঙ্কনেই কবির এরূপ বর্ণনা। তার হৃদয়বৃত্তির তুলনায় কবি তাকে শারীরিক শক্তি বিকাশের দিকে মনোযোগী হয়েছেন।

কালকেতুর বীর বিক্রম দেখে পিতা ধর্মকেতু তার বিবাহের ব্যবস্থা করে। স্বর্ণকেতুর কন্যা ফুল্লরার সঙ্গে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের স্বল্প পরেই কালকেতু তার পিতা-মাতা এবং শ্বশুর-শাশুড়িকে হারায়। কবি এখানে ব্যাধ কালকেতুকে সংসারী ও দায়িত্বের মধ্যে ঠেলে দেন। শুরু হয় কালকেতুর দাম্পত্য জীবন। সে পশুপাখি শিকার করে। শিকারজীবী কালকেতু পশু পাওয়ার জন্য দেবী চণ্ডীর চরণপদ স্মরণ করে গৃহ থেকে বের হয়। চণ্ডীর সঙ্গে তার মধ্যে সমকালীন রামভক্তিও লক্ষ্য করা যায়। শিকারে এসে কালকেতু একান্তে বসে রাম নাম গান করে।

''পঞ্চম আলাপিআ রাম নাম গান করে
হরিনি মঙ্গল শোনে।।''[১৫৬]

রাম নামের শুভ বা মঙ্গল গান শুনে হরিণী মোহিত হয় এবং কালকেতু তাকে শরবিদ্ধ করে। হরিণীর করুণ অবস্থা দেখে তার চিত্ত আকুল হয় এবং সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। সে কান্না করে বলে—

''ছাড় জাউক মোর ই শর সন্ধানে
ছার জাউক দক্ষিন হস্তে।
আমি কি জানিব পণ্ডিত হরিনি
বজ্র পড়ুক মোর মাথে।।''[১৫৭]

হরিণীর দুঃখে সে সমব্যথী। তার চরিত্রের বীর বিক্রমের পরিচয় থাকলেও সে অপরের দুঃখ কষ্টকে অতিক্রম করতে পারে নি। এখানে কালকেতু চরিত্রটি অত্যন্ত মানবিক গুণসম্পন্ন।

সে শিকারের মাংস ফুল্লরাকে বাজারে বিক্রি করার জন্য আদেশ দেয়। ফুল্লরা তাদের দাম্পত্য জীবনে অভাব অনটনের জন্য কালকেতুকে দোষারোপ করে। তা শুনে সে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করেছে। সে আবেগপ্রবণ। ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার বীরত্ব ও আত্মশক্তির পরিচয় দেয় নি। বরং স্ত্রীর কথায় সে প্রেরণা শক্তি হারিয়েছে। ফুল্লরা তাকে বলে —

''প্রভু পুরূস হয় না হইয় কাতর।
পুরূস কাতর জারা স্ত্রিয় বিদায় দেয় তারা
ফুলুরা জাইবে অন্যতর।।''[১৫৮]

এই কথা শুনে কালকেতু শিকারে বের হয়। পশুরা তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেবী চণ্ডীর শরণাপন্ন হয়। পশুদের রক্ষার জন্য দেবী গোধিকার ছদ্মবেশ ধারণ করে। গোধিকা বন্ধন করে

কালকেতু ‘ধনিয়া ডাঙ্গা’য় আসে। সেখানে বেরনিয়া বা ‘বেরনিঞা’ নামে এক কাষ্ঠবিক্রেতার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। নিজেকে ঊর্দ্ধে প্রকাশ করার জন্য কালকেতু তার অধিক উপার্জন এবং বীরত্বের আত্মঅহমিকা প্রকাশ করেছে। সে তাকে তার কর্ম এবং উপার্জনের পরিমাণ জিজ্ঞাসা করে। তার দেড়বুড়ি কড়ি প্রতিদিন উপার্জন শুনে কালকেতুর লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায়। কবির ভাষায় —

“এতেক শুনিয়া বীর হেট কৈল মাথা।
ধরিআ দিলেন কোল তুমি আমার মিতা।।”[১৫৯]

মুখলজ্জা নিবারণের জন্য সে তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে চেয়েছে। তবুও সে বলে তাকে পিছনেই নিয়েছে। কালকেতুর মতো বীর চরিত্রে কবি মধ্যবিত্তের স্বভাব লক্ষণটির সন্নিবেশ ঘটিয়েছে। তাই কালকেতুকে মধ্যবিত্ত মানসিকতার চরিত্র বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

অন্যদিকে, শক্তিশালী বীর কালকেতুর ভোজনরসিকতা অত্যন্ত উপভোগ্য বিষয়। বিত্তহীন, অভাবের দাম্পত্য জীবনে কালকেতুর ভোজন অসংগতি বলে মনে হয়। কবি হয়তো দুঃখ, অভাব ক্লীষ্ট ব্যাধ জীবনে কল্পনার স্বর্গ রচনা করার উদ্দেশ্যেই এইরূপ ভোজন রসিকতা করেছেন। কালকেতুর ভোজন বর্ণনায় মানিক দত্ত লিখেছেন —

“আম্বানি খাইতে প্রভু তোর থাকে সাদ।
কাটিআ আনহ খুদিআ মাণের পাত।।
খুদিআ মাণের পত্র আনিল কাটিআ।
সাত হাড়ি আম্বানি দিলেন ঢালিআ।।
পত্রে না রয় আম্বানি গড়াগড়ি জায়।
*　　*　　*
ছয় বুড়ি কুচিলা খাইল নয় বুড়ি ধুতুরা।
আড়িতে মাপিআ খাইল জটিয়া ভাঙ্গের গুড়া।।”[১৬০]

অতঃপর কালকেতু পশুশিকারে বের হয়। সেখানে দেবী তাকে চোখে ধুলো ছুঁড়ে মারলে কালকেতু চোখে কোন পশু দেখতে পায় না। এদিকে ফুল্লরা তার প্রতি প্রত্যাশা নিয়ে ঘরে অপেক্ষা করে। এরূপ সংকটাবস্থায় কালকেতু আত্মজিজ্ঞাসায় অধীর হয়ে পড়ে।

“আওাশে বসিয়া মহাবীর কান্দে তরুতলে।
না পাইয়া বনের মৃগ ঘরে জাব কুন ছলে।।
আমার ইষ্ট নাই কুটুম্ব নাই জে তারে পদার্থিব।

কড়াকের সম্বল নাই জে ঘরে বসিয়া খাব।।''[১৬১]

তার দুঃখে চণ্ডী গোধিকা রূপে ধরা দেয়। সে গোধিকা নিয়ে গৃহে ফিরে এবং ফুল্লরাকে রন্ধন করতে বলে সে স্নানে যায়। এদিকে দেবী গোধিকা থেকে ষোড়শী রমণীতে পরিণত হয়। তাকে দেখে ফুল্লরা কালকেতুর সম্মুখে সেই রমণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। তখন কালকেতু অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় ফুল্লরাকে বলে —

''না দেখাইতে পার জদি মোর বিদ্যমান।

চিড়াইড়ে কাটিব তোর নাক আর কান।।''[১৬২]

তার মধ্যে রোমান্টিকতার লেশ মাত্রও নেই। সে গৃহে দেবীকে দেখে বিনয়ের সঙ্গে বিদায় দিতে চায়। সে যেমন স্ত্রী জাতীর মান-সম্মান সম্পর্কে সচেতন তেমনি রাজদণ্ড হবার আশঙ্কায় চিন্তিত। তা সত্ত্বেও দেবী তার গৃহ ত্যাগ করতে নারাজ। তখন ব্যাধ কালকেতু উগ্র ক্রোধবশত দেবীকে বাণ মারতে উদ্ধত হয়। কিন্তু দেবীর মায়ায় সে ব্যর্থ হয়।

সুতরাং সংসারী কালকেতু শিকারজীবী ও বীর। তার সমস্ত কার্য ও চারিত্রিক গুণাবলী ব্যাধজীবনকে ঘিরেই অতিবাহিত হয়েছে। তার ফলে চরিত্রটি ব্যাধ জীবনের ফটোগ্রাফী হয়েছে, জীবন্ত হয়ে ওঠেনি। প্রসঙ্গত, আশুতোষ ভট্টাচার্য মুকুন্দ চক্রবর্তীর কালকেতু চরিত্র সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয় — ''সে বীর, কিন্তু বীরত্ব তাহার কৃত্রিম অনুশীলনের বিষয় ছিল না, ইহা তাহার সহজাত গুণ মাত্র ছিল। সেইজন্য বীরত্ব সম্পর্কিত কোনও সমাজ-নির্দিষ্ট আদর্শকে সে স্বীকার করে নাই, এই বিষয়ে সে তাহার জন্ম-সংস্কারকেই অনুসরণ করিয়াছে।''[১৬৩]

এরপর কালকেতুর দেবী কর্তৃক ধনলাভ। দেবী প্রদত্ত অঙ্গুরী পেয়ে সে হতভম্ব। অভাবনীয় অতিমূল্যের দ্রব্য ভারে তার বাক্‌রুদ্ধ হয়েছে। সাধারণ দরিদ্র ব্যাধের পক্ষে এরূপ অবস্থা হওয়াই স্বাভাবিক।

''অঙ্গুরি লইয়া বীর নাড়ে আর চাড়ে।

ভয়ে কালকেতু তবে রাও নাই কাড়ে।।''[১৬৪]

দেবী তাকে ধন দিতে চাইলে ফুল্লরা তাতে বারণ করে। তখন কালকেতুর সহজ সরল লোভী মানুষটি ভিতর থেকে জেগে উঠে। পরক্ষণে আবার নিজেকে সংযত করে নিয়েছে। তার মধ্যে সমাজ ভয় জাগ্রত হয়।

''ধনের কারণে লোকে ঠগাই করিবে

রাজ স্থানে করিবে গোহারি।।''[১৬৫]

স্বার্থপর, বিবেকহীন মানুষের দ্বারা কালকেতুর মত সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত ঠকেছে তার প্রমাণ

এই উক্তিটি। সেই সঙ্গে কালকেতুর দোলাচল মনেরও পরিচয় পাই। এখানে তাকে রক্ত মাংসের জীবন্ত চরিত্র বলে মনে হয়।

দেবীর ধন লাভ করেও কালকেতুর মধ্যে তার নিজস্ব জীবিকা সম্বন্ধে ভালোবাসা কমে না। দেবীর সাত ঘড়া ধনের সমান তার একটি মৃগ — একথা সে দেবীর সম্মুখে বলেছে। তার কাছে ধনের তুলনায় শিকারের মূল্য অনেক বেশি। অতঃপর সে দেবীর ধন নিয়েছে এবং সে দেবীকে তা বহন করতে দিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছে। তবে তার সঙ্গে ছিল ব্যাধসুলভ ক্রোধ।

''কালকেতু বীর তবে বলে ক্রোধ হৈয়া।
আমার ধন লইয়া জদি জাও পলাইয়া।।
পুন কালকেতু বলে ভবানীর তরে।
পিতার উম্মরের ধন পাইলাঙ এতকালে।।
* * *
আগু২ জায়ে বীর পাছু পানে চায়ে।
ধনঘড়া লইয়া পাছে ভবানী পলায়ে।।''[১৬৬]

এখানে কালকেতু রুক্ষ, অহংকারী ও সন্দেহপরায়ণ চরিত্র।

ধন লাভ করে কালকেতু গুজরাট নগরের রাজা হয়। তার একমাত্র প্রতিপক্ষ কলিঙ্গ রাজা সুরথ। সে অন্যের সাহায্যে যুদ্ধ জয় করতে চায়নি। তার কাছে অন্যের সাহায্যে যুদ্ধে জয় লাভ করা পরাজয়ের সামিল। তাই কলিঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধের সময় দেবী তাকে রক্ষা করলেও কালকেতু নিজের শক্তি পরখ করতে চেয়েছে। সে বলে —

''তিন দ্বার জিনিলাম দুর্গার বাহুবলে।।
আপনার বল কিছু না বুঝি আপনি।
কত কাল আমার শএ থাকিবে ভবানী।।''[১৬৭]

এখানে কালকেতু আত্মশক্তি জাগ্রত করতে এবং স্বাবলম্বী হতে চেয়েছে। তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের দিকটি তার চরিত্রে একীভূত হয়ে গেছে। সে কলিঙ্গরাজ সুরথকে পরাজিত করে গুজরাট নগর পত্তন করে। তার মত ব্যাধের পক্ষে সমাজ বর্হিভূত গুজরাট নগরের রাজা হওয়া স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে, অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন — ''... দেবী কলিঙ্গরাজের কাছ থেকে পরাজিত শত্রু কালকেতুর প্রতি সম্মাননা এবং স্বীকৃতি আদায় করে নিলেও সমাজ-সংস্থায় তার স্থান স্বীকৃত হয়নি; তাকে গুজরাটের বনেই প্রত্যাবর্তন করতে হলো। ... প্রচলিত সমাজে তখনও সে আসন লাভ করেনি। তার সামাজিক সম্মাননা বা স্বীকৃতি কিছুই নেই। সমাজে অধিষ্ঠান তখন তার নিকট দুরাশা। অরণ্যের মুক্ত পরিবেশে তার আদর্শ রাজ্য ও সমাজ; সেখানকার নিয়মকানুন দিয়ে কলিঙ্গ প্রভাবিত

হবে না, অথবা কলিঙ্গের প্রভাবও গুজরাটে অনুভূত হবে না। পারস্পরিক সম্পর্কের এই সমাধান কলিঙ্গের দিক থেকে শ্রেয়।''[১৬৮] দেবী শরণে পরাজিত সুরথ কর্তৃক কালকেতু বন্দী হয়। অতঃপর সে দেবী কর্তৃক বন্দীত্ব থেকে উদ্ধার হয়। কালকেতু ভাঁড়ুর প্ররোচনা অনুধাবন করে। তাই কালকেতুর অসৎ, মিথ্যাবাদীদের বিরোধিতা আপাত অর্থে ভাঁড়ুর প্রতি হলেও প্রচ্ছন্ন ভাবে দেবীর প্রতিই অঙ্গুলী নির্দেশ করে। কেননা, কালকেতু বারবার দেবীর উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে তার জীবিকাকে অবলম্বন করে শান্তিতে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। কালকেতু রাজদরবারে অপমানিত হলে ক্রুদ্ধ ভাঁড়ু দত্ত সকলের সম্মুখে কালকেতুর পূর্ব জীবনের জীবিকা ও জন্ম সূত্র তুলে ধরে। কালকেতু ভাঁড়ুর মুখে চরম সত্য কথা শুনে কোন কথাই বলে না। কারণ ভাঁড়ুর বিরোধিতা করলে 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ উঠতে পারে' সেই ভয়ে সে স্তব্ধ হয়ে যায়। আজ তার হঠাৎ রাজা হওয়ার কারণ ও তার বংশ মর্যাদা অজ্ঞাত প্রজাদের সামনে উন্মুক্ত হলে প্রজা সকল তাকে রাজা বলে মানবে না। তাই কালকেতু ভাঁড়ুকে অধম অপবাদ দিয়ে নিজের সাময়িক দ্বন্দ্ব, আচমকা কেঁপে ওঠা মনকে সান্ত্বনা দিয়েছে মাত্র। অতঃপর ভাঁড়ুর সঙ্গে কলিঙ্গ সৈন্য তাকে বন্দী করে নিয়ে যেতে এসেছে। সেই সময় ফুল্লরার নির্বুদ্ধিতায় কালকেতু বন্দী হয়। কিন্তু সে বল বিক্রমের পরিচয় অক্ষুন্ন রেখেছিল। এখানে কালকেতু বুদ্ধিবলের তুলনায় দেহ বলই বড় হয়ে উঠেছে। সুতরাং গুজরাট রাজা কালকেতু দেবীর দ্বারা পরিচালিত ও নির্দেশ পালনকারী চরিত্র। তবে তার মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বীজ সুপ্ত ছিল। চণ্ডীকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে সে একটু ম্লান হয়ে পড়েছে। তাই মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে রাজা কালকেতুর ক্ষত্রিয় গুণ নেই, বরং ব্যাধ রক্ত তার মধ্যে সর্বত্র বহমান তার বহিঃপ্রকাশ দেখি রাজা কালকেতুর মধ্যে। প্রসঙ্গত, আশুতোষ ভট্টাচার্য মুকুন্দ চক্রবর্তীর কালকেতু সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা মানিক দত্তের কালকেতু চরিত্র সম্বন্ধেও প্রণিধানযোগ্য — ''আর্য বা ক্ষাত্র বীরত্বের আদর্শ ও অনার্য বীরত্বের আদর্শ এক নহে। ... সে অনার্য, সুতরাং তাহার বীরত্ব কাপুরুষতামিশ্র, আত্মরক্ষার ধর্ম তাহার জীবনধর্ম।''[১৬৯] কালকেতুকে রাজা রূপে অঙ্কন করেও মনোবৃত্তির দিক থেকে সে ব্যাধই রয়ে গেল।

রাজ্য ত্যাগের পর কালকেতুর মধ্যে পিতৃসত্তা জাগ্রত হয়। এই সত্তা এতদিন সুপ্ত ছিল। ভাঁড়ু দত্তের আঁটকুড়া অপবাদের প্রতিক্রিয়ায় তার এই সত্তার জাগরণ। সে আত্মদ্বন্দ্বের জ্বালায় বলে —

''কোন ছাড় দত্ত ভাড়ুয়া নাবড়   সে মোকে আটকুর বোলে
এত দুঃখ না সয় শরীরে।''[১৭০]

কালকেতুর এই প্রতিক্রিয়া তাকে জীবন্ত মানুষে পরিণত করেছে।

এইরূপ ব্যাধ খণ্ডের প্রধান নারী চরিত্র **ফুল্লরা**। সুকুমার সেন বলেছেন 'ফুল্লরা' নামটি

''সরাসরি অপভ্রংশ-অবহট্ট হইতে আগত। ফুল্লরার সহিত আধুনিক বাঙ্গালা হিন্দী হইতে আগত (?) 'ফুলুরি' ও 'ফুলেল' সংপৃক্ত।''[১৭১] ফুল্লরার অর্থ হতে পারে এই রকম। 'ফুল্ল' অর্থাৎ প্রস্ফুটিত পুষ্প। প্রফুল্ল, প্রসন্ন অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'রা' বিশেষণ ফুলের মালা। সব মিলিয়ে বিকশিত পুষ্পদামের ন্যায় প্রফুল্ল নারী। প্রেম ও সৌন্দর্য তার জীবন। সেই-ই ফুল্লরা। তার স্বামী এবং মাতা-পিতা ব্যাধ শ্রেণীর। তার এই ফুল্লরা নামের পেছনে ব্যাধ জীবনের প্রসঙ্গটি অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত, প্রথম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ফুল্লরা শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে — ''ফুল্লরা — ফুল্ল (= প্রফুল্ল = স্পষ্ট) রা (= রব) যাহার — মাংস বিক্রিয়ার্থ পাড়ায় পাড়ায় দীর্ঘস্বরে চীৎকার করিবার জন্য ব্যাধকামিনীর উচ্চস্বর থাকা গুণাবহ ভিন্ন স-দোষ বোধ হয় না, সুতরাং ফুল্লরা নাম নিরর্থক নহে।''[১৭২] এই ধরনের নিম্ন অন্ত্যজ শ্রেণীর নারী ফুল্লরার চরিত্রে কবি মানিক দত্ত সামাজিক কুপ্রথার সমস্যা ও মাঝে মাঝে পৌরাণিক প্রসঙ্গ তার মুখে তুলে ধরেছেন। মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের ব্যাধ খণ্ডের প্রধান নারী চরিত্র ফুল্লরাকে সতীন সমস্যার পটভূমিকায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাতে তার ব্যাধ জীবনের দুঃখ, স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও সৌন্দর্যময়ী রূপটি প্রকাশ পেয়েছে।

মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের ফুল্লরা চরিত্রকে কাহিনী ধারা অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব। প্রথমত, ষোড়শী কন্যারূপী দেবী চণ্ডীর আসার পূর্বে ফুল্লরা চরিত্র; দ্বিতীয়ত, ছদ্মবেশী দেবীর আগমনে ফুল্লরা চরিত্র; তৃতীয়ত, ধন লাভের পর ফুল্লরা চরিত্র।

মানিক দত্তের ফুল্লরা নিশানকেতু ও দয়াবতীর কন্যা। কালকেতুর সঙ্গে তার বাল্য বয়সে বিবাহ হয়। সে খুবই সুন্দরী। দাম্পত্য জীবনে তার এই রূপই 'আপনা মাংসে আপনে বৈরী' হয়ে দাঁড়ায়। কালকেতু শিকার করে যে মাংস আনে তা তাকে শ্রীকলার বাজারে বিক্রি করতে বাইরে বেরোতে হয়। তার মত সুন্দরী রমণী বাইরে বেরোলে কীরূপ অশ্লীল ও অশালীন আচরণ সহ্য করতে হয়, তা ফুল্লরার কথায় বোঝা যায়। সে বলেছে —

''মাথায় মাংসের ডালি   নগর বাজারে জাব
কম্পিত হৈবে মহাজন।।
*   *   *
মাথায়ে মাংসের ডালি   বেড়াইমো বাড়ি বাড়ি
লোকে ব্যাধিনি কহিবে আমারে।।''[১৭৩]

লোকে তাকে 'ব্যাধিনি' বলুক এটা সে সহ্য করতে পারে না। তার আত্মসম্মানে ঘা লাগে। তাই সে বাজারে মাংস বিক্রি করতে নারাজ। কিন্তু অভাবের সংসারে তাকে বেরোতেই হবে। সে নিজের ভাগ্যের প্রতি দোষারূপ করে বলেছে —

"দ্বারেত বসিয়া কান্দে রামা ফুলুরা
কি আছিল অভাগির কপালে।
কেমন বিধাতা মোরে জনম লভাইল
দুষ্ট অক্ষটির ঘরে।"[১৭৪]

বাল্য বয়সে পিতা-মাতাকে হারিয়ে অসহায় ফুল্লরার একমাত্র অবলম্বন হয়েছে স্বামী কালকেতু। সেই সংসারেও দারিদ্রের অভাব নেই। সেই অবস্থায় ফুল্লরা নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে ক্রন্দনে ভেঙে পড়েছে। সেই সঙ্গে সমাজে নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ জাতির উপর উচ্চশ্রেণীর অবহেলার দিকটি ফুল্লরার কথায় সুপ্ত রয়েছে।

ফুল্লরার দাম্পত্য জীবনে ঘনিয়ে আসে ভাগ্যের পরিহাস। সে বাধ্য হয় বাজারে মাংস বিক্রী করতে। সেখানে ফুল্লরা দেবী চণ্ডীর ছলনার শিকার হয়। দেবীর ছলনায় ফুল্লরার সকল মাংস চিলে ভক্ষণ করে। তার ফলে সে ভাগ্যের প্রতি আক্ষেপ করে কালকেতুর সামনে ক্রন্দনে ভেঙে পড়ে। কালকেতুও স্ত্রীর দুঃখে সমবেত হয়েছে। কালকেতু তার অভাবের সংসারের কথা বলে আত্মধিক্কার দেয়। তখন স্বামীকে সে আশ্বাসবাণী শুনায়।

"প্রভু পুরূসের দশ দশা কখন গরিব কখন রাজা
কখন হৈতে পারে দণ্ডের মদন।
পৃথিবীতে ঝড় হয় সেহ কতক্ষন রয়
দুখ সুখ প্রভু পূর্ব্বেকার ভজন।।"[১৭৫]

ফুল্লরা দারিদ্রের দুঃখে নতোদর হলেও কালকেতুর মত ভেঙে পড়েনি। বরং সে মনে আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করেছে। দুর্বল চিত্ত স্বামী কালকেতুর মনে পুরুষত্বের সঞ্চার করার জন্য উদ্দীপনা যোগায়। দুঃখ-সুখ ও অর্থ জীবনে পরিবর্তনশীল। আজ তারা আর্থিক দিক থেকে দুর্বল। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। এই চিরন্তন বিশ্বাসে আত্মস্থ ফুল্লরা। নিম্নশ্রেণীর নারী ফুল্লরার এই প্রত্যয় তাকে কিছুটা আধুনিক নারীতে পরিণত করেছে, বললে অত্যুক্তি হবে না।

ফুল্লরার মধ্যে ঐতিহ্যবাহী বাঙালি গৃহবধূর রূপটি মুছে যায়নি। সে পতিপরায়না নারী। স্বামী কালকেতু শিকার করে গৃহে ফিরলে তাঁর চরণ জল দিয়ে ধুয়ে দেয়। কবির কথায় —

"আপনার গৃহে বীর দিল দরশন।
ফুল্লরা আসিয়া বীরের ধোয়াইল চরণ।।"[১৭৬]

তাদের অভাবের সংসারে একটি গোধিকাই রন্ধনের সম্বল। গোধিকা শিকারে ক্লান্ত স্বামী কালকেতু স্ত্রী ফুল্লরাকে তা দিয়ে স্নানে যায়। কিন্তু ফুল্লরা গৃহ থেকে বেরিয়ে কোন গোধিকা না দেখতে পেয়ে দুশ্চিন্তায় তার হৃদয় ভরে ওঠে। ক্ষুধার্ত কালকেতু স্নান করে খাবার না পেলে তাকে প্রহার করতে

বিবেচনা করবে না। কারণ ফুল্লরা তার স্বামী সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত যে, সে যুক্তি বুদ্ধির অতীত। তাই গোধিকা স্থানে ষোড়শী নারীকে দেখে মনে মনে ভীত হয়ে বলেছে —

"আমার প্রভু মূঢ়মতি নাহি তার সুবুদ্ধি
দৈবে আজি মারিবে কিলিয়া।।"[১৭৭]

তার মনে হয়েছে গৃহের আগন্তুক ষোড়শী নারীই গোধিকা ছেড়ে দিয়েছে। সেই ষোড়শী নারীকে সতীন ভেবে যে দুশ্চিন্তা তার তুলনায় ফুল্লরার মনে সংসারের অভাব, অনটন ও স্বামী নির্যাতনই বড় হয়ে উঠেছে। এইরূপ সংসারে দেবীকে দেখে ফুল্লরা তাকে বলে —

"ওহে দেবী সুন্দরী রামা ত্রিভুবনে অনুপামা
কেনে আইলা বীরের বাসরে।
জীবনের না পাইবে সুখ মরণের অধিক দুখ
বড় দুখ অক্ষটির ঘরে।।"[১৭৮]

এই অবস্থায় ফুল্লরা নিরুপায়। সে সঠিক উপায় নিরসনের জন্য দৌড়ে অভিজ্ঞ বৃদ্ধা মাসীর কাছে উপস্থিত হয়। কারণ সেই এই কঠিন অবস্থায় সঠিক উত্তরণের পথের সন্ধান দিতে পারে। ফুল্লরা তার মতানুসারে কালকেতুর অনুপস্থিতিতে ষোড়শী কন্যাকে ঝগড়া করে বিদায় করতে উদ্ধত হয়েছে। তবে মানিক দত্তের ফুল্লরা মুকুন্দ চক্রবর্তীর ফুল্লরার মত তৎক্ষণাৎ সতীনকে বিতাড়িত করার জন্য পদক্ষেপ নেয় না। তার কাছে অভাব, অনটন ও নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ জাতির হীন অবস্থা বড় হয়ে উঠেছে। ব্যাধিনী হয়ে মাংস বিক্রি করা কতটা সমাজের কাছে আত্মমর্যাদা নাশক ও লজ্জার কাজ সেটাই ফুল্লরা দেবীকে বলে। কিন্তু এসকল কথায় দেবী অটল। তখন ফুল্লরা নতুন কৌশল ফাঁদে। ফুল্লরা তার রূপের পুঙ্ক্ষাণুপঙ্ক্ষ বিশ্লেষণ করে এবং কুল ঘাতিনীর সামাজিক ভয় দেখায়। আবার দেবীকে তাদের দাম্পত্য জীবনে অনুপ্রবেশ থেকে নিরত রাখতে সংসারের অন্নাভাবের ভয় দেখায় এবং স্বামী কালকেতুকে দেবীর সম্মুখে দুশ্চরিত্র রূপে প্রতিপন্ন করে। কিন্তু সমস্ত কিছু শুনেও দেবী চলে যেতে অসম্মতি প্রকাশ করে। দেবী ফুল্লরাকে বলেছে যে, সে পুত্রের কারণে এখানে এসেছে। ফুল্লরার স্বামী কালকেতুই দেবীকে শর্ত করে গৃহে এনেছে। গৃহে দেবী তার দুই পুত্রকে নিয়ে আনন্দে থাকবে এবং ফুল্লরা তার দাসীবৃত্তি করবে। তাদের খাবার পর উচ্ছিষ্টাংশ সে পাবে। এমনকি, গরমে তাকে বাতাস করে দিবে। একথা শুনে তার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে। এবং দেবী তার দাম্পত্য জীবনের অক্ষমতা ও দুর্বলতায় আঘাত করে। দাম্পত্য জীবনে নারীর সন্তানহীনতা কতটা দুঃখের তা ফুল্লরার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে। ফুল্লরা তাকে বলেছে —

"আটকুড়ার পাতিলকে দোষ না দিহ সুন্দরি।।

এত বলি গালি পাড়ে জত মনে আইসে।''[১৭৯]

অভাবের দাম্পত্য জীবনে একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ স্বামী কালকেতুকে হারানোর আশঙ্কায় ফুল্লরা নিজেকে সংযত রাখতে পারেনি। গ্রাম্য গৃহবধূদের মত দেবীর সঙ্গে অসংযমী ও অশ্লীল আচরণ করেছে। তার ফলে দেবী তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, ব্যতিব্যস্ত হলে সে নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে। এইরূপ অবস্থায় ফুল্লরা তার 'বারমাস্যা' বা বারমাসের দুঃখ কাহিনী বলতে শুরু করে। মানিক দত্তের ফুল্লরার বারমাস্যার দুঃখ সমস্তটাই কালকেতু কেন্দ্রিক। স্বামীর জন্য তাকে কতটা কষ্ট সহ্য করতে হয় তার প্রমাণ ফুল্লরার বারমাস্যা। শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য সঙ্গত কারণেই বলেছেন — ''নারীর নিজস্ব স্মৃতির করুণরসে ঝঙ্কৃত, দুঃখময় জীবন অনুভব আশঙ্কায় আতঙ্কিত, মর্মরদাহের উষ্মতা নির্জন সন্ধ্যায় একমাত্র বীণাঝংকারের করুণতা, সবুজ অন্তরের সজীবতা এতে রূপায়িত।''[১৮০] মানিক দত্তের ফুল্লরা তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে দাম্পত্য জীবনের অবহেলার দিকটি রূপায়ণের সাক্ষ্য। তবে তার মধ্যে দাম্পত্য জীবনে সতীনের অনুপ্রবেশে স্বতঃস্ফূর্ত আশঙ্কার অভিব্যক্তি ও সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি লক্ষ্য করা যায় না।

এরপর দেবী চণ্ডী কালকেতুকে ধন দানের ইচ্ছা প্রকাশ করে। ফুল্লরা কালকেতুকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। এই ধনের কারণে দেবী কর্তৃক বিড়ম্বনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে দেবী তার অঙ্গুরীর দাম সাতকোটি টাকা বললে সে মুখ বাঁকা করে। তার মত নিম্ন শ্রেণীর ব্যাধ রমণীর কাছে অঙ্গুরীর মূল্য সত্যিই অজ্ঞাত থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেবী কর্তৃক সাত ঘড়া ধন প্রাপ্ত হয়ে ফুল্লরার লোভ জাগ্রত হয়। এবং দেবী চণ্ডীকে বিদায় দিতে অসম্মতির চূড়ান্ত প্রকাশ করে। এমনকি দেবী সম্পর্কে তার পূর্ব আচরণের জন্য লজ্জা বোধ করেছে। তার কাছে প্রাণের তুলনায় ধনদাত্রী দেবীর মূল্য তার জীবনের অধিক। তার ভাবনার পরিবর্তন কবি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন —

''হেট মুণ্ডে কথা কহে ফুলরা সুন্দরী
প্রাণ চাহ তাহা দেই বিদায় দিতে নারি।।''[১৮১]

দেবী সম্পর্কে ভাবনার পরিবর্তন তাকে সাধারণ নিম্নশ্রেণীর ব্যাধিনী নারী রূপে জীবন্ত করে তুলেছে। মানিক দত্তের ফুল্লরার কাছে সতীন সমস্যার তুলনায় তার অর্থের প্রতি লোভটাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। অতঃপর কালকেতু গুজরাট রাজ্যের অধিকর্তা এবং তার স্ত্রী ফুল্লরা তার অধিকর্ত্রী হয়। তারা অন্দরমহলে পাশা খেলে। কিন্তু তাদের এই সুখের দাম্পত্য জীবনে পুনরায় বিপদের মেঘ ঘনিয়ে আসে। কলিঙ্গ রাজের দ্বারা আক্রান্ত কালকেতু সঙ্কটাপন্ন দেখে সে অনাথ হওয়ার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছে। তার জীবন ও জগতের উপর অগাধ মায়া। সে এই মানব জন্মকে কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করে নাশ করতে অনিচ্ছুক। এই অবস্থায় ফুল্লরার জীবনে উভয়

সঙ্কট। তার ভাবনাও দ্বিধান্বিত। একবার তার মনে হয়েছে কলিঙ্গ রাজের কাছে আত্মসমর্পণ করে ভেট নিয়ে উপস্থিত হতে। আবার কখন কালকেতুকে পলায়ণপর হতে বলেছে। সে তার স্বামীকে বিপদের মুখে উত্তরণের সাহস যোগায়নি। বরং তার মনকে এই সঙ্কটাবস্থায় দুর্বল করেছে। সে স্বামী কালকেতুকে বলেছে —

"উহার পাইক সকল অস্ত্র ধরে।।

রাজাকে ভেটিতে চল নহে পালাও

ফুলুরার বচনে।।"[১৮২]

গুজরাট অধিকর্ত্রী ফুল্লরার মধ্যে এই দুর্বল চিত্তের প্রকাশ বেমানান বলে মনে হয়। লোভ জনিত কারণে স্বামীর সংঙ্কটাপন্ন অবস্থা লক্ষ্য করে নিম্নশ্রেণীর বাঙালী রমণীর মতো ফুল্লরা আত্মধিক্কারে ভেঙে পড়ে। কারণ স্বামী কালকেতু ছাড়া তার জীবন অভিভাবকহীন। নববিবাহিত সুন্দর যুবতী নারী ফুল্লরার জীবন সমাজে অসহায় ও আশ্রয়হীন। তাই সে স্বামীকে বলে —

"ধনের কারণে প্রভু হারাইলে প্রাণে।

য়নাথিনী করিলেক ফুলুরা অভাগিনে।।

পিতা কুলে শশুর কুলে কেহু নাহি আমারে।

এই রূপ জৌবন লইয়া জাব কথাকারে।।"[১৮৩]

মানিক দত্তের ফুল্লরা এই স্থানে অত্যন্ত দুর্বল, ভীতু ও নিরূপায় চরিত্র। ফুল্লরা স্বামীর প্রতি চিন্তার তুলনায় নিজের আত্মরক্ষার চিন্তায় বেশি ব্যাকুল। নিম্নশ্রেণীর সুন্দরী ব্যাধ নারীর সমাজে আত্মসম্মান টিকিয়ে রাখা কঠিন। অন্যদিকে, তার রয়েছে একমাত্র অভিভাবক স্বামীকে হারানোর দুঃশ্চিন্তা। তার চরিত্রের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগে নারীর অভিভাবকত্বহীন অবস্থায় শ্লীলতাহানীর আভাসও পাওয়া যায়।

নিম্নশ্রেণীর ব্যাধরমণী ফুল্লরার সহজ, সরল, নির্বোধ কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সে ভাঁড়ু দত্তের চতুরতা বুঝতে পারেনি। যুদ্ধে কলিঙ্গরাজের জয় হয়েছে। ভাঁড়ু দত্ত কলিঙ্গ রাজের হয়ে আত্মগোপনকারী কালকেতুতে গুজরাট রাজদরবারে ধরতে এসেছে। ফুল্লরা তার স্বল্প বুদ্ধির দ্বারা ভাঁড়ু দত্তের গোপন অভিসন্ধি উপলব্ধি করতে পারেনি। ভাঁড়ু দত্ত ফুল্লরার সম্মুখে অত্যন্ত তোষামদের সঙ্গে পুনরায় কলিঙ্গ রাজ্য ভাঙবার এবং কলিঙ্গ রাজ কর্তৃক খাজনা প্রেরণের প্রতিশ্রুতি শোনায়। তাতে ফুল্লরার মন সহজেই টলে। অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে ফুল্লরা ভাঁড়ু দত্তের চক্রান্তে পা দেয়। সে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে ভাঁড়ু দত্তের চক্রান্ত বিচার করেনি। সে দুর্বল চিত্তের ব্যাধ রমণী। তাই সে আত্মগোপনকারী কালকেতুকে দেখিয়ে দিয়েছে।

"সুবুদ্ধি ছিল ফুলরার কুবুদ্ধি পাইল।

ঘরে ছিল কালকেতু দেখাইয়া দিল।।''[১৮৪]

বন্দী স্বামীর জন্য ফুল্লরা ব্যাকুল চিত্তে অনাথিনী নারীর ন্যায় গৃহ-দ্বারে বসে থাকে। সে ব্রাহ্মণের পা ধরে কাতর আকূতি জানায়। সামাজিক দিক থেকে নিম্নশ্রেণীর অন্ত্যজ ফুল্লরা অনুভব করেছিল যে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণই তার স্বামী উদ্ধারের একমাত্র পন্থা। কিন্তু ফুল্লরার তাকে আর প্রয়োজন হয়নি। দেবী কর্তৃক তার স্বামী বন্দী মুক্ত হয়। তবে ফুল্লরা চরিত্রের দ্বারা রাজদরবারে ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর আধিপত্যের স্পষ্ট নিদর্শন মেলে।

শেষে ফুল্লরার দাম্পত্য জীবনে নারীকাঙ্ক্ষিত দিকটি ফুটে উঠেছে। সে সন্তান আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল। তার জন্য রাজ-ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে গঙ্গার তীরে দেবী চণ্ডীর পূজায় দীর্ঘদিন ব্যস্ত থেকেছে। সে দেবী চণ্ডীর ভক্ত। ফুল্লরা তাকে উপবাস থেকে সহৃদয়ে বনফুল দিয়ে পূজা করে। কবি তার বর্ণনা করেছেন এইভাবে —

''ফুলরা অনাহার পূজা করে কতকাল

বন পুষ্প তোলে নিরন্তর।''[১৮৫]

ফুল্লরা কর্তৃক পূজিত দেবী চণ্ডীকে এখানে বনদেবী বলে মনে হয়। নিম্নশ্রেণীর নারী ফুল্লরার সঙ্গে বনদেবী চণ্ডীর সম্পর্ক স্বাভাবিক। মানিক দত্তের ফুল্লরা জীবনাভিজ্ঞতায় পূর্ণ। বাঙালী বধূর ন্যায় সে স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন নারী রূপে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। কিছু তার মধ্যে সীমাবদ্ধতা থাকলেও ব্যাধ রমণী হিসাবে তার চরিত্রটি জীবন্ত।

অন্যদিকে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নানা স্থানে অন্ত্যজ মানুষের জীবন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কবি মানিক দত্ত প্রকট করে তুলেছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে অন্ত্যজ ব্যাধদের সঙ্গে মহাজন এবং অন্য ধরনের উচ্চবিত্ত মানুষের বিষয়টিও 'ব্যাধ খণ্ডে' এসেছে। এই দুই শ্রেণীর চরিত্রের দ্বারা বস্তুনিষ্ঠ জীবন তুলে ধরতে অবকাশ পাওয়া যায়। দুইয়ের দ্বন্দ্ব প্রকটে এবং তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এধরনের অপ্রধান পুরুষ চরিত্র **ভাঁড়ু দত্ত**। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ভাঁড়ু দত্ত উল্লেখযোগ্য চরিত্র। বাংলা মঙ্গলকাব্যে তার তুলনা মেলা ভার। তার চরিত্রের সম্বন্ধে সুকুমার সেন মহাশয় বলেছেন — ''গুজরাটে নবাগত অধিবাসীদের মধ্যে ভাঁড়ু দত্তেরই সুস্পষ্ট এবং কাহিনীর পক্ষে আবশ্যিক ভূমিকা। ... আধুনিক পূর্ব বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন উজ্জ্বল জীবন্ত পাষণ্ড চরিত্র আর নাই।''[১৮৬] ভাঁড়ু দত্ত অনেকটা ভিলেন (Villan) বা খল চরিত্র। সে চণ্ডীমঙ্গলের চরিত্র হয়েও আধুনিক উপন্যাসের চরিত্রের মতো জীবন্ত।

মানিক দত্তের ভাঁড়ু দত্ত কলিঙ্গ রাজ্যের মণ্ডলদের মধ্যে প্রধান। সে শিবের ভক্ত। দেবী চণ্ডীর গুজরাট নগর পত্তন প্রসঙ্গে কলিঙ্গ রাজ্য ভাঙনের পরিকল্পনার মুহূর্তে ভাঁড়ু দত্ত চরিত্রের

কাব্যে আগমন। কলিঙ্গের চারজন মণ্ডল দেবীর মন্ত্রণায় কলিঙ্গ রাজ্য ভাঙবার পরিকল্পনা করলে ভাঁড়ু দত্ত তাদের বাধা দেয়। এই থেকে সে চণ্ডীর পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। শুরু হয় চণ্ডীর সঙ্গে ভাঁড়ু দত্তের লড়াই। ভাঁড়ু দত্ত দেবীর বিপরীত পন্থী চরিত্র। তাকে শায়েস্তা করতে দেবীকে বার বার ইন্দ্রের সভায় যেতে হয়। শেষ পর্যন্ত তাকে বন্যার দ্বারা হেনস্থা করা হয়। তবুও তার নিজের শক্তির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। সে বিপরীত পক্ষের ইন্দ্রকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছে। শিবের প্রতি তার অবিচল বিশ্বাস। তাই সে মৃত্যুকেও ভয় করে না।

> ''পিড়াতে বসিয়া ভাড়ু মালসাট মারে।
> কি করিতে পারে ইন্দ্র পুরন্দরে।।
> শিবকে পূজিয়া আমি হৈয়াছি য়মর।''[১৮৭]

ভাঁড়ু যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সেই দিকেই জল থই থই করছে। ঘর-বাড়ি সমস্ত ভেসে গেলেও সে চণ্ডীর কাছে সহজে হার মানতে চায় না। সে বলেছে — ''তব না পূজিব দেবী সর্ব্বমঙ্গল।।''[১৮৮] শেষ পর্যন্ত চণ্ডীকে সে বাধ্য করেছে গঙ্গার কাছে যেতে। দেবী চণ্ডী গঙ্গার কাছে অপমানিত হয়ে ডাক-ডেউয়ের কাছে উপনীত হতে হয়েছে। তাদের দ্বারা কলিঙ্গে পুনরায় ব্যাপক বন্যা হয়েছে। সেই বন্যায় কলিঙ্গের ছত্রিশ জাতি তাদের বাসভূমি ছেড়ে পলায়নপর হয়। কিন্তু ভাঁড়ু দত্ত তাদের লক্ষ্য করে একাই কলিঙ্গের মণ্ডল হিসাবে থাকতে চেয়েছে। সে পরাক্রমশালী। বিপদে নিজেকে সঁপে দেয়নি। প্রাণপণ বিরূপ অবস্থার সঙ্গে লড়ে চলেছে। সে উঁচু মঞ্চ তৈরী করে তার উপর পিঁড়িতে বসে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করেছে। সেখানেও বন্যা অনুপ্রবেশ করলে ভাঁড়ু দত্ত গৃহে প্রবেশ করে। কিন্তু দেবীর চক্রান্তে গৃহের দেওয়াল ইঁদুর কর্তৃক কাটা হয়। অতঃপর গৃহের সকল পরিজনকে বাঁচানোর জন্য সে মাটির 'উগার' বা উঁচু মাচা তৈরী করে। কবি তার এই জীবন যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে —

> ''মাটি ভাঙ্গিয়া বেটা উগার বান্ধিল।
> সগোষ্ঠি সহিতে ভাড়ু উগারে চড়িল।।''[১৮৯]

ভাঁড়ু দত্ত কেবল নিজের আত্মরক্ষার কথা ভাবেনি। সঙ্কট কালে সে স্বজনের কথাও ভুলে যায়নি। স্বজন ভাবনায় ভাঁড়ু দেবীর কাছে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। সুকুমার সেন মানিক দত্তের ভাঁড়ু দত্ত চরিত্র সম্বন্ধে বলেছেন — ''ভাঁড়ু দত্ত শিবের উপাসক, তাই দুর্গা তাহার উপর বিরূপ। কলিঙ্গ বন্যার বর্ণনায় এই বিরূপতার একটু ইঙ্গিত আছে। মানিকদত্তের রচনায় ভাঁড়ু দত্ত শক্তিমান পুরুষ, একেবারে ভাঁড় নয়।''[১৯০]

এরপর ভাঁড়ু দত্তের গুজরাট নগরে আগমন কলিঙ্গের সকল প্রজাকে সঙ্গে নিয়ে। কালকেতুর সামনে নিজেকে সকলের প্রতিনিধি হিসেবে প্রকাশ করেছে। কিন্তু কালকেতুকে তার রাজা বলতে

আত্মমর্যাদায় বেঁধেছে। তার জাত্যাভিমান প্রবল। সে জাতিতে কায়স্থ। কালকেতু নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ হয়েও গুজরাট নগরের রাজা। নিম্নশ্রেণীর কালকেতুকে তার রাজা বলে সম্বোধন করতে দ্বিধা রয়েছে। সে কালকেতুকে বলেছে —

''বসত করিতে আনিলাম জত প্রজাগণ।।
আমি বসাইয়া দিব প্রজা লোকের তরে।
সুরথ রাজা বান্ধিয়া লবে তারে।।''[১৯১]

তার কথায় রাজা অত্যন্ত খুশি হয়। মানিক দত্তের ভাঁড়ু শঠ, মিথ্যাবাদী ও স্বার্থপর চরিত্র। তার রয়েছে কৌশলী বুদ্ধি ও বাক্যালাপের শঠতা। ভাঁড়ু দত্ত জানে কীভাবে রাজা কালকেতুর মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়। সে কালকেতুর প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা সুরথের নিন্দা করে এবং তার সামনে বলে যে, যারা কলিঙ্গ রাজের বলবিক্রমের প্রশংসা করবে তাদের বন্দী করা হবে। ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুর বলিষ্ঠতার কথা সরাসরি না বলে কলিঙ্গ রাজের দুর্বলতার কথা প্রসঙ্গে আভাসে তা প্রকাশ করেছে। এখানে ভাঁড়ু কালকেতুর মনোগ্রাহী। তাই সে সহজেই কালকেতুর ভালোলাগার বিষয় ধরতে পেরেছে। তাকে রাজ সভায় সম্মাননীয় আসন এবং হংসরাজ ঘোড়া দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

''এমত শুনিয়া রাজা খুসিত অন্তর।
নফরে আনিয়া দিল গাণ্ডিব য়াসন।।
তা সন্ধানে মারি তীর ভেদিল পয়ান।
প্রত্যএ না গেল দত্ত ভাড়ুয়া নাবড়।।''[১৯২]

ভাঁড়ু দত্ত একটি সম্মাননীয় পদেরই অভিলাষী ছিল। সেই উদ্দেশ্যে তীর ছুঁড়লে তা লক্ষ্যভেদ করে। তাই তার প্রত্যাশা বৃদ্ধি পায়।

অতঃপর সে কালকেতুর কাছ থেকে নগরে তোলা আদায় করার অনুমতি চায়। এবং নিমিষে রাজভাণ্ডার পূর্ণ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এটা তার কাছে রাজকার্যের অংশ। একথা কালকেতুকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাতে সে কালকেতুর অনুমতি লাভ করে। কার্যত সে বিপরীত করে। সে নিঃস্ব হওয়া সত্ত্বেও নিজের গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্বে অভিজাত ভাব বজায় রেখেছে — হোক না তার এক হাতে ভাঙ্গা দোয়াত এবং মুড়া কলম। তবু সে সঙ্গে নিয়েছে সাত পুত্রকে।

''সাত পুত্র লইল ভাণ্ডারি করিয়া।
ভাঙ্গা দোয়াত লইল কমরে করিয়া।।
মুড়া কলম লইল কর্নতে গুজিয়া।
বজারে প্রবেশ হৈল জমিদার হৈয়া।।''[১৯৩]

সে রাজার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থী। কিন্তু বাইরে সে জমিদারের আবেষ্টনে নিজেকে পরিবৃত করেছে। তার মধ্যে প্রকৃত অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার মানসিক দৃঢ়তা রয়েছে। এই দ্বান্দ্বিক পরিচয় তার চরিত্রে বিরল ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। এই মানসিকতা থেকেই তার বাজারে প্রবেশ। বাজারে প্রবেশ করে সকালের কাছ থেকে জোর করে তোলা তুলেছে। সে তার সামাজিক ও জাতিগত অবস্থানের পরিচয় প্রবল অভাবেও বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাতে ভাঁড়ুকে এক অসামাজিক, রূঢ় ও রুক্ষ্ম চরিত্র বলে মনে হয়।

ভাঁড়ুর অত্যাচারে জর্জরিত প্রজা সকল কালকেতুর কাছে কড়া মন্তব্যে নালিশ জানায়। তাই কালকেতু তাকে চড় মেরে সকলের সামনে অপমান করে। তখন মানিক দত্তের ভাঁড়ু দত্ত ভিলেন চরিত্রের মতো রাজা কালকেতুকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রতিজ্ঞা করে। সে দুষ্টু প্রকৃতির লোক। সেই তথ্য সকলে জানে। এখন তার পরিচয় পাবে কালকেতু। সে এতটাই ক্ষমতার অধিকারী যে, তার আদেশে বাইশ জন রাজা কর্তৃক কালকেতুর রাজ্য লুণ্ঠন করবে এবং তাকে কারাগারে বন্দী করিয়ে ছাড়বে।

“চড় খাইয়া ভাড়ু দত্ত মালসাট মারে
খুড়া আমার নাম ভাড়ুয়া নাবড়।।
আমার নাম ভাড়ু দত্ত সভে জানে আমার তত্ত্ব
খুড়া তোমার বস্ত্র দুইখানি কানি।
* * *
তবে ভাড়ু দত্ত আমি খ্যাতি রাখিব।
আপন হুকুমে বাইশ বাজার লুটিব।।
সভার মধ্যে ভাড়ু কএ কুবাক্য বচন।
ধুলিয়া কারাগারে তোকে করাব বন্ধন।।”[১৯৪]

ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুর অপমান সহ্য করতে পারেনি। তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। কালকেতুর বিরুদ্ধে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা তারই প্রতিধ্বনি। এই ধরনের প্রাণবন্ত চরিত্র মানিক দত্তের কাব্যে আর একটিও নেই।

ভাঁড়ু দত্ত অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। কালকেতু কর্তৃক অপমানে তার প্রতিশোধস্পৃহা জাগ্রত হয়। সে কলিঙ্গ রাজ সুরথকে কালকেতুর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কৌশলে যুদ্ধে উত্তেজিত করে। সেই যুদ্ধে কালকেতু আত্মরক্ষার জন্য আত্মগোপন করে। সেই কালকেতুকেও গোপন স্থান থেকে বিচক্ষণ জহুরীর মত বের করে আনে। মানিক দত্তের ভাঁড়ু দত্ত ফুল্লরাকে বলে —

“খুড়ার প্রসাদে করিলাম অনেক ঠাকুরালী।

সুরথ রাজা তোমার তরে পাঠাইল ইরসান।।
বিনএ ভাবে ভাডু দত্ত করে নিবেদন।
খুড়ার সনে মোর খুড়ী করাঅ দরশন।।
সুবুদ্ধি ছিল ফুলুরার কুবুদ্ধি পাইল।
ঘরে ছিল কালকেতু দেখাইয়া দিল।।''[১৯৫]

ভাঁড়ু র প্রতিশোধস্পৃহাতেই কলিঙ্গরাজ কর্তৃক কালকেতু কারাগারে বন্দী হয়। যদিও দেবীর কৃপায় সে মুক্তি পায়। মুক্তি পেয়ে কালকেতু সিংহাসনে বসেই ভাঁড়ুকে ঘোল ঢেলে মাথা অর্ধেক নেড়া করে যারপরনাই অপমান করে। তাতে নগরের সকল প্রজা চারিদিক থেকে তাকে উপহাস করে করতালি দিয়েছে। এই অপমানে তার বড় ছেলেকে কাঁদতে দেখলেও তার লোভ নিবৃত্তি হয় না। সে মাথায় ঢালা ঘোল খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তার শুভাকাঙ্ক্ষিদের কাছে ভাঁড়ু নিজের অপমান ঢাকবার জন্য সকলকে বলে — ''বারানসী তির্থভূমি ভ্রমিলো।''[১৯৬] এমনকি ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুকে আঁটকুড়া অপবাদ দেয়। সেই অপবাদ ঢাকবার জন্য কালকেতুর সন্তান লাভের আশা জাগ্রত হয় এবং রাজকার্য পরিত্যাগ করে দেবীর ব্রতে মনোগ্রাহী হয়। তাই কাহিনী ও চরিত্রের মনোভাবনা পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও এই চরিত্রের গুরুত্ব রয়েছে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''তবে ভাঁড়ুদত্তের চরিত্রটি অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল অপেক্ষা ইহাতে গুরুত্ব লাভ করিয়াছে; তাহাকে নিছক 'ভিলেন' বলিয়াও মনে হয় না।''[১৯৭] সে জীবন্ত খল চরিত্র। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এরূপ চরিত্র দুর্লক্ষণীয়।

তবে, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে **পুরাই দত্ত** চরিত্রটি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। কালকেতু দেবী প্রদত্ত অঙ্গুরী নিয়ে তার বাড়ি যায়। সেখানেই তার প্রথম আবির্ভাব। আর মুকুন্দ চক্রবর্তীর কালকেতু যায় মুরারী শীল নামে এক বাণ্যার গৃহে। সে অত্যন্ত বিচক্ষণ ও চতুর। কিন্তু মানিক দত্তের পুরাই দত্ত নিষ্প্রভ চরিত্র। তার আবির্ভাব ও অবস্থান কাব্যে খুবই সীমিত সময়ের জন্য। এই সীমিত সময় পর্বে চরিত্রটি কীভাবে অঙ্কিত হয়েছে দেখে নেওয়া যাক্।

পুরাই দত্ত মূল্যবান দ্রব্য সনাক্তকরণ করতে পাকা জহুরী। কালকেতু দেবীর অঙ্গুরী নিয়ে গৃহস্থ মণ্ডলের কাছে যায় যে এর মূল্য বুঝতে না পেরে তাকে ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু পুরাই দত্ত তার তুলনায় বুদ্ধিমান বানিয়া। সে কঙ্কণে ধর্ম নিরঞ্জনের নাম দেখে তা শিরে ঠেকায় এবং তা গোলার উপর রাখে।

''কঙ্কনে দেখিয়া ছিল ধর্ম নিরঞ্জন।
কঙ্কন লইয়া শীরে করিল বন্দন।।
গোলার উপর কঙ্কন থুইলেন বাণিয়া।

ভার ভরি খন্‌তা কোদাইল দিলেন আনিয়া।।"[১৯৮]

তার চরিত্রে যেমন একদিকে বিচক্ষণতার পরিচয় আছে, তেমনি তার সঙ্গে মিলে মিশে আছে তার ধর্ম বিশ্বাস। তাতে করে চরিত্রটি ধার্মিক বাণিয়ার পরিচয় প্রদান করে।

এ ধরনের অপর একটি অপ্রধান চরিত্র হল কলিঙ্গ রাজা **সুরথ**। সে ব্যাধ খণ্ডের উল্লেখযোগ্য চরিত্র। পূর্বে তার নিদর্শন পাই মার্কণ্ডেয়পুরাণে। সেখানে সে চন্দ্রবংশীয় রাজা এবং তার পিতা চৈত্র। চৈত্র চন্দ্রের পৌত্র। মার্কণ্ডেরপুরাণে মার্কণ্ডেয় মুনি তার সম্বন্ধে বলেছে —

"ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সুরথঃ স নরাধিপঃ।

*   *   *

তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মুর্ত্তিংমহীময়ীম।

অর্হণাং চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্প-ধূপাগ্নিতর্পণৈঃ।।" ৭[১৯৯]

অর্থাৎ, " অতিশয় মমতা এবং রাজ্যাপহরণ জন্য নিতান্ত দুঃখিত সেই নরাধিপ সুরথ, ... বৈশ্য এবং রাজা সেই পুলিনে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গঠন করিয়া পুষ্প, ধূপ এবং হোমাদি দ্বারা পূজা করিলেন।"[১৯৯] কিন্তু মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে রাজা সুরথ প্রথমত শৈব ভক্ত। পরে তার শক্তি দেবীর প্রতি আস্থা প্রকাশ পায়। পুরাণের রাজা সুরথের সঙ্গে কালকেতু নামে কোন ব্যাধ চরিত্রের লড়াই বিবৃত হয়নি। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতুর সঙ্গে তার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে শৈব শাক্ত ও শৈব ধর্মের বিরোধটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তার কলিঙ্গ রাজ্যে চণ্ডীর দোহরা নির্মাণকে কেন্দ্র করে এই দ্বন্দ্বের সূচনা। এই দ্বন্দ্বের প্রকাশ দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারক গায়েন মানিক দত্তের দ্বারা। তার গানে কলিঙ্গবাসী মোহিত ও আপ্লুত হয়ে রাজ দরবারে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। কোতাল মুখে সেই সংবাদ শুনে সে কুপিত হয়। গায়েন মানিক দত্তকে ধরে আনা হয়। তাকে সুরথ বলে —

"রাজা বোলে মিথ্যাগীতে লোকের গেল কাজ।

মিথ্যা গায়ন কর বেটা কলিঙ্গের মাজ।।

কুনদেব রূপ ধরে কেমন মূরতি।

কেমন দেখিলা তার স্বরূপ আকৃতি।।"[২০০]

তার ফলে দেবীর ভক্ত মানিক দত্তকে বন্দী করা হয়। দেবী চণ্ডী তাকে স্বপ্ন দেখায়। স্বপ্নে তার প্রচণ্ড মূর্তি দেখে মানিক দত্তকে রাজা সুরথ অত্যন্ত সমাদর এবং বিনয়ের সঙ্গে তাকে মুক্ত করে। কলিঙ্গ ভেঙ্গে দেবী চণ্ডী গুজরাট নগর পত্তন করলে রাজা সুরথের প্রজাবৎসল স্বরূপটি প্রকাশ পায়। নিজ রাজ্য ভাঙ্গনে সে শোকাহত ও বিধ্বস্ত। নিরপরাধ ও ভাগ্যের কাছে অসহায় কলিঙ্গ রাজ সুরথ। তার কাছে কলিঙ্গ রাজ্য ভাঙ্গনের শোক পুত্র হারানোর তুলনায় বেশি মর্মাহত। স্বীয়

রাজ্য হারানোর প্রতিশোধ নিতে তার দেবী চণ্ডীর মুখাপ্রেক্ষি হতে দেখা যায়। এভাবে পুরাণের রাজা সুরথকে মানিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নতুন মাত্রা দান করেছেন।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কবি নিজেই চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারক। তিনি গায়েন। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল **রঘু ও রাঘব**। তাদের নামে রামভক্তিবাদের একটা আভাস পাওয়া যায়। তারাও মূলত গায়েন। নিঃস্বার্থ ভাবে দেবী চণ্ডীর ভক্তিতে নিজেদের উৎসর্গীকৃত করেছিল। তাদের গানে কলিঙ্গবাসীরা মোহিত। তাদের গানের আকর্ষণে সকল কলিঙ্গপ্রজারা রাজ দরবার শূন্য করে উপস্থিত হয়।

চণ্ডীর স্বীয় পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বামী শিবের শিষ্য নীলাম্বরের প্রকৃত অধিকার নিয়ে উভয়ের মধ্যে লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়। এই দ্বন্দ্বে উভয়ের প্রতাপ ও প্রচণ্ডতা বড় হয়ে উঠেছে। সেই প্রচণ্ডতার প্রকাশ স্বরূপ **ধর্মকেতু** ও **নিশানকেতু**। উভয়ের লড়াই জনিত শিবের ঘর্ম থেকে ধর্মকেতু ও নিশানকেতুর জন্ম। এই দুই ব্যাধ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অপ্রধান পুরুষ চরিত্র। তারা শিবের অনুগত এবং দেবী চণ্ডীর প্রতিস্পর্ধী চরিত্র। ধর্মকেতুর স্ত্রী নিদয়া এবং তার পুত্র নীলাম্বর। আর নিশানকেতুর স্ত্রী কমলা এবং তার কন্যা ফুল্লরা। ধর্মকেতু ও নিশানকেতু উভয়ে শিকারজীবী। ধর্মকেতু তার পুত্রের সঙ্গে নিশানকেতুর কন্যার বিবাহ সম্পন্ন করে পিতার কর্তব্যপালন করে। এরপর তারা চণ্ডীর ছলনার শিকার হয়। ফলে, উভয় উভয়কে পশুবৎ দেখে এবং পরস্পর পরস্পরের বাণে মারা যায়। এভাবে তাঁদেরকে নিয়ে ব্যাধ খণ্ডে একটি সম্পূর্ণ কাহিনীবৃত্তের সৃষ্টি হয়েছে।

অন্যদিকে, কালকেতুর গার্হস্থ্য জীবনে তার শিকর যাত্রা, ব্যাধ জীবিকা ও তার মানসিকতা উন্মোচনে **বেনিয়ার** চরিত্রটির গুরুত্ব অপরিসীম। বেনিয়া চরিত্রটিকে কোন নামে চিহ্নিত করা হয়নি। জীবিকাই তার ব্যক্তিনামের পরিচায়ক। সে বন থেকে আনা আগর চন্দন ও কাঠ বাজারে বিক্রি করে। কালকেতুর সঙ্গে বনে তার সাক্ষাৎ হয়। সেখানে কালকেতু তার প্রতি তাচ্ছিল্য মনোভাব প্রকাশ করে। কিন্তু তার মুখে প্রতিদিন দেড়জুড়ি কড়ি উপার্জনের কথা শুনে তাকে কালকেতু বুকে জড়িয়ে নিয়েছে। তার সঙ্গে কালকেতু মিতার সম্পর্ক স্থাপন করে। এমনকি, পথে কালকেতু তার আগে গিয়ে তাকে পিছনে নিয়েছে। এখানে কালকেতু চরিত্রের দ্বৈতসত্তার প্রকাশে এই বানিয়া চরিত্রটির গুরুত্ব অপরিসীম বলে মনে হয়।

ব্যাধ খণ্ডে কলিঙ্গরাজ সুরথের সঙ্গে গুজরাটরাজ কালকেতুর যুদ্ধটি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ক্ষেত্রে অপরিহার্য অংশ। সেই যুদ্ধে রাজা সুরথের চারজন সর্দারের কথা উল্লেখ রয়েছে। তারা হল **রামানন্দ, দেবানন্দ, শোভানন্দ, কালডণ্ডা**। সামাজিক মর্যাদায় তারা উচ্চবর্ণের। এরা সকলে রাজার আবাদি জমি ভোগীদার ছিল। এই আবাদি জমি তাদের মাহিনা স্বরূপ। সৈন্যদের মধ্যে রামানন্দ

যুদ্ধে ব্যাপক পরাক্রমী। সে কালকেতুর রাজদরবারের পূর্বদ্বার আক্রমণ করে। সেই দ্বারে কালকেতুর 'বাঙ্গালি নস্কর' ছিল। বাঙ্গালী শব্দটির দ্বারা মধ্যযুগে নিম্নশ্রেণীর জাতিকে বোঝান হত। রামানন্দের আক্রমণে কালকেতুর এই বাঙ্গালী নস্কর থানা ছেড়ে পলায়ন করে। উত্তর দ্বারের দেবানন্দও রামানন্দের ন্যায় পরাক্রমী যোদ্ধা। পশ্চিমদ্বার আক্রমণ করে শুভানন্দ। শোভানন্দ বুদ্ধিতে বৃহঃস্পতির সমতুল্য। কালকেতুকে মারতে সে একশত হাতিসহ সৈন্যদের নিয়ে আসে। অন্যদিকে, দক্ষিণদ্বারের কালডণ্ডা নামে কোতাল অতি ঘোরতর। সে একসঙ্গে বত্রিশ জনের সঙ্গে লড়াই করতে সক্ষম এবং তার দেহ পর্বততুল্য। চক্ষু তার সূর্য্যের বর্ণের ন্যায় লাল। তার সঙ্গে ষাট হাজার ধনুকধারী যোদ্ধা লড়াই করে। এই অবস্থায় কালকেতুও যুদ্ধে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য মিরাখর নামে এক কর্মচারিকে ডাকে। মিরাখর কালকেতুর আদেশে যুদ্ধ জয় করার মত ঘোড়া এনে দেয়। যুদ্ধে সর্বপ্রথম রামানন্দের সঙ্গে তার মুখোমুখি হয়। তার মধ্যে উচ্চবর্ণের আত্মঅহমিকা প্রবল ছিল। তাই কালকেতুকে তার নিম্নবর্ণের ব্যাধ পরিচয় যুদ্ধাঙ্গনে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তার সমাজ বহির্ভূত ও নিম্নবর্ণের হীনমন্যতায় আঘাত করে। তাতেই কালকেতুর সঙ্গে তার যুদ্ধের সূচনা হয়। সে পরাজিত হলে কালকেতু পূর্বদ্বারে দেবানন্দের সম্মুখীন হয়। দেবানন্দও কালকেতুকে তার অন্ত্যজ শ্রেণীর পরিচয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়। সে কালকেতুকে বলে —

"একদ্বার জিনি বেটা দেখাইস শামনা।
আমার হস্তে আজি তোমার ভাঙ্গিব বীরপনা।।"[২০১]

শোভানন্দ ও কালডণ্ডা উভয়ে একই পরিচয় প্রদান করে। যদিও তারা কালকেতুর কাছে পরাজিত হয়। বস্তুত, তাদের মধ্যে সামাজিক উচ্চ-নিম্নের ভেদাভেদে লড়াই বড় হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে, ব্যাধ খণ্ডের দুই জন অপ্রধান নারী চরিত্র **নিদয়া** ও **কমলা**। চণ্ডীর স্বীয় প্রচণ্ড শক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব রয়েছে। শিবের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে চণ্ডী তার পরিধেয় বস্ত্রের নিষিক্ত জল থেকে এই দুই নারী চরিত্রের জন্ম। কবির কথায় —

"পহ্রিবার বস্ত্র দুর্গা ধরিয়া চিপিল।
নিদয়া কমলা নামে ব্যাধিনী জন্মিল।।"[২০২]

নিদয়া ও কমলা ব্যাধ গৃহবধূ। নিদয়ার স্বামী ধর্মকেতু এবং কমলার স্বামী নিশানকেতু। উভয়ে সন্তানবতী। দেবী চণ্ডী কর্তৃক নিদয়া কালকেতুকে এবং দয়াবতী ফুল্লরাকে সন্তান হিসাবে লাভ করে। লক্ষণীয়, কমলা নামটির স্থানে হঠাৎ **দয়াবতী** নামটি প্রয়োগ আশ্চর্যের। তারা পুত্র-কন্যার বিবাহ দিয়ে স্বামীর মৃত্যুর পর সহমৃতা হয়। কবির কথায় —

"ভাগ্যবতি দুইটা শ্রিয়া বার্ত্তা পাইল
সেহ মৃতা হৈল দুইজন।।"[২০৩]

নিম্নশ্রেণীর সমাজে সহমরণ প্রথার প্রচলন ছিল নিদয়া ও দয়াবতী চরিত্র দুটি মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ।

ফুল্লরাকে দেবী চণ্ডীর ষোড়শীর ছদ্মবেশ ধারণ করে ছলনা করতে আসা অংশটি গুরুত্বপূর্ণ। সেই অবস্থায় ফুল্লরার সতীন সন্দেহকে দৃঢ় করার জন্য **মাসিমা** চরিত্রটির আগমন। তার কোন নাম উল্লেখ নেই। সে বয়োবৃদ্ধ ও সমাজ অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক। ফুল্লরা তার সম্মুখে সতীন জনিত সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হয়। তাতে সে ফুল্লরাকে সতীন সমস্যার সম্পর্কে সচেতন হতে বলে। পুরুষ জাতীর রূপ-যৌবনের প্রতি মোহ তার অজ্ঞাত নয়। তাই সে ফুল্লরাকে কালকেতুর অনুপস্থিতিতে ছদ্মবেশী দেবী চণ্ডীকে অন্যত্র পাঠাবার জন্য বলে।

''শুনিয়া ফুলরার কথা মাসীমায়ে বলে।
দেখো দারুণ সতা আছে তোর কপালে।।
জাবত কালকেতু বীর না আইসে ঘর।
কন্দল করিয়া পঠাও দিগান্তর।।''[২০৪]

এই কথায় ফুল্লরা পরিকল্পিত ভাবে দেবীকে তাদের দাম্পত্য জীবন থেকে বিতাড়িত করার নবনব কৌশল গ্রহণ করেছে। দেবী তাদের রাজ-রাণী তৈরী করতে চাইলে ফুল্লরা পুনরায় মাসীমার দ্বারস্থ হয়। তার উপর দেবী চণ্ডীকে রাখার দায়িত্ব দিয়ে সে স্বামীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সেই দিক থেকে মাসীমা চরিত্রটি অবহেলার নয়।

এখন বণিক খণ্ডের প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রের আলোচনায় আসা যাক্।

বণিক খণ্ডে প্রধান পুরুষ চরিত্র **ধনপতি**। স্বর্গভ্রষ্ট নলকুবেরের পুত্র কর্ণমুনি মর্ত্যে ধনপতি নামে জন্মগ্রহণ করে। ধনের পতি বা অধিকারী সে। জীবিকায় সে বণিক। এই পরিচয়টি তার চরিত্রে অক্ষুন্ন রয়েছে। তার থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে উঠতে পারেনি। তবে তার মধ্যে জাত্যাভিমান-গৌরববোধ আমাদের বিস্মিত করে।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডী কর্তৃক শিবকে ছলনার প্রসঙ্গে তার আগমন। সে শৈব ও শিবের সেবক। কিন্তু শিবের সঙ্গে পাশাখেলায় চণ্ডী তাকে মিথ্যা সাক্ষী দিতে জোর করে। চণ্ডীর কূট কৌশলের শিকার সে। কর্ণমুনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তা এড়াতে চায়। সে প্রভুর বিপক্ষে অন্যায় ভাবে মিথ্যা সাক্ষী দিতে দ্বিধান্বিত। তার কাছে প্রভু ভক্তি ও নিষ্ঠা বড়। শেষ পর্যন্ত চণ্ডী তার জিহ্বায় সরস্বতীকে স্থাপন করে তার মুখ দিয়ে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ায় —

''জ্ঞান হীন কর্ন্নমুনি সাক্ষী দিতে আইল।
শিব হারিল পাশা কর্ন্নমুণি কহিল।।''[২০৫]

এই ভাবেই সাধারণ মানুষ শক্তির সম্মুখে অসহায়, নিরীহ, অন্যের ক্রীড়ানক রূপে পরিচালিত

হত। এবং তারা তাতে ভয়ানক বিপদের শিকার হত। কর্ণমুনি এধরনের ক্ষমতার কাছে অসহায় সাধারণ মানুষের মূর্ত প্রতীক। তাই তার পরিস্থিতির কাছে পরাজিত হওয়া, ভাগ্যের দোহাই দেওয়া ও অঝোর নয়নে নীরব কান্না ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

''দুই হস্তে চক্ষে মোছে নীর।।

হায়রে কম্মের দোষ প্রভুর মনে অসন্তোষ

ভজিতে নারিলাম রাঙ্গা পাও।''[২০৬]

দেবীর মত অন্যায়কারী মানুষের বিরুদ্ধে তার বাক্‌রুদ্ধ। প্রতিবাদহীন অসহায় অন্যের স্বার্থে বলি হওয়া অগণিত সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি কর্ণমুনি।

অতঃপর কর্ণমুনি বণিক জয়পতির স্ত্রী উর্বশীর উদরে মনুষ্য জন্ম লাভ করে। জয়পতি পুত্রের নাম রাখে ধনপতি। যৌবনে তার সঙ্গে লহনার বিবাহ হয়। কিন্তু সে নিঃসন্তান। তাই রাজা তাকে 'আঁটকুড়া' অপবাদ দেয় এবং দ্বিতীয় বিবাহ করার আদেশ দেয়। কিন্তু ধনপতির সমাজ-জ্ঞান প্রখর। সে জানে সতীন সমস্যা কতটা দুর্বিষহ। সে রাজাকে বলে —

''না বল ২ রাজা বাড়িবে জঞ্জাল।

দুইটি স্ত্রিয়ার তাপে প্রাণ জাইবে আমার।।''[২০৭]

সাময়িক সময়ের জন্য তার কাছে 'আঁটকুড়া' অপবাদের তুলনায় দাম্পত্য জীবনে একাধিক স্ত্রী জনিত জঞ্জাল ভাবনা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

ধনপতির চরিত্রে মধ্যযুগীয় বণিক শ্রেণীর আভিজাত্য বোধ সম্পূর্ণ বর্তেছে। সে লহনার সঙ্গে ঝগড়া করে পায়রা উড়াতে ইছানি নগরে যায়। তবে সঙ্গে নিয়েছে ওঝা জনার্দনকে।

''পায়েরা খেলিতে জায়ে সাধু ধনপতি

সঙ্গে ওঝা নড়ে জনার্দ্দন।''[২০৮]

মধ্যযুগে ধনি পুরুষদের অবসর বিনোদনের একটি ক্ষেত্র ছিল পায়রা উড়ানো। ধনপতির মধ্যে তা আমরা লক্ষ্য করি। প্রসঙ্গত, আশুতোষ ভট্টাচার্য মুকুন্দ চক্রবর্তীর ধনপতি চরিত্র সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা মানিক দত্তের ধনপতি চরিত্রের ক্ষেত্রেও প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয় — ''সে ধনশালী, কিন্তু বিলাসী প্রকৃতির লোক। লঘু কৌতুক ক্রীড়ায় তাহার উল্লাস, সে পরিজন সঙ্গী লইয়া পারাবত ক্রীড়ায় কালহরণ করিয়া থাকে।''[২০৯] ধনপতির পায়রা উড়ে গিয়ে বসে লক্ষপতির বাড়ির চালে। পায়রা সন্ধানে লঘুচিত্ত ব্যক্তি ধনপতির ক্রীড়াচ্ছলে খুল্লনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। খুল্লনার রূপ সৌন্দর্যে ধনপতি মোহিত ও আকর্ষিত হয়। পায়রা নেওয়ার ছলে সে তাকে একপলকে নিরীক্ষণ করে নেয়।

''সাধু ধরে বালা করে মুখ দেখিছে অহি ছলে

লয্যা পাইল খুলুনা অন্তরে।

*   *   *

জেইদিকে খুলুনা জায়ে   সে দিগে সাধু চায়ে

জোগী জেন বসিলেন ধিয়ানে।

বারেক দরশন পাব   তবে গিয়া প্রাণে জীব

মদন জিনিল কামবাণে।।"[২১০]

এখানে ধনপতিকে খুল্লনার রূপ সৌন্দর্য উপভোগের তুলনায় যৌবন সম্ভোগে বেশি আকর্ষিত করে। গৃহে তার পত্নী আছে তার কথা বিস্মৃত হয়ে খুল্লনাকে বিবাহ করতে অভিলাষ জ্ঞাপন করে। সেজন্য তার নির্লজ্জের মতো আচরণ করতে বাধে না। সে খুল্লনাকে বিবাহ করার জন্য অত্যন্ত কৌশলে কাকা শ্বশুরকে প্রথমে তার উপযুক্ত কন্যার বিবাহ দেওয়ার কথা উত্থাপন করে। যথারীতি লক্ষপতি তার কাছে কন্যা বিবাহের বিধান চায়। তৎক্ষণাৎ সুযোগ সন্ধানী ধনপতি কাকা শ্বশুরের সামনে নিজের অবস্থা তুলে ধরে। অকপটে সে খুল্লনাকে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করে। দ্বিতীয় বিবাহ তার কাছে বিলাসের সামগ্রী ছিল। প্রসঙ্গত আশুতোষ ভট্টাচার্য মুকুন্দ চক্রবর্তীর ধনপতি চরিত্র সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা মানিক দত্তের ধনপতি চরিত্রের ক্ষেত্রেও প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়— "বহুবিবাহ সে যুগের ধনশালী ব্যক্তির বিলাস ছিল, বিবাহে তাহার কিছুমাত্র বাধা হইল না।"[২১১] খুল্লনার প্রতি তার আসক্তি মনের প্রকাশ পায়।

ধনপতি ভোগী। সে নিজের হৃদয় সংযমে অত্যন্ত দুর্বল। সে তার চিত্ত দুর্বলতা ঢাকবার জন্য লহনার সামনে মিথ্যা কথা বলেছে। তবে লহনার সচেতনতা ও চতুরতার সামনে সে ধরা পড়ে যায়। তখন ধনপতি তার দুর্বলতা অকপটে লহনাকে বলে —

"না বল ২ রামা লহনা বাইনানী।

মোর প্রাণ হরিয়া নইল সুন্দর খুলুনি।।"[২১২]

খুল্লনাকে বিবাহ করার পর দিন প্রভাতে সে রাজার দরবারে আসে। আত্মঅহমিকা তার প্রবল। তাই সে গায়ের 'হরিদ্র রঙ্গ' বা হলুদ রঙ নিঃশেষ হতে দেয়নি। রাজা বিক্রমকেশর তাকে আঁটকুড়া বলায় সে আত্মশ্লাঘায় দগ্ধ হতে থাকে। তারই জবান এবং অহমিকা প্রকাশ করতে সে রাজ দরবারে আসে। রাজাকে সে সম্বোধন করে সরাসরি বিছানায় বসে পড়ে। ভবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বলেছেন— "তৎকালিক বণিকগণের বিশেষ মান্য ছিল। তাঁহারা রাজ-সভায় একাসনে বসিয়া রাজার হাতে পান পাইতেন; রাজাদের সহিত পাশা খেলা ও হাস্যপরিহাসাদিও চলিত।"[২১৩] তার মনে চাপা পড়া আঁটকূড়া অপবাদের আঘাত অগ্ন্যুৎপাতের মত প্রকাশ পায়। তার অভিজাত বনিক শ্রেণীর আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হয়। তাই রাজা তার গায়ে হলুদ রঙের কথা জিজ্ঞাসা

করতেই সে বলে—

"আটকুড় বলিয়া রাজা গালি দিলে তুমি।
তাপের তাপিত হৈয়া বিভা কৈলাঙ আমি।।"[২১৪]

কিন্তু তার দ্বিতীয় বিবাহ সম্বন্ধে সে রাজাকে পূর্বে জ্ঞাত করায় নি। তাতে রাজা ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে বন্দী করে। লক্ষণীয় সেকালে বিবাহ করার আগে রাজাকে জানানো বাঞ্ছনীয় নিয়ম ছিল। তা লঙ্ঘন করলে ধনপতির মত বণিককেও শাস্তি পেতে হয়। এরপর, ধনপতির গৌড়ে যাত্রাপালা। রাজা বিক্রমকেশর তাকে শারি-শুকের জন্য সুবর্ণ পিঞ্জর আনতে গৌড়ে যাবার ব্যবস্থা করে। তাতে ধনপতির সন্দেহপরায়ণ মনটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ধনপতি তখন রাজাকে বলে —

"সাধু বলে মোর নারী সুন্দর দেখিঞা।
পঞ্জরের ছলে গোউড়ে দিছ পঠাইয়া।।"[২১৫]

ধনপতি সমাজে অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী বণিক। তার সঙ্গে রাজার ঐশ্বর্য্যের তেমন তফাৎ নেই। সে তার সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান থেকেই রাজাকে সন্দেহ করতে পেরেছে। যদিও রাজা বিক্রমকেশর সেই অবস্থায় ধনপতির সম্মুখেই তার স্ত্রীকে 'জননী' বলে জ্ঞান করে জানিয়েছে। সম্ভবত কবি মানিক দত্ত সমাজের বন্ধন রক্ষা ও কাহিনীর অগ্রগতির প্রয়োজনে ব্যবহৃত করেছেন।

ধনপতির মত বীর, সাহসী চরিত্রও বিশ্বাস-সংস্কারের কাছে দুর্বল। মধ্যযুগের সংস্কারকে সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ধনপতি গৌড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে প্রথমে 'দধিমছ্য' দেখে শুভ এবং পরে মাথার উপর 'শগিনী' বা শকুনি দেখে অমঙ্গল যাত্রা মনে করেছে। তৎক্ষণাৎ ধনপতি শিবনাম মন্ত্র জপ করে এবং জ্যোতিষিকে দিয়ে গণনা করিয়ে নিয়েছে।

অতঃপর সে গৌড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। গৌড়ে পিঞ্জর তৈরী করতে গিয়ে সংসারের কথা ভুলে যায়। সংসার সম্পর্কে সে উদাসীন। তার দাম্পত্য জীবন ক্ষণস্থায়ী। প্রবাসে নতুন করে বিলাস জীবনের সূচনা করে। তার প্রেমের প্রতি নিষ্ঠা নেই। তার জন্য খুল্লনা ও রাজা বিক্রমকেশর অপেক্ষায় রত। সতীন সমস্যা সম্পর্কে তার ধারণা থাকা সত্ত্বেও সে উদাসীন। দুর্গা কর্তৃক স্বপ্নে তার খুল্লনার কথা মনে পড়ে। সে সুখ-ঐশ্বর্যের মধ্যে পড়ে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যবোধটি ভুলে যায়। তাই গৌড় থেকে ফিরে এসে রাজাকে সে বলে — "গৌউড়তে আনন্দে রহিলাম সর্ব্বথাই।"।।[২১৬] অর্থাৎ, ঘরের সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর কথা ভুলে সে গৌড়ে সুখভোগ, আনন্দে কাটায়। সঙ্গত কারণে, আশুতোষ ভট্টাচার্য মুকুন্দ চক্রবর্তীর ধনপতির চরিত্র সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা মানিক দত্তের ধনপতি চরিত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য — "সে ভোগী, লঘুপদে সে জীবনের পথে বিচরণ করে; প্রেমেও তাহার নিষ্ঠা নাই, খুল্লনার প্রতি আসক্ত হইবার পূর্বেই তাহার দীর্ঘদিন গৃহ হইতে অনুপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন হইল এবং প্রবাসে গিয়া সে নূতন করিয়া বিলাস-জীবন রচনা

করিল, গৃহের কথা ভুলিয়া গেল। তাহার মত চরিত্রের ব্যক্তির পক্ষে তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক।''[২১৭]

তবে গৌড়ে সুখ ভোগ করলেও তার আভিজাত্য গৌরব স্তিমিত হয়ে যায়নি। ধনপতি খুল্লনার দুঃখ-কষ্টের কথা জানিয়ে গৃহাভিমুখী হতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই অবস্থায় গৌড়েশ্বর তাকে অর্থগৌরব দেখিয়ে খুল্লনার দ্বিতীয় বিবাহের কথা উত্থাপন করে।

''ধনপতি বলে আমি ধনের ঈশ্বর।
ধনে বান্ধিতে পারি ই সপ্ত সাগর।।''[২১৮]

এখানে আপাত সে অর্থগৌরব প্রকাশ করলেও তার মনে স্ত্রীর প্রতি দুর্বল চিত্তের প্রাবল্য অধিক। তার চরিত্রে এটা স্বাভাবিক ও সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়।

অতঃপর সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। গৃহী ধনপতি একজন ভোজন রসিক বাঙালী চরিত্র। প্রথম অন্ন সে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে খায়। অম্ল খেয়ে সে মুখ সুদ্ধি করে। বাঙালী পেটুক গৃহস্থের মত ঘুমের সময় নাক ডাক্তে তার জুড়ি নেই। কবির ভাষায় —

''ভোজন করিতে বসিল ধনপতি।
শ্রীবিষ্ণু স্মরণ কৈল আর পশুপতি।।
গণ্ডুষ করিঞা ঝারি থূল্য বামপাশে।
অন্নবেঞ্জন খাএ আম্বল খাল্য শেষে।।
অবশেষে দধিদুগ্ধ করিল ভোজন।
ভৃঙ্গারের জলে সাধু কৈল আচমন।।
কর্পূর তাম্বুল খাঞা মুখ শুদ্ধি কৈল।
শয়ন মন্দিরে সাধু শজ্যাএ শুইল।।
* * *
খুলনা শজ্যাতে বসি ভাবিতে লাগিল।
শিহরে বসিয়া নাসা চাপিঞা ধরিল।।''[২১৯]

নিদ্রা ভঙ্গের পর খুল্লনা তার বারমাসের দুঃখ কষ্ট জানায়। কিন্তু ধনপতি পারিবারিক কলহ বা অশান্তি বৃদ্ধি করতে অনিচ্ছুক। প্রকৃত সত্য তার অজানা নয়। তাই অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলী গৃহকর্তার মত লহনার বিরুদ্ধে খুল্লনার রাবমাস্যার অভিযোগ এড়িয়ে যায়। সে খুল্লনাকে বলে — ''তোমর সতিনী দুঃখ দিয়াছে তোমাক।।''[২২০] এখানে সে বুদ্ধিমান বাঙালী গৃহকর্তার ভূমিকা পালন করেছে।

পিতার শ্রাদ্ধের সময় ধনপতির গৃহী রূপটি আরও স্পষ্ট। নিমন্ত্রিত কুলজ্ঞাতিদের মধ্যে কাকে প্রধান হিসেবে অভিবাদন জানাবে সে ব্যাপারে স্ত্রী খুল্লনার সঙ্গে পরামর্শ করে নেয়।

"সাধু বলিছে আগে কার করি মান।
সকলির মধ্যে দেখি চান্দোকে প্রধাণ।।
এমন বিচার কৈল খুলনার সনে।
আগে দণ্ডবৎ কৈল চান্দোর চরণে।।"[২২১]

সে চাঁদকে জ্ঞাতিপ্রধান করায় অন্যান্যরা একে অপরের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হয়। সেই সুবাদে বিষ্ণু দত্ত নামে এক জ্ঞাতি খুল্লনার ছাগল চরানোর দোষ উত্থাপন করে। তাই তারা ধনপতির গৃহে অন্নগ্রহণ করতে নারাজ। তারা ধনপতির কাছে খুল্লনাকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে বলে। নয়তো ধনপতি তাদের লক্ষ টাকা দিলে অন্নগ্রহণ করবে। অন্যথা তার জ্ঞাতি ও কুল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাতে ধনপতি চিন্তিত। কুল-ভ্রষ্টতা জনিত জ্ঞাতির গঞ্জনা তার কাছে মৃত্যুর তুলনায় ভয়াবহ ছিল। ধনপতি এই অবস্থার শিকার হয়েছে। সে লহনাকে বলে —

"খুলনার তরে তুমি রাখাইলে ছেলি।
কপটে লেখিলে পাতি কুলে দিলে কালি।।
ছেলি চরা দোষে জ্ঞাতি খাইতে না চায়।
প্রমাদ হইল এবে কি করি উপায়।।
জ্ঞাতির গঞ্জন কথা না জাএ সহন।
গরল ভক্ষিয়া আমি তেজিব জীবন।।"[২২২]

ধনপতি সমাজের পতি হলেও সমাজের গঞ্জনা সম্পর্কে সচেতন। তাই খুল্লনা সতীত্বের পরীক্ষায় পরাজিত হলে তাতে লজ্জার অন্ত থাকবে না। সে খুল্লনাকে অকাতরে দোষের সত্যতা তার সম্মুখে বলতে বলেছে। তাহলে সে বণিক সমাজকে লক্ষ টাকা দিয়ে মুখ চাপা দিবে। তবে লক্ষ টাকায় সাময়িক ভাবে সে উদ্ধার পাবে। তবে তাতে স্ত্রীর কলঙ্ক সমাজ থেকে মুছে যাবে না। এসকল ভাবনা তার অতীত। সামাজিক লাঞ্ছনার ভয়ে তার যুক্তি-বুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে।

এরপর ধনপতিকে সিংহলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হয়। খুল্লনা স্বামীর মঙ্গল কামনা করে চণ্ডীর ঘট পূজা করে। তার অরণ্য জীবনে চণ্ডীর কৃপা ও চণ্ডীর পূজার্চনা ধনপতির মত উচ্চবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে পরস্পর বিরোধী ভাবনার পরিচায়ক। তাই নিজ গৃহে উচ্চবর্ণের অস্বীকৃত দেবীর পূজা তার ক্রোধের কারণ। সে দেবী চণ্ডীর ঘট লাথি মেরে ফেলে দেয়। তার ফলে তার জীবনে চলে আসে বিপদের সঙ্কেত। এই বিপরীত বর্ণের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে অরবিন্দ পোদ্দার মুকুন্দ চক্রবর্তীর ধনপতি সম্পর্কে যা বলেছেন তা এখানেও প্রযোজ্য বলে মনে হয় — "এই আক্রোশ তার নিতান্ত ব্যক্তিগত নয়, তা সামাজিক। কারণ, তার পরিবারে এই সমাজ-অস্বীকৃত অনার্য স্ত্রী-দেবতার পূজা প্রচলিত হ'লে সামাজিক দিক থেকে তার অধঃপতন অনিবার্য; ধনপতি

এ ব্যাপারে তাই অস্বাভাবিক সচেতন।''[২২৩] তবে তার দাম্পত্য জীবন ভোগ খুব সামান্য। সে সুনিবিড় দাম্পত্য জীবন উপভোগ থেকে বঞ্চিত হলেও পিতা হিসেবে তার কর্তব্য-দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন। সিংহলে যাত্রার সময় সে ভবিষ্যৎ পুত্রের দায়িত্ব খুল্লনার উপর বর্তায়। সে পুত্রের নাম, আদর্শ শিক্ষা এবং পুত্রকে আত্মনির্ভর করে তোলবার দায়িত্ব দিয়ে যেতে ভুলে যায় না। বরং সে বারবার পুত্রের আত্মপ্রতিষ্ঠার উপর প্রবল জোর দিতে বলেছে। সে খুল্লনাকে বলেছে —

''ধনাই পণ্ডিতের ঠাই পুত্রকে পড়াইবে।
ইহ বাক্য কদাচিত অন্যথা নহিবে।।
পড়িয়া বালক হৈবে অতি বিচক্ষন।
পিতার উদ্দিশে জাইবে দক্ষিন পাটন।।
পুত্র পড়িঞা জদি ঘরে অন্ন খাএ।
বাপ তার গাধা গাধিনী তার মাএ।।''[২২৪]

ধনপতি ও তার স্ত্রী খুল্লনা উচ্চবর্ণের সমাজ কর্তৃক আক্রান্ত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। শিক্ষা-দীক্ষায়, বুদ্ধি-বিদ্যায় বিচক্ষণ হলে সমাজের কূটকৌশল সম্পর্কে সে সচেতন হতে পারত এবং তার আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠিত হত। ধনপতি পুত্রের শিক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, তা বললে অত্যুক্তি হবে না।

অনাগত পুত্রের ভার স্ত্রীর কাছে অর্পণ করে বণিক ধনপতি সিংহলে চন্দন আনতে যাত্রা করে। সেখানে কোতালদের সে স্পষ্ট ভাবে বলেছে যে, আতিথেয়তার সুব্যবস্থা পায় তাহলে চন্দন কিনবে। অতঃপর সে রাজাকে বস্ত্র ও নানা দ্রব্য ভেট দেয়। তখন রাজা তার পরিচয় জানতে চায়। পরিচয় পত্রের সঙ্গে ধনপতি কালিদহে কমলে-কামিনীর কথা বলে। সে রাজাকে বলে যে সেই মূর্তি দেখলে পাপ বিমোচন হয়। একথা মিথ্যা প্রমাণিত হলে তাকে বন্দী করা হয়। এই কারণে ধনপতি ক্রন্দনে ভেঙে পড়ে। তার মত পৌরুষ বীর চরিত্রের ক্ষেত্রে তা বেমানান ও অস্বাভাবিক বলে মনে হয়।

''কান্দে ধনপতি হাসেন ভগবতী
কেন কান্দ সাধুর নন্দন।''[২২৫]

বন্দী দশায় ধনপতির দুর্বল, শিশুসুলভ আচরণ হাস্যকর বোধ হয়। পরিস্থিতির কাছে সে হার মেনেছে, কঠোর দৃঢ়তা তার মধ্যে বড়ই অভাব। পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার চারিত্রিক গুণাবলী পরিবর্তন হয়েছে। এই ক্ষেত্রে চরিত্রটি ঘটনার অনুগামী। সে প্রতিটি ঘটনার থেকে উত্তরণের জন্য লড়াই করেনি। এই অবাঞ্ছিত উপদ্রব ও বিপদ থেকে মুক্তির জন্য তার ইষ্ট দেবতা

শিবের প্রতি কোন নিষ্ঠা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লক্ষ্য করা যায় না। চাঁদ সদাগরের মত লড়াই করে বেঁচে থাকার আত্মপ্রত্যয় ধনপতির মধ্যে একান্ত অভাব। সে বন্দী হয়ে বলেছে —

"দুর্গা লাগিলবাদে দুঃখ দিল নানামতে
আর না জাইব উজয়ানী।
ধনপতি কান্দে কেশ বেশ নাহি বান্ধে
আর না দেখিব সুন্দর খুলনী
* * *
জে হইতে লংঘিলাম বারি সেহি হইতে দুঃখে মরি
দেশ ছাড়ি হৈলাঙ দেশান্তরি।
এবার উদ্ধার কর এক লক্ষ বলি দিব
বারেক উদ্ধার মহেশ্বরি।।"[২২৬]

তার চিত্ত দুর্বলতা তাকে সাধারণ মানুষের ভিড়ে দাঁড় করিয়েছে।

তবে তার মধ্যে অন্যের প্রতি দায়বদ্ধতা ও কর্তব্যপরায়ণতার আদর্শ রয়েছে। দুর্গা নাম স্মরণ করে শ্রীমন্ত পিতাকে নিয়ে উজানি নগরে ফেরার সময় মগরায় পৌঁছায়। তার সঙ্গে আসা মৃত মানুষগুলির পরিবার সম্পর্কে ধনপতির ভাবনা জাগ্রত হয়েছে। ধনপতি বাড়ি গিয়ে কি মুখে তাদের সামনে দাঁড়াবে? তাই ধনপতি শ্রীমন্তকে বলেছে — "মগরাতে ডুব্যা মল্য জার বাপ ভাই।/ কি বল্যা পাত্যাব আমি তা সভার ঠাই।।"[২২৭] স্বাভাবিক ভাবেই ঐসকল পরিবার তাদের মৃত্যুর জন্য ধনপতিকেই দায়ী করবে। তাদের অপবাদ সম্পর্কে চিন্তিত। সে মগরায় এসে চণ্ডীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করছে। এই ক্রোধ শৈব ও শাক্তের দ্বন্দ্ব বলে মনে হয়। এই বিপরীত বিরোধী ধর্মে বিশ্বাসী এবং একই গৃহে থাকা পিতা পুত্র তার মূর্ত প্রতীক।

শুধু তাই নয় আত্ম অহমিকা ও সামাজিক অবস্থান গৌরব তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। সে সিংহল থেকে এসেই রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়। সে গিয়েছিল রাজাকে তার মান-সম্মান ও গৌরব বোধ উন্নতির সম্বন্ধে সজাগ করতে। শেষ পর্যন্তও ধনপতি তার আভিজাত্য গৌরব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। কবি তার চরিত্রের উপকরণ বাঙালী ধনী অভিজাত পরিবার থেকে সংগ্রহ করে তাকে অঙ্কন করেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার ফলে চরিত্রটি বিশেষ একটি সামাজিক অবস্থানের ছবি মাত্র হয়েছে। সে রাজাকে বলে —

"সাধু ধনপতি তবে বলিতে লাগিল।
সিংহল নগরে বড় মোর মাণ হৈল।।
দুর্গা করাইল এবে শ্রীমন্তের মান।

অর্দ্ধরাজ্য দিল আর কন্যা দিল দান।।"[২২৮]

একথা শুনে রাজা বিক্রমকেশর তার পুত্রের কাছে কন্যা বিবাহ দেবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করে। কিন্তু ধনপতি পুত্রের ক্ষেত্রেও আবার সতীন সমস্যা দেখা দিবে বলে তাতে নারাজ। রাজা বিক্রমকেশর তার কন্যা জয়াবতীর সঙ্গে ধনপতির পুত্র শ্রীমন্তের বিবাহ দেয়। অতঃপর ধনপতি ব্যতীত পরিবারের সকলে মিলে দেবী চণ্ডীর পূজা করে। সেও সকলের অনুরোধে বাধ্য হয় চণ্ডীর পূজা করতে। কবির ভাষায় —

"বন্ধনের কথা সাধু মনে কৈল।
ভবানী পূজিতে সাধু একচিত্ত হৈল।।
পূজার জতেক দ্রব্য একত্র করিল।
ধনপতি দুর্গাপূজা করিতে লাগিল।।
নম২ নম মাতা নম নারায়নি।
আমাকে কর গো দয়া আদ্যা ভবানী।।
আদ্য মন্ত্রে ধনপতি দুর্গাকে স্মরিল।
ভগতবচ্ছলা দুর্গা দরশন দিল।।
ধরনী লুটাএগ্রা সাধু চরন বন্দিল।
প্রসন্ন হইএগ্রা মাতা আশীর্ব্বাদ দিল।।"[২২৯]

ধনপতি দেবী চণ্ডীর সঙ্গে সংগ্রামে পরাস্ত। সমাজের মেনে নেওয়া ধর্ম ও দেবীকে সে মানতে বাধ্য হল। অরবিন্দ পোদ্দার মুকুন্দ চক্রবর্তীর ধনপতি চরিত্রের সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন তা এখানেও তুলে ধরা যায় — "ধনপতির এই সংগ্রাম প্রশংসনীয় হলেও নিষ্ফল; কেন না, তার দেবতা ও আদর্শ ইতিমধ্যেই সমস্ত সামাজিক মূল্য এবং সৃষ্টিমূল্য হারিয়ে ফেলেছিল। ... পরিণামে শ্রীমন্তের কল্যাণে, তার হারান সম্পদ পুনরুদ্ধৃত হ'লে সে দেখতে পেলো তার সনাতন আদর্শকে জুড়ে আছে এই নতুন আদর্শ, দুই আদর্শ এক হয়ে মিশে আছে। কিন্তু এই এক হওয়ার মধ্যে পুরাতন আর ঠিক পুরাতন নয়, নতুন প্রভাবে তা রূপান্তরিত। তাই পুরাতন আদর্শও এক নতুন সত্যে প্রকাশিত হলো। ধনপতি নতুন দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে তাকালো।"[২৩০]

ধনপতির একমাত্র পুত্র **শ্রীমন্ত**। খুল্লনা তার মাতা। সে বণিক খণ্ডের অন্যতম প্রধান পুরুষ চরিত্র। তাকে অন্যান্য কাব্যে শ্রীপতিও বলা হয়। স্বর্গের নর্তক মালাধর মর্তে শ্রীমন্ত নামে জন্মগ্রহণ করে। কাহিনীর পরিধিগত দিক দিয়ে ধনপতি খণ্ডের অর্ধেক অংশ সে অধিকার করে রয়েছে। ধনপতির মত তারও ধনগৌরব রয়েছে, তবে পিতার তুলনায় চরিত্রটি অনেকটাই জীবন্ত।

শ্রীমন্তের জন্মের পর তার পিতৃদর্শন হয়নি। পিতা ধনপতি সিংহলরাজ দ্বারা কারাবন্দী

হয়ে ছিল। পিতৃহীন মাতার আদরের ফলে তার শৈশব কাল অত্যন্ত দুরন্তপণায় ও চঞ্চলতায় কাটে। সে ষাট দত্তের পুত্র ভোলার চোখে ধুলো দিয়ে পলায়ণ করে। মানিক দত্ত অত্যন্ত নিপুণ ভাবে শ্রীমন্তের এই দুরন্তপনার চিত্র এঁকেছেন —

"ষাইট দত্তের বেটা নাম তার ভোলা।
তার চক্ষে শ্রীমন্ত তুলিয়া মারে ধুলা।।"[২৩১]

খুল্লনা শ্রীমন্তের বিরুদ্ধে শিশুদের এই অভিযোগে মর্মাহত হয়। সে তাদের বুঝিয়ে শান্ত করে; খুল্লনা শ্রীমন্তের দুষ্টুমি থেকে নিরস্ত করতে গুরু গৃহে পড়াশুনা করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়ার কথা ভাবে। খুল্লনার আদেশ মত দাসী দুর্বলা শ্রীহরি পণ্ডিতকে বাড়িতে ডেকে আনে। শ্রীমন্ত তার অধীনে পড়াশুনা শুরু করে। চঞ্চল শ্রীমন্ত পড়াশুনায় খারাপ ছিলনা। গুরুগৃহে সে অল্পবয়সেই বর্ণ পরিচয়, অভিধান পাঠ সমাপ্ত করে। সে দিনে গুরুগৃহে পড়াশুনা করতে যেত এবং রাতে দেবী চণ্ডী আসত তাকে পাঠ দেবার জন্য।

"দিবসে পড়েন সাধু গুরুপাট স্থানে।
রাত্রে পড়ান দুর্গা আসিঞা আপনে।।"[২৩২]

পাশাপাশি তার সুন্দর রূপের সঙ্গে হাতের লেখাও ছিল সুন্দর ও স্পষ্ট। তার এই সুন্দর অক্ষর বুননের পিছনে তার ধৈর্য্য নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের কঠোর ভূমিকা ছিল। "লেখিঞা সুন্দর কৈল সকল অক্ষর।"[২৩৩] কর্মের প্রতি এই নিষ্ঠা ও প্রত্যয় তার জীবনকে প্রভাবিত করেছে। তার চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে শৈশবকাল ছিল ভূমিকা স্বরূপ, বলা যেতে পারে।

অন্যদিকে, তার বাল্য বয়সে মাতার আদরে এবং অভিজাত গৌরবে তার মানবিকবোধ ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। খুল্লনা পণ্ডিতকে প্রচুর সুবর্ণ মুদ্রা দক্ষিণা দিয়ে বিদায় জানায়। গুরুর বিদায়কালে গুরু শ্রীমন্তের হাতে পুথি ও খড়ি তুলে দেওয়ার সময় চণ্ডীর মায়ায় শ্রীমন্তের হাত থেকে খড়ি মাটিতে পড়ে যায়। তার গুরুকে তা সে তুলতে আদেশ দেয়। তার ব্যবহারে গুরু রুষ্ট হয়ে তাকে 'জারুয়া' সম্বোধনে গালিগালাজ করে। সে বলে —

"সাধুকে পণ্ডিত বলে জারুয়া বচন।
মাতা তোর খুলনা পিতা কুনজন।।"[২৩৪]

পণ্ডিত তাকে 'জারুয়া' বা 'জারজ' বললে তার আত্মাভিমানে আঘাত লাগে। তার চরিত্রে আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হয়। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতের মাথায় পুথির আঘাত করে গৃহে চলে আসে। সে গৃহে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়। লক্ষণীয়, সে মৌখিক প্রতিবাদের কোন ভাষা পায়নি। কারণ জন্মের পর সে কোন দিন তার পিতাকে স্বচক্ষে দেখে নি। বাইরে প্রকাশ করা তার পক্ষে লজ্জা ও অপমানের সামিল। মায়ের কাছে অভিমানে ও রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছে —

"মাতাকে বলেন সাধু ঘরে থাকিঞা।/ আমার লাগিয়া কেন ফিরিছ কান্দিঞা।।
কপাট ধরিঞা কথা বলেন শ্রীপতি।/ মাতা আছ বিদ্যমান পিতা গেল কতি।।
শ্রীমন্ত বলেন মাতা না কর কন্দন।/ পণ্ডিতে বলিল মোকে জারুয়া বচন।।
কি হইল মোর পিতা দেহত কহিঞা।/ নহিলে মরিব আমি গরল ভক্ষিয়া।।"[২৩৫]

সে এ বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প বদ্ধ, জেদি ও একগুঁয়ে দৃঢ়চিত্ত। পিতাকে সে ফিরিয়ে আনবেই, না হয় আত্মহত্যা করবে। কারণ সে বুঝতে পারে যে, পিতা ছাড়া সমাজে চলা কতটা কন্টকাবৃত ও যন্ত্রণা দায়ক। এখানে শ্রীমন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আত্মাভিমানী, তেজস্বী ও প্রতিবাদী চরিত্র।

পাশাপাশি, শ্রীমন্ত সমাজ সচেতন চরিত্র। অল্প বয়সেই সে সমাজের কঠোর উপহাসনীতিকে নিরীক্ষণ করে নিয়েছিল। সিংহলে পিতাকে ফিরিয়ে আনতে যাবার সময় মাতাকে সমাজের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সম্পর্কে সচেতন করিয়ে যায়। পুরুষ অভিভাবকহীন সংসারে একজন নারীকে সমাজ যে কী নিন্দনীয় অপবাদ দিতে পারে, সে ব্যাপারে সে মাকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সজাগ করেছে —

"নিবেদিএ তুয়া পদে শুনহ বচনে।
কুলধর্ম্মশীল মাতা রাখিহ জতনে।।
কহি গো তোমারে জ্ঞাতির বড় ত্রাস।
কিঞ্চিত দেখএ দোষ করে উপহাস।।"[২৩৬]

কিন্তু খুল্লনা শ্রীমন্তকে বোঝায় তার পিতা ধনপতি প্রায় বারো বছর আগে বাণিজ্যযাত্রা করে আর ফেরেনি, সেও যদি সে পথ অনুসরণ করে একই কাজ করে তবে খুল্লনা অনাথা হয়ে যাবে। শ্রীমন্ত মায়ের এসব কথায় প্রচণ্ড চটে গিয়ে মাতৃ চরিত্রে সন্দেহ পোষণ করে বলে —

"পরার পুরুষ দেখে শিমলির ফুল।।
স্বামী করিঞা মাতা তোরে নাঞি মন।
অবিচার করি কেনে করিছ ক্রন্দন।।"[২৩৭]

এখানে সমাজের আগ্রাসী নীতি ও সমাজ বর্হিভূত কাজে পরিহাসপরায়ণ দিকটি পরিস্ফুট হয়েছে। শ্রীমন্তের কথা তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

শ্রীমন্ত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব চরিত্র। দক্ষিণ পাটন পৌঁছে সে কোতাল দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়। তাদের কাছ থেকে উত্তরণের জন্য সে মন টলানোর মত অর্থ প্রদান করে।

"একশত তঙ্কা সাধু দিঞা কোতালকে।
ঘাটে বান্ধিয়া রাখে সপ্ত নোকাকে।।"[২৩৮]

অতঃপর সে সিংহল রাজ্যে উপস্থিত হয়। যাত্রা পথে সে দেবীর কমলে-কামিনী রূপ দেখে। তা রাজার সাক্ষাতে বলে। তার বিশ্বাস যোগ্যতা নিয়ে দু'জনের মধ্যে শর্ত হয়। শর্তে শ্রীমন্ত হেরে

যাওয়ায় তার সমস্ত ধন লুট করা হয় এবং তাকে মশানে মুণ্ডু ছেদন করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তাই সে পিতা উদ্ধারে ব্যর্থ হওয়ায় অত্যন্ত শোক প্রকাশ করে। শেষ পর্যন্ত দেবীর কৃপায় শ্রীমন্ত রাজা শালবানের সঙ্গে শর্তে জিতে। শর্তানুসারে সে তার কন্যা সুশীলাকে বিবাহ করে এবং দান স্বরূপ বন্দীশালা চায়। সেই বন্দীশালায় পিতাকে সনাক্তকরণের জন্য পত্র বিবরণ ব্যবহার করেছে। পিতাকে সে সনাক্তকরণ করেও পিতার কাছ থেকে তার সত্যতা পরখ করে নিয়েছে।

ঠিক এই রূপ বিচক্ষণ পরীক্ষক চরিত্র শ্রীমন্ত। সে পিতাকে নিয়ে দেশে ফিরে আসে। পিতা-পুত্রের আগমন বার্তা শুনে খুল্লনা উল্লসিত। তাই সে দেবীর উপাচার নিয়ে নৌকা পূজা করতে নদী তীরে উপস্থিত হয়। শ্রীমন্ত লক্ষ্য করে যে, তার মায়ের দীর্ঘদিন পরে আগত পিতার তুলনায় নৌকা পূজার দিকে ধ্যান বেশি। শ্রীমন্ত মনে মনে মায়ের বিপথগামিতা সম্বন্ধে সন্দেহ করে। তার প্রত্যয় নির্ণয়ে সে পিতার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের পরীক্ষা করার জন্য পিতার ‘নেত’ বা সূক্ষ্মবস্ত্র মাটিতে রাখে। কবির কথায় ‘‘নোকা হইতে দিষ্ঠি করে সাধুর নন্দন।/ আজি মাএর কিছু বুঝি দেখি মন।।/ পিতার নেতখানি ভূমে বিছাইল।/ তাহা দেখি খুলনা রামা চমকিত হৈল।।’’[২৩৯] মাতার দুর্বল চিত্তকে সন্দেহ করে এবং তা যাচাই করে নেয়। পিতাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। পিতা ধনপতি সিংহলে অবস্থানকালে তার গৌরব ও মানসম্মানবোধ বজায় ছিল সে সম্বন্ধে উজানীর রাজা বিক্রমকেশরকে জ্ঞাত করায়। সে পুত্রের অর্ধরাজ্য অধিকার এবং রাজ-কন্যা লাভ করার বিষয়টি উত্থাপন করে উন্নত আত্মমর্যাদাবোধ উপলব্ধি করে। তাতে বিক্রমকেশরের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে। সেও তার কন্যা জয়াবতীকে শ্রীমন্তের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার জন্য পিতা ধনপতির কাছে বলে। কিন্তু ধনপতি তাতে অস্বীকৃত হলে রাজা তাকে বন্দী করে। পিতার বন্দী দশা শুনে শ্রীমন্ত বিচলিত হয়। সে দোলায় চড়ে রাজ-স্থানে উপস্থিত হয় এবং পিতার বন্দীর কারণ জিজ্ঞাসা করে। সে জয়াবতীকে বিবাহ করতে রাজার কাছে সম্মতি জানায়। বিবাহের বার্তা শুনে সুশীলা বৈধব্য বেশ ধারণ করতে চাইলে সে তার স্ত্রীর স্বল্প সমাজ অভিজ্ঞতা ও হঠাৎ বিভ্রান্ত হৃদয় লক্ষ্য করে হাসে। শ্রীমন্ত সুশীলাকে সতীনদের দাসী বৃত্তিতে অবস্থান সম্বন্ধে প্রবোধ দিয়ে বলে —

‘‘সুশীলার তরে সাধু বলিছেন হাসি।
জয়াকে আনাএগ্রা তব করাইব দাসী।।’’[২৪০]

সুতরাং শ্রীমন্ত চরিত্রে আভিজাত্য গৌরববোধ থাকলেও মনুষ্য জীবনের স্বাভাবিক অনুভূতিগুলি তার মধ্যে থেকে বিলীন হয়ে যায়নি। সে পিতা ধনপতির তুলনায় অনেক বেশি জেদি, দৃঢ় চিত্ত ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন চরিত্র। কবি তাকে বণিক পরিবারের পরিচয়ের চিত্র না করে রক্ত মাংসের জীবন্ত প্রাণে পরিণত করেছেন।

এবার আমরা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিক খণ্ডের মানব চরিত্র রূপে প্রধান নারী চরিত্রগুলির আলোচনায় প্রবেশ করব। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নানা শ্রেণীর মানুষের ছবি বাস্তবতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। এই কাব্যের ধনপতি খণ্ডে যে সকল নারী চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে তারা মানবিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও নারী চরিত্রগুলি বিস্ময়কর। আবার কখন কখন নারী চরিত্রগুলি কাহিনী অনুগামী, সমাজ ও তার রীতি-নীতির আদর্শ প্রতীক হয়ে উঠেছে। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের এইরূপ প্রধান নারী চরিত্রের সংখ্যা অল্প হলেও অবহেলার নয়।

বণিক খণ্ডের প্রধান ও সবচেয়ে আকর্ষণীয় নারী চরিত্র **লহনা**। সে বণিক ধনপতির প্রথমা স্ত্রী। প্রথম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার রামগতি ন্যায়রত্ন বলেছেন — ‘‘লহনা শব্দের পারস্যভাষায় বিপদ্ = দায় = ঝঞ্ঝাট; — ঐ স্ত্রীর যেরূপ স্বভাবাদি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে ধনপতি উহাকে লইয়া বিলক্ষণ দায়ে পড়িয়াছিলেন, বলিতে হইবে। সুতরাং উহার ‘লহনা’ নাম সার্থক হইয়াছে।’’[২৪১] তার যৌবন বিগত প্রায়। তার চরিত্রে হৃদয়ের দ্বন্দ্ব এতটাই মনস্তাত্ত্বিক যে অন্যান্য নারী চরিত্র তার কাছে নিষ্প্রভ। কবি মানিক দত্ত চরিত্রটি বর্ণনায় বস্তুতান্ত্রিক অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।

লহনা বণিক নিধুপতির গৃহে জন্মগ্রহণ করে। তাদের বাসগৃহ ইন্দ্রানী। সে চণ্ডীর ব্রতদাসী। সাত বছর বয়স থেকে গৌরী পূজা করে। সে প্রতিনিয়ত দেবীর কাছে ভালো ঘর, বর ও ধনী গৃহে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করে।

> ‘‘ঘর বর ভাল হয় স্বামী ভাল কয়ে।
> জন্মাবধি পূজিমু তোমাক এই মনে লয়ে।।’’[২৪২]

লহনা সাত বছর থেকে বারো বছর পর্যন্ত টানা ছ’বছর দেবী চণ্ডীর আরাধনায় নিজেকে নিরন্তর ব্যস্ত রাখে। কিন্তু তার বিবাহ সম্পন্ন হয় না। সে দেবীর কাছে অধৈর্য হয়ে পুনরায় স্বীয় বিবাহের কথা উত্থাপন করে। বিবাহের জন্য বাল্য বয়স থেকেই সে অধীর। পিতার তুলনায় সে বিষয়ে লহনা অধিক ব্যাকুল। এই অবস্থায় দেবী তাকে আশ্বাসবাণী দেয়। তখন লহনা দেবী চণ্ডীর জন্মান্তর ধরে পূজা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কারণ, তার মনে একমাত্র কাঙ্ক্ষিত বিষয় হল স্বামী। সে দেবী চণ্ডীকে বলে —

> ‘‘মা জাবত শরীরে মোর থাকয়ে জীবন।
> তুয়া পদ না ছাড়িমু জনমে জনম।।
> ব্রহ্মবাক্য লংহি হয় নরকে গমন।
> পতির কারণে তোমার লইলাম শরণ।।’’[২৪৩]

বাল্য বয়সেই লহনা দেবী চণ্ডীর কাছে রামায়ণে সীতার রামকে পতি হিসাবে পাওয়ার প্রসঙ্গে

উত্থাপন করে। অল্প বয়সেই তার পুরাণ জ্ঞানের পরিচয় মেলে। শৈশব থেকে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা , কুল-শীল ও ধন-সম্পত্তির সম্বন্ধে সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। বণিক সন্তান লহনার মধ্যে ঐশ্বর্য্য ও সমাজে উন্নত স্থান পাওয়ার বিলাস ভাবনা বর্তমান। দেবীর কাছে তার এরূপ মানত সেকালের নারী সমাজের চরম দুরবস্থা ও পুরুষ জাতির বিপথগামীর দিকে আমাদের অভিনিবেশ ঘটায়। শৈশবে তার এরূপ মানসিক গঠন যৌবনে তাকে পথ দেখিয়েছে।

বিবাহের পরে লহনার মধ্যে দেবীর প্রতি মনোনিবেশের অভাব ঘটেছে। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে বিবাহের পর চণ্ডী পূজা ভুলে যায়। দেবী চণ্ডী তাকে আঁটকুড়া ও সতীন সমস্যার অভিশাপ দেয়। তার জন্য ধনপতিকে আঁটকুড়া অপবাদ শুনতে হয়। সমাজের সকলে তার মুখ দেখতে চায় না। ধনপতি একথা লহনাকে বলে। তখন লহনা ধনপতির উপর দোষারূপ করে। লহনা ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে অশ্লীল কথাবার্তা বলে। যা তাকে বণিক পরিবার বহির্ভূত অশিক্ষিত, রুচিহীন ও সংস্কারহীন নীচ পরিবার ভুক্ত চরিত্রে পরিণত করেছে। সে ধনপতিকে বলে —

"পরার বালক প্রভু উদরে ধরিয়া।
ছেইলা দশবার প্রভু দিব প্রসবিয়া।।"[২৪৪]

লহনার এই আচরণে বিরক্ত ধনপতি উজানী নগরে পায়রা উড়াতে চলে যায়। সেখানে লহনার খুড়তুতো বোন খুল্লনাকে দেখে সে মোহ মুগ্ধ হয়। অতঃপর খুল্লনার সঙ্গে তার স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ স্থির হয়। সে ধনপতির বিবাহের জন্য কারিগর এনে অলঙ্কার তৈরীর অধীর আগ্রহ লক্ষ্য করে। তাতে তার নারী হৃদয় দগ্ধ হয়। সে স্বামীকে ভবিষ্যৎ যন্ত্রণার কথা আগাম সচেতন করে সে সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য নতুন অস্ত্র ব্যবহার করে। লহনা চায় না তার খুড়তুতো বোন তার সতীন হোক। কিন্তু তার জীবনে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অভিশাপ বর্ষিত হয়। ধনপতি খুল্লনাকে দ্বিতীয় বিবাহের জন্য মনস্থির করে। ধনপতি সেই খুল্লনার জন্য গহনা তার হাত দিয়ে পাঠায়। লহনাকে দেখে খুল্লনা প্রণাম করে। তখন লহনা বাইরে স্বতঃস্ফূর্ত আশির্বাদ করলেও অন্তরে তার বিষ বর্ষিত হয়। তা সে বাইরে প্রকাশ করতে পারে না। সে মনে এক বাইরে আর এক রকম আচরণ করতে বাধ্য হয়।

"খুলুনা আসিয়া লহনা দিদির চরণ বন্দিল।
নিমের অধিক তিতু রামা আশীর্ব্বাদ কৈল।।"[২৪৫]

এখানে লহনা অত্যন্ত মনস্তত্ত্বসম্মত এবং বাস্তবানুগ চরিত্র হয়ে উঠেছে।

স্বামী সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় লহনা চিন্তিত। তার রূপ ও যৌবন বিগত। তবু সে তার স্বামীর চোখের মধ্যমণি হয়ে থাকতে চায়। কিন্তু আজ তার চেয়ে সুন্দরী ও যুবতী বোনই তার সতীন। আর স্বামীর নজর সতীনের দিকে। এই যন্ত্রণা লহনা সহ্য করতে পারছে না। নারীর

এই যন্ত্রণা স্বাভাবিক। খুল্লনার রূপ-যৌবন নাশ করতে সে দুর্বলাকে দিয়ে নিলাবতী নামে ব্রাহ্মণীকে ডেকে এনেছে। স্বামী যাতে তার রূপে আকৃষ্ট হয় এবং তার অধিগত থাকে — সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। সেই জন্য নিলাবতীকে দিয়ে তুক্‌তাক করিয়ে নিচ্ছে।

"গাছ পত্র দেহ মোকে সই নিলাবতী।
সামীর সহিতে মোরে করাহ পীরিতি।।"[২৪৬]

সে নিলাবতীর বশীকরণ-মন্ত্র এবং তার চোখেরবালী স্বরূপ খুল্লনার রূপ-যৌবন হরণ করার কথা শুনে আনন্দিত। সে নিলাবতীর সঙ্গে খুল্লনার রূপ, অলংকার, ধন প্রভৃতি সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কুট বুদ্ধিতে লিপ্ত হয়। সে নিলাবতীকে দিয়ে ধনপতির জাল চিঠি লিখিয়ে নেয়। তার কথা মত নিলাবতী চিঠি লিখে চলে যায়। সে সময় লহনা খুল্লনার প্রতি ধনপতির বিরূপ চিঠি পাঠ করে এবং উচ্চস্বরে কান্নার অভিনয় করে। "পত্র লেখি দিঞা নিলাবতী ঘরে গেল।/ লহনা পত্র নঞা কান্দিতে লাগিল।।/ খুলনা ভ্রমরা তীরে স্নানে গিঞাছিল।/ লহনার ক্রন্দন শুনি খুলনা আইল।। / ... লহনা বলেন খুলনা শুন তুমি।/ কুমঙ্গল পত্র পঠাঞা দিল সামী।।/ লহনা খুলনার হস্তে পত্রখানি দিল।/ পত্র নঞা খুলনা সকল পড়িল।।"[২৪৭] একদিকে লহনা খুল্লনার প্রতি সর্বনাশের ফাঁদ পাতে। আর বাইরে তার প্রতি সহানুভূতি ও সমব্যথা প্রকাশ করে। লহনার এইরূপ আচরণ তাকে জীবন্ত ও নাটকীয় করে তুলেছে। ফুল্লরার সতীন সমস্যা জনিত মনস্তাত্ত্বিক কৌশলের তুলনায় মানিক দত্ত লহনাকে অনেক বেশী মনস্তাত্ত্বিক করে তুলেছেন।

কিন্তু তার সমস্ত চাতুরতা খুল্লনার শিক্ষার কাছে পরাস্ত হয়। খুল্লনা বুঝতে পারে যে, চিঠিটা নিলাবতীর হাতে লেখা। এটা খুল্লনা তার সামনে প্রকাশ করলে লহনা ঈর্ষা, হিংসা ও ক্রোধে ফেটে পড়ে। তৎক্ষণাৎ নিজের ক্রোধকে বশীভূত করতে না পেরে খুল্লনাকে শারীরিক নির্যাতন শুরু করে। লহনার এইরূপ ব্যবহারে তাকে সম্ভ্রান্ত বণিক পরিবার থেকে একেবারে গ্রাম্য গৃহস্থ রমণী পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে। তার কথায় খুল্লনার রূপ সৌন্দর্য এবং গৃহ সম্পদের অধিকার করায়ত্ত করাই তার ঈর্ষার প্রধান কারণ।

পাশাপাশি লহনার আত্মসম্মান বোধ প্রবল। সতীনের সঙ্গে গৃহে ঝগড়া করবে, কিন্তু তা বাইরের মানুষ দেখবে — এটা তার মান-সম্মানে বাধে। সে গৃহের কথা বাইরে প্রকাশ করতে চায় না। তাই তাদের ঝগড়া শুনতে বণিক রমণীরা সেখানে উপস্থিত হলে তাদের বলে — "জদি বা ঝগড়া শুন খাও পুত্রের মাথা।।"[২৪৮] লহনা জানে একমাত্র সন্তানের দোহাই দিলেই তারা চলে যাবে। পরিস্থিতি বুঝে সমাজ সচেতন লহনা তাকেই হাতিয়ার করে নিয়েছে। সতীন ভাবনা লহনাকে নিষ্ঠুর করে তুলেছে। খুল্লনা তার খুড়তুতো বোন হলেও তার প্রতি সতীন সুলভ আচরণ করতে একটুও বাঁধে না। এরপর সে খুল্লনার সমস্ত অলংকার খুলে নিয়ে তাকে ছাগল চরাতে

পাঠিয়েছে। নিজে পালঙ্কে শুয়ে খুল্লনাকে ঢেঁকিশালায় শুতে দিয়েছে।

এরূপ কঠোর চরিত্রও দুর্গার স্বপ্নাদেশে ভীত। সে এখন খুল্লনাকে স্নেহে যত্নে রাখতে ব্যস্ত। তার প্রতি স্বামীর ভালোবাসা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাতে লহনা সতীন খুল্লনার প্রতি সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করতে শুরু করে। এই প্রথম খুল্লনাকে সে 'বোন' বলে সম্বোধন করে এবং বিভিন্ন প্রকার তোষামোদ করে গৃহে ফেরাতে বনে এসে উপস্থিত হয়। সে ভয়ে বলে — "স্বামী আইলে দুখ না বলিহ তারে ।।"[২৪৯] কেননা, সে জানে এই অপরাধের শাস্তি কী হতে পারে। লহনার আদর আপ্যায়নের কারণ খুল্লনা বুঝতে পারে। তাই সে লহনাকে একটু শ্লেষের সুরে বলে— "দুর্গার কৃপাতে দিদি মোর হৈল সুখ।"[২৫০] খুল্লনার এই সুখের কারণ লহনা বাইরে প্রকাশ করেনা। কিন্তু খুল্লনা লহনার অন্তরগহনে লুকিয়ে থাকা ব্যথা অন্যভাবে প্রকাশ করে, যা লহনার কাছে অপ্রতিরোধ্য ও দুঃসহ। কিন্তু তার কাছে এই পরাজয় অত্যন্ত লজ্জাজনক।

লহনার ধনসম্পত্তির উপর লোভ প্রবল। ধনপতি রাজপরিবারের প্রয়োজনে দক্ষিণ পাটন যাত্রা করার পরিকল্পনা করে। খুল্লনা স্বামীকে চক্ষুর আড়াল করতে চায় না। সে বলে ঘরের আগর চন্দন রাজাকে দিয়ে দিতে। একথা শুনে লহনা রান্নাঘর থেকে ক্রোধান্বিত হয়ে বের হয়। খুল্লনার প্রতি সে ব্যঙ্গ করে বলে —

"তেজিয়া রন্ধন শাল   ক্রোধে হইল চন্দতাল
          ব্যাঘ্ররূপে বাহিরাইল লহনা।।
প্রভু তথা গেলে পাইবা দুখ   দেখহ কামিনীর মুখ
          সর্ব্বস্ব রাজার তরে দিঞা।"[২৫১]

কীভাবে পরোক্ষ দংশন করা যায় সে ব্যাপারে তার জবাব নেই। সেই সঙ্গে গৃহসম্পদ গচ্ছিত রাখতেও সে সচেতন। ধনপতি লহনার চারিত্রিক স্বভাব অনুধাবন করতে পারে। খুল্লনার কথা চিন্তা করে ধনপতি যাত্রার প্রাক্‌কালে সম্পত্তি ভাগ করে দেবার কথা বলে। তখন লহনা অত্যন্ত কৌশলে ধনপতির মনোবাঞ্ছাকে বিপরীতমুখী করে দেয়।

"আমি তোমার ভাগী নই ২ সহোদর।
পাপী স্ত্রিয়ার কারণে বাটীব বাড়ী ঘর।।
খুল্লনা হবে ঠাকুরানী দাসী হৈব আমি।
কর্ম্ম করিঞা খাইব ভাত কিসের অভিমানী।।"[২৫২]

কতটা কপটতার সঙ্গে নিজের উদ্দেশ্যকে সফলতার পথে আনা যায় তা লহনাকে না দেখলে বোঝা যায় না। তার উদ্দেশ্য সে একাই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হবে। এই জন্য আবার তাকে খুল্লনার চরিত্র স্খলন দেখাতে হয়। ধনপতির যাত্রার প্রাক্কালে খুল্লনা স্বামীর শুভযাত্রা কামনা করে

দুর্গা পূজা করতে বসে। লহনা ভাবে খুল্লনা দরজা বন্ধ করে পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলছে। লহনার কাছে প্রতিশোধ নেওয়ার এই সঠিক সময়! সে চাক্ষুষ প্রমাণ দিতে ধনপতিকে ডেকে নিয়ে আসে।

> ‘‘চলিল লহনা জথাতে ধনপতি।
> কপটে কহেন কথা হইএগ্রা অশ্রুমুখী।।
> তোমার কারণে প্রভু বিদরে মোর হিয়া।
> খুলুনা কি কম্ম করে হের দেখসিআ।।’’[২৫৩]

লহনার চতুরতা অস্বাভাবিক। তার প্রতি বিশ্বাস জাগানোর জন্য নয়নের জল ফেলতে তার জুড়ি নেই। খুল্লনার প্রতি স্বামীর দৃঢ় বিশ্বাসে সন্দেহের ও বিরূপতার বীজ সৃষ্টি করে স্বামীর প্রতি সহানুভূতি অর্জন করেছে। মানিক দত্তের লহনার মত কৌশলী চরিত্র চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বিরল।

কিন্তু লহনা স্বামীর বন্দী দশার কথা শুনে খুল্লনার সঙ্গে সমান ক্রন্দন করে এবং খুল্লনার গর্ভাবস্থায় তার প্রতি সুব্যবহার করে। কিন্তু লহনার এই রূপ আচরণ ক্ষণস্থায়ী। পরক্ষণে শ্রীমন্তকে না পেয়ে খুল্লনার ক্রন্দন দেখে সে আনন্দে ফেটে পড়ে এবং সে বলে — ‘‘আজি হৈতে দুই সন্ধ্যা রন্ধন টুটিল।।’’[২৫৪] এমনকি দক্ষিণ পাটনে শ্রীমন্তের মৃত্যুর সংবাদে খুল্লনার ক্রন্দন দেখে লহনা কান্নার অভিনয় করেছে। সে চোখে সরিষার গুড়া দিয়ে কাঁদতে চেষ্টা করে। তার মধ্যে বিমাতার কঠোর হৃদয়হীনতার রূপটি স্পষ্ট। পাশাপাশি খুল্লনার সন্তান হারানোর বেদনা তার মত বন্ধ্যা নারীর ক্ষেত্রে আনন্দের। তার চরিত্রের এই মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত উপভোগ্য। অতঃপর তাকে কাব্যে তেমন লক্ষ্য করা যায় না। তবু এই সামান্য পরিসরেই কবি তাকে যতটা মনস্তাত্ত্বিক রূপে অঙ্কন করেছেন — তা বিস্ময়ের বিষয়। অন্যান্য নারী চরিত্রের তুলনায় লহনার চারিত্রিক গুণাবলী অনেক বেশি আকর্ষণীয়, সর্বোপরি জীবন্ত ও প্রাণবন্ত বটে।

বণিক খণ্ডে অপর একটি প্রধান নারী চরিত্র **খুল্লনা**। তার পিতা বণিক লক্ষপতি এবং মাতা রম্ভাবতী। তাদের বাসস্থান ইছানী নগরে। তার সঙ্গে বণিক ধনপতির বিবাহ হয়। সে ধনপতির দ্বিতীয় স্ত্রী। তার একমাত্র সন্তান শ্রীমন্ত। এই সতীন সহ দাম্পত্য জীবনে গার্হস্থ্য রূপ চিত্রিত হয়েছে।

খুল্লনা স্বর্গে ইন্দ্র-সভার নর্তকী রত্নমালা নামে পরিচিতা। মর্ত্যে রত্নমালা রম্ভাবতীর গর্ভে খুল্লনা নামে জন্মগ্রহণ করে। সে লহনার তুলনায় যুবতী ও সুন্দরী। সম্পর্কে লহনা তার জ্যাঠতুতো দিদি এবং পরে তার সতীনে পরিণত হয়। তার বাল্য বয়সে সখীদের সঙ্গে খেলাধুলো করে সময় অতিক্রান্ত হয়। একদিন ধনপতির পায়রা তাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। সেই পায়রা তার আঁচলে আবদ্ধ হলে তাকে বন্দী করে। তাতে খুল্লনা পায়রাকে উদ্দেশ্য করে পুরুষ জাতির ভ্রমরবৃত্তির

আচরণের কথা উল্লেখ করে। খুল্লনা তাকে বলে —

"জাহার জৌবন দেখি ভুলিল তোমার মতি
তাহার নাহিক নিজ পতি।।"[২৫৫]

খুল্লনার সঙ্গে ধনপতির পায়রার স্বল্পাভাসে রতিসম্ভোগ কলা বিবৃত হয়েছে। কিন্তু খুল্লনার মুখে তার স্বামীহীন যুবতীর গোপন পরিচয় পেয়ে পায়রা তাকে সকলকে জানিয়ে দেওয়ার ভয় দেখায়। একথা শুনে খুল্লনা কলঙ্কের ভয়ে কাঁপতে থাকে। এখানে খুল্লনা গোপন অভিসন্ধির শিকার এবং সমাজ ভয়ে ভীত।

পায়রা সন্ধানে ধনপতির সঙ্গে খুল্লনার সাক্ষাৎ হয়। ধনপতি তাকে পায়রা বন্দীর অপবাদ দেয়। তাতে খুল্লনা অপমান ও লজ্জা বোধ করে। সে তার পায়রা ফিরিয়ে দেয়। ধনপতি পায়রা নেওয়ার ছলে যুবতী খুল্লনার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তাতে যৌবনবতী খুল্লনা লজ্জা অনুভব করে।

"সাধু ধরে বালা করে মুখ দেখিছে অহি ছলে
লয্যা পাইল খুলুনা অন্তরে।"[২৫৬]

লজ্জাবতী খুল্লনা বিনয়ী ও বিনম্র চরিত্র। ধনপতি বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করতে জনার্দন পণ্ডিত ইছানী নগরে লক্ষপতির গৃহে উপস্থিত হয়। অপরিচিত অতিথির জন্য জল প্রদান করে খুল্লনা তাকে প্রণাম করে। তখন তার বয়স সাত বছর। বাল্য বয়স থেকেই তার মধ্যে এই সংস্কারগুলি বিদ্যমান। তার যেমন গুরুজন তুল্য জনার্দনের প্রতি শ্রদ্ধা তেমনি সতীন দিদির প্রতি আন্তরিক বিনয়। বিবাহ সম্পন্ন হবার পর পিত্রালয় থেকে আগমনের সময় খুল্লনা মাতা রম্ভাবতীর কাছে সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ পারিবারিক সংস্কারের পরিচয় লাভ করে।

কিন্তু খুল্লনার দাম্পত্য জীবনের শুরুতেই বিপদের সূচনা হয়। তার স্বামী রাজা বিক্রমকেশর কর্তৃক বন্দী হলে আরম্ভ হয় সতীন লহনার তার প্রতি রোষযুক্ত বাক্যবাণ। আবার তাকে নিয়ে এদিকে চণ্ডীর ছাগল চরানোর পরিকল্পনা। তার ফলে ধনপতিকে শারী-শুকের জন্য সুবর্ণ পিঞ্জর তৈরী করতে গৌড়ে যেতে হয়। আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে খুল্লনাকে সতীন জ্বালার সম্মুখে পড়তে হয়। খুল্লনা সমূহ পরিস্থিতির কাছে অসহায় চরিত্রে পরিণত হয়। কিন্তু সে শিক্ষিতা। বিগত রূপ ও যৌবনা লহনা সুন্দরী ও যৌবনবতী খুল্লনাকে স্বামী ধনপতির নাম করে মিথ্যা জাল চিঠি লিখে ছাগল চরাতে আদেশ দেয়। যাতে তার রূপ ও যৌবন নষ্ট হয়। এবং সমাজের কাছে তার কলঙ্ক রটে। কিন্তু সে নিলাবতীর জাল চিঠির হস্তাক্ষর দেখেই সনাক্তকরণ করতে পারে এবং লহনার চক্রান্ত তার কাছে ধরা পড়ে যায়। সে লহনাকে বলে —

"কপট পাতি শুন দিদি লেখিএাছ তুমি।

লেখিঞাছে নিলাবতী চিহ্নিলাম আমি।।''[২৫৭]

লহনার মিথ্যা চক্রান্তের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ করেছে। এমনকি এই ঝঞ্ঝাট থেকে অতিক্রান্ত হওয়ার জন্য সম্পত্তির ভাগ চেয়েছে। মধ্যযুগে কোন নারী চরিত্র বোধহয় মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের খুল্লনার মত এইরূপ সমাজ-বিরুদ্ধ প্রতিবাদী বাক্য উচ্চারণ করতে পারেনি। সে লহনাকে বলে —

''শুনহ লহনা দিদি তোর সকল নাট।

আমাকে বুঝিঞা দেহ গৃহস্তির বাট।।''[২৫৮]

একথায় তাকে লহনা কর্তৃক শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। তা সে মুখ বুঝে সহ্য করেছে। অতঃপর, প্রতিবাদের ফণা তুলে নি একবারের জন্যও। কারণ তার কাছে আজ স্বামী-স্তম্ভটি নেই। তাই অসহায় নতজানু হওয়া এবং চোখের জল ফেলা ছাড়া উপায় নেই। সে বলে —

''শুনহ লহনা দিদি তোরে বলি আমি।

মোর বিড়ম্বনা দিদি না করিহ তুমি।।

করিব দাসীর কম্ম জা বলিবা তুমি।

ছেলি চরাইতে দিদি না পারিব আমি।।

লহনার পাও ধরি বলিল খুলনা।''[২৫৯]

স্বামী বর্তমান থাকা খুল্লনাকে লহনা বৈধব্যের বেশ পরিধান করায়। এই অবস্থায় তাকে ছাগল চরাতে যেতে হয়। এই দুঃখে তার মাতা-পিতার কথা মনে পড়ে। কিন্তু তার সতীন গৃহে বিবাহের পর কেউ তাকে একবারের জন্য দেখতে আসে নি। পিতা-মাতা তথা সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তার সূক্ষ্ম প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। তবুও দুঃখে সে ভেঙে পড়ে। সে আক্ষেপ করে বলে —

''পিতা মাতা বিভা দিল জ্বলন্ত আনলে।।

বিভা দিঞা তত্ত নাই কৈল পুনর্ব্বার।''[২৬০]

সেকালের সমাজ ব্যবস্থাই বোধ হয় এমন ছিল। ধনী পরিবারের গৃহবধূ হওয়া সত্ত্বেও তাকে পোড়া অন্ন খেতে হয় এবং ঢেঁকিশালায় তার শয়ন মেলে। তার নিরাভরণ ও দুঃখের কথা শুনে ভাই হরিবাণ্যা তাকে অলংকার দিতে বনে আসে। খুল্লনা আত্মসম্মানবোধে, লজ্জায়, দুঃখ-কষ্টে মুখ লুকোতে আড়াল হয়। ছাগল চরাতে চরাতে পরিশ্রান্ত খুল্লনা ঘুমিয়ে পড়ে। তখন চণ্ডীর ছলনায় সমস্ত ছাগল হারিয়ে যায়। একদিকে সতীনের গঞ্জনা, অন্যদিকে ছাগল হারানোর চিন্তায় সে বিপর্যস্ত। এরূপ বিপদে তার মৃত্যু কামনা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তাই সে বনের বাঘ-ভাল্লুকের কাছে নিজ প্রাণ সমর্পন করতে চেয়েছে। সে চণ্ডীর ব্রতদাসী। তাই সকলে তাকে ছেড়ে দেয়। অতঃপর বনে পঞ্চবিদ্যাধরিদের চণ্ডীপূজা করতে দেখে খুল্লনা পরিশুদ্ধ হয়ে তাদের সঙ্গে যুক্ত

হয়। তার ফলে চণ্ডীর কৃপায় পুনরায় সে সমস্ত ছাগল ফিরে পায়।

এরপর খুল্লনার জীবনে দুঃখের দিন অস্তমিত হয়। চণ্ডীর ভক্ত খুল্লনার জীবনে সুখের নতুন দিন ফিরে আসে। চণ্ডীর স্বপ্নে ভীত লহনা তাকে অপ্রত্যাশিত আদর যত্ন করে। খুল্লনাকে লহনা বারংবার চুম্বন করে। দুর্বলা দাসীকে দিয়ে বিভিন্ন প্রকার মাছ ও ব্যঞ্জন রন্ধন করে তাকে খাওয়ার জন্য তোষামোদ করা হয়। কিন্তু লহনা এরূপ দয়া দাক্ষিণ্যের কারণ প্রকাশ করে না। বুদ্ধিমতী খুল্লনার কাছে তা বুঝতে দেরী হয় না। তাই খুল্লনা লহনার ভিতরের লুকিয়ে থাকা দুর্বলতাকে উস্কে দিয়ে একটু তীর্যক ভাবে বলে —

"কহিতে বিদরে হিয়া কি কহিব দুখ।
দুর্গার কৃপাতে দিদি মোর হৈল সুখ।।"[২৬১]

লহনা তাতে লজ্জিত হয়। লহনার প্রতি খুল্লনার এই কথায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

এরপর দেবী চণ্ডী ধনপতির ছদ্মবেশ ধারণ করে স্বপ্নে এলে খুল্লনার কামিনী রূপ বিকাশ পায়। ঘুম ভাঙার পর স্বামীকে না পেয়ে তার যৌবন জ্বালার মাঝে স্বামীর দুঃশ্চিন্তায় মনকে আচ্ছন্ন করে। নিজেকে হতভাগিনীর আখ্যা দিয়ে যন্ত্রণাকে নীরবে আত্মস্থ করে। দেবী চণ্ডী তার সম্মুখে কাক রূপে এসে তার স্বামীর গৃহে ফেরার আশ্বাস দেয়। স্বামী স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের খবর পেয়ে স্বীয় শিথিল সৌন্দর্যকে খুল্লনা বেশভূষায় পরিপাটি সজ্জায় সজ্জিত করে নিয়েছে। এই স্থানে খুল্লনার যেমন রূপ সজ্জার পারিপাট্য রয়েছে, সেরূপ রয়েছে তার পতিভক্তি। দীর্ঘদিন পর স্বামীর আগমনে সে বিভিন্ন প্রকার ব্যঞ্জন রন্ধন করে খাওয়ায়। তারপর খুল্লনা ধনপতির সঙ্গে শয্যাগৃহে যায়। শয্যাগৃহে ধনপতির ঘুমন্ত অবস্থায় নাক ডাকার শব্দ শুনে খুল্লনা তার নাক চেপে ধরে। খুল্লনার এই আচরণ কৌতুকাবহ। নিদ্রাভঙ্গের পর ধনপতি তাকে সম্ভোগবাসনা জ্ঞাপন করে। স্বামীর এই অভিসন্ধিকে সে অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নিবারণ করে। এবং তার অনুপস্থিতিতে সতীন লহনা কর্তৃক স্বীয় দুঃখ-কষ্টের যন্ত্রণা আত্মাভিমানের সুরে ও বারোমাস্যার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছে। এই অবস্থায় ধনপতি তার রূপ যৌবনের প্রশংসা করলে খুল্লনা নিজেকে স্বামীর কাছে সঁপে দেয়।

কিন্তু এই মিলনের আনন্দ তার দাম্পত্য জীবনে ক্ষণকালের। অতঃপর তার জীবনে আসে কঠোর পরীক্ষা দেওয়ার পালা। ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে নানা স্থান থেকে স্বজাতিবর্গ নিমন্ত্রিত হয়। বণিক সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন নিয়ে ঘোর কলহ বেঁধে যায়। তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান বিষ্ণু দত্ত ধনপতিকে হেনস্থা করার জন্য সদাগরি পাকে ফেলে স্ত্রী খুল্লনার বনে ছাগল চরানোর ফলে সতীত্ব ভ্রষ্টের দোষ উত্থাপন করে। খুল্লনা যদি সতীত্বের পরীক্ষা না দেয়, তবে ধনপতিকে একলক্ষ টাকা দিতে হবে, তবেই তারা তার গৃহে ভোজন করতে পারে। ধনপতি জ্ঞাতির গঞ্জনার

ভয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে চেয়েছে। কিন্তু খুল্লনা তার সতীত্ব সম্পর্কে অবিচল নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে। সে স্বামীকে সর্বদা তার সতীত্ব সম্বন্ধে আত্মস্থ করতে চেয়েছে। কিন্তু ধনপতি শিথিল বিশ্বাসে খুল্লনাকে আভাসে ঈঙ্গিতে সন্দেহ পোষণ করে। খুল্লনাকে সে পরীক্ষা থেকে বিরত থাকতে বলে এবং তাদের লক্ষ টাকা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু খুল্লনা নির্বোধ নয়, সে তাদের অত্যাচার ও শোষণের ফাঁদ সম্পর্কে অবহিত। সে ধনপতিকে বলে —

"বনে খুলনার জ্ঞাতি নল্য কুনজন।
প্রমাদ ভাবিছে প্রভু এহি সে কারণ।।"[২৬২]

সে কঠোর পরীক্ষা দিতে রাজী। সে সতী। নিজের চরিত্রের দৃঢ়তা দেখাতে প্রফুল্লমুখে সভায় পরীক্ষা দিতে দাঁড়ায়। খুল্লনা সমাজের অর্থনৈতিক শোষণ সম্পর্কে অভিজ্ঞ নারী। সে জানে প্রতি বছর এরূপ তার চরিত্র দোষ উত্থাপন করবে এবং ধনপতিকে জ্ঞাতি-কুল নষ্টের ভয় দেখিয়ে তারা সুবিধা ভোগ করবে। এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। সে জানে তার সতীত্বের পরীক্ষা না দিলে সমাজ ও পরিবারের গঞ্জনা ক্ষান্ত হবে না। সে ধনপতিকে বলে —

"খুলনা বোলেন তঙ্কা দিবে একবার।
জনমের মত কৈল কলঙ্ক আমার।।
আমি দুষ্টা হব প্রভু তুমি অভাজন।
বচ্ছরে ২ তঙ্কা লবে জ্ঞাতিগণ।।
পরীক্ষা করিতে জদি না দিবে আমারে।
গলে কাতি দিব কিবা মরিব সাগরে।।"[২৬৩]

এখানে খুল্লনা প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী ও প্রতিবাদী চরিত্র।

খুল্লনাকে কঠোর থেকে কঠোরতর সাতটি পরীক্ষা দিতে হয়। তাকে সাজির মধ্যে জলপূর্ণ করে ডুবাতে চেষ্টা করা হয়, লোহার শাবল দগ্ধ করে বিদ্ধ করতে চেষ্টা করা হয়, সর্প দ্বারা দংশনের ব্যবস্থা করা হয়, দাঁড়িপাল্লায় তুলা ও তাকে তুলে পরীক্ষা করা হয়, ধানের খোলস দ্বারা নৌকা তৈরী করে জলে ডোবানোর চেষ্টা করা হয় এবং শাণিত ক্ষুরের উপর সাতবার খুল্লনাকে হাঁটতে হয়। অবশেষে জতুগৃহ নির্মাণ করে খুল্লনাকে তার মধ্যে রেখে আগুন দেওয়া হয়। কিন্তু শুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় এই জতুগৃহ থেকে খুল্লনা সতী আরও উজ্জ্বল হয়ে বের হয়। এবার শত্রুগণ পরাভব মেনে খুল্লনাকে প্রণাম করে। কবি তৎকালীন পুরুষ সমাজকে অত্যন্ত দক্ষতায় নারীর পদস্থলে স্থাপন করিয়ে ছেড়েছেন। কবির কথায় —

"জ্ঞাতি বিদ্যমানে রামা দিল দরশন।

ধরিল সকল জ্ঞাতি খুলনার চরণ।।''[২৬৪]

নারী হিসেবে খুল্লনার এই সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে রামায়ণের সীতার সতীত্ব পরীক্ষার সাদৃশ্য রয়েছে। খুল্লনার এইরূপ প্রতিস্পর্ধী আচরণ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমী বলে মনে হয়।

পাশাপাশি খুল্লনা স্বামীপরায়ণ নারী। স্বামীর মঙ্গল কামনা করে সে চণ্ডীর মণ্ডপে যায়। সে শরীর পরিশুদ্ধ করে সূর্য পূজা করে নেয়। এরপর খুল্লনা চণ্ডীর ঘট স্থাপন করে অত্যন্ত সমারোহের সঙ্গে দেবী চণ্ডীর পূজা করে। তার পূজায় চণ্ডী তুষ্ট হয় এবং তার গৃহে আগমন করে। উভয়ের কথা শুনে লহনা স্বামীর কাছে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার জন্য পর পুরুষের সঙ্গে খুল্লনার সম্পর্কের কথা জানায়। তাতে ধনপতির গৃহে প্রত্যাবর্তন এবং ক্রোধান্বিত হয়ে চণ্ডীর সেই ঘট লাথি মেরে ফেলে দেয়। এবং খুল্লনাকে ধনপতি চণ্ডীর পূজা ত্যাগ করে শিব পূজা করতে আদেশ দেয়। শিব ভক্ত ধনপতির গৃহে তার স্ত্রী কর্তৃক চণ্ডীপূজার মধ্য দিয়ে একই গৃহে দুই শক্তির বিরোধের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। খুল্লনা পুনরায় দেবীকে আরাধনা করে। কিন্তু দেবী তার ডাকে সাড়া দেয় না। তখন স্বামীর মঙ্গলাকঙ্ক্ষায় খুল্লনা স্বীয় মস্তকের চুল তুলে, পিঠের চামড়া, হাতের দশ আঙ্গুল, জিহ্বা ও দুই কান কেটে দেবীকে প্রদান করে। এখানে তার স্বামীর প্রতি প্রাণাধিক ভক্তি ও অবিচল নিষ্ঠার পরিচয় রয়েছে।

শ্রীমন্তের জন্মের পর তার স্বামী ভক্তি মাতৃস্নেহে পরিবর্তিত হয়। সে সর্বদা শিশু শ্রীমন্তকে আগলে রাখে। তার দুরন্তপনার অভিযোগ অবলীলাক্রমে সহ্য করে। সে পুত্রের বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনার বিষয়ে চিন্তিত হয়। স্বামীর কথা মত সে শ্রীমন্তের শিক্ষার ব্যবস্থা করে। খুল্লনা বলে —

''মুক্ষ হঞা বাড়ে পুত্র সাধু নাই ঘরে।
সাধু আসিঞা মন্দ বলিবে আমারে।।''[২৬৫]

খুল্লনা দাসী দুর্বলাকে দিয়ে পণ্ডিত শ্রীহরিকে গৃহে ডেকে আনে। এবং পুত্রকে সে গুরুগৃহে শিক্ষা লাভের জন্য দেয়। পুত্র গুরুগৃহ থেকে অপমানিত হয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে। এদিকে খুল্লনা পুত্র ফেরার সময় অতিক্রম হলে কেঁদে আকুল হয়। সে গুরুগৃহে পুত্রের সন্ধান না পেয়ে তার ব্রাহ্মণী সখীর বাড়িতে যায়। সেখানে শ্রীমন্তকে পাওয়া যায় না। এভাবে সে যত্রতত্র সন্ধান করে বেড়ায় শোকাকুলা মাতার মত। তার এই বাৎসল্যবোধ কৃষ্ণপ্রাণা যশোদার ন্যায়।

''কান্দিয়া আকুল হৈল খুলনা যুবতি।।
এইমতে স্থানে ২ পুত্র তল্বাসিল।''[২৬৬]

অতঃপর শ্রীমন্ত তাকে পিতার কথা জিজ্ঞাসা করে। তখন স্বামীর প্রতি চণ্ডীর বিরূপ ভাবনার কথা

সে বলে। তার স্বামী জীবিত — এই বিশ্বাস তার রয়েছে। তাই সে সতীত্বের রীতি-আচারগুলি এখনও লঙ্ঘন করেনি। এসকল কথা বলে বিচলিত পুত্রকে পিতার সম্বন্ধে আশ্বাস দেয়। এবং সে তার পিতার দেওয়া পত্রটি হাতে দেয়। পুত্রের যাত্রার সময় অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকে। সেই সঙ্গে সন্তানের পথের বিপদ আশঙ্কা করে মাতা খুল্লনা শঙ্কিত। পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্খা করে চণ্ডী পূজার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই সময় চণ্ডী শ্বেতমাছির ছদ্মবেশে খুল্লনার কানে প্রবাসে পুত্রের বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার মন্ত্রণা দেয়। তখন খুল্লনা শ্রীমন্তকে কাছে বসিয়ে স্বীয় দুঃখ-কষ্টের কথা বলেছে, যাতে পুত্রের প্রতি তার অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে। পিতাকে পেয়ে শ্রীমন্ত যাতে তাকে ভুলে না যায়, তা আকুল কণ্ঠে প্রকাশ করে। স্বামী ছাড়া তার হৃদয় দুঃখে বুক পাথর হয়ে গেছে। এই অবস্থায় পুত্রই একমাত্র তার অবলম্বন। তাই সে বলে —

“পুত্র সঙ্গে খুলনা বসিল একঠাই।
দুঃখ সুখে কথা বাছা তোমারে সধাই।।
বিদেশে জাইবে পুত্র আমি বলি তোকে।
পিতাকে পাইঞা পুত্র পাশরিবে মোকে।।
তোর পিতা গেল মোকে বুকে শিলা দিঞা।
তুমি জে বিদেশে জাঅ অনাথ করিঞা।।
পুত্রের সমান ধন ত্রিভুবনে নাই।
উজানীর মধ্যে মোকে কে বলিবে মায়।।”[২৬৭]

তার পুত্র স্নেহ ও পুত্রকে অবলম্বন করে জীবন চালনার বাসনাই বড় হয়ে উঠেছে। এখানে তার স্ত্রীসত্তা একটু শিথিল হয়ে জাগ্রত হয় মাতৃসত্তা। তার এই সত্তার বিবর্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সুন্দর।

তা সত্ত্বেও শ্রীমন্ত মাতার কাছ থেকে পিতার পত্র নিয়ে সিংহল যাত্রা করে। শ্রীমন্ত পিতাকে নিয়ে উজানী নগরের নদীর ধারে উপস্থিত হয়। স্বামী পুত্র ফিরবার কথা শুনে সে দৌড়ে যায়। কিন্তু সে চণ্ডী প্রণতি করে নৌকা পূজায় ব্যস্ত। শ্রীমন্ত মাতাকে পিতার কথা স্মরণ করাতে পিতার একটি সূক্ষ্ম বস্ত্র খুল্লনার সম্মুখে সনাক্তকরণ স্বরূপ মাটিতে পেতে দেয়। তা দেখে খুল্লনার হৃদয় চকিত হয়, কিন্তু স্বামীর প্রতি দীর্ঘ প্রতীক্ষার আনন্দ প্রকাশ পায় না। সে চণ্ডী পূজা এবং পুত্র ও নববধূকে নিয়েই মত্ত হয়।

“পিতার নেতখানি ভূমে বিছাইল।
তাহা দেখি খুলনা রামা চমকিত হৈল।।
সাধুর নেতখানি খুলনা চিহ্নিঞা।

নেতকে বন্দিল রামা ভূমিতে পড়িএগ্র।।
দুর্গাকে প্রনতি করি নৌকা পূজিএগ্র।
পুত্রবধূ খুলনা লইল আলচিএগ্র।।"[২৬৮]

বস্তুত খুল্লনার চরিত্রে দুটি সত্তার (স্ত্রী ও মাতৃ) বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ঘটনার সঙ্গে তার চরিত্র গুণাবলী পরিবর্তন ঘটেছে। কবি চরিত্রকে প্রথাগত গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন; ঘটনা বা পরিস্থিতির বিপরীত স্রোতে প্রথামুক্তির আস্বাদ খোঁজেন নি।

এবার 'ধনপতি খণ্ড'-এর অপ্রধান চরিত্রগুলির আলোচনায় আসা যাক।

বণিক খণ্ডের **জয়পতি** ও **নিধুপতি** চরিত্রটিও উচ্চবিত্তের প্রতিনিধি। এই খণ্ডে জয়পতি মানব চরিত্র। সে বণিক এবং উজানি নগরে তার নিবাস। তার স্ত্রীর নাম উর্বশী। পুত্র ধনপতি। আর নিধুপতিও বণিক। তার বাসভূমি ইন্দ্রানী নগরে। তার কন্যার নাম লহনা। উপযুক্ত কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তিত। তার সঙ্গে জয়পতির কুল-ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হয় সঙ্গে। সে তার বিধান দেয়। ব্রাহ্মণ পঞ্জিকা দেখে দিনক্ষণ বিচার করে বিবাহের দিন স্থির করে। জয়পতিও তার সমস্ত আত্মীয়স্বজনদের আমন্ত্রণ জানিয়ে পুত্রের বিবাহ দেয়। নিধুপতি নিজেই জামাতাকে বরণ করে। কুলের ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্র পাঠ করে। কবির ভাষায় —

"নিধুপতি সাধু করে জামতা বরণ।
বেদমন্ত্র উচ্চারিল কুলের ব্রাহ্মণ।।"[২৬৯]

তাতে উচ্চবর্ণের বণিক সমাজে পুরুষ প্রধান আর্য সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কন্যার সুখ-শান্তির চিন্তায় নিধুপতির পিতৃসত্তার জাগরণ ঘটেছে। সে কন্যার শ্বশুরালয়ে যাত্রায় ব্যাকুল ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ে। এমনকি, বিবাহ সভায় কন্যাপক্ষের দোষ ত্রুটি হলে তার ফলশ্রুতি কন্যার উপর বর্তাবে। সকল দিক চিন্তা করে পিতা নিধুপতি জয়পতিকে হাত ধরে অনুনয় বিনয় করে। এবং বিবাহ রাত্রের সমস্ত ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে নেয়। কন্যার বিবাহে পিতা নিধুপতির অবস্থা কবি এই ভাবে তুলে ধরেছেন —

"ধনপতির হাতে লহনাক সমপিয়া।
করূণা করিছে সাধু ভূমিতে পড়িয়া।।
জয়পতি হস্ত নিধুপতি ধরে।
বিহাই বিবাহের রাত্রের দোষ ঘাইট খেমিবেন আমারে।।"[২৭০]

নিধুপতির চরিত্র অঙ্কনে কবি বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন।

ধনপতির সঙ্গে খুল্লনার সাক্ষাতের উপায় স্বরূপ পায়রা উড়ানো বিষয়টি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এসেছে। ধনপতির পায়েরা উড়ানোর আভিজাত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে **জনার্দন ওঝা**, **হরিয়া ছুতার** ও

কাণ্ডার বুলন চরিত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। এরা সকলে ধনপতির সঙ্গ নিয়েছে। বৃত্তিতে তারা নিম্নশ্রেণীর।

"পায়েরা খেলিতে জায়ে সাধু ধনপতি
সঙ্গে ওঝা নড়ে জনার্দ্দন।
হরিয়া ছুতার নড়ে হিরার গড়ণ গড়ে
সঙ্গে ভাই কণ্ডার বুলন।।"[২৭১]

হরিয়া বৃত্তিতে ছুতোর। তার ভাই বুলন। বুলন উচ্চবিত্ত শ্রেণী প্রতিনিধি ধনপতির পথ -প্রদর্শক। উচ্চবিত্তের ধনপতির সঙ্গে ইছানি নগরের ধূলিয়া মাঠে সাক্ষাৎ হয় **হরি দত্ত**-এর। সেও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। তার সঙ্গে ধনপতির পায়রা খেলার প্রতিযোগিতা। একলক্ষ টাকা এই খেলায় তারা রাজী করে। কিন্তু হরি দত্ত তাতে পরাজিত হয়। তবুও ধনপতির পায়রাও খুঁজে পাওয়ার সংবাদ হরি দত্তই দেয়। সেই সূত্রে ধনপতি লক্ষপতির দ্বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তার সঙ্গী হয় বুলন। ধনপতির আজ্ঞাবহ সে। ধনপতির কথায় সে লক্ষপতিকে ডাকতে যায়। এই ভাবে উচ্চশ্রেণীর মানুষের কথা বলতে গিয়ে অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষদের স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা হয়েছে।

তবে **লক্ষপতি** বণিক। সে ধনপতির খুড়তুতো শ্বশুর। জামাইয়ের প্রেরিত বার্তায় সে তৎক্ষণাৎ তার সম্মুখে উপস্থিত হয়। ধনপতি জল প্রার্থনা করলে দেবীর ছলনায় লক্ষপতি তা প্রদানে অক্ষম হয়। কিন্তু সে ধনপতিকে পান দিয়ে আপ্যায়ন করতে ত্রুটি করে না। যুবতী কন্যা খুল্লনাকে দেখে ধনপতি তাকে উপযুক্ত কন্যার বিবাহ সম্পর্কে অনুযোগ করে। তাতে লক্ষপতির মাথা হেট হয়ে যায়।

"ই কথা শুনিয়া সাধু হেট কৈল মাথা।
উপযুক্ত কন্যার নামে সাধু পাইল ব্যাথা।"[২৭২]

যুবতী কন্যার বিবাহ না দিতে পারলে লক্ষপতির মত উচ্চবর্ণের পিতাকেও সামাজিক গঞ্জনার শিকার হতে হত। পিতৃহৃদয়ের দুর্বলতা লক্ষ্য করে ধনপতি তার উদ্দেশ্য উথাপন করে। কিন্তু পিতা লক্ষপতি কন্যার বিবাহ সতীনের গৃহে দিতে দ্বিধান্বিত। সে ধনপতিকে বলে — "কি বোল বলিলা বাপু ধড়ে থুইয়া জীউ।"[২৭৩] একদিকে তার পিতৃসত্তা জনিত কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তা এবং অন্যদিকে সামাজিক কুলমর্যাদার দিক থেকে বহুবিবাহের নীরব সম্মতিতে লক্ষপতি চরিত্রটি জীবন্ত। এই অবস্থায় সে স্ত্রী রম্ভাবতীর মনোবাঞ্ছা জানা শ্রেয় বলে মনে করে। শেষ পর্যন্ত লক্ষপতি ধনপতির সঙ্গে কন্যার বিবাহে সম্মতি দেয়।

'বণিক খণ্ডে' **বিক্রমকেশর** উজানি নগরের রাজা। তার কন্যা জয়াবতী। এই রাজ্যেই বসতি ধনপতি নামে বণিকের। ধনপতির সঙ্গে তার পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের কথা বড়

হয়ে উঠেছে। ধনপতিকে বিক্রমকেশর 'আঁটকুড়া' অপবাদ দেয়। সমাজ ও রাজ্যে আঁটকুড়া থাকা শুভ ও কল্যাণ কর্মে ব্যাঘাত ঘটায় — এই ছিল তখনকার ভাবনা। এই বিশ্বাস সকলের মধ্যে চূড়ান্ত। তাই রাজার অপবাদ নিবারণের জন্য ধনপতি দ্বিতীয় বিবাহ করে। কিন্তু তার দ্বিতীয় বিবাহ রাজা বিক্রমকেশরের আজান্তে হওয়ায় সে তার প্রতি ক্রোধান্বিত হয় এবং ধনপতিকে কারারুদ্ধ করে। কিন্তু ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত দক্ষিণ পাটনের রাজকন্যা সুশীলাকে বিবাহ করে ফিরলে বিক্রমকেশর তার আভিজাত্যকে টিকিয়ে রাখতে তার কন্যা জয়াবতীকেও তার সঙ্গে বিবাহ দেয়। এক্ষেত্রে রাজা বিক্রমকেশরের মধ্যে একই সঙ্গে সামাজিক বহুবিবাহ প্রথা এবং আভিজাত্যের মহিমা ভাস্বর।

বিক্রমকেশরের পাশাপাশি রাজা **শ্রীবৎস**-এর কথা পাওয়া যায়। সে কোন্ রাজ্যের রাজা কাব্যে তাঁর কোন উল্লেখ নেই। শারী-শুক নামক পাখি দুটি এই রাজা কর্তৃক পালিত হয়। সে শনি মহারাজের দ্বারা ছলনা শিকার হয়। শনির ছলনার কথা শারী স্মরণ করে দিলেও সে তার কথা অমান্য করে সন্ন্যাসীরূপ শনির সামনে উপস্থিত হয়। শ্রীবৎসের উপর শনি কামবাণ নিক্ষেপ করে। কামপ্রবৃত্ত হলে রাজার একাদশী ব্রত লঙ্ঘন হয়। সেই পাপে শনির দৃষ্টি লাগল তার উপর। তার ফলে রাজা শ্রীবৎস যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সেদিকেই ধনলক্ষ্মী অদৃষ্ট হয়। এখানে লোক প্রচলিত বিশ্বাস তার চরিত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এরূপ অবস্থায় প্রজাবৎসল রাজা শ্রীবৎস প্রজার কল্যাণের দিকে লক্ষ রেখে রাজ্য পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। রাজা দর্জি এনে কাঁথা তৈরী করে তাতে সমস্ত ধন পরিপূর্ণ করে এবং স্ত্রী চিন্তাবতীও শারী-শুয়াকে নিয়ে পলায়ন করে। কিন্তু খেয়া পারাপারের সময় রাজা শ্রীবৎস পুনরায় শনির ছলনার শিকার হয়। তাতে শারী-শুক সহ সমস্ত ধন হারায়। নীঃস্ব রাজা বাধ্য হয়ে পুনরায় রাজ্যে ফিরে আসে।

অভিজাত রাজা চরিত্রের সঙ্গে নিম্ন শ্রেণীর চরিত্রগুলিও তার জীবিকায় সচল হয়ে উঠেছে। সেই নিম্নশ্রেণী ব্যাধ চরিত্র হল **উতু ও পাতু** নামে দুই ভাই। শারী-শুক্রের ধরা পড়া এবং কাহিনী নিয়ন্ত্রণে তাদের ভূমিকা রয়েছে। তারা দুই ভাই বনে পাখি শিকার করে এবং বাজারে তা বিক্রি করে। তারা শিকারজীবী। কবির ভাষায় —

> "উতুপাতু নামে ব্যাধ দুই ব্যাধ ছিল।
> পক্ষ মারিতে দুহে সাজিতে লাগিল।।"[২৭৪]

শিকারের উপর তাদের সংসার অতিবাহিত হয়। তারা শিকারে বিচক্ষণ। তাতে শারী-শুয়া পক্ষিদ্বয় নিজেদের কথা ভেবে কাঁদতে থাকে। শারী পক্ষী নিজেকে উতু ও পাতুর হাতে আত্মসমর্পণ করে। শুয়াকে তারা আহার দ্বারা খাঁচায় বন্দী করে। শারী শুয়ার ক্রন্দনে ব্যাধদ্বয়ের সহানুভূতি জাগ্রত হয়। পক্ষীদ্বয়ের কথামতো উতু ও পাতু তাদেরকে রাজা বিক্রমকেশরের রাজদরবারে নিয়ে যায়।

শারী-শুয়া ব্যতীত তারা বিভিন্ন প্রকার পাখি বিক্রি করে। তাতে নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা ফুটে উঠে।

অন্যদিকে, উচ্চবিত্ত শ্রেণীও সামাজিক রীতির কাছে অসহায়। তার প্রতিভূ **হরি বান্যা** চরিত্রটি। সে খুল্লনার ভ্রাতা। রম্ভাবতীর একমাত্র পুত্র। মায়ের ক্রন্দনে তার হৃদয় ব্যাকুল। তাতে সে গুরুর গৃহ থেকে বাড়ি ফিরে আসে। মায়ের কাছে সে বোনের সমস্ত দুঃখের ঘটনা শোনে। তার জন্য অলংকার নিয়ে বনে উপস্থিত হয়। ভ্রাতা হিসাবে তার সাহস হয়নি সামাজিক রীতির কঠোর বন্ধন অস্বীকার করে খুল্লনাকে পিত্রালয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাকে বাধ্য হতে হয়েছিল সমস্ত অলংকারাদি রেখে আসতে। খুল্লনার সামাজিক কোন খারাপ অপবাদ রটনার ভয়ে সম্মুখে না গিয়ে দূর থেকেই সমস্ত কিছু রেখে চলে আসে। তার চরিত্রের মধ্য দিয়ে সামাজিক রীতি বন্ধনে মানুষ কতটা অসহায় তা পরিস্ফুট হয়েছে।

খুল্লনার দুরবস্থা অতিক্রম করার সূচক হিসাবে রাজা **ধনেশ্বর** চরিত্রটির আগমন। সে গৌড়ের অধিশ্বর তার রাজ্যে অবস্থানরত বণিক ধনপতি। দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশে ধনপতি গৃহাভিমুখী হওয়ার ব্যাকুলতা লক্ষ্য করে রাজা ধনেশ্বর সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। সে ধনপতির জন্য স্বর্ণপিঞ্জর তৈরী করতে সাতজন স্বর্ণকারকে ডাকে। ধনপতির সঙ্গে রাজা মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তাকে গৌড়েই থেকে যেতে অনুরোধ করে। কিন্তু ধনপতি খুল্লনার রূপসৌন্দর্যে মোহগ্রস্ত। এই অবস্থায় রাজা ধনেশ্বর নারী জাতিকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখেছে এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর নিম্ন অবস্থানকে ধনপতির সম্মুখে তুলে ধরেছে। তার কাছে নারী পুরুষের জীবনে সাময়িক প্রয়োজনের বস্তু এবং সকলের ভোগ্যা। তাই ধনপতিকে সে বলে —

> ‘‘নারীর কারণে ভাবে ধিক তার জী।।
> এক হিত কথা শুন মিতা মহাশয়।
> নারীলোক আপনার কোন যুগে নয়।।
> পর পুরুষের আশ করে সর্ব্বথায়।
> নারী কি আপন হয় কুন শাস্ত্রে কয়।।’’[২৭৫]

এমনকি, সে ধনপতিকে তৃতীয় বিবাহ করার কথা বলে। রাজা ধনেশ্বর চরিত্রের মধ্যে কৌলিন্য প্রথার ব্যাপকতা এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অস্তিত্ব সংকটের চিত্র ফুটে উঠেছে।

বণিকরা সমাজে অর্থশ্রেষ্ঠ। মানিক দত্ত এই বণিক শ্রেণীর অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন। ধনপতির পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ঘটনাকে পটভূমিকা রূপে অঙ্কন করা হয়েছে। শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হয় বিভিন্ন গ্রামের ক্ষমতাসম্পন্ন বণিকরা। তারা হল **নীলাম্বর দাস**, **রাম রায়**, **সনাতন**, সপ্তগ্রামের **বিষ্ণু দত্ত**, **শঙ্খ দত্ত**, চাঁপালির **চাঁদ সদাগর**, দিম্বীপের **হরিহর** ও ইছানীর **লক্ষপতি** উল্লেখযোগ্য।

এদের মধ্যে সমাজ-প্রধান চাঁদ সদাগর। চাঁদকে ধনপতি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উপস্থিত বণিকদের মধ্যে কুল শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করে তার কপালে চন্দন ও গলায় মালা দেয়। তাতে প্রতিবাদ করে নীলাম্বর দাস। সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের লড়াই চললেও নীলাম্বরের পারিবারিক ব্যবসা উচ্চমানের নয়। চাঁদ সদাগর নীলাম্বরকে বলে —

"তোর বাপ লবন বেচে চক্ষ করে টেড়া।
ফাএর কারণে লোকসনে করিত ঝগড়া।।"[২৭৬]

নীলাম্বরের পাশাপাশি অন্যান্য বণিকরাও কুলশ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া শুরু করে। এই নিম্নমানসিকতার সঙ্গে তারা সমাজের অধিকর্তা তারও বিবৃতি পাওয়া যায়। খুল্লনার ছাগল চরানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। তারা ধনপতি হেনস্থা করতে তার স্ত্রী খুল্লনার সতীত্ব নষ্টের অপবাদ দেয়। অপবাদ থেকে রক্ষার একমাত্র উপায় একলক্ষ টাকা ঘুষ। নতুবা ধনপতির গৃহে তারা অন্নগ্রহণ করবে না। বণিক শ্রেণীর মানসিকতা, অধঃপতন, ক্ষমতার নামে জুলুমের চিত্র পরিস্ফুটনে চরিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য।

সামাজিক অবস্থার পরিচয় প্রদানে **গোপাল** চরিত্রটির ভূমিকা অসামান্য। সে চোর। দেবী চণ্ডীর আদেশে রাজা বিক্রমকেশরের রাজদরবার থেকে চন্দন চুরি করে। সে চণ্ডীর অনুগত ভক্ত। রাজসভার প্রয়োজনে চন্দনের জন্য ধনপতির সিংহল যাত্রা। কাহিনীর ধারা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গোপাল চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য।

বণিক খণ্ডে অপ্রধান শিশু চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য **ভোলা**। সে যাইট দত্তের পুত্র। তার সঙ্গী ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত। শ্রীমন্তের বাল্য বয়সের চাঞ্চল্য ও দুরন্তপনা প্রকাশে ভোলার গুরুত্ব রয়েছে। শ্রীমন্ত কর্তৃক ছোঁড়া ধুলো তার চোখে গিয়ে লাগে। তাতে ভোলার কান্না ও তার পিতা যাইট দত্তের অভিযোগ অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

শ্রীমন্তের বাল্য শিক্ষক তথা গুরু হল পণ্ডিত **শ্রীহরি**। সে শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তাকে দাসী দুর্বলা ডেকে আনে শ্রীমন্তকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য। প্রথমে সে তাকে শুভক্ষণ গণনা করে হাতে খড়ি দেয়। তার আলয়ে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে শাস্ত্রজ্ঞান দেওয়া হয়। শিষ্যদের কাছ থেকে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ সুবর্ণমোহর নেওয়া হত। চণ্ডীর ছলনায় শ্রীমন্তের হাতের খড়ি মাটিতে পড়লে তা গুরুকে তুলতে আদেশ করে। তাতে শ্রীহরি ক্রোধ প্রকাশ করে এবং শ্রীমন্তকে জারজ সন্তান বলে গালাগাল করে। কবি বলে — "সাধুকে পণ্ডিত জদি জারূয়া বলিল।"[২৭৭] শ্রীহরি চরিত্রের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের গুরুগৃহে শিক্ষা ব্যবস্থা ও শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রার কারণ অনুসন্ধান করা যায়।

সিংহল বা দক্ষিণ পাটনের রাজা **শালবান**। বণিক খণ্ডের চরিত্র সে এবং তার কন্যা

সুশীলা। তার সঙ্গে শ্রীমন্তের বাণিজ্যিক কারণে সাক্ষাৎ হয়। শ্রীমন্ত তাকে নানা ভেটজাত দ্রব্যের সঙ্গে নারকেল প্রদান করে। কিন্তু রাজা নারকেল যে ফল সে সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। তাই, শ্রীমন্তকে কূটচক্রান্তকারী ভেবে সন্দেহ করে। তার মনে হয়েছে বিষ ফল দিয়ে তাকে হত্যা করার চক্রান্ত করা হচ্ছে। শ্রীমন্তকে সেই নারকেল খাওয়ানোর পর সেই অজানা বস্তুটি যে অনিষ্টকর নয় তার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

''রাজার কথা শুনি সাধু নারিকল খাল্য।
নারিকল খাঞা দুই প্রহর হইল।।
প্রত্তয় পাইঞা রাজা শ্রীমন্তকে বলে।
বুঝিলাম বিষ নাই নারিকেলের ফলে।।''[২৭৮]

অতঃপর শ্রীমন্ত কমলে কামিনীর কথা উত্থাপন করলে শালবান তা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়। যদি সত্য হয় তবে সে শ্রীমন্তকে অর্ধ রাজ্য ও কন্যা দানের শর্ত করে। শ্রীমন্ত কমলে কামিনী দেখাতে ব্যর্থ হলে তার সমস্ত বাণিজ্যিক দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করে তাকে কারারুদ্ধ করা হয়। শালবান মশানে তার মুণ্ডচ্ছেদের আদেশ দেয়। শ্রীমন্তকে রক্ষার জন্য দেবী চণ্ডীর আগমন এবং শালবানের সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাজা শালবানের শিবভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শিবের দেওয়া শক্তিশেল দ্বারা রাজসেনারা দেবীর দৈত্যদের নাশ করে। বলা হয়েছে —

''শালবানকে শিব শক্তিশেল দিয়াছিল।
সেই শেল রাজসেনা মারিতে লাগিল।।''[২৭৯]

যুদ্ধে সেনাদের মৃত্যুতে শালবান শোকাহত। এই অবস্থায় তার মহাপাত্র দামোদর তাকে দেবীর স্মরণ নিতে বলে। পরিস্থিতির চাপে শিব ভক্ত শালবান অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে দেবীর চরণে নিজেকে সমর্পণ করে। চণ্ডীর ভক্ত শ্রীমন্তকে কন্যা সুশীলার সঙ্গে বিবাহ দেয় এবং তাকে অর্ধরাজ্য সহ সাতটি নৌকা, হাতি ঘোড়া ও বহুমূল্যবান সম্পত্তি প্রদান করে।

মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের ছবি অধিক পরিমাণে রয়েছে। সেই পরিবারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘটনা কবি মানিক দত্ত বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে জীবন্ত করে তুলেছেন। পরিবারের পরিচায়িকা দাসী থেকে শুরু করে তুক্-তাক্ বশীকরণে পারদর্শি কেউ কবির চোখ এড়ায়নি। তাঁর বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতার পরিচয় এই ধরনের চরিত্রগুলিকে সচল ও প্রাণবন্ত করে তুলতে সাহায্য করেছে। তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিক খণ্ডের এরূপ অপ্রধান নারী চরিত্র **দুর্বলা**। বণিক ধনপতির পরিবারে সে দাসীবাঁদীর কাজ করে। ধনপতির মুখে তার প্রথম 'কিঙ্করী'র পরিচয় পাওয়া যায়। লহনার সে সহচরী। লহনার কুট চক্রান্তে তার সহযোগিতা যথেষ্ট ছিল। পরিবর্তনশীল অবস্থায়ও তার চরিত্রের ভূমিকা

পরিবর্তন হয়নি। এরূপ নারী চরিত্র হিসেবে তার গুরুত্ব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অপরিসীম। দুর্বলা লহনার সহকারী চরিত্র। সতীনের সমস্যা নিবারণের জন্য লহনার নির্দেশে সে নিলাবতীকে ডেকে আনে। পাশাপাশি সে খুব চতুরা ও তোষামোদকারী চরিত্রও বটে। লহনা সংসারে জ্যেষ্ঠ গৃহবধূ। সুতরাং তার ক্ষমতা খুল্লনার তুলনায় অধিক। এই অবস্থায় কীভাবে লহনার মন জয় করা যায় তার কৌশলে দুর্বলা দক্ষ। তাই লহনার সপক্ষে তোষামোদ করে সে খুল্লনাকে বলেছে —

"জদি বা খুলনা তোকে সতিনীএ মারে।
কে করিবে রক্ষা তোরে সামী নাই ঘরে।।"[২৮০]

এখানে সে নামে দুর্বলা হলেও কৌশলে সবলা। সে প্রসঙ্গান্তে রামায়ণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। সে বলেছে যেমনি রামের আজ্ঞাতে সীতাকে বনবাসী হতে হয়েছিল তেমনি লহনার আজ্ঞাতে খুল্লনাকে বনবাসী হতে হবে।

"পুন রামায়ণ কিছু শুন ইতিহাস।
রামের আজ্ঞাতে সীতা গেল বনবাস।।
তোকে হিত খুলনা বলিলাঙ্ সকলি।
সতীনের আজ্ঞামত বনে চরাও ছেলি।।"[২৮১]

এখানে দুর্বলা 'বাঁশের চেয়ে কন্‌চি দড় বেশী' -র মত আচরণ করেছে। লহনার গৃহক্ষমতা যেন দুর্বলাই অধিকার করে নিয়েছে। দুর্বলের উপর দুর্বলা এখানে অতি সবল।

দুর্বলার কুটবুদ্ধি থাকলেও নারী হয়ে সে অন্য নারীর দুঃখে লহনার মত মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেনি। সে খুল্লনার দুঃখের কথা তার বাপের বাড়ি প্রেরণ করে। সে সময় সে একবারের জন্যও লহনার দ্বারা প্রতারণার কথা ভাবে নি। যদিও পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে তোষামোদ করে। কিন্তু আড়ালে তার নারী হৃদয়টি অন্য এক নারীর কষ্টে একটু সময়ের জন্য হলেও কেঁদে ওঠে। তার জন্যই হয়তো সে খুল্লনার দুঃখের কথা নির্দ্বিধায় তার বাপের বাড়ি পৌঁছে দেয়। সে খুল্লনার কথামত তার মাতা রম্ভাবতীর কাছে দুঃখের বার্তা নিয়ে চলে যায়। অতঃপর দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশে লহনা ভীত। তাই খুল্লনাকে ভালো মন্দ রান্না করে খাওয়াতে চায় লহনা। তার জন্য রন্ধন দ্রব্যসামগ্রী লহনার কথা মত দুর্বলাই যোগাড় করে। দুর্বলা তবুও আদেশ মান্য করতে বাধ্য। সেও হয়তো খুল্লনার প্রতি শ্রদ্ধাবশত।

"দাসী দুবলা শীঘ্র দ্রব্য আনি দিল।
লহনা রসইশালে রন্ধনে বসিল।।"[২৮২]

এরপর দুর্বলা চরিত্রের পূর্ণ পরিবর্তন হয়। ক্ষমতা পরিবর্তনের সঙ্গে মনুষ্য চরিত্রের পরিবর্তন — এটা স্বার্থ সর্বস্ব মানুষের স্বাভাবিক গুণ। দুর্বলার ক্ষেত্রে তা অগ্রাহ্যের নয়। ধনপতির

কাছে লহনার স্থান কমতে থাকলে দুর্বলাও নিজেকে সম্পূর্ণ খুল্লনার দিকে সরিয়ে নেয়। তার কুটবুদ্ধি সুবুদ্ধিতে পরিবর্তিত হয়। ধনপতি দীর্ঘদিন পরে ফিরে আসার বার্তা দুর্বলাই খুল্লনাকে দেয়।

''দাসী বোলে খুলনা কি কর বসিঞা।
সদাগর আল্য হের দেখহ আসিঞা।।''[২৮৩]

এবং খুল্লনার গর্ভাবস্থায় সমস্ত বাইরের কাজগুলি দুর্বলা খুব আনন্দ সহকারে করে। গর্ভবতী খুল্লনার জন্য বিভিন্ন প্রকার শাড়ি সংগ্রহ করা এবং আইয়গণকে খবর দেওয়া, সন্তান প্রসবকালে দাইকে ডেকে আনা প্রভৃতি সমস্ত কাজই করেছে। এমনকি শ্রীমন্তের শৈশব কালে দেখভালের দায়িত্বও দুর্বলার উপর বর্তায়। বস্তুতঃ দুর্বলা এখন আর লহনার সহচরী নয়, সে খুল্লনার সহচরী। তার মত দাসী চরিত্রের এই পরিবর্তন স্বাভাবিক। এই রূপ বাস্তব চরিত্রের সংখ্যা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অল্পই পাওয়া যায়। কবির পর্যবেক্ষণ শক্তি না থাকলে এধরনের চরিত্র অঙ্কন করা সম্ভব হত না, দুর্বলা তারই প্রমাণ।

মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে অপর একটি অপ্রধান অথচ প্রাণবন্ত নারী চরিত্র **নিলাবতী**। সে লহনাদের প্রতিবেশী। জাতিতে ব্রাহ্মণ। লহনা তাকে 'সই' হিসেবে মান্য করে। লহনার দাম্পত্য জীবনে সতীন সমস্যা নিবারণের উদ্দেশ্যে কাব্যে তার আগমন। চরিত্রটি কাহিনীতে জটিলতা আনতে ও উপভোগ্য করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

নিলাবতী বশীকরণে পারদর্শী। লহনা স্বামী ধনপতিকে বশ করবার জন্য নিলাবতীকে ডেকে আনে। লহনার রূপ-যৌবন বিগতপ্রায়। ফলে তার প্রতি স্বামীর অবহেলা। এই দাম্পত্য সমস্যা থেকে উদ্ধারের জন্য লহনাকে নিলাবতী স্বামী বশীকরণে উপায় উত্থাপন করে। নিলাবতীর বশীকরণের জন্য যা যা প্রয়োজন কবি তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন বাস্তব অভিজ্ঞতায়। মানিক দত্ত বাস্তবের মাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত স্থান থেকে তাকে তুলে এনেছেন। নিলাবতীর বশীকরণ প্রক্রিয়াটি এরূপ —

''গাছের কথা লহনাকে বলে নিলাবতী।/ হাট হৈতে কিনি আন এক মূল্যের বাতি।।
শশানের সরিষা আর হাএ হামলা।/ ভরন হাটের লাগে এক মুঠি ধুলা।।
প্রথম হাটের সই লাগে গুয়া পান।/ প্রথমে জে অন্ন খায় তার লাগে ধান।।
খঞ্জনের হাড় লাগে আর অঙ্গের মলা।/ সাত কুপের পানি লাগে তেপথির ধুলা।।
অন্ন সহিত এই গাছ সামীকে খাওাবে।/ প্রাণের অধিক সামী তোমাকে জানিবে।।''[২৮৪]

শুধু স্বামী বশীকরণ নয়, লহনার সতীনের রূপ-যৌবন কীভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে তারও ঔষধ দেয়।

"গাছ দিঞা বুড়ি করাইব খুলুনাকে।
সেইটা গাছের কথা বলি সই তোকে।।
তৈলের মধ্যেতে সই দিহ কিছু হিঙ্গ।
তৈলতে দিহ মধু য়ার সুয়াম সিঙ্গ।।
তৈল পাক করি তাতে দিহ কানাকড়ি।
এহি গাছ খাওালে খুলনা হবে বুড়ি।।"[২৮৫]

এসকল কাজে নিলাবতীর পরিপক্কতা অভাবনীয়; বশীকরণে তার জুড়ি নেই।

নিলাবতী শুধু বশীকরণে পারদর্শী নয়, সে যথেষ্ট শিক্ষিতাও বটে। তার চিঠি লেখার কৌশল লক্ষণীয়। কুটবুদ্ধিতে সে তৎপর। সে ধনপতির হয়ে খুল্লনার সর্বনাশের চিঠি লেখে। নিলাবতী লেখে —

"স্বস্তি য়াগে লেখিয়া লেখিল ধনপতি।
সকল মঙ্গলা লয় লহনা যুবতী।।
বচ্ছর রহিব গোড়ে পঞ্জর গড়িতে।
মোর আজ্ঞা লহনা পাহিল লিপিমতে।।"[২৮৬]

তার চিঠির সহায়তায় লহনা খুল্লনার সমস্ত অলংকার ছিনিয়ে নিতে পারে এবং তাকে দিয়ে ছাগল চরাতে বাধ্য করে। প্রতিবেশী গৃহে সতীন কলহে যেকোন ভূমিকা নিতে তার দ্বিধা নেই। এরূপ নিলাবতীর মত কুটনি চরিত্রকে বাস্তবের ধুলো-মাটি সহ তুলে এনেছেন। ফলে চরিত্রটি হয়ে উঠেছে জীবন্ত।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একটি অপ্রধান কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র **সুশীলা**। সুশীলা নিলাবতীর মত দরিদ্র নয়। সে সিংহল রাজ শালবানের কন্যা। মাতা নিলারাণী। সুশীলাকে কবি প্রথাগত কাহিনীর জন্য কাব্যে এনেছেন। তার ফলে চরিত্রটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের পরিধি পায়নি।

রাজা শালবানের কন্যা সুশীলাকে কমলে-কামিনীর শর্ত স্বরূপ দানে শ্রীমন্তকে দেওয়া হয়। শ্রীমন্ত তাকে বিবাহ করে। সেখানে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তার ফলে তার নিজস্ব ব্যক্তি স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার কোন প্রয়াস লক্ষ্য করি না। কিন্তু তার সাজ-সজ্জার চাকচিক্য ও রুচিবোধ রয়েছে। শ্রীমন্তের সঙ্গে বিবাহে সুশীলার রূপসজ্জা তার প্রমাণ। কবির কথায় —

"গৃহে থাকি সুশীলা করিছে নানা বেষ।
বান্ধিল বিচিত্র খোপা আচুড়িয়া কেশ।।
কেশ বান্ধি বেষ কৈল পহ্রিলেন শাড়ী।

কপালে সিন্দু পহ্রে কন্নে পহ্রে কড়ি।।
নয়ানে কজ্জ্বল পহ্রে বেসর নাসাতে।
গলে হার বাহে তার শঙ্খ পহ্রে হাতে।।
সুশীলা পহ্রিল অঙ্গে নানা অলংকার।
চন্দ্র জিনিঞা রূপ হইল সুশীলার।।"[২৮৭]

সুশীলা অত্যন্ত সুন্দরী। তার বাল্য বয়সে বিবাহ হয়। বিবাহ রাতে শ্রীমন্ত মায়ের স্বপ্ন দেখে এবং দেশে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়। অল্প বয়স্কা সুশীলা তার স্বামীকে প্রবোধ জানাতে পারে না। কিন্তু মায়ের কাছে তার কোন কথা বলতে অসুবিধা হয় না। তাই মাকে বলে — "স্বপ্ন দেখিঞা সাধু দেশে জাইতে চাহে।।"[২৮৮] তখন সুশীলা বাধ্য হয়ে স্বামীকে সিংহলে থাকবার জন্য বারমাসের সুখের কথা বলে। যদিও তার বারমাসের কাহিনীর মধ্যে কোথাও একটা মনোবেদনার কথা রয়েছে। ফুল্লরা ও খুল্লনার মত সুশীলার বারমাস্যা নিখাদ দুঃখের কাহিনী নয়। বরং স্বামীকে নিয়ে সুখ ভোগ করার অধীর আগ্রহের বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে।

সুশীলা খুল্লনার মত দুর্গার ব্রতদাসী। ধনপতির সঙ্গে সিংহলে যাত্রাকারী লোকজন মৃত, কিন্তু ধনপতি বেঁচে যাওয়ায় সে ধনপতির জন্য চিন্তিত। শ্বশুরের সমূহ বিপদে ও মান-সম্মান রক্ষার জন্য সে দেবীর স্তুতি করে। তার স্তুতিতে শ্বশুরের মান রক্ষা হয় এবং হারানো সকল ফিরে পায়। স্বামী গৃহে এসে শ্রীমন্তের দ্বিতীয় বিবাহে সে ভেঙে পড়েছে। সতীন সমস্যার নিদারুণ কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য আগেই সে হাতের শাঁখা ভেঙে ফেলে। সতীনের তুলনায় বৈধব্য বেশ তার কাছে শ্রেয়। কবির কথায় —

"বিবাহের কথা জদি সুশীলা শুনিল।
খুলিঞা হস্তের শঙ্খ ভাঙ্গিঞা ফেলিল।।"[২৮৯]

সুশীলার এই আচরণ তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ। তাকে রাজকন্যার পরিচয়ের তুলনায় বাস্তব নারীরূপে চিত্রাঙ্কনে মানিক দত্ত অধিক পারঙ্গম দিয়েছেন।

বণিক খণ্ডের অপ্রধান নারী চরিত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল **উর্বশী**। তার স্বামী জয়পতি এবং তাদের নিবাস উজানী নগরে। উর্বশীর একমাত্র কন্যা সন্তান লহনা। তবে তার মাতৃত্বের রূপ প্রকাশ এখানে লক্ষ্য করা যায় না। এই খণ্ডের আর একটি অপ্রধান নারী চরিত্র হল **রম্ভাবতী**। রম্ভাবতী লক্ষপতির স্ত্রী এবং খুল্লনার মাতা। তাদের নিবাস ইছানি নগরে। সে খ্যাতিবান বণিক গৃহের বধূ। কন্যাকে সতীনের সংসারে বিবাহ দেওয়ার প্রসঙ্গে তার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। লক্ষপতি কন্যাকে সতীনের সংসারে বিবাহ দেওয়ার বিষয়ে মতামত জানতে আসে স্ত্রী রম্ভাবতীর কাছে। রম্ভাবতী সামাজিক রীতির ঐতিহ্যকে লক্ষ্য করে আপাত সম্মতি দিলেও বাল্যবিবাহ ও

সতীন সমস্যার বিপক্ষে বলে —

"পুন রম্ভাবতী বলে পণ্ডিতের তরে।
প্রাণতুল্য বাছা দিব সতীনের ঘরে।।"[২৯০]

এভাবে নিরুপায় মাতা তার হৃদয়ের ধনস্বরূপ কন্যাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে বাধ্য হয়েছে। মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল কব্যে রম্ভাবতী সেই নিরুপায় মাতার উদাহরণ। তার চরিত্রে বিভিন্ন সামাজিক অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই অভিজ্ঞতা সে কন্যা বিদায়ের সময়ে তুলে ধরেছে। সে কন্যা খুল্লনাকে শ্বশুরালয়ে যাত্রার পূর্বে সতীনের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করার সম্পর্কে কয়েকটি দিক সচেতন করে দেয়। সে জানে সতীনের সংসার কন্যার কাছে অপ্রতিরোধ্য। তাই সতীনের সঙ্গে ঝগড়া করলে দাম্পত্য জীবনে অশান্তির ঝড় নেমে আসবে। তার মতে সতীনের কথা মত চলাই শ্রেয়। আবার কন্যাকে স্মরণ করে দেয় যে, ধনপতির মত প্রতিপত্তি সম্পন্ন বণিকের গৃহে আত্মীয় স্বজন সর্বদাই আসবে, নববিবাহিত কন্যার তাদের সম্মুখস্থ হওয়া দৃষ্টিকটু বিষয়। রম্ভাবতী কন্যাকে সমাজ-পরিবার সচেতন করার সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতাকেও পরোক্ষভাবে বলেছে। কন্যাকে রম্ভাবতী বলেছে যে, সকালে গৃহের সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ করে স্নানে যেতে। স্নানের সময় বাইরের অপকীর্তিকারী, দুশ্চরিত্র, ইন্দ্রিয় দুর্বল মানুষের থেকে সচেতন থাকতে বলেছে। স্নানের পর শুদ্ধ হয়ে রান্নার পর পরিবারের সকলের খাওয়া হলে উচ্ছিষ্ট সে খাবে।

"রম্ভা কান্দিয়া বলে শুনহ খুলনা।
ভালমতে মানাইহ সতিন লহনা।।
ইষ্টমিত্র সাধুর আসিবে সর্ব্বজন।
তার আগে তুমি না ভাণ্ডাবে সর্ব্বক্ষণ।।
গৃহে বাসি কম্ম করি স্নানকে জাইবে।
চতুর্দিগে দেখি তুমি স্নান করিবে।।
সকলিকে খাওাইহ করিয়া রন্ধন।
অবশেষে জেবা পায় করিহ ভোজন।।"[২৯১]

এভাবে রম্ভাবতী মধ্যযুগে গাহর্স্থ জীবনে বিবাহিত নারী কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে এবং তা থেকে কন্যাকে পূর্ব থেকে সচেতন করে দেয়। সেই সঙ্গে একটি নারী তার দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তিকে বজায় রাখতে কীভাবে নিজেকে সঁপে দেয় তার পরিচয়ও রয়েছে। রম্ভাবতীর এত সচেতনতার পরও কন্যাকে সতীনের ঘোরাটোপ থেকে রক্ষা করতে পারল না। কন্যা খুল্লনা সতীন লহনার চক্রান্তে বৈধব্য ধারণ করে এবং ছাগল চরাতে বাধ্য হয়। একথা দুর্বলা দাসীর মুখে শুনে রম্ভাবতীর মাতৃহৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠে। পুত্র হরিকে দিয়ে কন্যার পোশাক-পরিচ্ছদ ও

অলংকার প্রেরণ করে। কন্যার বিবাহের পর কন্যাকে দেখতে যাওয়া এবং তার সমস্যার কথা জানা সহজ ছিল না মধ্যযুগে। কেবল দূর থেকে সন্তানের দুরবস্থা শুনে দগ্ধ হত মাতা। মধ্যযুগের সেই অসহায় মাতা রম্ভাবতী।

ধনপতির বিবাহে উপস্থিত নামহীনা নারীরাও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা পিষ্ট। তারা তাদের হৃদয়ের যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করেছে ধনপতির সুদর্শন রূপ দেখে। তারা হল সধবা যুবতী, বিধবা যুবতী ও বৃদ্ধা সধবা প্রভৃতি। এসকল নারীরা তাদের পতিনিন্দার মধ্য দিয়ে নারীর দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে কতটা অমর্যাদার সঙ্গে দিন কাটায় তার চিত্র তুলে ধরেছে। প্রথমে একজন সধবা যুবতী নারী বলে যে, তার স্বামী বৃদ্ধ ও কানে শোনে না। যুবতী নারীর মনের চাহিদা অনুভব করতে তার স্বামী অসমর্থ। আবার কারো স্বামী সারা বছরের যক্ষা আক্রান্ত, কারো স্বামীর পিঠে রয়েছে কুজ। এইরূপ স্বামীর প্রতিও তারা পতিপরায়ণতা দেখিয়েছে। স্বামীর জন্য প্রতিদিন শাক, সুকুতার পরিবর্তে কোন শক্ত খাবার রান্না করলে তাকে পিঁড়ির প্রহার সহ্য করতে হয়।

> ''এক জুবতী বলে পতির নাই দরশন।
> শাক সুকুটা বিনে না করে ভোজন।।
> একদিন অন্নবেঞ্জন দিড় করি রান্ধি।
> মারয়ে পীড়ার বাড়ি কোনে বসি কান্দি।।''[২৯২]

শুধু তাই নয়, বিধবা যুবতী ও সধবা বৃদ্ধাদের কথাও এখানে ব্যক্ত হয়েছে। আশি বছরের সধবা বৃদ্ধারও মনের সখ-আহ্লাদ শেষ হয়ে যায়নি। তারও যুবতী সাজার সখ রয়েছে। সে ধনপতিকে দেখতে যাওয়ার আগে চোখে কাজল এবং চুল শক্ত করে বেঁধে দুই নাতিনীকে নিয়ে যাত্রা করেছে। যুবক ধনপতিকে দেখে তার হৃদয় দগ্ধ হয়েছে। তার মত হৃদয়ের যন্ত্রণা এবং অপূর্ণ মনোবাঞ্ছার যন্ত্রণা নাতিনীরা যাতে না পায়, সেই জন্য তাদেরকে ধনপতির কাছে সমর্পণ করতে চেয়েছে। এই সকল নারীর মাধ্যমে মধ্যযুগের কৌলিন্য প্রথা ও পুরুষ শাসিত সমাজের অকথ্য অত্যাচারের কথা অত্যন্ত জীবন্ত।

খুল্লনার বিবাহে যে সকল এয়োরা উপস্থিত হয় বলাই বাহুল্য, তারা সকলে বিবাহিত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য **শিতলি, পাতলি, শাকম্ভরী, সত্যভামা, রোহিনী, দ্রৌপদী, ইমলা, বিমলা, সরস্বতী, কমলা, ইন্দুমতি, তারা, রুক্মিনী** , **রত্না** প্রভৃতি। খুল্লনার বিবাহাচারের পূর্বে দুর্গার ঘট স্থাপন করা হয়েছে। এদের দ্বারা মনে হয়, উচ্চবিত্ত বিবাহিত কুলবধূদের মধ্যে দুর্গা বা চণ্ডীর পূজা প্রচলিত ছিল। তাদের মধ্যে রুক্মিনী জলসাধতে সুন্দর কাঁচুলি পরিধান করে এবং চুলের খোপায় চাঁপা ফুল গোঁজে। বিবাহাদিতে উচ্চশ্রেণীর নারীদের মধ্যে সাজ-সজ্জার রীতি প্রচলন ছিল। কবি তাদের নাম উল্লেখ করে সেই সাজ-সজ্জার বিবৃতি দিয়েছেন —

"হরি হরি রাইহ জানাও প্রতি ঘরে ঘরে।
শিতলি পাতলি রাইহ   সাধুর মন্দিরে জাইহ
জারে তোরা জল সাধিবারে।।
শাকম্ভরী সত্তভামা   রোহিনী দ্রৌপদী রামা
সকলের মাথায়ে দুর্গার ঘটবারা।
ইমলা বিমলা   সরস্বতী কমলা
ইন্দুমতি আর তারা।।
রুক্মিনী চলিয়া জায়ে   কাচুলি পহ্রিয়া গায়ে
খোপাভরি পহ্রে চাঁপার ফুল।"[২৯৩]

দক্ষিণ পাটনের রানী **নিলা**। তার স্বামী রাজা শালবান। তার সঙ্গে দেবী চণ্ডীর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধের শর্ত স্বরূপ ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত অর্ধরাজ্য ও তার কন্যা সুশীলাকে বিবাহ কথার উত্থাপন করে। সেই মুহূর্তে নীলারানীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাতে তার রানীর মর্যাদাবোধটি জাগ্রত হয়ে উঠেছে। সে শ্রীমন্তকে জানিয়ে দেয় যে, যুদ্ধে মৃত সৈন্যরা তার ভাই ও গুরুজন তুল্য। তাই সে একবছর তিলকুশ স্পর্শ করবে না। এই অবস্থায় শ্রীমন্তের শর্ত পূরণ করা সম্ভব নয়। সে শ্রীমন্তকে বলে —

"জিয়াইএগ্রা দেহ বাছা জত সেনাগণ।
তবে বিভা দিব বাছা শুনহ বচন।।"[২৯৪]

সুতরাং নীলারানীর মনোবাঞ্ছা অনুযায়ী দেবী চণ্ডী পুনরায় মৃত সৈন্যদের জীবিত করতে বাধ্য হয়। অতঃপর তার কন্যার সুশীলার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিবাহ স্থির হয়। সে সমস্ত এয়োদের সঙ্গে জামাতা শ্রীমন্তকে বরণ করে এবং বিবাহাচার সম্পন্ন করে। এখানে তার রানী সত্তার সঙ্গে সামাজিক মাতৃসত্তাটিও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কন্যাকে শ্বশুরালয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা শুনলে সে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে। কন্যার শ্বশুরালয়ে যাত্রা এবং তার কাছে অপ্রত্যাশিত দাম্পত্য জীবনের কথা ভেবে মাতা নীলারানীর দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কার অন্ত নেই। তাই সে বলে —

"দুষ্ট বিধাতা লেখন কৈল কি।
দুখ পাইলাম বড় বিভা দিএগ্রা ঝি।।"[২৯৫]

বাঙালী মাতাদের মত নীলারানীর কন্যাকে বিবাহ দিয়ে দুঃখ, কষ্ট ও আক্ষেপের শেষ নেই।

শ্রীমন্ত বিবাহ করে পিত্রালয়ে আগমনের বার্তা শুনে যে সকল এয়ো তাকে বরণ করতে এসেছে তারা সামাজিক রীতি উন্মোচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তারা হল **হিরাবতী, নিলাবতী, তারাবতী, হরিপ্রিয়া, চন্দ্রমুখী** ও **মালতী**। শ্রীমন্তের মাতা খুল্লনার সঙ্গে তারা

নদীর তীরে যায়। এদের দ্বারা খুল্লনার আভিজাত্য বোধ এবং শুভাগমনের বিভিন্ন রীতির চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে।

সে যাইহোক, মানিক দত্ত তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বহু ধরনের চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তারা অনেকেই পুরাণ পরিচিত। তা সত্ত্বেও পুরাণে প্রচলিত স্বভাব বৈশিষ্ট্যের বাইরেও তারা মানবিক গুণাবলীর অধিকারী হয়ে উঠেছে। দেব চরিত্রগুলি পুরাণের সঙ্গে বাস্তব অনুভূতির ধুলা মাখিয়ে নিয়েছে। আর লৌকিক চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে বিচিত্র গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য তুলনামূলক ভাবে বেশি অন্বিত হয়েছে। মানিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই দুই প্রকারের চরিত্রের (দেব ও মানব) মধ্যে নারী চরিত্ররা বেশি জীবন্ত। মানব পুরুষ চরিত্রগুলি অধিকাংশ তাদের পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। তার প্রধান চরিত্রের তুলনায় অপ্রধান চরিত্রগুলি রক্ত মাংসের বলে মনে হয়। তাতে কবি চরিত্র সৃষ্টিতে বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন। শুধু চরিত্র সৃষ্টিতেই নয়, তাঁর কবি প্রকৃতির সম্যক পরিচয় পেতে কাব্যটির সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রসঙ্গটি বড় হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। E. M. Forster; Aspects of the Novel; Penguin Books, Reprinted, 1964, p. 73.

২। Id; p. 75.

৩। S. H. Butcher's translated; Aristotle's Theory of Poetry and fine Art, Kalyani Publishers, Reprented, 2012, Chap. XV, p. 53.

৪। Id; p. 53.

৫। Id; p. 53-55.

৬। Id; p. 55.

৭। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ; কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত, শ্রীশ্রীচণ্ডী (ভূমিকা), উদ্বোধন কার্যালয়, নবম সংস্করণ, ২০ মার্চ, ১৯৬২, ৫০ তম পুনর্মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪১৮, পৃ: ৩৪-৩৫।

৮। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৯, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ৩৪৬-৩৪৭।

৯। শশিভূষণ দাশগুপ্ত; ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৩৬৭, অষ্টম মুদ্রণ, কার্তিক, ১৪১৬, পৃ. ১।

১০। রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত; ঋগ্বেদ-সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড) ১০ মণ্ডল, ১৪৬ সূক্ত, হরফ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬, পৃ. ৬৩৮-৬৩৯।

১১। তদেব, পৃ. ৬২০।

১২। সুকুমার সেন; ভারত কোষ (তৃতীয় খণ্ড), সম্পাদক আদিত্য ওহদেদার, কালীদাস ভট্টাচার্য, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, চিন্তামণি কর, নির্মল কুমার বসু, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, বিনয় দত্ত, রমেশচন্দ্র মজুমদার, রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুকুমার সেন, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীল কুমার দে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রকাশ ১৩৭৪, পৃ. ২৭৩।

১৩। দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত, মহাভারত (জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ), ভীষ্মপর্ব (১৭ নং খণ্ড) শ্রীহরি দাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য প্রণীত টীকা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় বিশ্ববাণী সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮৫-১৮৬।

১৪। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মার্কণ্ডেয়পুরাণ (৮৬ তম অধ্যায়), নবভারত পাবলিশার্স, প্রথম নবভারত সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৯০, পৃ. ৩৪৬।

১৫। তদেব; পৃ. ৩৪৯।

১৬। তদেব; পৃ. ৩৫৬।

১৭। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত অগ্নিপুরাণ (৫০ অধ্যায়), নবভারত পাবলিশার্স, নবভারত প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৮৯, পৃ. ৯২।

১৮। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; দেবী-ভাগবতী (বঙ্গানুবাদ), বঙ্গবাসী ইলেক্ট্রো মেশিন যন্ত্রে নটবর চক্রোবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৩১ সাল, পৃ. ২৫৩।

১৯। সুকুমার সেন; ভারতকোষ (৩য় খণ্ড), সম্পাদক আদিত্য ওহদেদার, কালীদাস ভট্টাচার্য, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, চিন্তামণি কর, নির্মল কুমার বসু, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, বিনয় দত্ত, রমেশচন্দ্র মজুমদার, রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুকুমার সেন, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীল কুমার দে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রকাশ ১৩৭৪, পৃ. ২৭৩।

২০। তদেব।

২১। তদেব।

২২। সুকুমার সেন; বঙ্গভূমিকা, ইষ্টার্ন পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, পৃ. ১২৯।

২৩। সুকুমার সেন; ভারতকোষ (৩য় খণ্ড), সম্পাদক আদিত্য ওহদেদার, কালীদাস ভট্টাচার্য, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, চিন্তামণি কর, নির্মল কুমার বসু, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, বিনয় দত্ত, রমেশচন্দ্র মজুমদার, রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুকুমার সেন, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীল কুমার দে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রকাশ ১৩৭৪, পৃ. ২৭৩।

২৪। নীহাররঞ্জন রায়; বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৪, পৃ. ৭২৩।

২৫। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন

পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩।

২৬। তদেব; পৃ. ৯।

২৭। তদেব; পৃ. ১৫।

২৮। তদেব; পৃ. ১৬।

২৯। তদেব; পৃ. ২১।

৩০। তদেব; পৃ. ২৩।

৩১। তদেব; পৃ. ২৫।

৩২। তদেব।

৩৩। তদেব।

৩৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বাতায়নিকের পত্র, সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্ঠম খণ্ড, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৩৪৮, পুনর্মুদ্রণ, ১৪০১, পৃ. ৩১২।

৩৫। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩৩।

৩৬। তদেব; পৃ. ৫০।

৩৭। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারী, ১৯৯১, অষ্টম মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৭, পৃ: ৪৫৪।

৩৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৫৭।

৩৯। তদেব; পৃ. ৫৮।

৪০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্ঠম খণ্ড, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৩৪৮, পুনর্মুদ্রণ, ১৪০১, পৃ. ৪৩৯-৪০।

৪১। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৭৭।

৪২। তদেব; পৃ. ৭৯।

৪৩। তদেব; পৃ. ৮০।

৪৪। তদেব; পৃ. ৯৬।

৪৫। তদেব; পৃ. ১০০।

৪৬। তদেব; পৃ. ১০৬।

৪৭। তদেব; পৃ. ১০৭-১০৮।

৪৮। তদেব; পৃ. ১০৮।

৪৯। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত; কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন সংস্করণ, ১৯৫২, পুনর্মুদ্রিত, ১৯৯৬, পৃ: ১৫।

৫০। ক্ষুদিরাম দাস সম্পাদিত; কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (প্রথম খণ্ড), দে'জ, নব সংস্করণ ও মুদ্রণ, ১৯৯৩, পৃ: ৩৫।

৫১। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১০৯।

৫২। তদেব; পৃ. ১১০।

৫৩। তদেব; পৃ. ১২৯।

৫৪। তদেব; পৃ. ১১৫।

৫৫। পল্লব সেনগুপ্ত; লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৯৫, পরিশীলিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০২, পৃ: ৭১।

৫৬। মিহির চৌধুরী কামিল্যা; আঞ্চলিক দেবতা : লোকসংস্কৃতি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৫ ডিসেম্বর, ২০০০, পৃ: ২০৬।

৫৭। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৫৪-১৫৫।

৫৮। তদেব; পৃ. ১৫৫।

৫৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৩৪৮, পুনর্মুদ্রণ, ১৪০১, পৃ. ৪৪০।

৬০। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৫৭।

৬১। তদেব; পৃ. ১৬৩।

৬২। তদেব; পৃ. ১৬৮।

৬৩। তদেব; পৃ. ১৭৪।

৬৪। তদেব।

৬৫। তদেব।

৬৬। তদেব; পৃ. ১৭৬।

৬৭। তদেব; পৃ. ১৮৬।

৬৮। তদেব; পৃ. ২২১।

৬৯। তদেব; পৃ. ২৩১।

৭০। তদেব; পৃ. ২৩২।

৭১। তদেব; পৃ. ২৫৪।

৭২। তদেব; পৃ. ২৭৪।

৭৩। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; কবিকঙ্কণ-চণ্ডী : চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী (প্রথম ভাগ), সম্পাদনা তরুণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যলোক, সাহিত্যলোক সংস্করণ, আশ্বিন ১৪০৭, পৃঃ ১৭৫।

৭৪। সুকুমার সেন; 'লঙ্কাহ্রদ- হ্রদে চণ্ডী কমলে-কামিনী?' প্রবন্ধ, প্রবন্ধাবলী (১ম খণ্ড — বিচিত্র দেবতা), এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং, প্রথম প্রকাশ, জন্মাষ্টমী, ১৩৯১/১৯৮৪, পৃঃ ৬৮।

৭৫। তদেব; পৃ. ৭০।

৭৬। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (? — ষোড়শ শতাব্দী), আনন্দ, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৭৮, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯১, অষ্টম মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৭ , পৃঃ ৪১৪।

৭৭। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩৬৩।

৭৮। তদেব; পৃ. ৩৫৪।

৭৯। তদেব; পৃ. ৪।

৮০। তদেব; পৃ. ৫।

৮১। তদেব; পৃ. ৮।

৮২। তদেব; পৃ. ৯।

৮৩। তদেব।

৮৪। তদেব; পৃ. ১০।

৮৫। তদেব; পৃ. ১১।

৮৬। তদেব; পৃ. ১৩।

৮৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; শক্তিপূজা, সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চর্তুবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রন, বৈশাখ, ১৩৯৩, পৃ. ৩১৭।

৮৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৩।

৮৯। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য; হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় পর্ব, ফার্মা কে. এল. এম প্রাইভেট লিমিটেড, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৪, পৃঃ ৫৭।

৯০। রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত; কুমার সম্ভব, পঞ্চম সর্গ, কালিদাসের গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় ভাগ), বসুমতী সংস্করণ, দশম সংস্করণ, ১৩৫৭ পৃ. ৮০।

৯১। তদেব; তৃতীয় সর্গ, পৃ. ৫০।

৯২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৪।

৯৩। শশীভূষণ দাশগুপ্ত; বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৭২, পৃঃ ১৬।

৯৪। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য; হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় পর্ব, ফার্মা কে. এল. এম প্রাইভেট লিমিটেড, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৪, পৃঃ ৪৭।

৯৫। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৬।

৯৬। তদেব; পৃ. ২৪।

৯৭। সুকুমার সেন; 'শিব-ঠাকুর ও সম্পর্কিত নারী-দেবী' প্রবন্ধ, প্রবন্ধাবলী (বিচিত্র দেবতা-প্রথম খণ্ড), এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং, প্রথম প্রকাশ, ১৩৯১, পৃ. ১৫৪।

৯৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৪৬।

৯৯। তদেব; পৃ. ৪৭।

১০০। তদেব; পৃ. ৫০।

১০১। ক্ষেত্র গুপ্ত; কবি মুকুন্দরাম, গ্রন্থনিলয়, তৃতীয় সংস্করণ, ১লা আষাঢ়, ১৪০৪, পৃ. ৬৯।

১০২। সুকুমার সেন; প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, প্রথম প্রকাশ, পৌষ, ১৩৫০, পুনর্মুদ্রণ, ১৮৯৪, পৃ. ৪৭।

১০৩। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১।

১০৪। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; কবিকঙ্ক ণ চণ্ডী : চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী, প্রথম ভাগ, সাহিত্যলোক, আশ্বিন ১৪০৭, পৃঃ ২০২-২০৩।

১০৫। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২।

১০৬। তদেব; পৃ. ৩।

১০৭। দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত; ঋগ্বেদ-সংহিতা (অষ্টমোহষ্টকঃ), হাওড়া শহরে পৃথিবীর ইতিহাস মুদ্রাযন্ত্রে ধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী মুদ্রিত, দশম মণ্ডল, ১১ অনুবাক, ১২৯ সূক্ত, ১৩৩২ সাল, পৃ. ৬৩৯।

১০৮। রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত; ঋগ্বেদ-সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড), ১০ মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত, হরফ প্রকাশনী, প্রথম

প্রকাশ, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬, পৃ. ৬২৪।

১০৯। সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত; সরল বাঙ্গালা অভিধান, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ, অষ্টম সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৭১, পৃ. ৭৬১।

১১০। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; কবিকঙ্কণ চণ্ডী : চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী, প্রথম ভাগ, সাহিত্যলোক, আশ্বিন ১৪০৭, পৃ: ২২৯।

১১১। তদেব; পৃ. ২৩০।

১১২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১১।

১১৩। তদেব।

১১৪। তদেব; পৃ. ১২।

১১৫। তদেব।

১১৬। তদেব; পৃ. ৫৩।

১১৭। তদেব; পৃ. ৫৪।

১১৮। তদেব; পৃ. ৯১।

১১৯। তদেব; পৃ. ১২৩।

১২০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৩৪৮, পুনর্মুদ্রণ, ১৪০১, পৃ. ৪৩৪।

১২১। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৪২।

১২২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩৩৯।

১২৩। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৪২।

১২৪। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩০।

১২৫। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৪২।

১২৬। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৯১।

১২৭। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৪২।

১২৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৫০।

১২৯। তদেব; পৃ. ৫৫।

১৩০। তদেব; পৃ. ৫৬।

১৩১। তদেব; পৃ. ১২৩।

১৩২। তদেব; পৃ. ১২৭।

১৩৩। তদেব।

১৩৪। তদেব; পৃ. ১৮৯।

১৩৫। তদেব; পৃ. ২১৯।

১৩৬। তদেব; পৃ. ৮০।

১৩৭। তদেব; পৃ. ৮২।

১৩৮। তদেব; পৃ. ১৮৬।

১৩৯। তদেব; পৃ. ২৭৪।

১৪০। তদেব; পৃ. ৩০১।

১৪১। তদেব; পৃ. ৭।

১৪২। তদেব; পৃ. ১৫।

১৪৩। তদেব; পৃ. ১২৫।

১৪৪। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীত মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৮৫তম অধ্যায়, নবভারত পাবলিশার্স, প্রথম নবভারত সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৯০, পৃ. ৩৪৩।

১৪৫। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৩।

১৪৬। অতুল সুর; বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৪, পৃ. ২৫৮।

১৪৭। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৪।

১৪৮। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; দেবী-ভাগবত (বঙ্গানুবাদ), বঙ্গবাসী-প্রেস থেকে নটবর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, পঞ্চম অধ্যায়, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৩১, পৃ. ১১।

১৪৯। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৪৭।

১৫০। তদেব; পৃ. ১৮৭-১৮৮।

১৫১। তদেব; পৃ. ১৮৮।

১৫২। তদেব; পৃ. ২৭১।

১৫৩। তদেব; পৃ. ৫৯।

১৫৪। তদেব; পৃ. ৬৪-৬৫।

১৫৫। ক্ষেত্র গুপ্ত; প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, পুস্তক বিপণি, পরিবর্জিত তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৮, পৃঃ ১৭৫।

১৫৬। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৬৯।

১৫৭। তদেব; পৃ. ৭০।

১৫৮। তদেব; পৃ. ৭৩।

১৫৯। তদেব; পৃ. ৭৮।

১৬০। তদেব; পৃ. ৭৭।

১৬১। তদেব; পৃ. ৭৯।

১৬২। তদেব; পৃ. ১০২।

১৬৩। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ.মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৪২২।

১৬৪। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১০৬।

১৬৫। তদেব; পৃ. ১০৯।

১৬৬। তদেব; পৃ. ১১৪।

১৬৭। তদেব; পৃ. ১৫০।

১৬৮। অরবিন্দ পোদ্দার; মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৫২, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৬২।

১৬৯। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ.মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৪২২।

১৭০। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন

পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৬৭।
১৭১। সুকুমার সেন; কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, পাদটীকা, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ: ৪৯।
১৭২। রামগতি ন্যায়রত্ন; বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বুক কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৪২ সাল, পৃ. ৯৭-৯৮।
১৭৩। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৭১-৭২।
১৭৪। তদেব; পৃ. ৭১।
১৭৫। তদেব; পৃ. ৭৩।
১৭৬। তদেব; পৃ. ৮০।
১৭৭। তদেব; পৃ. ৯২।
১৭৮। তদেব।
১৭৯। তদেব; পৃ. ৯৭।
১৮০। শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য; ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৯, পৃ: ৩৭।
১৮১। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১১৫।
১৮২। তদেব; পৃ. ১৪৩।
১৮৩। তদেব।
১৮৪। তদেব; পৃ. ১৫৬।
১৮৫। তদেব; পৃ. ১৬৮।
১৮৬। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ, ষষ্ঠ সংস্করণ, অষ্টম মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ: ৪৩৪।
১৮৭। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১২৪।
১৮৮। তদেব।
১৮৯। তদেব; পৃ. ১৩০।
১৯০। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ, ষষ্ঠ সংস্করণ, অষ্টম মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ: ৪৫৪।
১৯১। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৩১।
১৯২। তদেব।

১৯৩। তদেব; পৃ. ১৩৪।

১৯৪। তদেব; পৃ. ১৩৭-১৩৮।

১৯৫। তদেব; পৃ. ১৫৬।

১৯৬। তদেব; পৃ. ১৬৬।

১৯৭। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড : চৈতন্যযুগ (খ্রীস্টীয় ১৪৯৩ — ১৬০৫ অব্দ), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ষষ্ঠ মুদ্রণ (নতুন সংস্করণ), ২০০৬-২০০৭, পুনর্মুদ্রণ, ২০১০-২০১১, পৃ. ৯২।

১৯৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১১১।

১৯৯। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; মহর্ষি দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীত মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৯৩ অধ্যায়, নবভারত পাবলিশার্স, প্রথম নবভারত সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৯০, পৃ: ৩৬৬-৬৭।

২০০। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩৬।

২০১। তদেব; পৃ. ১৪৭।

২০২। তদেব; পৃ. ৫৮।

২০৩। তদেব; পৃ. ৬৭।

২০৪। তদেব; পৃ. ৯৩।

২০৫। তদেব; পৃ. ১৭৭।

২০৬। তদেব; পৃ. ১৭৯।

২০৭। তদেব; পৃ. ১৯৩।

২০৮। তদেব; পৃ. ১৯৪।

২০৯। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ.মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৪২৮।

২১০। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৯৭।

২১১। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ.মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৪২৯।

২১২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২০৪।

২১৩। ভবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী; ‘মানিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী’ প্রবন্ধ, প্রতিভা, সম্পাদক অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার, ঢাকা সাহিত্য পরিষদ, তৃতীয় বর্ষ, অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩২০, পৃ. ২৯৩।

২১৪। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন

পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২১২।

২১৫। তদেব; পৃ. ২২০।

২১৬। তদেব; পৃ. ২৩৯।

২১৭। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ.মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৪২৯।

২১৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৪০।

২১৯। তদেব; পৃ. ২৪৩।

২২০। তদেব; পৃ. ২৪৫।

২২১। তদেব; পৃ. ২৪৭।

২২২। তদেব; পৃ. ২২২।

২২৩। অরবিন্দ পোদ্দার; মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৫২, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৬৮।

২২৪। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৬৯।

২২৫। তদেব; পৃ. ২৭৭।

২২৬। তদেব; পৃ. ২৭৮।

২২৭। তদেব; পৃ. ৩৬৩।

২২৮। তদেব; পৃ. ৩৬৫।

২২৯। তদেব; পৃ. ৩৬৮।

২৩০। অরবিন্দ পোদ্দার; মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৫২, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৬৯।

২৩১। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৮৬।

২৩২। তদেব; পৃ. ২৮৭।

২৩৩। তদেব।

২৩৪। তদেব।

২৩৫। তদেব; পৃ. ২৮৮।

২৩৬। তদেব; পৃ. ২৯৪।

২৩৭। তদেব; পৃ. ২৯৫।

২৩৮। তদেব; পৃ. ৩১৫।

২৩৯। তদেব; পৃ. ৩৬৫।

২৪০। তদেব; পৃ. ৩৬৬।

২৪১। রামগতি ন্যায়রত্ন; বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বুক কোম্পানি প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৪২ সাল, পৃ. ৯৮।

২৪২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৮২।

২৪৩। তদেব; পৃ. ১৮৩।

২৪৪। তদেব; পৃ. ১৯৩।

২৪৫। তদেব; পৃ. ২০৫।

২৪৬। তদেব; পৃ. ২২২।

২৪৭। তদেব; পৃ. ২২৪।

২৪৮। তদেব; পৃ. ২২৫।

২৪৯। তদেব; পৃ. ২৩৪।

২৫০। তদেব।

২৫১। তদেব; পৃ. ২৬০।

২৫২। তদেব; পৃ. ২৬২।

২৫৩। তদেব; পৃ. ২৬৪।

২৫৪। তদেব; পৃ. ২৮৮।

২৫৫। তদেব; পৃ. ১৯৫-১৯৬।

২৫৬। তদেব; পৃ. ১৯৭।

২৫৭। তদেব; পৃ. ২২৪।

২৫৮। তদেব।

২৫৯। তদেব; পৃ. ২২৫।

২৬০। তদেব; পৃ. ২২৭।

২৬১। তদেব; পৃ. ২৩৪।

২৬২। তদেব; পৃ. ২৪৮।

২৬৩। তদেব; পৃ. ২৪৯।

২৬৪। তদেব; পৃ. ২৫৬।

২৬৫। তদেব; পৃ. ২৮৬।

২৬৬। তদেব; পৃ. ২৮৭।

২৬৭। তদেব; পৃ. ২৯৪।

২৬৮। তদেব; পৃ. ৩৬৫।

২৬৯। তদেব; পৃ. ১৮৪।

২৭০। তদেব; পৃ. ১৮৫।

২৭১। তদেব; পৃ. ১৯৪।

২৭২। তদেব; পৃ. ১৯৮।

২৭৩। তদেব; পৃ. ১৯৯।

২৭৪। তদেব; পৃ. ২১৫।

২৭৫। তদেব; পৃ. ২৪০।

২৭৬। তদেব; পৃ. ২৪৭।

২৭৭। তদেব; পৃ. ২৮৭।

২৭৮। তদেব; পৃ. ৩১৭।

২৭৯। তদেব; পৃ. ৩৪৫।

২৮০। তদেব; পৃ. ২২৫।

২৮১। তদেব।

২৮২। তদেব; পৃ. ২৩৪।

২৮৩। তদেব; পৃ. ২৪২।

২৮৪। তদেব; পৃ. ২২২-২২৩।

২৮৫। তদেব; পৃ. ২২৩।

২৮৬। তদেব।

২৮৭। তদেব; পৃ. ৩৫৭।

২৮৮। তদেব; পৃ. ৩৬১।

২৮৯। তদেব; পৃ. ৩৬৬।

২৯০। তদেব; পৃ. ১৯৯।

২৯১। তদেব; পৃ. ২১১।

২৯২। তদেব; পৃ. ২০১।

২৯৩। তদেব; পৃ. ২০৬।

২৯৪। তদেব; পৃ. ৩৫৪।

২৯৫। তদেব; পৃ. ৩৬২।

——০০——

পঞ্চম অধ্যায়

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মূল্যায়ন

পঞ্চদশ শতক থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত দেবীকে বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে একটি বিশেষ রূপে বাংলা সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়। এই মঙ্গলকাব্যগুলি বাংলাদেশেরই একটি বিশেষ সম্পদ; কারণ, আমাদের মধ্যযুগের অন্যান্য যেসব জাতীয় সাহিত্য রয়েছে তা অল্পবিস্তর ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু মঙ্গলকাব্য পাওয়া যায় একমাত্র বাংলা সাহিত্যেই। আনুমানিক পঞ্চদশ শতকে প্রথম মনসা নামে এক দেবীকে কেন্দ্র করে মনসামঙ্গল কাব্যের সূচনা হয়। এই মনসামঙ্গল কাব্য মঙ্গলকাব্যের ধারায় আদি সৃষ্টি। মনসামঙ্গলের পর একজন শক্তিদেবী বা লৌকিক দেবীকে কেন্দ্র করে অপর একটি মঙ্গলকাব্যের ধারার সূচনা হল। সেই শক্তিরূপিনী দেবী চণ্ডী এবং তাকে নিয়ে রচিত কাব্যের নাম চণ্ডীমঙ্গল। এই ধারার প্রথম কবি মনে করা হয় মানিক দত্তকে। তিনি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য নামে নতুন একটি মঙ্গলকাব্য ধারার সৃষ্টি করেছিলেন, তা বললে অত্যুক্তি হবে না। মানিক দত্তের সম্বন্ধে একথা মনে রাখা সর্বত্রই প্রয়োজন যে তিনি অল্প শিক্ষিত, এমনকি অন্যান্যদের মত রাজসভার কবি নন। তিনি একজন গায়েন কবি। তাঁর সামনে ছিল সাধারণ অল্প শিক্ষিত, লোক বিশ্বাসে আশ্রিত মাটির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত মানুষ। তাদের মানস প্রবণতা অনুযায়ী তিনি এই কাব্যটি লিখেছেন। উপরন্তু তাঁর সামনে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কোন স্ট্রাকচার ছিল না। কিন্তু তাঁর পূর্বে মনসাদেবীকে নিয়ে মনসামঙ্গল কাব্যের গঠনরীতি তৈরী হয়েছিল। তিনি মনসামঙ্গলের গঠন রীতিকে সামনে রেখে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মঙ্গলকাব্যের ধারার সৃষ্টি করেছেন। এটাই তাঁর মূল্যায়নের মূল কথা। তিনি যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের গঠন রীতির খসড়া তৈরী করেছিলেন সেখানেই তাঁর কৃতিত্ব। তাই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম কাঠামো গঠনে তাঁর স্বতন্ত্রতা নয়, বরং তাঁর কৃতিত্বের দিকটাই বড় হয়ে উঠেছে।

মানিক দত্ত উত্তরবঙ্গের কবি। উত্তরবঙ্গের মাটিতে তিনি প্রথম এই নব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধারা উপ্ত করলেন। তাঁর আগে এই অঞ্চলের কবি কর্তৃক মনসামঙ্গল কাব্য লিখিত হয়েছিল। তাঁদের মনসামঙ্গল কাব্য রচনার একটি আলাদা বৈচিত্র্য রয়েছে। সেটা হল সৃষ্টিতত্ত্ব দ্বারা কাব্যের সূচনা। কিন্তু যদি মনসামঙ্গল কাব্যের পূর্ববঙ্গীয় ধারায় দেখি, তাহলে দেখা যাবে সেখানে বন্দনা দ্বারা কাব্যের সূচনা হয়েছে। এমনকি পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের কবি নারায়ণ দেব ও বিজয়গুপ্ত — এঁদের কাব্যে সৃষ্টিতত্ত্বের দিকটি বিবৃত হয়নি। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের কবি জগজ্জীবন ঘোষাল ও তন্ত্র বিভূতির কাব্যের সূচনায় সৃষ্টিতত্ত্বের বিস্তারিত বর্ণনা

রয়েছে। উত্তরবঙ্গের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি মানিক দত্ত তাঁর কাব্যও সূচনা করেন সৃষ্টিতত্ত্বের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে। সেই সৃষ্টিপত্তন কাহিনীতে বৌদ্ধশূন্যবাদ এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। হরিদাস পালিত বলেছেন — "বিশেষত্বের মধ্যে এই চণ্ডীর মধ্যে বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতের বহুল সমাবেশ দৃষ্ট হয়। সেই কারণে আমাদের মনে হয়, মঙ্গলচণ্ডীর গীতের প্রাধান্য সময়ে এদেশে বৌদ্ধভাবের সৃষ্টিপ্রকরণ এবং চণ্ডিকার উৎপত্তি সবিশেষ প্রচলিত ছিল। দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই সেই বৌদ্ধ তান্ত্রিকতামূলক সৃষ্টি প্রকরণ অবগত ছিল। সেই কারণে কবি বাধ্য হইয়া দেশীয় জনগণের মনস্তুষ্টি উদ্দেশে তাঁহার গীত গ্রন্থে স্থানীয় ধর্ম্মভাবই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।"[১] মানিক দত্তের এরূপ বর্ণনা রীতি মঙ্গলকাব্যের সাধারণ রীতি অনুযায়ী নতুন।

সেই সঙ্গে তাঁর কাব্যটি ব্রতকথার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সূচনা, সমাপ্তি ও সংযোগ রক্ষা হয়েছে। এই কাব্যের দেবদেবীর উল্লেখিত কাহিনী অংশ পুরাণ নির্ভর ও কাহিনী গ্রন্থনা আড়ষ্ঠ। এমনকি, তিনি মঙ্গলকাব্যের গঠনরীতি অনুসারে তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সর্বপ্রথম বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা রচনা করেন নি। তিনি তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী সাজিয়েছেন 'সৃষ্টিপালা'র বর্ণনা দিয়ে। সৃষ্টিপালায় আদি-ধর্ম বা আদি-বুদ্ধ সৃষ্টির বাসনায় তার 'হাই' বা 'হাম্বি' থেকে আদি দেবী আদ্যার সৃষ্টি হয়। মানিক দত্তের কাব্যে এই আদ্যাই দেবী চণ্ডীতে পরিণত হয়েছে। কবির এই চণ্ডী ভাবনার সঙ্গে মালদহের ঐতিহ্যবাহী গম্ভীরার আদ্যার সাদৃশ্য লক্ষ্য করে হরিদাস পালিত বলেছেন — "আদি বুদ্ধ বা আদিধর্ম্ম হইতে আদ্যা নামক এক শক্তির উদ্ভব দেখিতে পাইতেছি। এই আদ্যাদেবী ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। মালদহের আদ্যার গম্ভীরায় সেই আদ্যার পূজা হইয়া থাকে। বৌদ্ধ আদ্যাদেবী বা চণ্ডী ক্রমশঃ আমাদের শ্রীশ্রীচণ্ডী দেবী হইয়া শিবসহ অর্চ্চিত হইতেছেন। মানিক দত্ত এই আদ্যার চণ্ডীত্ব প্রাপ্তির যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অদ্ভুত ব্যাপার।"[২] মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদ্যার সপ্তজন্মের ঘটনা অভিনব। এই পর্যন্ত কাহিনী সরলরৈখিক। তার কার্যকারণ সম্পর্কের তুলনায় মধ্যযুগীয় বাতাবরণে অলৌকিকতাকেই বেশি স্থান দেওয়া হয়েছে।

কবি আদ্যার গৌরীরূপ ও পিতা হিমালয়ের সঙ্গে গৌরীর সম্পর্কের এক নতুন কাহিনী গড়েছেন, তা একান্ত কবির নিজস্ব। এই কাব্যে গৌরী হিমালয় ও মেনকার গর্ভজাত সন্তান নয়। গৌরী তাদের পালিত সন্তান। কবি এখানে লোক প্রচলিত কাহিনীকে গ্রন্থনায় যুক্ত করেছেন। পুরাণের এই ঘটনা কবির হাতে লোকপুরাণে পরিণত হয়েছে। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সম্পাদক সুনীলকুমার ওঝা 'ভূমিকা' অংশে বলেছেন — "... মানিক দত্তের কাহিনী এইরূপ অনেকস্থলেই সংস্কৃত পুরাণ বা কাব্যকাহিনীর একান্ত অনুগত না হইয়া লোকশ্রুতির আশ্রয় লইয়াছে। মনে হয় মানিক দত্ত এইরকম অন্যান্য বহুস্থলেই নবপুরাণ সৃষ্টি প্রয়াসের সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। অথবা বলা চলে তিনি লোকপ্রচলিত কাহিনীকেই আশ্রয় করিয়াছেন।"[৩] মানিক দত্তের এই বর্ণনা

সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ভাবনা প্রসূত বলে মনে হয়।

শিবের বিবাহকে কেন্দ্র করে মানিক দত্ত পুরাণের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত দুটি উপকাহিনীর সংযোজন করেছেন। তার কৌশল রীতিও কবির নিজস্ব। তাতে কবি বুদ্ধিদীপ্ত কাব্যিক গুণের পরিচয় দিয়েছেন। শিবের ধ্যান ভঙ্গের প্রসঙ্গে কামদেব, রতি ও সরস্বতী প্রভৃতি চরিত্রে এসেছে বাস্তবতা ও করুণ রসের ছোঁয়া। এছাড়াও পুরাণের গঙ্গা ও শান্তনুর দাম্পত্য জীবনের উপকাহিনীটি মূল কাহিনীতে সংযোজন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে একান্ত নিজস্ব পরিকল্পনা। শিবের অধিবাসের দ্রব্য সামগ্রী বাহক হিসাবে নারদ ও ভীম চরিত্রের ভূমিকা চমংকার। এই চরিত্র দুটি কাব্যে পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী কার্যকলাপ আমাদের তাদের সম্বন্ধে পুরাণ সম্পর্কিত ধারণা জাগ্রত করে। বিবাহে জল সাধতে যেসকল পুরনারী মেনকার সঙ্গ দেয় তাদের এই গ্রন্থে লৌকিক নরনারী বলে মনে হয়। যথা — হিরা, তারা, সুরেশ্বরী, মোহিনী ও পিঙ্গলা। কিন্তু মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে মেনকার সঙ্গদাত্রী আইয়গণের নাম পুরাণ পরিচিত। মানিক দত্তের কাব্যে পিতা হিমালয়ের কোলে চড়ে শিশু দুর্গার বিবাহ মণ্ডপে আগমন এবং হিমালয়ের কন্যা-জামাতার গলায় মাল্য প্রদান কৌতূহলোদ্দীপক ও স্বতন্ত্র বটে। তাতে অতি বাল্য বয়সে বিবাহ রীতির প্রত্যক্ষ বাস্তব চিত্রের পরিচয় দিয়েছেন কবি।

হর-গৌরীর বিবাহের পর গণেশ ও কার্তিকের জন্ম বৃত্তান্ত প্রায় সকল কবিই বিবৃত করেছেন। তবে গণেশের জন্মের পর শনির আগমন ও তার দর্শনে গণেশের শিরচ্ছেদ এবং ইন্দ্রের হাতির মুণ্ডু তাতে স্থাপন বর্ণনা কেবল মাত্র মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেই লক্ষ্য করা যায়। ততে মানিক দত্ত এই দুটি জন্মরহস্য নিয়ে কাহিনীকে বর্ধিষ্ণু করেছেন। সেক্ষেত্রে কবি লোককৌতুহলকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে তাঁর পরিচয় লোককবি হিসাবে।

তবে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে দেবী চণ্ডীর পৌরাণিক চেতনাগুলি পরিস্ফুট করে তার অলৌকিক মাহাত্ম্যের প্রতি মানুষকে মুগ্ধ করতে লাগল। তারফলে মানুষ দেবতার কাছে আত্ম সমর্পণ-প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে লাগল। তার উপর রাজনৈতিক জীবনের পরাজয় ও অসহায়ত্ববোধ এই ভাবকে আরও ঘণীভূত করল। সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের ভোগলিপ্সা ও সুখমসৃণ জীবনচর্যার জন্য এই নতুন দেবীর কাছে সুবিধাবাদমূলক তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছিল। তাই কবি মানিক দত্ত দেবীর পুরাণ-সম্পর্কিত প্রচলিত নিধনকারিনী রূপ প্রকাশের জন্য মূল কাহিনীর সঙ্গে অল্প সম্পর্কযুক্ত ঘটনার উপস্থাপন করেছেন। এই রকম অল্প সম্পর্কযুক্ত ঘটনা হল চণ্ডীর মধুকৈটভ, শুম্ভ-নিশুম্ভ নিধনের ঘটনা। সেক্ষেত্রে তিনি মধুকৈটভ নামক অসুরদ্বয়ের জন্মের কথা বলেছেন। প্রসঙ্গত, 'দেবী-ভাগবত'-এ উল্লেখ রয়েছে যে, এদের জন্ম হয় বিষ্ণুর কর্ণমূল থেকে। চণ্ডীর সঙ্গে তাদের এবং মহাবীজ, রক্তবীজের সঙ্গে যুদ্ধ বিবৃতি, যুদ্ধে ক্লান্ত চণ্ডীর গাত্রঘর্ম থেকে কালীর সৃষ্টি

এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ নিধন ঘটনা কাহিনীতে জটিলতা এনে দিয়েছে। মানিক দত্তের কাব্যে এই কাহিনীর সঙ্গে মার্কণ্ডেয় পুরাণের বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। এরূপ পুরাণ ঘটনার ব্যবহার মানিক দত্ত তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অনুসরণ করলেও সেই বর্ণনার কৌশল লোকগল্পের বর্ণনার মত। প্রসঙ্গত, গৌড়ের ইতিহাসকার রজনীকান্ত চক্রবর্তী মুকুন্দ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর বর্ণনা রীতি পার্থক্য লক্ষ্য করে বলেছেন — ‘‘মুকুন্দরামের পৌরাণিক বর্ণনা হিন্দুপুরাণের অনুযায়িনী; কিন্তু মানিকদত্তের পুরাণ অতি অদ্ভুত।’’[৪]

অসুর নিধনের পর পুত্রদের প্রতিপালনের জন্য চণ্ডীর ইন্দ্র-সভায় যাত্রা এবং পঞ্চদাসী প্রাপ্তির ঘটনা আশ্চর্যের। সেই পঞ্চদাসীগণ হল হারা, তারা, সত্যা, কমলা ও পদ্যা ইত্যাদি। অন্যান্য কাব্যে দেবী বিবাহের সময় কেবল তিনদাসী পায়। তারা হল জয়া, বিজয়া ও পদ্মা। মানিক দত্তের কাব্যের ঘটনাও স্বতন্ত্র এবং সেই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত চরিত্র পটভূমি ও চরিত্রের সংখ্যাও পৃথক। এই পঞ্চদাসীর প্রতি স্বামী শিবের সম্ভোগ বাসনা লক্ষ্য করে চণ্ডীর পূজা প্রচারের তথা স্বীয় প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। এইরূপ কৌশলে কবিত্বের তেমন একটা ছাপ নেই বটে, কিন্তু চণ্ডীর মধ্য দিয়ে নারীর আত্ম প্রতিষ্ঠার দিকটি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। সেই ইচ্ছার থেকে প্রথম চণ্ডীর সঙ্গে পদ্মা নামক সহচরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। পদ্মার স্থানে আগমন পথে তার সারথি ছিল ইমলা, বিমলা নামে দুটি নারী চরিত্র। পদ্মার কাছে সে জানতে পারে মর্ত্যে পূজা প্রচারের একমাত্র বাধা ধূম্রাসুরের নাম। এরপর যে দেবী কর্তৃক ধূম্রাসুর বধের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা কবি মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে গ্রহণ করেছেন। এমনকি, দেবী চণ্ডী পদ্মার উপদেশেই কলিঙ্গে দোহরা নির্মাণ করে কলিঙ্গরাজ কর্তৃক স্বীয় পূজা করিয়ে নেয়।

‘‘পদ্মা বলে শুন মাতা মঙ্গলচণ্ডীগণ।
কলিঙ্গে দেহরা করাহ নির্ম্মান।।
সুরথ রাজার তরে স্বপ্ন দেখাহ তারে।
তোমার পূজা সব নরলোকে করে।।’’[৫]

মানিক দত্তের এই বর্ণনা তাঁর নিজস্ব। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যের কাহিনী গ্রন্থনায় ধূম্রাসুরের প্রসঙ্গ নেই। অন্যদিকে, দ্বিজমাধব অসুর দলনী চণ্ডীর দ্বারা মঙ্গলাসুরকে বধ করার প্রসঙ্গকে তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন। আর মানিক দত্ত দেবী চণ্ডীর উগ্রমূর্তিকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। এই নতুন দেবীর প্রতি মানুষের আশ্বাস যোগান ও ভরসা সৃষ্টির জন্য তাঁর কবিত্ব অসাধারণ।

শুধু তাই নয়, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মূল বৈশিষ্ট্য হল কাব্যটি দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম প্রচারের মুখাপেক্ষি করে হয়েছে কাহিনীর বয়ন। তিনি নিজেই যেভাবে মর্ত্যে দেবীর পূজা ও মাহাত্ম্য-কাহিনী প্রচার করেছেন, তা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের বর্ণনা থেকে পৃথক। এই কাব্যে সতন্ত্র

কোন ‘গ্রন্থোৎপত্তির কারণ’ অংশ না থাকলেও কবি তার যে ব্যক্তি পরিচয় দিয়েছেন তা মধ্যযুগীয় সাহিত্যের একটি সনাতন ধারার অনুবর্তন। এখানে তাঁর গয়েনীরূপটি ফুটে উঠেছে। সেখানে চণ্ডী পদ্মার উপদেশে তাঁর দ্বারা ব্রতকথা প্রচারিত হয়েছে। পদ্মার উপদেশে দেবী মর্ত্যে মানিক দত্তকে দিয়ে তিন লক্ষ সংস্কৃত লাচাড়িকে বাংলায় তিন শত বত্রিশ লাচাড়ি লিখিয়ে ব্রতকথা সম্পূর্ণ করে।

“প্রভাতে উঠিয়া দত্ত পুঁথি দেখে নাড়ি।
তিনলক্ষ পুস্তক মধ্যে আছেন নাচাড়ী।।
তিনলক্ষ দূরে রাখি তিনশত কৈল।
বত্তীশ নাচাড়ী গীত অধিক রাখিল।।”[৬]

দেবী যে লোকভাষায় লিখিত কোন পুথি না দিয়ে সংস্কৃত পুথি মানিক দত্তের শিয়রে রেখে গেল, তাতে এ কাহিনীর পৌরাণিকতা ধরা পড়েছে। সেই সঙ্গে কবি দু’জন দোহারকে সঙ্গে নিয়ে কলিঙ্গে যাত্রা, কলিঙ্গরাজ কর্তৃক বন্দী এবং দেবীর কৃপায় উদ্ধার — এই বিস্তৃত আত্মকথনকে কবি তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে তুলে ধরেছেন। নিজেকে কাব্যের একটি চরিত্র রূপে উপস্থাপিত করেছেন এবং নিজের হাতে স্বীয় কীর্তির কথা সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। কলিঙ্গ রাজের দ্বারা দেবীর পুজায় তান্ত্রিক পূজা পদ্ধতির আভাস রয়েছে। সেই তান্ত্রিক পুজার হাত ধরে অবলীলাক্রমে এসেছে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে প্রচলিত লোকবাদ্য ও লোকনাট্য প্রসঙ্গ। যেমন, সারিন্দা, পীণাক ও নাটুয়া ইত্যাদি। তবে কলিঙ্গ রাজের পূজার পরও দেবী দশভুজ ও ত্রিনয়নের কারণ ও তাদের কার্যাবলীর পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা কাহিনী গ্রন্থনাতে এনেছে আড়ষ্ঠতা। সেই দিক থেকে কাব্যটিকে প্রচারমূলক কাব্য বললে, অসমীচীন হবে না।

কিন্তু উপকাহিনী নির্বাচনে কবি মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। শিব-শক্তির দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে বিজু বনের ঘটনাটি এসেছে। চরিত্রানুযায়ী সেই ঘটনার সঙ্গে যোগসূত্র থাকলেও বিজু বনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিবরণ তাঁর কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক। শিব-গৌরীর দাম্পত্য জীবন মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুযায়ী সন্নিবেশিত হলেও তা সংক্ষিপ্ত। হয়তো কবি বস্তু পৃথিবীর বাস্তব জীবনের তুলনায় অলৌকিক মহিমার বাতাবরণ সৃষ্টি করতে বেশি আগ্রহী ছিলেন। কবি গণেশ ও কার্তিকের জন্মের পর শিব-চণ্ডীর সংসার জীবনের মাঝে অনেক ঘটনাই অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্য থেকে আলাদা রকমের। দ্বিজমাধবের ‘মঙ্গলচণ্ডীর গীত’ কাব্যের সম্পাদক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সঙ্গত কারণেই বলেছেন — “কাব্যটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, ইহাতে নূতন নূতন motif স্থান লাভ করিয়াছে, মাধবানন্দ বা মুকুন্দরামের কাব্যে ঐ সকল গল্পাংশ পাওয়া যায় না।”[৭] শিব ভক্ত ইন্দ্রকে চণ্ডী ছলনা করে পুত্রবর দান করেছে। কবি এই

ঘটনায় কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। কিন্তু ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে নিয়ে শিব ও শক্তি তথা চণ্ডীর মধ্যে প্রকাণ্ড লড়াই এবং উভয়ের ঘর্ম থেকে ধর্মকেতু-নিশানকেতু ও নিদয়া-কমলার জন্ম হয়। এরূপ দেব-কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত উপকাহিনী সৃষ্টি করে মানিক দত্ত অত্যন্ত কৌশলে ব্যাধখণ্ডে প্রবেশ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে স্বতন্ত্র করে 'দেবখণ্ড' নেই। 'দেবখণ্ড' থেকে কাহিনী কালানুক্রমিক ব্যাধখণ্ডে প্রবেশ করেছে। ব্যাধ ধর্মকেতু ও নিশানকেতুর সঙ্গে যথাক্রমে নিদয়া ও কমলার বিবাহ হয়েছে। ধর্মকেতু ও নিশান কেতুর অলৌকিক মায়ার প্রভাবে মৃত্যু হলেও তাদের স্ত্রীদের সমমরণ উচ্চবর্ণ সুলভ হিন্দু আদর্শ অনুসারে বর্ণিত হয়েছে। কবি যেন তাতেই সন্তুষ্ট। অতঃপর কালকেতু ও ফুল্লরার জন্ম। কালকেতুর জন্মের পূর্ব মুহূর্ত থেকে শুরু করে জন্মের পর পর্যন্ত যে সকল বর্ণনা কবি দিয়েছেন তার মধ্যে বাস্তব রসের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে কালকেতুর শৈশব-জীবনের অনুপম চিত্র বর্ণনায় কবি পুরাণ প্রভাবিত নন এবং তা একেবারেই নিরাভরণ। এরূপ একটি বৃত্তাকার প্লট মানিক দত্ত সুন্দর ভাবে তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন। এক্ষেত্রে যে সকল চরিত্র কাহিনী এসেছে তাদের মধ্যে কমলা চরিত্রটি দ্বিতীয় রহিত।

অতঃপর মানিক দত্ত কালকেতু ও ফুল্লরার দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় লৌকিক কবির পরিচয় দিয়েছেন। তার চিত্রিত কালকেতুর সঙ্গে ফুল্লরার দাম্পত্য জীবনের করুণ কাহিনীর ছাপ পড়েছে। কিন্তু তিনি কেবল দম্পত্য জীবনের করুণ কাহিনী তুলে ধরেন নি, সেই সঙ্গে সমকালীন সমাজের প্রয়োজনে বহু তথ্য তুলে ধরেছেন স্বচ্ছন্দভাবে। তাঁর কৃতিত্ব কেবল বাস্তব-রস পরিবেশনে, বস্তু সঞ্চয়ে তেমন নয়। তাঁর কাব্য থেকে যে সমকালীন সামাজিক অবস্থার প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করা যায় তার অন্তরালাশ্রয়ী মর্মস্পন্দন চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। কালকেতুর পশু শিকারের বর্ণনায় বাঘের বিভিন্ন দেহাবশেষ দ্বারা বিভিন্ন প্রকার লোক ঔষধ তৈরী ও তার প্রয়োজনীয়তার কথা সেই প্রমাণ দেয়। কাহিনী ধারায় এরূপ বাঘের দেহাবশেষের উপকারিতা সম্বন্ধে কবি লোক সাংবাদিকতা করার ফলে গ্রন্থনা রীতি অনেকটাই শিথিল হয়ে পড়েছে। কবির ভাষায় —

> ''একাক ব্যাঘ্র বধ কৈলে জতেক কার্যেত লাগে
> তাহার লেখা জোখা বলি।''[৮]

মুল কাহিনী ধারা থেকে বেরিয়ে এসে সাধারণ মানুষ তথা শ্রোতাগণকে বাঘের দেহাবশেষের সম্পর্কে সচেতন করা লোক কবি বা গায়েনী রীতির লক্ষণ বলে মনে হয়। ব্যাধ জীবন ও চরিত্রের মধ্যে লোককবির গভীর অনুপ্রবেশ না থাকলেও তাঁর বর্ণনাকে যে বাস্তব সত্য করে তুলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে যে পরিমিতিবোধের জন্য উত্তম সৌন্দর্যের স্রষ্টা ও কবিত্বগুণ

ফুটে ওঠে তা তাঁর কাব্যে তেমন স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়নি। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য মাঝে মাঝেই প্রকাশ পেয়েছে।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অপর একটি মূল্যবান ও দৃষ্টি আকর্ষক বৈশিষ্ট্য হল প্রবল রামভক্তিবাদের প্রভাব। সমকালীন জন-মানসে প্রচারিত ও প্রভাবিত রামভক্তিবাদকে কবি সমগ্র কাহিনীর মধ্যে অত্যন্ত চমৎকার করে প্রয়োগ করেছেন। এইরূপ একটি রাম ভক্তিবাদের উল্লেখ পাই বনে পশু শিকারের মুহূর্তে। এখানে কবির সমাজ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা সুপ্রচুর, অথচ কবি স্বভাব অনুসারেই তিনি মানবিকতার পন্থী, আর এরই সঙ্গে তিনি ভাষা ও বর্ণনা রীতির অদ্ভুদ সমন্বয় ঘটিয়েছেন। কবির বর্ণনাটি অত্যন্ত সহজ-সরল এবং অলংকার বর্জিত। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাই তাঁর কাব্যে পদ্যের আকারে রূপ পেয়েছে। তবে পশুগণের সঙ্গে কালকেতুর সমরে যাত্রা এবং যুদ্ধে পরাজিত পশুগণের ক্রন্দন এখানে বিবৃত হয়নি। কালকেতুর বাণে বিদ্ধ হরিণীর মৃত্যু মুহূর্তেও রামনামের কথা শোনা যায়। কালকেতুর শিকারে অত্যাচারিত পশুগণ দেবীকে তাদের করুণ কাহিনী জানায়। মানিক দত্তের কাব্যে তা সংক্ষিপ্ত, তেমন জীবন্ত নয়। কবি যেন তাদের পশু করেই রেখেছেন, মানবিক গুণ সম্পন্ন করে তুলতে পারেন নি।

এর পরেও কবি কাহিনী ধারায় কার্যকারণ সম্পর্কের ছেদ রক্ষা করতে পারেন নি। তিনি কালকেতুর ভোজন বর্ণনা করেছেন। ভোজনের পর কালকেতু পশু শিকারের জন্য বনে যাত্রা করে। সেখানে মানিক দত্ত এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছেন এবং ব্যাধখণ্ডের প্রধান চরিত্র কালকেতুকে জীবন্ত করে তোলার অবকাশ রেখেছেন। সে শৈশব থেকেই শক্তিশালী ও বীর। কবি তার চরিত্রে কৃষ্ণের বাল্য ছায়া পড়তে দেয়নি। একজন ব্যাধ বালক যেভাবে বড় হয় ঠিক তার জীবন্ত প্রতিফলন ঘটেছে কালকেতুর ক্ষেত্রে। বনে কালকেতুর সঙ্গে নামহীন যে বেনিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় সে কবির নিজস্ব সৃষ্টি চরিত্র। সেখানে কবি কালকেতুর মত নিম্নশ্রেণীর চরিত্রে মধ্যবিত্ত মানসিকতা ফুটিয়ে তুলেছেন। সে যাইহোক, সেই বনের পশুদেরকে রক্ষার জন্য দেবী চণ্ডীও তাকে ছলনার জন্য তুচ্ছ একটি কৌশল অবলম্বন করে। সেটি হল কালকেতুর চোখে ধুলো দেওয়া। এরূপ হাস্যকর ও লৌকিক ঘটনার দ্বারা কাহিনীকে কবি নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

তথাপি শ্রীকলার বাজারে ফুল্লরার মাংস বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ সমাজের চরম বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে কবি সক্ষম হয়েছেন। সেই সঙ্গে কবির দারিদ্র জীবনের প্রতি আত্মধিক্কারের মাধ্যমে তাদের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। ফুল্লরার দুঃখময় দাম্পত্য জীবন থেকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাবার নতি কথায় কবির রোমান্টিক জীবন ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষণীয়, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পশুদের সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধের বর্ণনা নেই। এমনকি তাঁর কাব্যে পশুগণের গোহারী অংশ এবং সমকালীন বাস্তবতার ছোঁয়ায় তা জীবন্ত

হওয়ার কোন ঘটনা নেই। বরং কবি পশুদের করুণ কাহিনীর দৃশ্য বিবৃত করে দেবী চণ্ডীর মহিমাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। সে কারণে হয়তো চার প্রকার কাচুলি নির্মাণের কথা এত বিস্তারিত এবং তা লোক উপাদানে পূর্ণ। সেই কাচুলি নির্মাণে চকা-চকি পাখির প্রসঙ্গে রামায়ণের নীতিগান করা লোককবির পরিচায়ক। সমস্ত বিষয়ই দেবীর প্রতি শ্রোতা বা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কবির অভিপ্রায় ছিল একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

ছদ্মবেশী ষোড়শী রমণী দেবী চণ্ডীকে দেখে ফুল্লরার সতীন মনে করা ও বারমাস্যার কথা বলা মঙ্গলকাব্যের বর্ণনা রীতির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তবে সতীন ভাবনায় শঙ্কিত ফুল্লরার প্রথমে বৃদ্ধা মাসীর কাছে যাওয়া কবির নিজস্ব সমাজ অভিজ্ঞতা জাত তা বলা যায়। এরপর চণ্ডী ফুল্লরার দাম্পত্য জীবনের দুর্বলস্থানে আঘাত করে। এটি হল ফুল্লরার বন্ধ্যাত্বতা। তাকে কেন্দ্র করেই এই কাব্যে 'ফুল্লরার বারোমাস্যা' অংশটি উপস্থাপিত হয়েছে কার্যকারণ সূত্রের হাত ধরে। দেবী তার দুই পুত্রকে নিয়ে কালকেতুর সঙ্গে অতিরঙ্গে সংসার করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এবং সেক্ষেত্রে ফুল্লরা হবে তার দাসী। দেবী ফুল্লরাকে বলে —

> ''দুই পুত্র কোলে করি কেতুর আগে শুইব।
> তুমি পায়ে তৈল দিবা আনন্দে থাকিব।।
> আলস্য লাগিলে জাতিবে হস্ত পাও।
> গ্রীষ্ম লাগিলে দিবে দণ্ড পাখার বাও।।''[৯]

অতঃপর গ্রাম্য গৃহবধূর ন্যায় ফুল্লরার ক্রোধ প্রকাশ এবং বারমাস্যা বর্ণনা স্বাভাবিক। ব্যাধ জীবনে বারমাসের দুঃখ-কষ্ট ঘটা করে বর্ণনা করা ফুল্লরার গৃহস্থলীয় রিক্ততা ও তার জীবন সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি নয়, অবাঞ্ছিত আগুন্তককে বিদায় দেবার কৌশল মাত্র। কবির বর্ণনা রীতি এখানে স্বতন্ত্র মাত্রা পেয়েছে। তবে চরিত্রের আচরণে গ্রাম্যতার স্পর্শ আছে। তিনি ফুল্লরার বারমাস্যা বৈশাখ থেকে সূচনা না করে জ্যৈষ্ঠ থেকে শুরু করেছেন এবং সমাপ্ত করেছেন বৈশাখ দিয়ে। দেবীর প্রতি তাদের প্রত্যয় জন্মানোর জন্য দেবী চণ্ডীর যে রূপ প্রদর্শন করা হয়েছে তাতে তার মাতৃরূপিনী তন্ত্রের স্বরূপটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

> ''ক্রোধে কালিকা জে মরায়ে দিল পাও।
> বিকট দশন হৈল দশভুজা মাও।।
> জিহ্বা হৈল লহ ২ মুখ ঘোরতর।
> দেখিতে ২ ঐরি জায়ে যম ঘর।।''[১০]

এইরূপ দেখে কালকেতু ও ফুল্লরা মূর্ছিত হয়। সেই প্রচণ্ডা শক্তিদেবী তাদের মাতৃসুলভ স্নেহে কোলে তুলে নেয়। আদিম কৌম সমাজে দেবীর মাতৃতন্ত্রের প্রাধান্য ছিল। এই কাব্যে শক্তিরূপের

সঙ্গে স্নেহময়ী কল্যাণরূপটি সহাবস্থানে তন্ত্রের দেবী ভাবনার স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত, বাঙালীর ইতিহাসকার ও প্রখ্যাত সমাজ গবেষক নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন — "আদিম কৌম সমাজের মাতৃকাতন্ত্রের দেবীদের প্রাধান্য কৌম সমাজে তো ছিলই; বিচিত্র নামে তাঁহার নানাস্থানে পূজাও লাভ করিতেন। পরে যখন আর্য-ব্রাহ্মণ্য পুরুষ প্রকৃতি ধ্যান সুপ্রতিষ্ঠিত হইল তখন সেই মাতৃকাতন্ত্রের দেবীরা প্রকৃতি বা শক্তিরূপিনী বিভিন্ন দেবীর সঙ্গে, বিশেষ ভাবে দুর্গা ও তারা সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেলেন।"[১১] দেবী কালকেতু ও ফুল্লরাকে তার যে পুরুষ-প্রকৃতির গূহ্য রহস্যের স্বরূপ-কথা বলে তাতেও কবি চণ্ডী ভাবনায় তন্ত্রকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। কবি হয়তো সমকালীন যুগ-চেতনাকে চণ্ডীর এরূপ বৈশিষ্ট্যে প্রকট করতে চেয়েছেন।

দেবী কর্তৃক প্রাপ্ত ধন বিক্রি করে ঘন্তা-কোদাল কেনার জন্য প্রথমে চাষাড়িয়ার কাছে এবং পরে বণিক পুরাই দত্তের কাছে কালকেতুর যাত্রার ঘটনা রয়েছে। দেবীর অঙ্গুরীর মূল্য পুরাই দত্তের মত বাণিয়ার অনুধাবন করা দুঃসাধ্য। তা কল্পনাতীত ও মহামূল্যবান বোঝাতেই পুরাই দত্তের প্রয়োজন হয়েছে এই কাব্যে। পরবর্তী কবিদের কাব্যে এভাবে ঘটনাটি দেখা যায় না। তাতে কবি ঘটনাতে জটিলতা বৃদ্ধি করেছেন। এমনকি পুরাই দত্ত চরিত্রটি তাঁর কাব্যে নিষ্প্রভ।

ধনপ্রাপ্তির পর কালকেতুর দেবীর শতনাম এবং তার স্বরূপ জানতে চাওয়ার ঘটনা কাহিনী ধারায় বাধা সৃষ্টি করেছে। সেই শতনামের মধ্যে দেবীর একটি নাম আঞ্চলিক প্রভাব জাত। সেটি হল 'দ্বারবাসিনী'। উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলায় এই 'দ্বারবাসিনী' দেবী মন্দিরের অবস্থান রয়েছে।

"জক্ষিনী ত্রিপুটা ত্রিনেত্রা সঙ্কটা
শতভূজা দ্বারবাসিনী।"[১২]

এই শতনামের উল্লেখ 'দেবীপুরাণ' গ্রন্থেও লক্ষ্য করা যায়। যাইহোক, সেই ধন-সম্পদের পূজা করার ঘটনাটিও কাহিনী গ্রন্থনায় অভিনব। কালকেতু দেবীর কথায় প্রাপ্ত ধনের পূজা করে।

"জঙ্গলের পুষ্প তুলি আনিল বিস্তর।
ধন পূজা করে বীর অক্ষটী কুঙর।।
এক অঞ্জলি পুষ্প তুলিল হৃদয়ে।
আস্থা করি দিল পুষ্প চামুণ্ডার পায়ে।।
বীর পূজা করে রামা দেয় জয়ধ্বনি।
ধন সহিত আনন্দ হৈইল নারায়নী।।"[১৩]

দেবীর সঙ্গে বনদুর্গার মিশ্রণ ঘটেছে। এই দেবী ভাবনায় মানিক দত্ত ব্রাহ্মণ্য ও লৌকিক সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়েছেন। প্রসঙ্গত, বাঙালীর ইতিহাস রচনাকার ও প্রখ্যাত সমাজ গবেষক নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয় — " 'গ্রাম-দেবতা' সর্বত্র একই নামে বা একই রূপে

পরিচিত নহেন; সাম্প্রতিক বাঙলায় কোথাও তিনি কালী, কোথাও ভৈরব বা ভৈরবী, কোথাও বনদুর্গা বা চণ্ডী, কোথা বা অন্য কোনও স্থানীয় নামে পরিচিত। কিন্তু যে নামেই পরিচিত তিনি হউন, পুরুষ বা প্রকৃতি-তন্ত্রেরই হউন, সংশয় নাই যে, সর্বত্রই তিনি প্রাক্-আর্য আদিম গ্রামগোষ্ঠীর ভয়-ভক্তির দেবতা। আদিবাসীদের এই সব গ্রাম্য দেবতাদের প্রতি আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি খুব শ্রদ্ধিতচিত্ত ছিল না। ... শীতলা, মনসা, বনদুর্গা, ষষ্ঠী, নানা প্রকারের চণ্ডী, নরমুণ্ডমালিনী শ্মশানচারী কালী, শ্মশানচারী শিব, পর্ণশবরী, জাঙ্গুলী প্রভৃতি অনার্য গ্রাম্য দেবদেবীরা এইভাবেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মকর্মে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন বলে মনে হয়।"[১৫] ঘটনার মধ্য দিয়ে এমনভাবে মিশ্র সংস্কৃতির দেব ভাবনার প্রকাশ মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে আলাদা মাত্রা দান করেছে। এমনকি সামাজিক পরিচয়ে নিম্নস্তরের ব্যাধ হঠাৎ দেবীর কৃপায় উচ্চবিত্তে পরিণত হলে শাসক শ্রেণীর করাল শাসনের কবলে পড়তে বাধ্য। এরূপ চিরন্তন সত্য থেকেও অভয় দিয়ে থাকে দেবী চণ্ডী।

দেবীর চণ্ডীর কলিঙ্গভাঙন ও গুজরাট রাজ্য পত্তনের বর্ণনা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রথাগত রীতি অনুসারে বিবৃত করা হয়েছে। তবে বর্ণনার কৌশল বিভিন্ন কবির ভিন্ন। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সেই ভিন্নতা কিঞ্চিৎ পরিলক্ষিত হয়। কলিঙ্গরাজ্য ভাঙনের ঘটনা বর্ণনায় কবি চরিত্রকে মানবিক ও দ্বন্দ্বসম্পন্ন করে তুলেছেন। তার পরিচয় পাই চণ্ডীর ইন্দ্রের সভায় আগমনে ইন্দ্রের তার প্রতি আতিথেয়তায়। কবির ভাষায় —

"মাথে করি নিল ইন্দ্র দিব্য সিংহাসন।
সমুখে আসন থুইয়া বন্দিল চরণ।।"[১৫]

চণ্ডী কলিঙ্গভাঙনে সর্বপ্রথম পদ্মার উপদেশে নয়, মানিক দত্তের কাব্যে সে নারদের উপদেশে ইন্দ্র সভায় যায়। যেখানে আট প্রকার মেঘ দেবী আনে। তারা হল হুরুকা, দুরূকা, আবর্ত, সামর্ত, কালাপাহাড়, আন্ধারিয়া, কালিয়া ও সিন্ধুরিয়া ইত্যাদি। অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কেবল চার প্রকার (পুণ্ডরীক, পুষ্কর, আবর্ত ও সম্বর্ত) মেঘের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু মানিক দত্তের কাব্যে অতিরিক্ত যেসকল মেঘের নাম রয়েছে সেগুলিও লোকবিশ্বাস থেকে সৃষ্ট। তার ফলে তাঁর কাব্যে লোকবিশ্বাস যুক্ত মেঘের অতিরিক্ত নামের ঘটনার ঘনঘটা প্রকাশ পেয়েছে। এরা ব্যর্থ হলে মানিক দত্তের চণ্ডী গঙ্গার দ্বারস্থ হয়েছে। গঙ্গার সঙ্গে চণ্ডীর সতীন সম্বন্ধকে কবি সন্নিবেশিত করেছেন। তাই এই কাব্যেও গঙ্গার কাছ থেকে বিফল মনোরথ হয়ে গঙ্গার পুত্র ডাক-ডেউরের কাছে উপস্থিত হয়। কবির ভাষায় —

"ইন্দ্র বলে মাও মঙ্গলচণ্ডীগণ।
সাতাইল পর্ব্বতে মাত করহ গমন।।

ডাক ডেউর নামে আছে গঙ্গার নন্দন।
তাক লইয়া যাহ মাও কলিঙ্গ ভুবন।।"[১৬]

এখানে সমুদ্র দ্বারা নয়; ডাক ও ডেউর নামক গঙ্গার পুত্রদ্বয় দ্বারা কলিঙ্গে বন্যা সৃষ্টি করা হয়েছে, যা এই কাব্যে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। এই ঘটনা ও চরিত্র দুটি কবির একান্তই নিজস্ব সৃষ্টি বলে মনে হয়। তবে ভাঁড়ু দত্ত চরিত্রটি সকল চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য অপ্রধান চরিত্র। তার দ্বারাই কাহিনীতে দ্বান্দ্বিক পরিবেশের সূচনা। এই চরিত্রটি সৃষ্টিতে মানিক দত্ত ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মত ভাঁড়ু দত্ত কেবল কূটকৌশলী নয়, সে একজন শক্তিমান পুরুষ বটে। দেবীর সঙ্গে তার লড়াইয়ের চিত্রে তা ফুটে উঠেছে —

"নড় দিয়া ভাড়ু দত্ত ঘরে প্রবেশিল।
শিব মন্ত্র জপিয়া ভাড়ু হুরুকা লাগাইল।।"[১৭]

সে শিব ভক্ত। শিবই তার আত্মশক্তির মূল উৎস। কবির সৃষ্ট এই চরিত্র সম্বন্ধে প্রখ্যাত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার সুকুমার সেন বলেছেন — "মানিক দত্তের রচনায় ভাঁড়ু দত্ত শক্তিমান পুরুষ, একেবারে ভাঁড় নয়।"[১৮] এই ভাঁড়ু দত্তের দ্বারা কাহিনী অগ্রগতি এবং দেবীর ব্রতকথা মর্ত্যে প্রচারের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়েছে। সেইজন্য দেবী চণ্ডীকে নারদ বলে —

"ঠগঠামন হৈতে অনেক কম্ম হএ।
ভাডু মরিলে মা তোমার বর্ত্ত হবার নএ।।"[১৯]

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উদ্দেশ্য চণ্ডীর ব্রতকথা প্রচার করা। পুরাতন ঐতিহ্যবাহী ভাবনার ক্রমবিলোপ এবং নতুন লৌকিক অথচ শক্তিময়ী দেবীর প্রতি আস্বাস বৃদ্ধির দিকটি ভাঁড়ু দত্তের সঙ্গে চণ্ডীর লড়াইয়ের প্রতিয়মান অর্থ। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য মুদ্রিত হয়ে প্রকাশের পূর্বে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন — "বোধ হয় মূল পাঁচালিটি ব্রতকথা জাতীয় ছিল।"[২০] মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই ব্রতকথার রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। তবে এই কাব্যে ভাঁড়ু দত্তকে শায়েস্তা করতে দু'বার ইন্দ্রের স্বর্গপুরে যাত্রা, একবার গঙ্গার কাছে এবং শেষে গঙ্গার পুত্র ডাক-ডেউরের কাছে যাত্রা প্রভৃতি কাহিনী গ্রন্থনায় কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকলেও জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কবির বর্ণনা কৌশলে চরিত্র ও ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ জীবন্ত রূপ পেয়েছে। কাহিনী ধারায় দেবীর মাহাত্ম্য গীত প্রচারের প্রতিস্পর্দ্ধি ধর্ম হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করেছে ভাঁড়ু দত্ত। সমাজে বহুকাল স্থায়ী শৈব ধর্মের উত্তরে শাক্ত ধর্মের প্রতিষ্ঠা হল। সেই শাক্ত ধর্মের ধারক ও বাহক দেবীর ভক্তকূল। আর এই অনার্য দেবীর শ্রেণীহীন ক্ষেত্র গুজরাট নগর। সেই গুজরাট নগরে মাছুয়ানীর অভিযোগকে কবি কালকেতু ও ভাঁড়ু দত্তের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ হিসাবে নির্বাচন করেছেন। কবির এধরনের বর্ণনা এবং চরিত্রের মধ্যে নাটকীয়তা প্রকাশ পেয়েছে।

তবে, কলিঙ্গের চারজন সর্দারের সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধ বর্ণনা বিস্তারিত। চারজন সর্দার কর্তৃক কালকেতুর চারদ্বারের জয়ের কথা গতানুগতিক। কিন্তু কবি চারজন সর্দারের নাম এবং নামের সঙ্গে তাদের শক্তি, বুদ্ধি ও বিশালতা প্রকাশে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় কবি কাহিনী গ্রন্থনাকে শিথিল করলেও তা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক করে তুলেছেন। দ্বিজমাধব রচিত 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' গ্রন্থের সম্পাদক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য ভূমিকা অংশে মানিক দত্তের বর্ণনারীতির সম্বন্ধে বলেছেন — ''ইহার ভাষা তেমন মার্জ্জিত নহে ও ছন্দ অধিকাংশ স্থলে শিথিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বর্ণনা ভঙ্গী বেশ চিত্তাকর্ষক।''[২১] পাশাপাশি, যুদ্ধের প্রাক্কালে অপর একটি চমৎকার ঘটনা কবি তুলে ধরেছেন। কালকেতুর পূজা পেয়ে প্রসন্ন দেবী 'হিরিমকসের চাল' তাকে প্রদান করে। সেই চালে দেবীর শক্তিরূপের চার অবতারের আত্মপ্রকাশ রয়েছে। সেই চার অবতার হল শৃগাল, শকুন, সিংহ ও প্রেত। যুদ্ধে দেবীর ভয়ঙ্কর রূপ ও 'হিরিমকসের চাল'-এর বর্ণনায় কবি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। পাশাপাশি, তন্ত্র প্রভাবিত গৌড়বঙ্গের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য কবির এই বর্ণনায় সুস্পষ্ট। প্রসঙ্গত, যুদ্ধে কালকেতুর আত্মশক্তির প্রতি নববিশ্বাস জন্মানো এ কাব্যে নতুন বিষয়। সে বলে —

''তিন দ্বার জিনিলাম দুর্গার বাহুবলে।।
আপনার বল কিছু না বুঝি আপনি।
কত কাল আমার শএ থাকিবে ভবানী।।''[২২]

এখানে কবি মানিক দত্তের সৃষ্ট কালকেতু চরিত্রের সঠিক বিকশের পথ ছিল। কিন্তু কবি তার মত ব্যাধ চরিত্রকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে চণ্ডী চরিত্রের ভিন্ন রূপ প্রকাশে আগ্রহী হলেন। যুদ্ধে কালকেতু রক্তাক্ত ও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে তার উপর দেবী বাম পা রাখার ঘটনাটিতে 'ছিন্নমস্তা' কালীর রূপটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কবির বর্ণনা এরূপ —

''বাম পা খানি উদর মাঝারে দিয়া।
দক্ষিন হস্তে শেল গাছ তুলিল টানিয়া।।
আপনার পদ্ম পাও বীরের মাথাএ দিল।
এক গুন বল ছিল দশ গুন হৈল।।
লোকে বলে আইল ছিন্ন মস্তকা।।''[২৩]

সে যাইহোক, বর্ণনার বিষয় হয়তো সকল কবির কাব্যে একই, কিন্তু সেই ঘটনা বর্ণনায় দৃষ্টিভঙ্গি গত প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। এই বর্ণনায় দেবী চণ্ডীর স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

কালকেতুর সঙ্গে দ্বন্দ্বের পর ভাঁড়ু 'আটকুড়া' অপবাদকে কেন্দ্র করে কবি কাহিনী সমাপ্তির দিকে যাত্রা করেন। সেক্ষেত্রে তিনি সমাজের এই বন্ধ্যাত্বকে কাজে লাগিয়েছেন। তার ফলে

কালকেতু ও ফুল্লরা রাজ্য ভোগ ত্যাগ করে দেবীর পূজার জন্য গঙ্গারণ তীরে উপস্থিত হয়। কিন্তু দেবী চণ্ডী গৃহবধূর ছদ্মবেশে তাদের পূর্বস্মৃতির মধ্য দিয়ে কেবল মাতৃসত্তা ও পিতৃসত্তার জাগরণ হয়েছে। কবির এখানে সামাজিক সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কালকেতুকে সন্তান প্রদান করলে কাহিনী গ্রন্থনা শেষে কীরূপ হত সে বিষয়ে মানিক দত্ত হয়ত স্থির করতে পারেন নি। তাই তারা সকলে স্বর্গে যাত্রা করে। এভাবে কাহিনী যেখান থেকে সূত্রপাত হয়েছে সেখানে গিয়ে পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। মানিক দত্ত কার্যকারণ সূত্রকে তথা দেবী চণ্ডী কর্তৃক পূর্ব ঘটনা স্মরণ করে দেওয়ার ঘটনাটি সন্নিবেশিত করে কাহিনীকে স্বর্গাভিমুখি করে তুলেছেন। এখানে মানিক দত্ত ব্যাধ খণ্ডের কাহিনীকে বৃত্তাকার প্লটের রূপদান করেছেন। সেই সঙ্গে উল্লেখিত ব্রতকথার দিকটিকে অপর একটি কাহিনীতে যাত্রার কারণ হিসাবে নির্বাচন করেছেন। চণ্ডীর কথায় —

''চারিদিনের ব্রতকথা সমাপ্ত হইল।।
চারিদিনের ব্রতকথা সমাপ্ত করিঞা।
বসিলা ভবানী দেবী চিন্তাযুক্ত হয়া।।''[২৪]

মানিক দত্ত আট দিনের পাঁচালী গাওয়ার রীতিকে ষোলটি পাল্লায় বিভক্ত করেছেন। সেই পাঁচালী ব্রতকথার রীতিতে রচিত। এসকল দিকগুলি মানিক দত্তের কাব্যে অভিনব।

অতঃপর কবি দুটি স্বতন্ত্র খণ্ডের মধ্যেই যোগসূত্র গেঁথে দিয়েছেন ব্রতকথার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। চারদিনের ব্রতের প্রচার সমাপ্ত করে বাকী চারদিনের ব্রতকথার প্রচার প্রয়োজন বোধ থেকেই কবি অপর একটি আলাদা খণ্ডের সূচনা করেছেন। তবে ধনপতি খণ্ডে অনেকটাই কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। এখানে দেবীর নিয়ন্ত্রন তুলনামূলক ভাবে অনেক কম। এই খণ্ডের কয়েকটি কবি কৃতিত্বের পরিচয়ও রয়েছে। আখেটিক খণ্ডে ঘটনার দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চরিত্রগুলি পরিচালিত হয়েছে। চণ্ডীকে যে কোন প্রকারে ঐশ্বর্যশালী ও শক্তিরূপিনী করে তোলাই কবির লক্ষ্য ছিল। আর বণিক খণ্ডে এসেছে দাম্পত্য জীবনের ঘটনা। সেখানে দেবীর নিয়ন্ত্রণ থাকলেও কবি এখানে চরিত্রকে প্রাণবন্ত ও কাহিনী গ্রন্থনার অনুগামী করে তুলেছেন। বণিক খণ্ডের সূচনায় বলা হয়েছে —

''চারিদিনের ব্রত মাতা মর্থে সৃজিয়া।
বসিল চামুণ্ডা চণ্ডী হেট মুণ্ড হৈয়া।।''[২৫]

সেকারণে স্বর্গের শিব-শিষ্য কর্ণমুনিকে দেবীর ছলনা এবং সেই ছলনায় দেবী সরস্বতীর সাহায্য নেওয়ার ঘটনা এসেছে। সরস্বতীর দ্বারা কর্ণমুনিকে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার ঘটনাও অভিনব বটে। তবে লক্ষণীয়, এই কাব্যে ছাড়া সরস্বতীর কাক বাহন স্বরূপটি অন্যত্র পাওয়া যায় না।

''সরস্বতীর তরে দুর্গা করিল স্মরণ।

শীঘ্রগতি আইল দেবী কাগ বাহন।।"[২৬]

সরস্বতী ঋগ্‌বেদের দেবী। তার সঙ্গে কাকের সংযোগে আর্য-অনার্যের তথা ব্রাহ্মণ্য ও লৌকিক সংস্কৃতির সমন্বয়ের সুর অনুমান করা যায়।

ছলনার দ্বারা শিব-শিষ্য কর্ণমুনি অভিশপ্ত হলে শিব ক্রুদ্ধ হয়। শিব তার পূজা সম্বন্ধে আত্মস্থ করার জন্য অত্যন্ত কৌশলে দেবী চণ্ডী 'হরগৌরী'র মিলিত অদ্বয় স্বরূপকে তুলে ধরেছে।

"হরগৌরী দুই করি জানে জেইজন।
দ্বিতীয় ভেদ করিলে তার নরকে গমন।।
অভেদ মূরতি এই গৌরী শঙ্কর।
বাম অঙ্গ গৌরী দক্ষিন অঙ্গ হর।।"[২৭]

এই অভেদ তত্ত্বই শিবের বিরূপ ভাবনাকে পরিবর্তনের কারণ। এই সকল ঘটনা পরবর্তী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নেই। এখানে কাহিনী গ্রন্থনে কবির কৌশলী ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

মর্ত্যে কর্ণমুনির ধনপতি নামে জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা কবির নিজস্ব, তা কাহিনী ও চরিত্রের মূল উৎসকে নির্দেশ করে। কর্ণমুনি চরিত্রটিকে মানিক দত্ত নতুন সংযোজন করেছেন। এছাড়া লহনার জন্ম বৃত্তান্তও অন্যত্র পাওয়া যায় না। সাতবছর বয়স থেকে তার চণ্ডীর ব্রতপালনের বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি চরিত্রের বাল্য পরিচয় দান করেছেন। এমনকি লহনার সঙ্গে ধনপতির বিবাহে যেসকল নিয়মনীতির কথা এসেছে তাও আশ্চর্যের। বিবাহে ব্রাহ্মণের বেদমন্ত্র উচ্চারণ ও দানে দাসী প্রদানের রীতি আর্য সংস্কৃতির পরিচায়ক। বিবাহের পর দেবী চণ্ডীর প্রতি অন্যমনস্কতাকেই লহনার নিঃসন্তানের কারণ হয়েছে। চরিত্রের মধ্যে পূর্বে দুর্বলতার সূত্র নির্দেশ করে তারপর সেই চরিত্রের পরিবর্তন এবং তাতে চণ্ডী কর্তৃক অভিশাপ দানের মধ্য দিয়ে কাহিনীর মোড় ঘোরানো কবির সুন্দর গ্রন্থনা কৌশল বলা যায়। লক্ষণীয়, ধনপতির দ্বিতীয় বিবাহের আগে এই সকল ঘটনা অন্যত্র লক্ষ্য করা যায় না। এমনকি ধনপতির মাতা উর্বশী চরিত্রটিও অন্যত্র পাওয়া যায় না।

ধনপতির খুল্লনাকে বিবাহ করার কারণ দেখাতে গিয়ে মানিক দত্ত দেবীর কৌশলের সঙ্গে নিজস্ব গ্রাম্যস্থূল জীবন ভাবনার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। দেবী চণ্ডী স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উজানী নগরের রাজা বিক্রমকেশরকে স্বপ্নাদেশে জানায় যে, রাজা যেন অপুত্রক ধনপতি সদাগরকে তার রাজদরবারে সম্মান না দেয়। স্বভাবতই রাজা বিক্রমকেশর ধনপতির প্রতি সেই আচরণ করে। এগার বছর বয়সে দাঁড়িয়ে লহনা এসময় ধনপতিকে আরও চার বছর অপেক্ষা করতে বলে পুত্র সন্তানের জন্য, কিন্তু তা না হলে ধনপতি যেন দ্বিতীয় বিবাহ করে। সেই প্রসঙ্গে লহনার পরিহাসচ্ছলে বলেছে।

"পরার বালক প্রভু উদরে ধরিয়া।

ছেইলা দশবার প্রভু দিব প্রসবিয়া।।"[২৮]

এধরনের উক্তি মধ্যযুগের কাব্যের ক্ষেত্রে তেমন আশ্চর্যজনক নয়। গায়েন কবি মানিক দত্ত শ্রোতাদের আনন্দ দানের জন্য অবলীলাক্রমে এরূপ বাক্য তুলে ধরতে দ্বিধা করেন নি।

স্ত্রীর প্রতি ক্ষুব্ধচিত্ততার কারণকে ধনপতির পায়রা উড়ানোর কার্য হিসাবে এই কাব্যে তুলে ধরা হয়েছে। পরিস্থিতি ও ঘটনার সঙ্গে ধনপতি চরিত্রের প্রতিক্রিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অনিবার্য। ধনপতির সঙ্গে স্ত্রী লহনার এই বিষয়কে নিয়ে গ্রাম্য কটুক্তিযুক্ত কোন্দলকে কেন্দ্র করেই দুর্বলা দাসীর আগমন। কবি এই চরিত্রটি কাহিনীতে উপযুক্ত সময়ে প্রবেশ ঘটিয়েছেন। ধনপতির পায়রা খুল্লনার কাচুলিতে নর-নারীর মিলন চিত্র দেখে তা ক্ষতবিক্ষত করার মধ্যে আদিরসের আভাস রয়েছে। খুল্লনার সঙ্গে বিবাহ পাকা হওয়ার পর প্রতিবেশিনীদের পতিনিন্দা অংশটি মধ্যযুগের সমাজ প্রেক্ষাপটে বিশেষত্বের পরিচায়ক। যুবতী নারীরা ধনপতিকে দেখে তাদের বিফল দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে আক্ষেপের করুণ সুর ধ্বনিত করেছে। শুধু যুবতীরা নয়, বিধবা নারীদেরও বেদনাময় দীর্ঘ সঞ্চিত ও পূর্ব স্মৃতিকে কবি হাস্যরসিকতার ভেতর দিয়ে সরস করে তুলেছেন। বিধবানারীর জীবন ও সমাজের অসহায় অবস্থার কথা তাদের উক্তিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তারা স্বামী অন্তর্ধানের কঠিন জীবনকে অনুভব করে খুল্লনাকে বলে —

"প্রাণন্ত হৈলে উহাক কোথা না পঠাও।
বিকালে হুড়ুকা লাগায়ো বিহানে খসাও।।"[২৯]

এমনকি, এক আশি বছরের বৃদ্ধাও ধনপতিকে দেখতে আসার আগে তার মনে বিবাহের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়।

"সকল রাইহ থাকিতে বুড়িক পাইল রসে।
কাচা হরিদ্রা কটূ তৈল আপন গায়ে খোশে।।"[৩০]

শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধা নিজের অন্তর বাসনাকে দুই নাতিনীর মধ্য দিয়ে পেতে চেয়েছে। সমাজের বিভিন্ন ধরনের অবহেলিত ও লাঞ্ছিত নারী জীবনের লেখচিত্র কবি তুলে ধরেছেন। 'নারীগণের পতিনিন্দা' বিষয়টি সংযোগে কবির সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও কাহিনী গ্রন্থনার দিক থেকে এই বিষয়টি প্লটের গতিবেগকে মন্থর করেছে সত্য, তবে সমাজ ও নারীর মনস্তত্ব ব্যাখ্যায় এর গুরুত্ব রয়েছে।

খুল্লনার বিবাহের অনুষ্ঠানের লোকাচারগুলি সমাজ ভাবনার বিষয় হিসাবে এসেছে। লক্ষণীয়, এয়োনারীদের সঙ্গে খুল্লনার মাতা রম্ভাবতীর 'জলসাধা'র গানটির সঙ্গে মালদহ জেলায় প্রচলিত বিবাহের গানের মিল রয়েছে। কবি যে নিজ অঞ্চলের আচার অনুষ্ঠানকে কাব্যে স্থান দিয়েছেন তা বোঝা যায়।

ধনপতির বিবাহের পরদিন তার রাজা বিক্রমকেশরের রাজদরবারে গায়ে হলুদ নিয়ে উপস্থিত হওয়া তার আভিজাত্যের প্রকাশ। রাজা তাকে 'আটকুড়া' অপবাদ দেয়, তার উপযুক্ত জবাব দিয়েছে সে দ্বিতীয় বিবাহ করে। বণিক শ্রেণীর আভিজাত্যের দাম্ভিকতা ধনপতির চরিত্রকে আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে। আর, রাজা বিক্রমকেশরও তাকে না জানিয়ে বিবাহ করার অপরাধে ধনপতিকে কারাদণ্ড দিয়েছে। উচ্চ শ্রেণীর বিবাহে সর্বোচ্চ শাসক রাজার অনুমতি নেওয়া তৎকালের নিয়ম ছিল। এধরনের ঘটনাটিও কবির নিজস্ব।

এরপর কবি চণ্ডীর ব্রত প্রচারের জন্য শারি-শুক পাখির উপকাহিনীকে মূল কাহিনীর মধ্যে সংযুক্ত করেছেন। এই উপকাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত করে কবি আরও দুটি উপকাহিনীর সংযোগ করেছেন। যেমন শ্রীবৎস ও উতু-পাতুর উপকাহিনী। এই উপকাহিনীগুলি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর গতিমুখ নিয়ন্ত্রণের একটি চাবিকাঠি। কবি এই বিস্তৃত বর্ণনায় শিল্প-সংযম রক্ষা করতে পারেন নি। কিন্তু দীর্ঘ চণ্ডীর কাহিনী শোনার মাঝে কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত একটু ভিন্ন ঘটনার সমাবেশ পাঠককে ভিন্ন স্বাদের আস্বাদন এনে দিয়েছে। তা চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ধারায় সকল কবিই ব্যবহার করেছেন। তবে মানিক দত্তের কাব্যে এই উপকাহিনীটি বিস্তারিত। চণ্ডী তার ব্রত প্রচারের জন্য ইন্দ্রের সভায় আসে। সেখানে পুষ্পদত্ত ও বিদ্যামন্ত নামে দুই গায়কের রামগুণ গান শুনে ইন্দ্র পত্নী শচী মোহিত হয়ে স্বামীর বুকে হাত দেয়। তা দেখে এই দুই গায়ক পরিহাস করলে তাদের শারি-শুক নামে পাখি হয়ে মর্ত্যে জন্মাবার অভিশাপ দেওয়া হয়। অর্থাৎ শারি-শুকের পূর্ব নাম এবং পাখি রূপে জন্ম গ্রহণের কারণ এই কাব্যে বিবৃত হয়েছে। প্রসঙ্গত, কবি সমকালীন রামভক্তিবাদকে এই স্থানে গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। শুধু তাই নয়, কীভাবে উজানী নগরের রাজা বিক্রমকেশরের কাছে এই দুই পাখি পৌঁছোল তার বিভিন্ন সম্ভাব্য ও সম্পর্কযুক্ত ঘটনার দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। শারি-শুক প্রথমে রাজা শ্রীবৎসের কাছে পালিত হয়। সেখান থেকে শনির ছলনায় শ্রীবৎস ও তার স্ত্রী চিন্তাবতী তাদের বনে হারায়। উল্লেখযোগ্য, এধরনের ঘটনা ও চিন্তাবতীর নাম অন্য কোন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লক্ষ্য করা যায় না। সে যাইহোক, এরপর উতু-পাতু নামে দুই ব্যাধ তাদের শিকার করে। উতু-পাতু নামে দুই বিরল ব্যাধ চরিত্রের উল্লেখ করার সঙ্গে কবি নিম্নশ্রেণীর গ্রাম্য ব্যাধের অর্থনৈতিক জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন সুন্দর ভাবে।

অতঃপর, ধনপতির পক্ষিদ্বয়ের জন্য স্বর্ণপিঞ্জর আনার জন্য গৌড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। সেই পরিবেশে লহনা কর্তৃক নীলাবতীর দ্বারা খুল্লনাকে অপদস্ত করার জন্য যে সকল তুক্তাকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে তা তার বর্ণনার সূক্ষ্মতা সত্যিই আমাদের বিস্মিত করে। নীলাবতীর এই তুক্তাক করার বিষয়টিকে কবির কলমের আঁচড়ে সজীব হয়ে উঠেছে। লোকজীবনে বশীকরণের কৌশল বর্ণনায় কবি এখানে সিদ্ধহস্ত। কাহিনী গ্রন্থনায় চিঠির

উপাদান ব্যবহারেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় খুল্লনা গৃহে দেবীর পূজার আয়োজন করেছে। তাতে দেবী প্রীত হয়ে খুল্লনার সামনে বর দিতে উপস্থিত হয়েছে। দেবী ও খুল্লনার এই সময়কার কথোপকথন লহনা শুনে সন্দেহ হয়। লহনার কথায় ধনপতি গৃহে ফিরে চণ্ডীর ঘট ভেঙ্গে ফেলে। শেষে যাত্রা শুরু করার মনস্থ করলে নানা অশুভ সংকেত দেখে ধনপতি ভীত হয়। ধনপতি দৈবজ্ঞকে ডেকে আনে — ''জোতিষ পুথিখান বিচারিঞা নৈল।''[৩১] দৈবজ্ঞের মুখে বিপদের কথা শুনে তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করার নির্দেশ দিয়ে বাণিজ্য যাত্রা করে। তখন কবি খুল্লনা কর্তৃক যে দেবীর পূজার পরিচয় আছে তাতে তান্ত্রিক সাধনার প্রভাব রয়েছে বলে মনে হয়। খুল্লনা চণ্ডীর বীজ মন্ত্র জপ করে। তন্ত্র শাস্ত্রানুযায়ী খুল্লনা ঘটের উপর দেবীর পূজা করে। সেই দেবী ভয়ঙ্কর। এরূপ পূজা পদ্ধতি সম্বন্ধে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী বলেছেন — 'ইহার কারণ বোধ হয় ইহাদের মূর্তির ভীষণতা।''[৩২] এই ভীষণ বা প্রচণ্ডা দেবীকে সন্তুষ্ট করতে হলে অহংকে বলি দিতে হয়।

কবি ধনপতির গৌড়ে যাত্রার পর লহনার পরিকল্পনায় অত্যন্ত সামাজিক সচেতনতায় পরিচয় দিয়েছেন। লহনাকে কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা করতে দুর্বলা নামে যে একটি দাসী চরিত্রের নাম এসেছে বাস্তব রক্ত মাংসে গড়া। সে এই কাব্যে অত্যন্ত বিচক্ষণ। হৃদয়ে খুল্লনার করুণ অবস্থার জন্য সহানুভূতি থাকলেও তার মত দাসীকে যে, পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয় তা কবির চরিত্র চিত্রণে দক্ষতা ফুটে উঠেছে। সে খুল্লনার দুঃখে মাতা রম্ভাবতীকে নারী হৃদয়ে সহানুভূতি থেকেই খবর দিয়েছে। সে ক্ষেত্রে লহনার সামনে তাকে কোন চতুরতার প্রকাশ করতে হয় নি। রম্ভাবতী চরিত্রটিও কন্যা খুল্লনার দুঃখে মানবিক হয়ে উঠেছে। সেই ক্রন্দন শুনে পুত্র হরিবাণ্যা গুরুগৃহ থেকে দৌড়ে আসাও চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত ও সচল করে তোলা হয়েছে। কবির কথায় —

''হরি বান্যা গুরু স্থানে পড়িতে গিঞাছিল।
মাএর ক্রন্দন শুনি ঘরে চলি আল্য।।''[৩৩]

মায়ের ক্রন্দনে সন্তানের ব্যাকুলত্ব প্রকাশে হরিবাণ্যা চরিত্রটি চমৎকার সৃষ্টি। খুল্লনা চণ্ডীর ব্রতদাসী। সে কারণে কাহিনীর অবশ্যম্ভাবী ধারায় ফুল্লনা ও ধনপতির মিলনের বার্তা হিসাবে প্রাকৃতিক জগতের যে মিলনের আভাস পাওয়া যায় তাতে কবি রোমান্টিক কল্পনা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাই লহনাকে স্বপ্নে তার ভীষণ রূপ দেখায় তাতে খুল্লনাকে লহনা অতিযত্নে বন থেকে নিয়ে এসে বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজী দ্বারা ভাত দেয়। সেখানে বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজী এবং বাঙালীর গৃহে রন্ধনশালার একটি চিত্র আমাদের সামনে হাজির করেছেন। কবি খুল্লনা ও ধনপতির মিলনের জন্য চণ্ডী কর্তৃক একে অপরকে খুল্লনা ও ধনপতির ছদ্মবেশে স্বপ্নকে কাজে লাগিয়েছেন। দিনান্তে তাদের জৈবিক মিলনের পূর্বে অত্যন্ত কৌশলে কবি 'খুল্লনার বারমাস্যা'-কে এই কাব্যে তুলে

ধরেছেন। কবি সেই বারমাস্যা শুরু করেছেন কার্তিক মাস থেকে আর শেষ করেছেন আশ্বিন মাসে। হেমন্ত ঋতু দিয়ে সূচনা খুল্লনার এই বারমাস্যা নারী হৃদয়ের শূন্যতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও কাব্যগুণ বিশিষ্ট।

ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত বণিকদের মধ্যে চাঁদ সদাগর চরিত্রটির উল্লেখ আমাদের আশ্চর্য করে। তাকেই নিমন্ত্রিত সভায় বণিকদের প্রধান করা হয়। তাতে বণিক মহলের কোন্দলে তাদের ঐতিহ্যের অন্তঃসারশূন্য চেহারা তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে খুল্লনার সতীত্বের পরীক্ষায় উদাহরণ স্বরূপ রামায়নের প্রসঙ্গ আনায়ন চিরাচরিত সংস্কারজাত। খুল্লনার জৌঘর পরীক্ষায় তাকে উদ্ধারের নিয়ে দুর্গার সঙ্গে শিবের কোন্দলের ঘটনাটি এই কাব্যে রয়েছে। সেই কোন্দলে দুই শক্তির বিরোধের বিষয়টি বড় হয়ে উঠেছে। পরে দুর্গা তার ভক্তকে রক্ষার জন্য ব্রহ্মার কাছে যায় এবং সে খুল্লনাকে জৌঘর থেকে রক্ষা করে।

> ''ব্রহ্ম মন্ত্র পড়ে ব্রহ্মা পরীক্ষার ঘরে।
> অগ্নি শীতল হৈল ব্রহ্মা দেবের বরে।।''[৩৪]

এমনকি, জৌঘর পরীক্ষায় খুল্লনা মরলে ধনপতির জ্ঞাতিগণকে রাজা বিক্রমকেশর শাস্তি বিধান করবে তার ঘটনা মানিক দত্তের কাব্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

কবি ধনপতির দ্বিতীয়বার সিংহলে যাত্রার প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছেন রাজকোষ থেকে একটি জিনিস চুরির বিষয় দ্বারা। রাজভাণ্ডার থেকে নেপাল নামে এক চোর চন্দন চুরি করে। এই চুরির বিষয়টি ঘটেছে চণ্ডীর ছলনায়। রাজভাণ্ডারে বিষনাশক চন্দনের সঙ্গে শঙ্খ দ্রব্যের অভাব দেখা দেয়। স্বভাবতই এই কাব্যে ধনপতির সিংহলে বাণিজ্য যাত্রার ব্যাপারটি অনিবার্য হয়ে উঠে। স্বামীর সিংহলে যাত্রাকে নিয়ে লহনা ও খুল্লনার চরিত্রের যে পরিচয়টি ফুটে উঠে তা চরিত্র রচনায় স্বতন্ত্রতার পরিচায়ক। খুল্লনা সতীন-যন্ত্রণার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্বীয় স্বামীকে গৃহ ছাড়া করতে অনিচ্ছুক। তাই সে গৃহে মজুত চন্দন রাজাকে দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। আর লহনা তার এই মনোবাঞ্ছার বিপক্ষে। সে নিজগৃহ-সম্পদের হানির আশঙ্কায় কটাক্ষ করে বলে —

> ''প্রভু তথা গেলে পাইবা দুখ   দেখহ কামিনীর মুখ
> সর্বস্ব রাজার তরে দিএগ।
> স্ত্রীর বচনে তুমি থাক ঘরেতে বসিএগ।।''[৩৫]

কবি এই ঘটনার মধ্য দিয়ে বণিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থা ও সতীন যন্ত্রণার অনবদ্য দিকটি তুলে ধরেছেন।

এরপর কবি ধনপতি ও খুল্লনার সন্তান শ্রীমন্তের জন্ম ও তার শৈশব জীবনের ঘটনা বিবৃত করেছেন। কবি ধনপতির 'জয়পত্র'-এ উজানীর রাজা বিক্রমকেশর এবং ধনপতির বংশ

তালিকার যে পরিচয় দিয়েছেন তা অত্যন্ত তথ্য সাপেক্ষ। এমনকি ধনপতির জয়পত্রে পুত্র বা কন্যার নামের উল্লেখ এবং তার সন্তানের সিংহল যাত্রার অগ্রিম আভাস পাঠক চিত্তকে কৌতূহলী করে তুলেছে। যাত্রা পথের বর্ণনায় কবি মালদহের আঞ্চলিক পরিবেশের স্থাননামকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। খুল্লনার সাধভক্ষনেও যে সকল শাক-সবজির তালিকার উল্লেখ পাওয়া যায় তা সত্যিই পল্লীবাংলার মুখোমুখি করে দেয়। শুধু তাই নয়, কবি বণিক পরিবারের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে শ্রীমন্তের জন্মের রীতি-নীতি তুলে ধরেছেন। লক্ষণীয়, তিনি এই কাব্যে শ্রীমন্তের স্থানে কখন শ্রীপতি আবার কখন শ্রীমন্ত নামটি ব্যবহার করেছেন। তার শৈশবকাল পুরাণ প্রভাবিত নয়। গ্রাম্য বালকের স্বভাব বৈশিষ্ট্য তার চরিত্র অঙ্কনে রেখাপাত ঘটিয়েছেন। তা একান্তই লৌকিক ও বাস্তব সম্মত বলে মনে হয়। এছাড়া কবির ষাইট দত্তের ছেলে ভোলা নামটি নির্বাচনের সঙ্গে ঘটনা ও পরিস্থিতির সামঞ্জস্য রক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমন্তের দৌরাত্ম লক্ষ্য করে মাতা খুল্লনা তাকে গুরু গৃহে শিক্ষা লাভের কথা ভাবে। তার শিক্ষকের নাম শ্রীহরি। সেখানে শ্রীমন্তের পাঠ্যবিষয় নির্বাচনেও কবির বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমন্তকে শৈশবে সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করতে হয়নি। সে 'ক', 'খ', 'বারফলা', 'পিঙ্গল', 'সুবন্ত' ও 'অভিধান' প্রভৃতির শিক্ষা লাভ করে। কবির ভাষায় —

> ''ক, খ পড়েন সাধু গুরুর মন্দিরে।
> বার ফলা পড়ি সাধু শাস্ত্রপাট করে।।
> পিঙ্গল পড়িল আর পড়িল সুবন্ত।
> অভিধান পড়িয়া শব্দের পাল্য অন্ত।।''[৩৬]

এমনকি দুর্গাও গৃহে এসে শ্রীমন্তকে পড়ায়। এরূপ গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেখা যায় না। এখানে কবি দেবীর প্রভাবকে অতি প্রাধান্য দিয়েছেন।

শিক্ষাগুরুর সঙ্গে শ্রীমন্তের দ্বন্দ্বের ঘটনাটি কাহিনী গ্রন্থনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যময়। তবে এই দ্বন্দ্বের কারণ আকর্ষণীয়। দেবীর অলৌকিক ছলনায় শ্রীমন্তের হাতের খড়ি মাটিতে পড়ে যায় তা পণ্ডিতকে তুলতে বললে সেই ধৃষ্টতাজনিত কারণে শ্রীমন্তকে 'জারজ' বলে। এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য কবি যে কৌশলটি বেছে নিয়েছেন, তা কাহিনী গ্রন্থনার ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত।

কবি শ্রীমন্তের যাত্রাকালে যে সপ্তডিঙ্গার নাম উল্লেখ করেছেন সচরাচর লক্ষ্য করা যায় না। এই সপ্তডিঙ্গার নাম হল 'কর্ণ', 'উদরতারা', 'চন্দ্রখোলা', 'শাশিয়া', 'ধুমকুরা', 'যাত্রাসিদ্', 'হরিহরা' প্রভৃতি। দেবী শ্বেত মাছির ছদ্মবেশে খুল্লনাকে সিংহল যাত্রার পরবর্তী ঘটনা বলেছে। তার ফলে পাঠকের কৌতূহল এখানে বিঘ্নিত হয়েছে। শ্রীমন্তের তিন দিন নদীয়ায় অপেক্ষা করার ঘটনাও এই কাব্যের বিশেষত্ব। শ্রীমন্ত দ্বারা তার পূজা করানোর জন্য কাব্যে চণ্ডী ইন্দ্রের সভা

থেকে বিচিত্র প্রকার মেঘ আনে। তাতে প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে শ্রীমন্ত দেবী ‘চৌতিশা’ উচ্চারণ করার পরেও মগরার জলের উত্তাল আবহাওয়া কাটে না। তখন শ্রীমন্ত অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তুলসীর মালা পরিধান করে এবং বিষ্ণুনাম উচ্চারণ করে প্রথম সূর্য পূজা করে নেয়।

“তুলসীর মাল্য সাধু গলায় পহ্বিল।
শ্রীবিষ্ণু বলিএ্যা জল মুখে তুল্যা দিল।।
*   *   *
দেবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম করে মন দুঃখে।
সূর্য্যের নামতে অর্ঘ্য ধরে পূর্ব্বমুখে।।”[৩৭]

শ্রীমন্তের এই আচরণে কবি বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে তান্ত্রিক ধর্মের পূজা পদ্ধতির মিলন ক্ষেত্রকে তুলে ধরেছেন। তান্ত্রিক মতে প্রথম সূর্যপূজার কথা উল্লেখ রয়েছে। সেই কথা দ্বিজমাধব বিরচিত ‘মঙ্গলচণ্ডীর গীত’ গ্রন্থের সম্পাদক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য বলেছেন — “মঙ্গলচণ্ডী পূজার প্রথমে সূর্য্য-পূজা করা তান্ত্রিক মতে প্রশস্ত।”[৩৮] অতঃপর সে চণ্ডীর পাশাপাশি পিতা, মাতা, বিমাতা, দাস-দাসীকে স্মরণ করেছে। শ্রীমন্তকে তখন দেবী চণ্ডী কোলে তুলে নেয়। তার উগ্রমূর্তির সঙ্গে শান্ত স্নিগ্ধ মাতৃবাৎসল্যের রূপ দেবী মঙ্গলাচণ্ডীকে মনে করিয়ে দেয়। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এরূপ সূর্য্যের তর্পণ ও স্বীয় আত্মীয় স্বজনদের তর্পণ করার বিনয় চৌতিশার পর বিবৃত হয়েছে।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কমলে কামিনীর কাছে বিভিন্ন জীব-জন্তুর মধ্যে হিংস্রতা প্রকাশ পায় না। দেবীর মোহিনীরূপে শ্রীমন্ত ভয় পায়। কর্ণধার বুদ্ধিমন্তের কথায় শ্রীমন্ত কালিদহের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে কবি চরিত্রকে কাব্যে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। রত্নমালার ঘাটে তাদের আগমন বার্তা দক্ষিণ পাটনের কাছে শত্রু আশঙ্কায় পরিণত হয়েছে। তাই কোটালের বিপরীত বাদ্যের আওয়াজ শুনে সকলে শঙ্কিত হওয়ার মধ্য দিয়ে কবি সমকালীন বিভিন্ন রাষ্ট্র শক্তির আক্রমনের আভাস দিয়েছেন। কিন্তু শ্রীমন্তকে তাদের শত্রু পক্ষ বলে মনে হয়নি। শ্রীমন্তের রূপ দেখে পুরনারীগণ তাদের স্বামীর প্রতি আক্ষেপের দিকটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শ্রীমন্ত রাজা শালবানকে ভেট করতে গেলে যেসকল খাদ্যদ্রব্য নেয় তার মধ্যে কবি বারমাসে আম ও তালের উল্লেখ মালদহ তথা উত্তরবঙ্গের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

“বারমাস্যা আম্র দিল রামমাস্যা তাল।
বারমাস্যা দিলেন জামির করনাল।।”[৩৯]

স্বাভাবিক ভাবেই শ্রীমন্তের সঙ্গে রাজার বাণিজ্য দ্রব্যের আদান প্রদান সমাপ্ত হয়। তারপরই এই কাব্যে চণ্ডী কর্তৃক পূর্বোল্লেখিত পিতার সঙ্গে পুত্রের সাক্ষাৎ এবং সুশীলার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিবাহের

কথা আসে। তখন চণ্ডীর অলৌকিক স্বপ্নের দ্বারা রাজা শালবানের মধ্যে শ্রীমন্তের প্রতি সন্দেহ তৈরী করা, তাতে শ্রীমন্তকে বন্দী করা এবং বন্দী শ্রীমন্ত রাজাকে কমলে কামিনীর ঘটনা উত্থাপন করা ইত্যাদি একে একে কাব্যে স্থান লাভ করেছে। কাহিনী গ্রন্থনায় কমলে-কামিনী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অপরিহার্য অংশ। কবি এই ঘটনায় কাহিনীকে সচল করতে কাহিনী গ্রন্থনায় কৌশল হিসাবে অলৌকিক স্বপ্নের আশ্রয় নিয়েছেন। সেক্ষেত্রে চরিত্রের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা প্রাপ্ত হয়েছে বলে মনে হয়।

শ্রীমন্তের বিবৃত কমলে কামিনীর ঘটনা রাজা শালবানের কাছে মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং তাকে মশানে বলীর আগে শ্রীমন্তের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে তন্ত্রাচারের আভাস রয়েছে। সে প্রথমে গঙ্গার জলে নিজেকে পবিত্র করে সূর্য পূজা করে। তারপর একে একে আত্মীয় স্বজনদেরকে তর্পণ করে। শ্রীমন্ত চণ্ডীর উদ্দেশ্যে চৌতিশা উচ্চারণে উগ্র বা প্রচণ্ডা শক্তি দেবীকে স্মরণ করে দেয়। প্রসঙ্গত, মানিক দত্তের কাব্যে মোট তিনটি চৌতিশার উল্লেখ রয়েছে। সেই দেবী হল এখানে শক্তিরূপিনী কালী। শালবান কর্তৃক শ্রীমন্তকে মশানে বলি দেওয়ার সময় তার দেবীর উদ্দেশ্যে চৌতিশা বিবৃতি মানিক দত্তের কাব্যে পাওয়া যায়। এই চৌতিশা অংশটি তন্ত্রাচারের দ্বারা প্রভাবিত। সেই সঙ্গে শৈবশাক্ত এবং শাক্ত বৈষ্ণবের মিলন মহিমাও ধ্বনিত হয়েছে। চৌতিশার দ্বারা শ্রীমন্ত বিপদে দেবীকে স্মরণ করে। চণ্ডী আভাস পায় বিভিন্ন অশুভ লোক বিশ্বাসের ইঙ্গিতের দ্বারা। কাব্যিক গুণ না থাকলেও সমকালীন পাঠক নিজের সংস্কার-বিশ্বাস ও সমাজকে এই কাব্যে খুঁজে পাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাতে কবি চণ্ডীকে সাধারণ মানবীতে পরিণত করেছেন। এই সকল স্থানে পাঠক যেন দেবীর সঙ্গে একাত্মবোধ করে। এই অশুভ সংকেতের পর চণ্ডী পদ্মাকে দিয়ে গণনা করিয়ে প্রকৃত ঘটনা জানতে পারে।

> ‘‘রাম ঘড়ি গনি পদ্মা বলিছে দুর্গাকে।
> মশানে শ্রীমন্ত সাধু স্মরিছে তোমাকে।।’’[৪০]

নিজের ভক্তকে উদ্ধারের জন্য চণ্ডীর রণ সজ্জা কালীর মত। এই শক্তিরূপিণী দেবীর যুদ্ধে যাত্রার সময় ‘রাম’ নাম স্মরণ করে বের হওয়ার মধ্যে সমকালীন সমাজে রামভক্তির ছায়াপাত রয়েছে। মানিক দত্ত সমাজের এই সমস্ত দিকগুলি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

দেবীর মশানে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে উপস্থিত হওয়া এবং দেবী চণ্ডী তাদের সম্মুখে বেদ পাঠ করে, প্রতিদানে শ্রীমন্তকে শালবানের কোতালদের কাছ থেকে চায়।

> ‘‘বুড়ি রূপে দুর্গামাতা মশানতে গেল।
> বেদ পড়ি কোতালকে আশীর্ব্বাদ দিল।।’’[৪১]

কিন্তু তারা নারাজ হলে দেবী চণ্ডী তাদেরকে একাদশীর ব্রত পারণার জন্য খাদ্য বস্তু হিসাবে

একলক্ষ ছাগল, ভেড়া এবং মহিষ চায়। তার ফলে কোতালরা তাকে ডাইনী অপবাদ দিলে তার ভয়ঙ্কর ও উগ্রমূর্তি প্রকাশ পায়। শুরু হয় কোতালদের সঙ্গে দেবীর যুদ্ধ। দেবী চামুণ্ডারূপ ধারণ করার পর দানাগণকে, বলবীর হনুমান এবং জমের পুত্র মঙ্গলাকে স্মরণ করে। যমের পুত্র মঙ্গলার কথা বলতে গিয়ে কবি মূল কাহিনীর বহির্ভূত তার শক্তি সম্বন্ধে কিছু অতিকথন করেছেন। যা তাঁর কাব্যের কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করেছে। এছাড়াও কাহিনীতে তিনি নতুন নতুন চরিত্রের সংযোজন করেছেন। ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের এরূপ সমাবেশে কাহিনীর মধ্যে জটিলতা বৃদ্ধি হয়েছে।

যুদ্ধে শালবান রাজার সমস্ত সৈন্যের মৃত্যু হয়। তাতে বাধ্য হয়ে সে দেবীর স্তব করেছে। তার আগে দেবীর পরিচয় জানতে চাইলে দেবী অত্যন্ত অভিনব ভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করে। কাহিনী গ্রন্থনায় দেবী চণ্ডীর শালবান রাজার কাছে পরিচয় প্রদান স্বতন্ত্র সংযোজন বলা যেতে পারে। সেখানে একই সঙ্গে দেবী তার লৌকিক ও পৌরাণিক পরিচয় দিয়েছে। লৌকিক পরিচয়ের সঙ্গে মিশে আছে মালদহের আঞ্চলিক পরিচয়েরর সংযোগ সূত্রটি। এইভাবে পরিচয় পত্র দ্বারা মশানের পালা সমাপ্ত হয়েছে, যা অন্যত্র পাওয়া দুষ্কর।

এরপর দেবী কর্তৃক কমলে কামিনী রূপ প্রদর্শন এবং পূর্ব শর্তানুযায়ী শ্রীমন্তের বিবাহ প্রসঙ্গটি সামনে আসে। মানিক দত্ত সেক্ষেত্রে দুটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার সংযোজন ঘটিয়েছেন। সেই দুটি ঘটনা কাহিনীকে গতিশীল করেছে। আর অপর ঘটনাটি এর সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত। এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে অলৌকিকতাকে। তাই দেবীর ভক্ত শ্রীমন্তের অনুরোধে চণ্ডী হনুমানকে যমালয় থেকে মৃতদের প্রাণ ফিরিয় আনতে পাঠায়।

> ‘‘দুগার কথা শুনি বীর করিল গমন।
> একদণ্ডে জমপুরে দিল দরশন।।’’[৪২]

হনুমান সমস্ত সৈন্যদের প্রাণ ফিরিয়ে আনলে দেবী চণ্ডী পবিত্র গঙ্গাজল হাতে নিয়ে ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ করলে তারা প্রাণ ফিরে পায়। এতে কবি জীব সৃষ্টির মূল উৎস ও গঙ্গার পবিত্র জলের পুরাণ নির্ভর সত্যকে তুলে ধরেছেন। তবে নীলারানীর চরিত্রের উল্লেখ, কিংবা তার বুদ্ধিমত্তায় পুনরায় প্রাণ ফিরে পাওয়ার ঘটনা অন্য কবিদের কাব্যে নেই। এমনকি, পুরাণে বর্ণিত বিশল্যকরণী দ্বারা প্রাণ ফিরে পাওয়ার ঘটনাটি এখানে কাজে লাগানো হয়নি। বরং এই কাব্যে সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে অর্থাৎ মৃত্যুর পর প্রাণ যমালয়ে চলে যায় এই বিশ্বাসকে কাজে লাগানো হয়েছে। কবি সেই লৌকিক বিশ্বাসকে তুলে ধরেছেন।

শ্রীমন্তের বিবাহ বর্ণনায় কবি বাঙালী গৃহের চিত্র এঁকেছেন। সর্বত্রই এই বিবাহের কথা রয়েছে। তবে জলসাধা, ব্রাহ্মণ দিয়ে পুথি পড়ে ধান দুর্বা দিয়ে পিতা মাতার বরকে বরণ করা, বরকন্যার সপ্তবার প্রদক্ষিণ, মালাবদল, আত্মীয় স্বজনদের দান সামগ্রী প্রদান ইত্যাদি সমস্ত বিষয়গুলি

বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই দানসামগ্রী প্রদানের সময়ে শ্রীমন্তের দানস্বরূপ বন্দীঘর চাওয়ার মধ্যে কোন কারণ স্পষ্ট করে বলা হয়নি। শ্রীমন্ত নিজের বেদনাকে অন্তরে গোপন করে রেখেছে। দেবীর স্বপ্নে তার গৃহমুখী ভাবনার জাগরণ ঘটে। সেই প্রসঙ্গে সুশীলার বারমাস্যা বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যে আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণ দিয়ে দুর্গা পূজা করা এবং অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব পালন করার এক অনবদ্য চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

অতঃপর শ্রীমন্তের নিজ দেশে যাত্রার পথে পিতা ধনপতির সপ্তডিঙ্গাসহ কাণ্ডারীদের মৃত্যুতে আক্ষেপ ও সেই সঙ্গে দেবীর অপার মহিমাকে বড় করে দেখানো হয়েছে। তখন পুত্রবধূ সুশীলার চণ্ডীপূজা ঘটনাটি এই কাব্যে পৃথক সংযোজন হয়েছে। সেই পূজায় রয়েছে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব। রজোগুণের অধিকারী জবা ফুল দিয়ে আদ্যের মন্ত্র পাঠ করে দেবীর পূজায় তার সাক্ষ্য মেলে। দেবীর কৃপায় সমস্তই ধনসম্পদ নিয়ে নদীর কূলে ফিরলে সেখানেই খুল্লনা সহ এয়োগণ তাদের বরণ করতে আসে। শ্রীমন্ত মাতা খুল্লনার মনের অবস্থা পরীক্ষার জন্য পিতার একটি বস্ত্রখণ্ড তার সামনে ফেলে। তার মধ্য দিয়ে যেমন কবির সামন্ততান্ত্রিরক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর প্রতি পুরুষের সন্দেহ প্রবণতা এবং তা দেখাতে গিয়ে শ্রীমন্তের দ্বারা যে কৌশল অবলম্বন করেছেন তা সত্যিই উপভোগ্য। বিক্রমকেশরের কন্যা জয়াবতীর সঙ্গে শ্রীমন্তের দাম্পত্য জীবনের কথা না থাকলেও তার দ্বারা চণ্ডী-পূজাকে কাব্যে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এইভাবে বিভিন্ন রাজ্যের চার নারীর দ্বারা দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচার করাই মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মূল অভিসন্ধি বলে মনে হয়। কবি নিজেই বলেছেন —

> ‘‘চার রাজ্যের চারিজন একত্র হইল।
> দুর্গাকে পূজিতে সঙে একচিত্ত কৈল।।’’[৪৩]

এমনকি এই কাব্যে ধনপতি পুত্রের দ্বিতীয় বিবাহ দেওয়ার পরেও নিজের ইচ্ছায় চণ্ডীর পূজা করতে চায়নি। পুত্র শ্রীমন্ত ও দেবী চণ্ডীর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত ধনপতি তার পূজো করে। যখন দেবী চারজন ভক্তকে নিয়ে স্বর্গে যাচ্ছিল তখন তার সঙ্গে যমের বিবাদ এবং পরে বিষ্ণু ও শিবের মাধ্যমে সে বিবাদ ভঞ্জন এবং দেবীর তাদেরকে নিয়ে স্বর্গে গমনের ঘটনা রয়েছে। তবে এখানে বিবাদ ও বিবাদ ভঞ্জন কবির নিজস্ব সৃষ্টি।

শেষে মানিক দত্ত সমগ্র কাব্যের একটি সংক্ষিপ্ত ব্রতকথা বিধৃত করেছেন। তাঁর পরবর্তী চণ্ডীমঙ্গলে কবিরা এই ব্রতকথা সংক্ষিপ্তাকারে তাঁদের কাব্যে সংযুক্ত করেন নি। সেখানে চণ্ডীর পূজার বার, ক্ষণ, উপযোগিতার কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। কবি বলেছেন —

> ‘‘পূজার নিয়ম কথা শুন সর্ব্বজন।
> করিহ দুর্গার পূজা হবে পুত্রধন।।’’[৪৪]

এভাবে এই কাব্যে কাহিনী গ্রন্থনায় ব্রতকথা ও লৌকিক উপাদানকে লোকমানসের প্রত্যয়ের সঙ্গে মিশ্রণ করে প্রকাশ পেয়েছে। মঙ্গলকাব্যের এই ব্রতকথার রূপটি প্রাচীনতর। মানিক দত্তের কাব্যে সেই প্রাচীন রূপটি বিদ্যামান। সেই দিক থেকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় তিনি প্রথম কবি।

তাঁর চণ্ডীমঙ্গলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডতা। ব্যাধ খণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ধনপতি খণ্ডের ব্রতকথা বর্ণনা এবং শ্রীমন্তকে সিংহল যাত্রায় অভয়দান হিসাবে দেবী চণ্ডী কর্তৃক কালকেতুর উৎকর্ষময় জীবনকে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা হয় ধনপতি খণ্ডে। তাঁর কাব্যে যখন সাধারণ মানুষ তথা ভক্ত সাধারণকে দেবীর অনুগামী করতে চেয়েছেন তখন দেবীর শক্তিরূপিনী রূপটিই সর্বদা প্রাধান্য পেয়েছে। সেই শক্তি দেবীর কথাই মানিক দত্তের কাব্যে বারবার উঠে এসেছে। তার প্রকাণ্ডরূপে ভক্ত মূর্চ্ছিত হলে সেই মুহূর্তে তার স্নেহময়ী কোমল মাতৃরূপ পরিস্ফুট হয়েছে। এই কাব্যে দেবীর দু'টি স্বভাবই তন্ত্রের দেবী ভাবনার অবলম্বনে সঞ্চারিত। দেবীর এই স্বরূপ কাব্যে ভক্তজনের বিপদ-আপদের মত বিশেষ বিশেষ মুহূর্তেভাস্বর হয়ে উঠেছে। তবে লক্ষণীয়, এই কাব্যের চণ্ডী স্বরূপে শক্তিরূপিনী, কিন্তু অন্তরে সে সমকালীন সাধারণ মানুষের মত লোকসংস্কারে গড়া রক্ত-মাংসের মানবী।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ঘটনার চালিকা শক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজ, নীতিকথা, অলৌকিক শক্তি, ভক্তিবাদ ও ধর্ম। এই কাব্যে স্বপ্নাদেশের বারংবার উল্লেখ, ভক্তের বিপদে তার কল্যাণ-হস্ত-প্রসারণ, ভক্তের সঙ্গে তার মানবিক আচরণ সার্বভৌম ও সহজ প্রত্যয়ের নিদর্শন। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ধারায় মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি সেই বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তি ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্য কবি দেবতা ও মানবের মিলনের জন্য বহু উপলক্ষ্যকে কাব্যে সংযোজন করেছেন। তাতে সমকালের মানুষের প্রত্যক্ষ বিশ্বাসকে অর্জন করেছে। তা না হলে এমন নির্দ্ধিধায় ও কোন প্রমাণ ছাড়াই কবি এরূপ কাহিনীর বয়ন করতে সাহস করতেন না। কাব্যটি সেই দিক থেকে সমকালের চাহিদার অনুকূলে রচিত।

ঘটনার আখ্যান যদি পাঠক বা শ্রোতার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ বার্তা হয়, তাহলে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল তাই। তিনি রামায়নকে সমকালীন মানুষের জীবন চলার ব্রতরূপে উপস্থাপন করেছেন। কাব্যের প্রত্যেকটি চরিত্র যেন সেই ব্রতের দাস। এই কাব্যের কাহিনী যখন কোন নতুন ঘটনায় প্রবেশ করেছে তখনই কবি তার কার্যকারণ সূত্র লঘু করে ফেলেছেন। সেখানে তাঁর উপস্থাপন ভঙ্গি গল্প বলার মত। এ প্রসঙ্গে কাহিনীতে ফুল্লরা ও লহনার অনুপ্রবেশ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুযায়ী অভিশাপ, বারমাস্যা, চৌতিশা, নারীগণের পতিনিন্দা, বিবাহাচার ইত্যাদি এই কাব্যে সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর কাব্যে বহুস্থানে রয়েছে বাস্তবতার প্রকাশ। সহজ-সরল ভাষা বিষয়কে করেছে সাবলীল। এমনকি বিষয় নির্বাচনেও তাঁর মৌলিকতা অপর

একটি কাব্যগুণ।

মানিক দত্তের কাব্যটিতে বাস্তব রসের উদ্‌ঘাটন না হলেও তা বাস্তব সত্যযুক্ত তথ্যমূলক কাব্য বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। তাঁর কাব্যের বাস্তব তথ্যগুলি গ্রাম্য পরিবেশের আত্মপ্রকাশ। রম্ভাবতীর দ্বারা মালিনীর তুক্‌তাক এই বিষয়ের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কবি এখানে বাস্তব তথ্যের অবতারণা যেখানে করেছেন সেখানে কাহিনী গ্রন্থনার স্বচ্ছন্দ গতি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রসারের দিকটি লক্ষ্য রাখতে পারেন নি। তাঁর বস্তু বর্ণনা কাহিনী গ্রন্থনাকে আড়ষ্ঠতা দান করেছে। মোটের উপর একথা বলা যেতে পারে যে, মানিক দত্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজে প্রচলিত বাস্তব সত্যের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করেছেন। কিন্তু সেগুলিকে আত্ম প্রসারণের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করতে পারেন নি। তার ফলে তাঁর কাব্যের গ্রন্থনা রীতি হয়ে পড়েছে শিথিল। এরূপ শিথিলতার কারণ হিসাবে বলা যায় — প্রথমত, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল প্রচারমূলক। দেবীর আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য কারণে-অকারণে মাহাত্ম্যগীত হয়েছে। যেমন, কলিঙ্গরাজ সুরথ ও সিংহলরাজ শালবানের কাছে বিশ্বস্ত হওয়ার জন্য তার অলৌকিক মহিমা প্রকাশের প্রয়োজন ছিল। তারফলে কবি কাহিনী গ্রন্থনায় বেশি মনযোগ দিতে পারেন নি। দ্বিতীয়ত, কবির সামনে কোন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাঠামো ছিল না। তাই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি স্রষ্ঠা হিসাবে এরূপ গ্রন্থনা হতে পারে। তৃতীয়ত, কবির শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যের অভাবে হয়তো শিল্পের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। চতুর্থত, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রাজনৈতিক পরাভব একদিকে অসাধ্য সাধনক্ষম দেবতার আশ্রয় গ্রহণে ও অনুগ্রহ ভিক্ষায় প্রণোদিত করেছিল, তেমনি অপর দিকে দৃঢ়তর সমাজ ও ধর্ম সংহতির প্রতিও প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। দেবীর অসীম শক্তির প্রকাশ ও লৌকিক ধর্মের বিষয়গুলি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এধরনের গ্রন্থনা রীতি পাঠকের কাছে কৌতুহল জাগ্রত করে। তার আবেদন আবেগ প্রবণ হৃদয়ের কাছে, বুদ্ধির কাছে নয়। তথ্যকে শিল্পরূপ দিতে না পারলেও তিনি যে একজন সমাজ সচেতন কবি ছিলেন, এই বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র :

১। হরিদাস পালিত; গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী গীতে বৌদ্ধভাব, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, সম্পাদক নগেন্দ্রনাথবসু, ১৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩১৭, পৃ. ২৫০।

২। তদেব; পৃ. ২৫৩।

৩। সুনীলকুমার ওঝা; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৬৪-৬৫।

৪। রজনীকান্ত চক্রবর্তী; মানিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু, একাদশ

ভাগ, প্রথম সংখ্যা, ১৩১১, পৃ. ৩৫।

৫। সুনীলকুমার ওঝা; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৮-২৯।

৬। তদেব; পৃ. ৩৫।

৭। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য; ভূমিকা, দ্বিজমাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫, পৃ. ।

৮। সুনীলকুমার ওঝা; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৬৮।

৯। তদেব; পৃ. ৯৬।

১০। তদেব; পৃ. ১০৭।

১১। নীহাররঞ্জন রায়; বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, ষষ্ঠ সংস্করণ, মাঘ, ১৪১৪, পৃ. ৭১৩।

১২। সুনীলকুমার ওঝা; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১১২।

১৩। তদেব; পৃ. ১১৫।

১৪। নীহাররঞ্জন রায়; বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, ষষ্ঠ সংস্করণ, মাঘ, ১৪১৪, পৃ. ৪৮১।

১৫। সুনীলকুমার ওঝা; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১২২।

১৬। তদেব; পৃ. ১২৬।

১৭। তদেব; পৃ. ১৩০।

১৮। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (? — ষোড়শ শতাব্দী) আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯১, অষ্টম মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৭, পৃ. ৪৫৪।

১৯। সুনীলকুমার ওঝা; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৩০।

২০। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড : চৈতন্যযুগ (খ্রীষ্টীয় ১৪৯৩-১৬০৫ অব্দ), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০০৬-০৭, পুনর্মুদ্রণ, ২০১০-২০১১, পৃ. ৯২।

২১। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত; ভূমিকা, দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫, পৃ. ।

২২। সুনীলকুমার ওঝা, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৫০।

২৩। তদেব; পৃ. ১৫৩।

২৪। তদেব; পৃ. ১৭০।

২৫। তদেব; পৃ. ১৭১।

২৬। তদেব; পৃ. ১৭৭।

২৭। তদেব; পৃ. ১৭৮।

২৮। তদেব; পৃ. ১৯৩।

২৯। তদেব; পৃ. ২০১।

৩০। তদেব; পৃ. ২০২।

৩১। তদেব; পৃ. ২৬৩।

৩২। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী; তন্ত্রকথা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬২, পৃ. ৫৩।

৩৩। সুনীলকুমার ওঝা; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২২৮।

৩৪। তদেব; পৃ. ২৫৫।

৩৫। তদেব; পৃ. ২৬০।

৩৬। তদেব; পৃ. ২৮৬-২৮৭।

৩৭। তদেব; পৃ. ৩০৮।

৩৮। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য; ভূমিকা, দ্বিজমাধব বিরচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫, পৃ. ।

৩৯। সুনীলকুমার ওঝা; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩১৬।

৪০। তদেব; পৃ. ৩৩৩।

৪১। তদেব; পৃ. ৩৩৫।

৪২। তদেব; পৃ. ৩৫৪।

৪৩। তদেব; পৃ. ৩৬৭।

৪৪। তদেব; পৃ. ৩৭৬।

——০০——

উপসংহার

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মানিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার আদি কবি। তার আগে মনসামঙ্গল কাব্যের ধারা সৃষ্টি হয়েছিল। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের তুলনায় তার দেবী ভিন্ন, গঠন রীতি ও চরিত্র আলাদা। তুর্কী আক্রমনের প্রেক্ষাপটে দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির মিলনে মনসামঙ্গল কাব্য সৃষ্টি হয়েছিল। যেখানে মনসা নিম্নশ্রেণীর দেবী হয়েও তাকে উচ্চশ্রেণীর দেবদেবীর সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক-ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে কবিরা সেটা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সৃষ্টি হল মনসার উগ্র ও ক্রূর মূর্তি। তারপর ভিন্ন এক উগ্র ও বরাভয়দাত্রী মাতৃসুলভ দেবীকে নিয়ে রচিত হল চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধারা। এই কাব্যের ধারার প্রথম অবয়ব দান করলেন মানিক দত্ত।

এই অভিসন্দর্ভে আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী গ্রন্থনা ও চরিত্র নির্মাণের পরিচয় লাভ করা। সেই প্রসঙ্গে প্রথমে তৎকালীন ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বাতাবরণটি পর্যালোচনা করেছি। তার সঙ্গে দেবী চণ্ডীর স্বরূপটিও প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিকতার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর কাব্যে চণ্ডীকে পেলাম স্বরূপে উগ্র ও শান্ত রূপে। তিনি তাঁর কাব্যে সমাজে প্রচলিত ধর্মের তাগিদকে বেশি অনুভব করেছিলেন। প্রথম কবি হিসাবে তাঁর লক্ষ্য ছিল লোকমানসের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তা করতে গিয়ে দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্যকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। সেই সঙ্গে দেবী মাহাত্ম্যের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ব্রতকথা, গালগল্প, নীতিকথা, লোকবিশ্বাস ও পুরাণকে কাব্যে সন্নিবেশিত করেছেন। এরূপ কাব্য রচনার কারণ স্বরূপ সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় চাহিদা কার্যকর ছিল। সে কারণে প্রথম অধ্যায়ে সেই প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। সে সময় মানুষ এমন এক দেবীর আশা করেছিল যে দেবী ভক্তের বিপদে অভয়দান করবে এবং প্রয়োজনে মাতৃস্নেহে বুকে টেনে নিবে। দেবীকে শক্তি-কল্পনায় মানুষের দুটি সহজাত প্রবৃত্তি কাজ করেছিল যে সময়। একদিকে বাঁচার আর্তি, আত্মরক্ষা এবং অন্যদিকে সৃষ্টি ও পালনের আকুতি। সেই সময় এই দেবীকে শক্তি দেবী কালীর সঙ্গে এক করে ভাবনার প্রমাণ দেখা গেল। এরূপ ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কবি মানিক দত্তের ব্যক্তি পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। মানিক দত্তের কাব্যের বিভিন্ন নদ-নদী, স্থান-নামের ভিত্তিতে বোঝা গেছে যে, তিনি উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলার গৌড়ের অদূরে উত্তরে নঘরিয়া গ্রামে বাস করতেন। কবি ছিলেন গায়েন। তিনি মুকুন্দ

চক্রবর্তীর কাব্য রচনার অল্প আগে কাব্য রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়েছে। কবির সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ। তিনি সাধারণ মানুষের চাহিদা, জীবন চলার কথা, সুখ-শান্তির কথা সেই দেবীকে ঘিরে তার স্বরূপ অনুভব করতে পেরেছিলেন। এদিকে লক্ষ্য রেখে গায়েন মানিক দত্ত নতুনমঙ্গল কাব্যের কাহিনী সাজিয়েছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী গ্রন্থনা পর্যালোচনা করা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে আধুনিক প্লটের স্বরূপ অনুসন্ধান করা হয়েছে। আধুনিক প্লটের সঙ্গে মনসামঙ্গল কাব্যের গঠন রীতিকেও সামনে রাখা হয়েছে। কারণ এই দুটি দিক থেকে দেখলে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রকৃত রূপটি অনুসন্ধান করা হয়েছে। তাতে কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা গ্রন্থনার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ছাপ রেখেছেন। তিনি উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের কবি তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল ও জীবনকৃষ্ণ মৈত্রের কাব্যের গঠন অনুসরণ করে তাঁর কাব্যের সূচনা করেছেন। তাঁর কাব্যে দেবখণ্ড বলে স্বতন্ত্র খণ্ড নেই, সৃষ্টিতত্ত্বই দেবখণ্ড রূপে বিবৃত হয়েছে। কবি মানিক দত্তের কাব্যে চণ্ডীর সাত জন্মের পর গৌরী নামের কথা পাওয়া যায়। তার প্রথম জন্ম ধর্ম-নিরঞ্জনের 'হাম্বি' থেকে। তাঁর কাব্যে চণ্ডী, দুর্গা, কালী, মঙ্গলচণ্ডী, অভয়া, গৌরী সকলেই একই দেবী। এই মিশ্রভাবনার দেবীকে নিয়ে নতুন কাব্যে চণ্ডীকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তার কারণ হল —(১) নতুন দেবীর প্রতি মানুষের বিশ্বাস গড়ে তোলা। সেই জন্য তার অসীম ক্ষমতা মানুষের সামনে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। (২) লোকসমাজে প্রচলিত দেবীর স্বরূপকে প্রতিফলন করা। তার মাহাত্ম্যগীত করতে গিয়ে কবি কাহিনীতে কয়েকটি উপকাহিনীর সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। সেই উপকাহিনীগুলি গড়ে উঠেছে গণেশ, কার্তিক, মধুকৈটভ, রক্তবীজ, মহাবীজ, শুম্ভ-নিশুম্ভকে কেন্দ্র করে। তাতে কবি কাহিনী গ্রন্থণার কার্য কারণ সম্পর্ক রক্ষা করতে পারেন নি। তবে দেবখণ্ডে কামদেব ও রতি এবং গঙ্গা ও শান্তনুকে নিয়ে গঠিত উপকাহিনী দুটিতে বাস্তব করুণ রসের স্পর্শ আছে। তার সঙ্গে সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-বিশ্বাস, বিবাহাদির লোকাচার মঙ্গলকাব্যে গঠনসূত্র ধরে উঠে এসেছে। তাছাড়াও কবি চণ্ডীর মাহাত্ম্যগীত করতে গিয়ে কাহিনী গ্রন্থনে একটু অতিরঞ্জন এনেছেন, যা কবির কবিত্বগুণ অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সম্ভাব্য ও অনিবার্যতা ছাড়াই প্রসঙ্গক্রমে বিস্তৃত পুরাণ বর্ণিত দেবীর স্বরূপ কথা তুলে ধরা হয়েছে, যার ফলে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের গ্রন্থনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিথিল। ব্যাধ খণ্ডে পুরাণের ব্যবহার কম। যেখানে লৌকিক দিকটি কাহিনী গ্রন্থনায় বেশি সক্রিয় ছিল। সেই লৌকিক দিকটি হল রামভক্তিবাদ। সে সময় রামকথা ভারতবর্ষের লোকসমাজের কাছে একই সঙ্গে ছিল আনন্দ ও শিক্ষার উৎস। লোকসমাজের কত কালের কত হাসি, কান্না, সুখ-দুঃখের সঙ্গে এই রামকথার যোগ। রামকথা লোকসমাজকে

দিয়েছে পথ চলার প্রেরণা, কর্তব্য, অকর্তব্যের নির্দেশ। সমকালীন এই রামভক্তির চেতনা ছাড়াও লোকবিশ্বাস ও তন্ত্রচেতনাকে কবি কাহিনী গ্রন্থনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। এগুলি মানিক দত্ত তাঁর কাব্যে শিল্প সচেতন ভাবে প্রয়োগ করতে পারেন নি। তবে তাঁর সৃষ্ট উপকাহিনীগুলি অনেকাংশে কাহিনী গ্রন্থনার উৎকৃষ্টতা বৃদ্ধি করেছে। এক খণ্ড থেকে অন্য খণ্ডের সংযোগ সূত্র রক্ষাকে তিনি শিথিল করে দেননি। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে তিনি উপকাহিনীর ব্যবহার করেছেন। সেই উপকাহিনীগুলিতে কবির সহানুভূতি, বাস্তবতা ও কাব্যিক গুণাবলীর প্রয়োগ রয়েছে। তবে কাব্যের অনেক স্থলে প্রাত্যহিক সমাজ ও পরিবার জীবনের নীতি কথা ও চলার পথ নির্দেশ করেছেন কারণে-অকারণে। আবার অনেকস্থলে কবি মঙ্গলকাব্যের বাঁধাধরা অপরিহার্য অংশের প্রথানুসরণ করেছেন। ধনপতি খণ্ডের কাহিনী গ্রন্থনায় এই প্রথানুসরণ লক্ষ্য করা যায়। সেখানে বিবাহাচার, স্ত্রী আচার, খাদ্য তালিকা, জন্মের পর বিভিন্ন রীতি-নীতি ও পূজা-পার্বনের বিভিন্ন নিয়ম-নীতির বাস্তব তথ্য পরিবেশন করেছেন। চৌতিশা, বারমাস্যা ও সতীন সমস্যা ইত্যাদি প্রথানুগ ও জ্বলন্ত বাস্তব চিত্র অঙ্কনে কবি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ লাভ করেছেন।

কাহিনী গ্রন্থনা চরিত্র ছাড়া সম্ভব নয়। তাই এই অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্র চিত্রণ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। তা করতে গিয়ে আমরা চরিত্রকে মানব ও দেবদেবী চরিত্রে ভাগ করে নিয়েছি। সেখানে আবার চরিত্রকে প্রধান-অপ্রধান এই দুই ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, কবি চণ্ডী চরিত্রকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে এঁকেছেন। চণ্ডী চরিত্রটি তাঁর কাব্যে 'আদ্যা' নামের রূপান্তর। এই কাব্যে আদ্যাই ক্রমে গৌরী, গৌরীই চণ্ডী বা দুর্গা নামে পরিচিত। তাতে দেবখণ্ডে চরিত্রটি পৌরাণিক আবহমণ্ডলে বেড়ে উঠেছে। আর ব্যাধ খণ্ডে তাকে আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে, তন্ত্রচেতনায়, লোক বিশ্বাসের আলোকে সাধারণ মানবীতে পরিণত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতু চরিত্র বর্ণনায় বাস্তবতা, কুশলতার সামগ্রিক পরিচয় দিয়েছেন। চণ্ডীর দেবীর মাহাত্ম্যের বাতাবরনেও চরিত্রটি নিজস্ব ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। এছাড়াও ভাঁড়ু দত্ত ও পুরাই দত্ত কবির নিজস্ব সৃষ্টি। ভাঁড়ু দত্তের অসাধুতা ও দুর্জনতা ব্যাপারে মানিক দত্ত যে পূর্বজন্ম সূত্র টেনে এনেছেন তা ইঙ্গিতবহ। ভাঁড়ু দত্ত নিজস্ব ক্ষমতায় ও শক্তিতে ভাস্বর। আর নারী চরিত্রগুলি তার কাব্যে গ্রাম্যতার প্রভাবে অধ্যুষিত। লহনা ও খুল্লনাও তার অনুরূপ। তবে তাদের নারী মনস্তত্ত্ব অবহেলার নয়। ধনপতি ও শ্রীমন্ত চরিত্র চিত্রণে বণিক শ্রেণীর আভিজাত্যের ছাপ পড়েছে। মানিক দত্তের চরিত্র চিত্রণ পর্যালোচনায় একটি দিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল অপ্রধান চরিত্রের ক্ষেত্রে। তাঁর কাব্যের পদ্মা, নারদ, দুর্বলা ও

নীলাবতী এরা সকলেই জীবন্ত ও সমাজ অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। কাহিনী গ্রন্থনায় প্রধান চরিত্রের মানস পরিচালনে, ঘটনা নিয়ন্ত্রনে তাতে ভূমিকা অসামান্য।

এই রকম অবস্থায় পঞ্চম অধ্যায়ে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সার্বিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। সেখানে তার গায়েনরীতির ছাপ পড়েছে। তাঁর বর্ণনারীতি পদ্যে হলেও তাতে মূলত গদ্যরীতির আভাস রয়েছে। কোথাও কোথাও তিনি কবিত্বের গুণের অধিকারী হলেও লোকসমাজের প্রতি বেশি লক্ষ্য রাখায় তাঁর সেই দিকটি একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাঁর কাব্যে যোলটি পালায় চণ্ডীর আট দিনের ব্রতকথা প্রচার করাই মূল উদ্দেশ্য হয়ে পড়েছে। তাতে কাব্যের অনেক অংশে কাহিনী গ্রন্থনা শিথিল ও চরিত্র নির্মান গতানুগতিক হয়ে পড়েছে। লক্ষণীয়, ব্যাধ খণ্ড ও ধনপতি খণ্ডের কাহিনী গ্রন্থনা বৃত্তাকার। কবির উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও আবেগ প্রবন হয়ে সম্ভবত সেই স্থানগুলিকে কাব্যরূপ দিতে সক্ষম হন নি। তবে মানিক দত্ত যে মঙ্গলকাব্যের নতুন একটি পথ তৈরী করলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর তৈরী পথ ধরেই পরবর্তী কবিরা তাঁদের শিল্প প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। মানিক দত্ত এই ধারা সৃষ্টি না করলে হয়তো তাঁরা এরূপ প্রতিভার পরিচয় রাখতে পারতেন না।

——oo——

(ক)

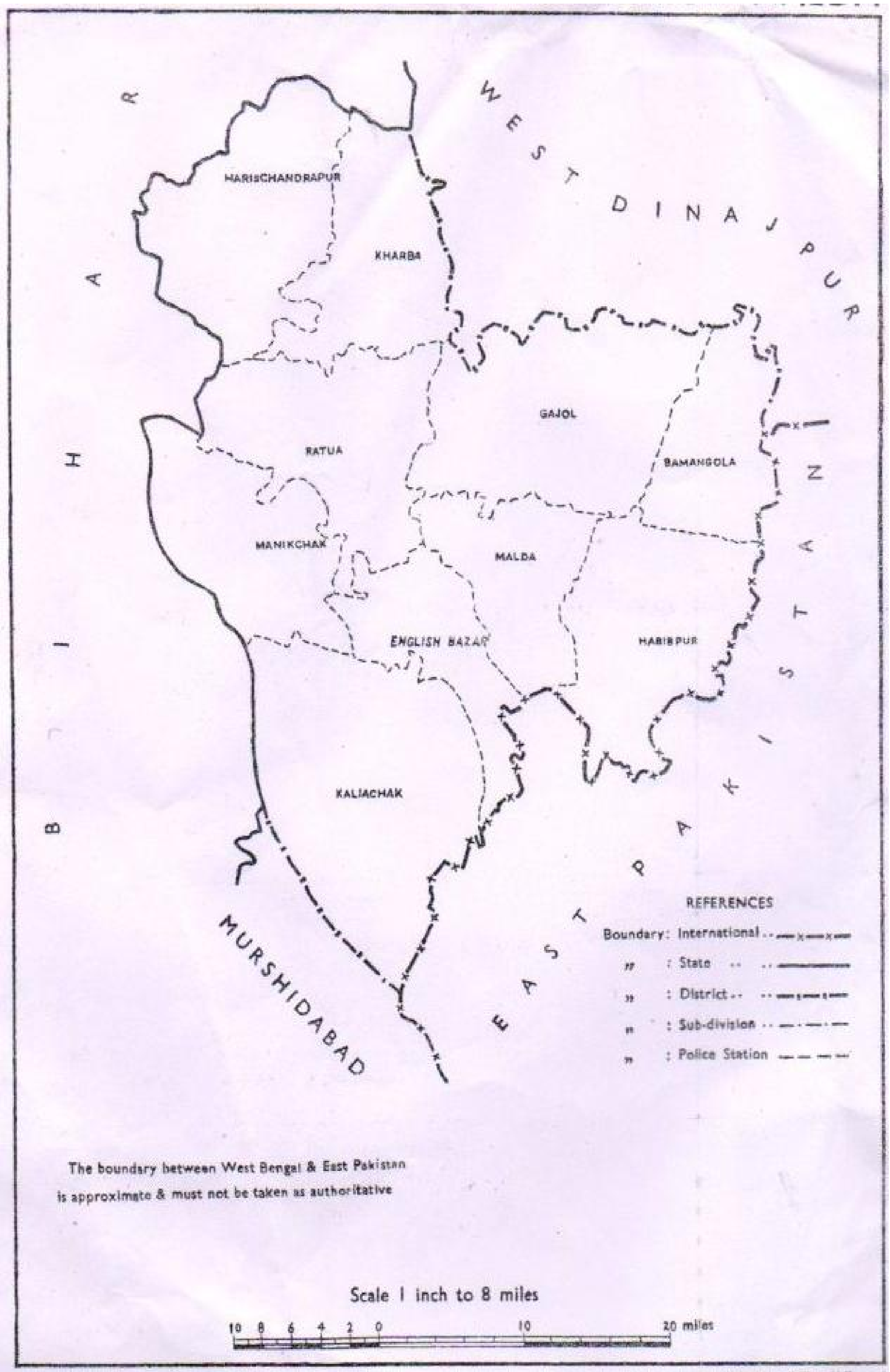

'Maldah Census Hand Book' (1961) থেকে প্রাপ্ত মালদহের মানচিত্র

(খ)

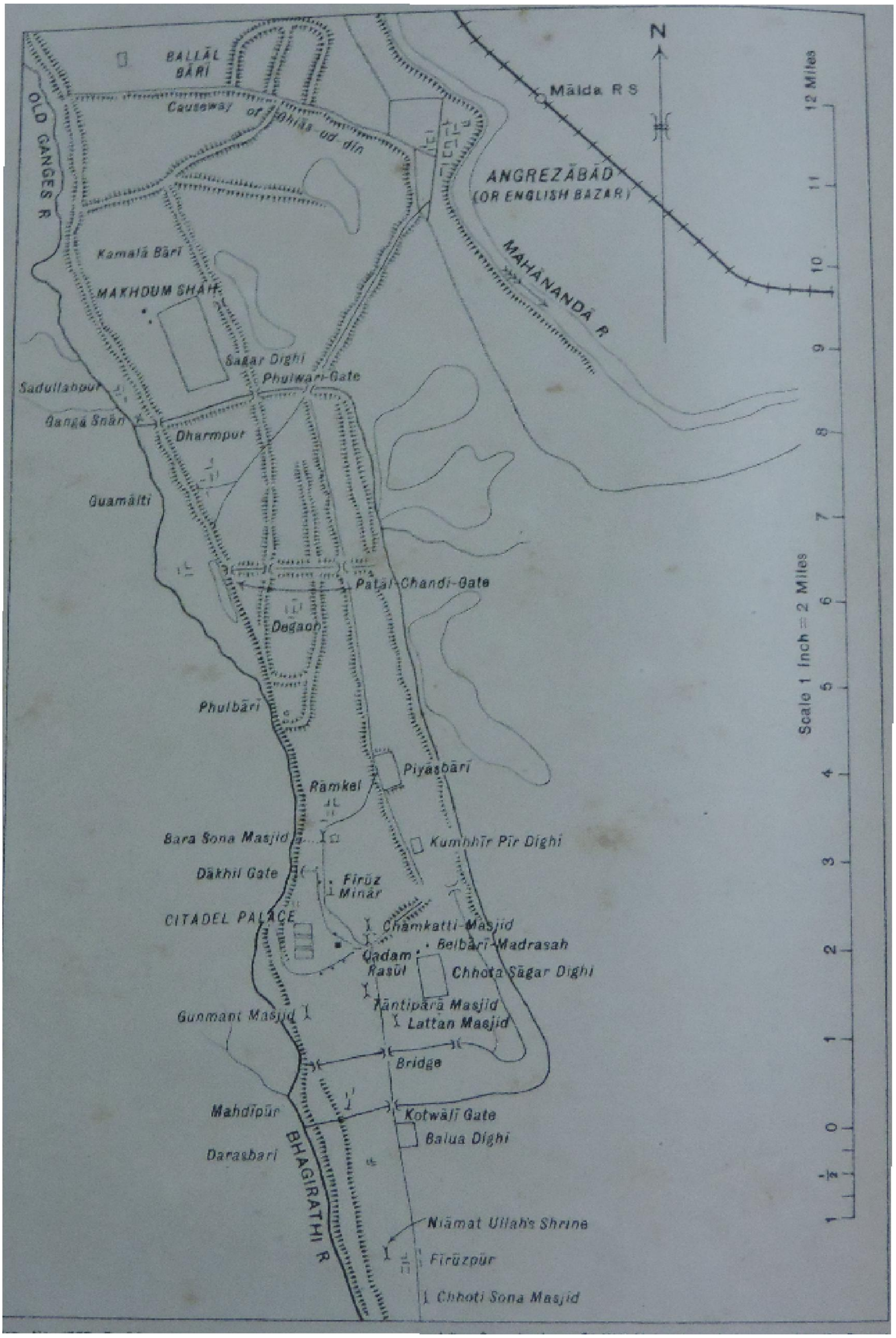

খান সাহেব মহম্মদ আবিদ আলি খানের 'Memoirs of Gaur and Pandua' গ্রন্থের ৪০ নং পৃষ্ঠা থেকে প্রাপ্ত প্রাচীন গৌড়ের মানচিত্র

(গ-i)

ALPHABETICAL LIST OF VILLAGES AND TOWNS

Sadar Subdivision

4 P. S. Habibpur

Name of Villages and Towns	Jurisdiction List No.	Population 1951	Population 1961
(1)	(2)	(3)	(4)
Adampur	119	189	207
Agra	84	1,027	912
Aharail	149	165	228
Aiho	247	2,343	2,776
Aihodanga	33	203	219
Akalpur	223	112	323
Aliarpur	120	*	12
Amarpur	203	410	478
Anail	219	510	476
Ananda Pathar	291	*	*
Anantapur	252	*	195
Angarpota	59	*	*
Aragachhi	57	28	43
Asrafpur	277	217	361
Bade Chandihar	129	123	182
Bahadurpur	79	181	181
Baidyapur	35	177	245
Baijpur	238	88	118
Bakna	241	67	93
Baksinagar	246	1,176	2,244
Bali Simla	66	*	*
Banchhair	180	45	50
Bankail	76	218	192
Bankail Bishnupur	75	495	535
Banpur	272	509	643
Barail	152	168	285
Basantapur	82	93	136
Begunbari	171	446	445
Bet Pukuria	197	126	136
Bhabanipur	85	279	327
Bhabuk	89	443	672
Bhairabpur	86	306	347
Bharila	112	*	*
Bhola Baona	113	16	*
Bijail	50	727	832
Bilpani Bhenda	53	*	*
Binakail	141	65	158
Binodpur	44	706	712
Bishnupur	87	134	162
Bodrail	167	231	157
Bulbul Chandi	212	753	1,065
Buzruk Khanpur	143	278	220
Chakdahari	175	116	126
Chak Katla Pukur	231	107	132
Chakli	52	60	284
Chak Mahabat	192	94	158
Chak Sukur	96	741	710
Chamarjol	256	*	*
Champa Dighi	23	32	131
Chandihar	128	214	295
Chapardanga	127	139	134
Charaigola	36	108	250
Chatra	29	229	249
Chenchai Chandi	244	104	83
Chhilimpur	151	159	104
Chhuchail	156	98	169
Dabur	121	*	*
Dadpur	142	96	185
Daharlangi	209	846	1,236
Dakshin Brindabanbati	286	893	1,444
Dakshin Chandpur	251	465	1,462
Dakshin Kharikadanga	264	*	*
Dalla	54	891	1,035
Damdama	243	309	216
Darajpur	215	170	187
Daudpur	92	179	135
Debendra Purendra	200	*	*
Dhaka Pathar	288	*	93
Dhalakandar	218	95	71
Dhananjaya	104	313	386
Dharenda	74	880	650
Dhumpur	236	194	281
Dighal Kandi	117	*	*
Dolachhola	1	*	*
Dolmalpur	208	388	418
Dolmari Dighali	6	*	42
Eklaspur	282	420	322
Fakira Kandar	228	174	178
Gandharbapur	148	57	55
Ganramari	250	2,370	3,540
Gazia Kandar	144	108	119
Gobindapur	159	59	104
Gopalnagar	170	343	342
Gopalpur	100	414	524
Guhinagar	237	271	335
Gurila	174	34	38
Habibpur	190	791	884
Haito	181	114	121
Haito Inlis	183	118	182
Hapania	220	485	491
Harail	157	145	92
Harinathpur	106	184	321
Haripur	102	602	422
Harischandrapur	83	749	1,144
Hazipur	26	381	394
Hialapur	191	172	240
Hiyatpur	49	133	183
Hogla	22	151	223
Horgao	242	469	591
Hurabari	168	174	174
Jadabnagar	248	1,123	1,643
Jagadispur	259	*	*
Jagajjibanpur	73	926	957
Jagannathpur	284	234	68
Jahanabad	46	272	364
Jajail	98	158	213
Jamalpur	21	754	976
Jamir Pukur	40	139	140
Janakibati	257	281	176
Jatarpur	24	126	186
Jaydebpur	107	268	354
Jaypur	94	393	377
Jiakandar	105	58	135
Jiapur	90	119	8
Jodanga	188	197	193
Jordanga Inlis	173	264	305
Jot Alam	154	196	186
Jot Balaram	133	*	*
Jot Gokul	225	*	*
Jot Jitan	136	*	*
Jot Kabir	126	450	493
Jot Kandarpa pur	268	153	93
Jot Maniram	260	163	176
Jot Srihari	281	*	*
Kachupukur	211	1,069	2,724
Kadaripara	62	*	*
Kadipur	146	611	463
Kaichana	110	*	*
Kalmegha	45	138	144
Kalna	20	280	321
Kalpechi	194	294	192
Kanchana	116	2	*
Kanturka	155	390	388
Karanja	25	442	435
Karanjabari	229	190	196
Kasiadanga	206	32	16
Kasipahara	150	93	77
Kathal Banpur	101	529	494
Kathra Naopara	39	408	20
Kayra	130	230	178
Kendua	213	615	2,081
Kendu Danga	38	512	521
Khanpur	131	336	331
Kharibari	32	574	554
Khas Haripur	287	201	197
Khatiakana	204	69	98
Khocha Kandar	19	1,006	1,083
Khujipur	30	46	120
Kiol	34	698	696
Kismat Daudpur	91	170	259
Kismat Nangbahara	80	70	74
Kokabirni	193	114	245
Komarpur	273	294	211
Kotalpur	108	384	382
Krishnapur	261	430	443
Kuchiamor	70	*	*
Laibari	196	122	161
Lakshmipur	165	126	221
Lakshmitor	187	139	137
Lalpur Bodra	31	922	927
Lonsa	95	763	614
Lota Bhanga	221	110	146
Madasidanga	109	5	*
Mahalbaldi	253	*	*
Mandighi	161	333	292
Mangalpura	13	570	575
Manikora	93	375	400
Manoharpur	214	361	308

* Uninhabietd

'Maldah Census Hand Book' (1961) থেকে প্রাপ্ত বর্ণানুসারে

গ্রাম ও শহরের প্রদত্ত তালিকা

ALPHABETICAL LIST OF VILLAGES AND TOWNS

Sadar Subdivision

4 P. S. Habibpur—contd.

Name of Villages and Towns	Jurisdiction List No.	Population 1951	Population 1961
(1)	(2)	(3)	(4)
Mani Chak	290	*	*
Mostapara	195	*	*
Minanagar	276	590	966
Mirzabad	124	59	*
Mirzapur	160	241	143
Mitarpara	198	135	98
Mohanpur Inlis	207	181	270
Muraripur	158	261	297
Nabaghar	279	120	114
Nakail	11	364	420
Nakharia	176	834	1,020
Nangbahara	81	275	337
Narsainbati	41	339	298
Nasratpur	274	129	44
Nayandob	111	*	*
Neamatpur	147	305	258
Niamatpur	240	219	223
Nij Hosenpur	278	196	125
Nimbari	97	352	241
Nimnail	47	66	151
Nirail	169	807	761
Nityanandapur	172	342	316
Nunchora	115	11	13
Oltara	177	439	494
Pakuria	233	124	110
Palasdanga	78	146	207
Panch Pukuria	226	67	92
Pannapur	51	593	696
Paralia	37	369	535
Patolia Buzruk	139	171	221
Parulia Hosenpur	280	36	100
Paschim Basudebpur	153	243	117
Pasuli	15	231	249
Pathar Amarpur	202	*	*
Pathar Banpur	267	186	159
Pathar Basuli	7	*	*
Pathar Bhabsa	270	*	*
Pathar Bhikan	263	*	*
Pathar Chapar	125	*	23
Pathar Chapri	3	*	*
Pathar Dharenda	55	*	*
Pathar Dighali	2	*	*
Pathar Dojat	65	*	*
Pathar Domaichand	269	*	*
Pathar Haito	182	*	*
Pathar Harischandrapur	69	*	*
Pathar Islampur	58	*	*
Pathar Jugi	56	*	*
Pathar Khairan	4	59	42
Pathar Kasinathpur	137	*	*
Pathar Kundi	114	*	*
Pathar Laibari	179	*	*
Pathar Mahadebbati	266	*	*
Pathar Mandala	5	*	19
Pathar Mirzabad	122	23	55
Pathar Nachharatpur	289	*	26
Pathar Nandagar	71	*	*
Pathar Niabati	258	*	*
Pathar Oltara	178	*	52
Pathar Parlia	138	*	*
Pathar Phulbana	10	*	8
Pathar Sasuli	72	*	*
Pathar Sibram	68	*	*
Pathar Sisudanga	8	*	*
Pathar Srikrishnapur	255	*	*
Pathar Subarni	132	*	*
Pathar Tilasan	135	*	*
Perapur	42	609	726
Phulban	222	138	200
Pindal	14	378	357
Pipratola	235	117	257
Pirgachhi	48	119	159
Pirozabad	283	256	332
Poali	64	*	*
Purba Basudebpur	61	*	*
Raghabpur Gujia	162	294	217
Rajarampur	28	640	931
Rajdol	17	426	346
Rahutara	27	108	236
Ram Pukuria	140	182	157
Rampur	103	84	90
Ranahat	199	235	345
Rangamati	18	365	469
Rishipur	249	296	853
Sadapur	224	168	167
Saidpur	201	151	159
Sahapur	205	39	98
Sankail	166	619	717
Sankopara	239	64	52
Santail	227	242	245
Sarbadikpur	16	69	92
Sasinda	67	*	*
Sekandara	186	546	584
Sibpur	234	206	236
Singabad	134	261	444
Singra	163	491	466
Sisdanga	9	256	317
Sital Kursi	63	*	*
Sitalpur	262	125	158
Soladang	210	348	550
Srikrishnapur	254	365	313
Sripur	230	185	131
Srirampur	275	455	1,040
Suchal Mahamadpur	118	139	118
Sukni Kandar	164	165	153
Sundarban	12	292	314
Sundarpur	123	126	116
Tajpur Inlis	189	252	199
Talpukur	216	119	279
Tambutana	185	702	592
Tapsahar	43	278	341
Tegharia	285	108	215
Tekura	232	164	166
Telipukur	217	235	201
Telnai	60	*	*
Tilasan	265	1,256	1,473
Tulshi Danga	77	171	224
Ulator	184	156	163
Upar Kendua	245	129	162
Uttar Brindabanbati	88	113	31
Uttar Chandpur	271	*	65
Uttar Kharikadanga	145	186	116
Walisnagar	99	33	3
Total		72,193	87,494

* Uninhabited

'Maldah Census Hand Book' (1961) থেকে প্রাপ্ত বর্ণানুসারে

গ্রাম ও শহরের প্রদত্ত তালিকা

ALPHABETICAL LIST OF VILLAGES AND TOWNS

Sadar Subdivision

5 P. S. Ratua

Name of Villages and Towns	Jurisdiction List No.	Population 1951	Population 1961
(1)	(2)	(3)	(4)
Ailpara	147	484	168
Alpara	113	243	293
Amarsinha	62	209	294
Andirampara	68	980	1,580
Arazi Balarampur	49	*	*
Arazi Harago-bindapur	29	275	884
Arazi Raghabbati	105	*	*
Arazi Ratua	111	*	*
Asutola	32	984	1,196
Atgama Bala-rampur	116	221	308
Baharal	117	685	826
Bahir Kap	45	1,155	1,590
Baikanthapur	112	1,025	1,411
Bakhra	124	299	1,054
Balarampur	120	255	344
Balarampur	16	191	252
Balarampur Diar	119	*	143
Balia Binodpur	58	314	428
Ballabhpur	72	593	734
Balupur	13	2,667	3,304
Bampal Charkhi	51	802	1,083
Baniabati	104	*	*
Bansipur	46	198	*
Barail	82	1,441	1,947
Bazidpur	12	557	1,075
Betaha Ekbarna	135	1,231	2,050
Bhado	47	2,871	4,957
Bhaluara	39	253	400
Bihari	42	678	768
Bijra Bhita	84	1,416	1,914
Bisal Gokul	56	*	*
Bishanpur	130	218	253
Bishnupur Lakshmipur	24	984	1,357
Chandi Prasad	52	184	291
Chandipur	48	460	772
Chandpur	126	1,647	2,181
Chauduar	148	329	415
Chhabilpara	65	1,682	2,275
Dakshin Durgapur	107	760	1,000
Dakshin Maricha Bishanpur	139 / 151	614	*
Darbasini	106	217	292
Daudpur	54	98	173
Debipur	19	1,234	1,807
Dotal	57	*	*
Durgapur	14	853	1,277
Dwitiya Balupur	8	235	750
Elahabad	94	532	695
Faridpur	115	*	*
Gadai Maharajpur	1	3,219	4,297
Gangarampara	69	383	442
Gauripur	100	584	938
Ghumania	37	*	*
Gobarjana	143	536	1,323
Gobindapur	79	425	568
Gopalpur	61	162	270
Gorna Goaldaha	78	*	*
Govindpur †			1,458
Haragobindapur	30	571	139
Harekrishnapur	63	57	180
Harinkol	44	617	698
Haripur	99	1,094	1,247
Haripur Gopi	28	875	1,404
Harirampur	80	243	348
Iswarpur	5	364	659
Jagannathpur	55	*	83
Jannagar	20	930	1,289
Jaydebnagar	110	*	*
Jogi Gofa Bahadurpur	128	*	*
Jot Lachhmi	122	284	603
Kadamtali	98	1,363	1,677
Kalutola	31	514	752
Kamalpur	3	3,374	3,902
Kankat	50	978	1,468
Karbanna	40	1,721	1,212
Kasba	121	505	603
Kasichak	15	502	646
Khailsana	146	868	850
Khanpur	102	372	553
Kharbari Jhamuria	149	249	438
Kheria	74	876	1,061
Khutaha	141	693	246
Koklamari	139	2,007	2,425
Kotoali	10	368	457
Kshidirganj	17	*	*
Kumarganj	88	863	1,319
Lakshmipur	85	637	970
Laskarpur	76	558	895
Lokhra	142	280	465
Magura	77	808	1,011
Magurakhod	81	1,130	1,480
Mahadebpur	36	*	4
Mahammadpur	73	691	979
Maharajpur	91	1,834	2,709
Mahespur	70	592	768
Maniknagar	4	3,393	3,844
Matiganj	60	255	409
Mirdadpur	131	1,389	1,701
Mohanpur	27	207	439
Nandanpur Gopalpur	22	270	370
Naoda	129	2,103	2,393
Naokaram	53	143	183
Narottampur	26	958	117
Nasipur	145	1,466	2,091
Nesta	136	1,575	1,545
Nijgan Araidanga	132	1,601	1,928
Nijgan Paranpur	125	2,784	3,382
Nijgaon Faridpur	38	201	270
Okhra Chand-para	64	1,025	1,402
Paharpur	138	52	96
Palasbana	89	1,019	594
Parakaram	59	925	1,431
Paranpur	127	*	228
Paschim Ratanpur	2	*	237
Pirpur	133	481	610
Pukhuria	144	6,833	8,036
Purba Balaram-pur	96	73	121
Purba Kamalpur	114	297	407
Purba Radhanagar	103	1,218	1,113
Radhanagar	18	871	1,043
Raghabbati	123	177	350
Raghunathpur Kalekhan	33	116	130
Rajapur	92	1,550	1,948
Ram Chak	109	*	*
Ramnagar	9	700	249
Rampur	41	365	543
Rangamatia	93	846	1,107
Raninagar	90	1,614	2,231
Ratanpur	67	259	351
Ratua	34	1,869	2,165
Rukundipur	35	2,477	2,889
Sahanagar	6	887	1,119
Sahapur	118	1,565	1,947
Salabatpur	83	457	711
Sambalpur	87	833	2,332
Sambalpur	11	796	862
Samsi	66	724	1,189
Santapur	86	1,044	1,431
Satmara	150	1,179	1,592
Seharakol	43	*	*
Sekhpur	75	358	522
Sibnagar	97	1,698	2,141
Sibpur	25	486	913
Sibrampur	108	69	115
Simla	134	380	398
Sripur	71	578	903
Sultanganj	95	42	118
Sultanpur	137	1,518	1,054
Surjyapur	23	391	458
Tal Paranpur	101	864	991
Terasia Debipur	21	394	576
Udaypur	7	258	413
Uttar Maricha Bishanpur	140	*	784
Total		**115,834**	**151,899**

* Uninhabited

† The population of Ratua Police Station in the District of Malda includes the population of five tolas of the [illegible] Govindpur (Thana No. [illegible] of Katihar Revenue Thana) on the Bihar-West Bengal border. West Bengal claimed those tolas as they had all along been [illegible] as parts of West Bengal. It was decided by the Registrar General that Census in these tolas would be taken by the West Bengal [illegible] without prejudice to the claims of either Government, pending final settlement of the issue between them.

'Maldah Census Hand Book' (1961) থেকে প্রাপ্ত বর্ণানুসারে

গ্রাম ও শহরের প্রদত্ত তালিকা

ALPHABETICAL LIST OF VILLAGES AND TOWNS

Sadar Subdivision

1 P. S. English Bazar

Name of Villages and Towns	Jurisdiction List No.	Population 1951	Population 1961
(1)	(2)	(3)	(4)
Abhirampur	91	**	215
Anandamohanpur	18	591	736
Anandipur	50	923	1,219
apur	56	1,013	1,354
Arazi Dilalpur	70	*	*
Arazi Nazirkhani	137/144	*	*
Arazi Phulbari	106	*	*
Aigama	17	2,378	2,902
Aimpur	82	60	72
Badulyabari	129	1	*
Bagbari	73	399	674
Bahadurpur	119	*	*
Balupur	27	1,130	973
Bara Chak	107	257	229
Barampur	15	539	649
Bara Phulbari	103	701	1,198
Basudebpur	21	1,041	1,272
Begamnagar	59	*	*
Bhabanipur	3	3,135	4,085
Bholanathpur	127	218	419
Bilbari	139	101	68
Binodpur	22	274	352
Byaspur	114	178	*
Byaspur Arazi	111	*	145
Byaspur Arazi Inlis	113	*	3
Chandangar	131	*	*
Chandipur	83	117	423
Chaukapara	137	*	*
Daibakipur	36	173	256
Daigram	116	*	*
Dakshin Chandipur	10	193	158
Dakshin Jadupur	89	499	922
Dariadaha	115	*	*
Daulatpur	31	*	13
Dharampur	108	15	15
Dilalpur	87	102	183
Fatepur	19	64	63
Gabgachhi	90	127	213
Ganga Gobindapur	5	*	*
Gangarampur	39	*	*
Ganibahadur Khan	118	*	6
Ganibahadur Khan Arazi Inlis	133	*	*
Gar Mahali	137/146	178	73
Ghurni Madia	142	*	*
Gobindapur	97	133	381
Golahat	123	*	*
Gonsaipur	8	510	598
Gopalpur	95	88	238
Gopinathpur	110	128	*
Harispur	12	382	334
Hazaratnagar	86	144	6
Hosenbazar	60	*	*
Imamnagar	6	255	351
Inrajbazar	67	**	**
Islampur	20	283	334
Itakhola	52	75	49
Jagadispur	93	48	100
Jamalpur	124	*	*
Jatalpur	54	351	474
Jhaljhalia	72	203	912
Jot	55	523	664
Jot Basanta	47	2,371	3,065
Jot Gopal	49	1,089	1,491
Jot Narasinha	35	61	45
Jot Prithwi	78	721	392
Jot Puran	9	*	*
Kaltapara	62	596	1,021
Kamalpur	81	46	75
Kanaipur	28	*	*
Kanakpur	130	*	*
Karmanigram	79	718	928
Khalilabad	43	*	*
Khalimpur	32	38	64
Khaskol Chandipur	4	2,547	3,172
Khirki	134	244	314
Khorda Jalalpur	37	*	*
Kishanpur	121	15	15
Krishnaprasad Nij	102	*	*
Krishnapur	99	46	65
Kumarpur	98	298	434
Kutubpur Phulbari	64	**	**
Lakshmighat	26	1,515	1,757
Lakshmipur	74	501	792
Lalapur	16	373	439
Madapur	77	2,566	3,355
Madia	2	1,002	1,272
Mahadipur	135	2,684	3,049
Mahajamapur	76	379	492
Mahesmati	66	21	**
Mahespur	92	629	1,465
Majhagar	140	*	*
Makdumpur	68	**	228
Malihat	38	120	144
Manganpara	75	87	129
Mathurapur	13	130	171
Milki	7	2,842	3,564
Mobarakpur	14	465	591
Mollapara	85	18	24
Moslempur	101	253	295
Nagharia	25	1,422	2,875
Nagrai	44	*	*
Naodabazar	80	427	434
Narhatta	48	303	426
Naya Guamalati	109	4	*
Nazirkhani	138	117	77
Nazirkhani Arazi	126	15	2
Nazirpur	58	248	145
Niamatpur	23	3,198	4,977
Nimasarai	53	523	541
Nischintapur	94	363	689
Nrisinhapur	100	*	*
Parbatipur	136	*	*
Paschim Nazirkhani Arazi	132	*	*
Phulbari	120	8	*
Phulbaria	24	2,732	2,969
Phulbari Arazi	122	432	523
Pichli	40	169	227
Pirojpur	69	**	520
Pora Madia	125	*	*
Purana Guamalati	105	*	*
Purapara	65	**	**
Pyalapur	42	*	*
Ramchandrapur	112	69	413
Ramkeli	128	237	273
Raypur	96	130	300
Sadekpur	61	*	81
Sadullapur	84	135	67
Saha Zalalpur	34	996	1,171
Sailpur	45	273	477
Satgada	138/143	*	17
Sattari	11	1,991	3,351
Serpur Makimpur	63	211	267
Sonatala	29	1,948	2,792
Sultanpur	57	524	663
Syampur	30	33	26
Tantipara	117	*	148
Tentulia	141	*	*
Tiakati	104	616	859
Uttar Chandipur	1	2,921	3,708
Uttar Gobindapur	51	363	492
Uttar Gopinathpur	46	223	285
Uttar Jadupur	88	614	957
Uttar Lakshmipur	41	905	1,345
Uttar Nazirpur	33	551	555
Uttar Ramchandrapur	71	304	327
Uttar Umarpur	135/145	299	319
English Bazar (Municipality)		*30,663*	*45,900*
Rural		63,209	85,477
Urban		*30,663*	*45,900*
Total		**93,872**	**131,377**

* Uninhabited

** Included in Urban Area

'Maldah Census Hand Book' (1961) থেকে প্রাপ্ত বর্ণানুসারে

গ্রাম ও শহরের প্রদত্ত তালিকা

(ঘ)

ALPHABETICAL LIST OF VILLAGES AND TOWNS

Jangipur Subdivision

4 P. S. Raghunathganj

Name of Villages and Towns	Jurisdiction List No.	Population 1961	Population 1971
1	2	3	4
Aitalghata	79	*	*
Akbarpur	32	873	1,756
Amgachhi	132	500	705
Arazi Katnai	127	*	21
Asrafnagar	77	*	*
Babupur	87	571	764
Bagha	99	522	669
Bagpara	149	420	561
Bahadinagar	115	355	638
Bahara	84	2,925	3,244
Bahura	20	892	1,288
Baidpur	126	401	495
Bainda	102	630	816
Bajitpur	44	*	781
Balighata	5	†	†
Bandkhola	116	*	63
Bangabari	10	*	*
Bara Jumla	61	*	579
Barala	108	2,051	2,592
Bara Simul	25	2,428	3,491
Basudebpur	95	1,169	1,528
Bhabanipur	8	†	†
Bhabki	65	4,155	*
Bijaypur	133	907	1,250
Binoddighi	41	1,647	*
Birendranagar	154	383	510
Birthamba	105	223	247
Brindabanpur	140	87	144
Chak Bahala	141	*	*
Chak Katubpur	75	*	*
Chak Sadpur	39	1,365	*
Char Dafarpur	91	25	*
Charka	93	1,021	1,296
Char Sekandara	11	168	258
Chhota Kalia	19	*	*
Dafarpur	92	3,028	5,185
Dakshinpara	136	258	354
Dakshin Sekhalipur	59	1,717	1,677
Dariapur	46	*	48
Dayarampur	43	31	*
Deuli	96	635	791
Dhala	137	200	230
Diar Raghunathpur	83	*	*
Diar Raninagar	144	874	1,265
Dighirpahar	86	901	1,257
Donalia	72	1,092	2,054
Dubra	55	1,452	*
Durgapur	78	123	192
Elaspur	148	169	263
Enayetnagar	9	†	†
Frasernagar	155	603	778
Gadaipur	3	343	442
Gankar	138	858	1,041
Gankar Chak	134	*	*
Ghorsala	98	560	661
Giria	35	6,723	7,418
Giria Kismat	13	2,485	3,353
Gosainpur	67	1,832	*
Habipur	71	504	1,006
Hasampur	101	174	168
Hirkati	42	214	*
Hirkati	45	*	*
Hudrapur	69	989	*
Indranarayanpur	49	*	153
Jagadanandabati	128	618	874
Jalalpur	27	664	*
Jalsukha	26	*	*
Jangipur	7	†	†
Jarur	110	1,984	2,554
Jayrampur	18	436	1,020
Jethia	130	673	1,070
Jhamra	82	1,380	1,821
Jot Biswanath	56	*	*
Jot Kamal	21	2,366	2,827
Jot Sundar	29	972	2,887
Kajikola	37	1,352	*
Kalaimati	50	*	*
Kanaimati	52	333	280
Kanchanpur	150	70	103
Kankuria	113	261	143
Kanupur	1	2,481	3,255
Kasiadanga	85	4,141	5,589
Katnai	125	80	133
Kazimati	51	*	*
Khamra	47	*	412
Khanpur	81	*	*
Kharkati	63	2,346	3,754
Khidirpur	2	1,121	1,425
Khodrampur	23	510	1,286
Krishnasali	76	710	2,718
Kulgachhi	80	2,722	3,432
Kulri	122	316	441
Kutubpur	73	518	1,118
Lakshmijola	88	947	1,178
Lalkhandiar	12	*	*
Mahammadpur	152	352	583
Malgotha	58	*	*
Mandalpur	107	950	1,175
Mangaljan	97	276	1,070
Markol	31	503	755
Mathurapur	119	295	328
Mirzapur	131	2,249	2,662
Mithipur	15	3,350	6,043
Mukundapur	17	710	1,088
Nababjagir	30	963	1,317
Nait Baidara	103	1,720	2,067
Naodatuli	66	362	89
Naru Khaki	54	119	177
Nasipur	70	1,345	417
Nista	117	783	1,095
Nutanganj	145	1,829	2,605
Osmanpur	22	1,123	2,505
Pachanpara	146	144	204
Paikar	139	89	117
Pananagar	16	1,167	1,541

* Uninhabited   † Included in Jangipur (Municipality)

মুর্শিদাবাদের 'District Census Hand Book' (1971) থেকে প্রাপ্ত বর্ণানুসারে গ্রাম ও শহরের প্রদত্ত তালিকা

গ্রন্থপঞ্জী
(Biblography)

আকর গ্রন্থ :

১। ওঝা, সুনীলকুমার সম্পাদিত — মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারামমোহপুর, দার্জিলিং , প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪।

২। চট্টোপাধ্যায়, ভক্তিমাধব সম্পাদিত — রামাই পণ্ডিত বিরচিত শূন্যপুরাণ, ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫৭/ বি, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৭।

৩। তর্করত্ন, পঞ্চানন সম্পাদিত — বিষ্ণুপুরাণম্, বেদব্যাস প্রণীত, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা-৯, প্রথম নবভারত সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৩৯০।

৪। তর্করত্ন, পঞ্চানন সম্পাদিত — দেবীপুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ), বেদব্যাস বিরচিত, বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেশিন-প্রেসে নটবর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ৬ নং ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৩৪ সন।

৫। তর্করত্ন, পঞ্চানন সম্পাদিত — স্কন্দ-পুরাণম্ (মাহেশ্বর খণ্ডম — কেদার খণ্ডম) বেদব্যাস প্রণীত, অনুবাদক তারাকান্ত দেবশর্মা কাব্যতীর্থ, বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেশিন-প্রেসে নটবর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ৩৮/২ নং ভবানীচরণ দত্তের স্ট্রীট, কলকাতা, ১৩১৮ সন।

৬। তর্করত্ন, পঞ্চানন সম্পাদিত — দেবী-ভাগবত (বঙ্গানুবাদ), নটবর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৩৮/২ নং ভবানীচরণ দত্তের স্ট্রীট, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৩১ সন।

৭। তর্করত্ন, পঞ্চানন সম্পাদিত — মার্কণ্ডেয়পুরাণম্, বেদব্যাস প্রণীত, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থপরিশোধিত, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২

মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা - ৯, প্রথম নবভারত সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৯০।

৮। তর্করত্ন, পঞ্চানন সম্পাদিত — অগ্নিপুরাণম্, বেদব্যাস প্রণীত, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ পরিশোধিত, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা - ৯, প্রথম নবভারত সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৮৯।

৯। তর্করত্ন, পঞ্চানন সম্পাদিত — রামায়ণম্, মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত, বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেশিন-প্রেসে নটবর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ৩৮/২ নং ভবানীচরণ দত্তের স্ট্রীট, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩১৫ সাল।

১০। দত্ত, রমেশচন্দ্র সম্পাদিত — ঋগ্বেদ-সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭, প্রথম প্রকাশ, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬।

১১। লাহিড়ী, দুর্গাদাস সম্পাদিত — ঋগ্বেদ-সংহিতা (অষ্টমোহষ্টকঃ), পৃথিবীর ইতিহাস মুদ্রা যন্ত্রে ধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ৬৫, কালীপ্রসাদ ব্যানার্জী লেন, হাওড়া (কলকাতা), প্রথম প্রকাশ, ১৩৩২।

১২। সেন, সুকুমার সম্পাদিত — কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৫৩, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৫, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০৭।

১৩। সেন, সুকুমার সম্পাদিত — চৈতন্যভাগবত, বৃন্দাবন দাস বিরচিত, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ রোড, নতুন দিল্লী-১, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৩।

১৪। বিদ্যাভূষণ, রাজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত — কালিদাসের গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় ভাগ), উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বিশেষ পরিবর্ধিত-পরিশোধিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬, বহুবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-১২, দশম সংস্করণ, ১৩৫৭।

১৫। ভট্টাচার্য্য, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত— মহাভারতম্ (বন পর্ব, বিরাট পর্ব, ভীষ্ম পর্ব জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ), বেদব্যাস প্রণীত,

বিশ্ববাণী প্রকাশনা, ৭৯/১ বি, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় (বিশ্ববাণী)সংস্করণ, মাঘ, ১৩৮৪।

১৬। ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র ও দাস, আশুতোষ সম্পাদিত — কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৮ হাজরা রোড, কলকাতা - ১৩, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০।

১৭। ভট্টাচার্য্য, সুধীভূষণ সম্পাদিত — দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৮ হাজরা রোড, কলকাতা-১০, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫।

১৮। মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ সম্পাদিত — রামায়ণ, কৃত্তিবাস বিরচিত, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আপার সারকুলার রোড, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট, ১৯৫৭, পুনর্মুদ্রণ, জুন, ১৯৮৩।

১৯। মুখোপাধ্যায়, সুখময় সম্পাদিত — কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিরচিত রামায়ণ, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ভারবি তৃতীয় সংস্করণ, নভেম্বর, ১৯৯৭, পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল, ২০১১।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। ওহদেদার, আদিত্য, কালীদাস ভট্টাচার্য, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য — ভারতকোষ (তৃতীয় খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৭১।

২। কুণ্ডু, শম্ভুনাথ — প্রচীন বঙ্গে পৌরাণিক ধর্ম ও দেবভাবনা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৬।

৩। খালেক, মুহম্মদ আবদুল — মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক-উপাদান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫।

৪। গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ — মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৪ নভেম্বর, ১৯৯৮।

৫। গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ — মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে পুরুষ-চরিত্র, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৫ এপ্রিল, ১৯৯৯।

৬। গুপ্ত, ক্ষেত্র — কবি মুকুন্দরাম, গ্রন্থনিলয়, ৫৯/১ বি, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, তৃতীয় সংস্করণ, ৪ আষাঢ়, ১৪০৪।

৭। গুপ্ত, ক্ষেত্র — প্রাচীনকাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪০৮।

৮। ঘোষ, বিনয় — পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পুস্তক প্রকাশ, ৮/১ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৫৭।

৯। চক্রবর্তী, রজনীকান্ত — গৌড়ের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯।

১০। চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার — প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, বিধান সরণী, কলকাতা-৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৮২।

১১। চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ — তন্ত্রকথা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৩৬২।

১২। চট্টোপাধ্যায়, রবিরঞ্জন সম্পাদিত — কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় চ্যাটার্জী সংস্করণ, ১৫ মার্চ, ২০০১।

১৩। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার — ভারত সংস্কৃতি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, তৃতীয়

পরিমার্জিত সংস্করণ, আষাঢ়, ১৪০০।

১৪। চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্রমোহন — বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা (১১০০-১৯০০ খ্রী:), সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ১৯৭৪।

১৫। চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল — সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, ১১ এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলকাতা - ৯, পঞ্চম মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০০৩।

১৬। চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর — গৌড়-বঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ), গ্রন্থমিত্র, ১ বি. রাজালেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ মে, ২০০৫, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই, ২০১১।

১৭। চৌধুরী, ভূদেব — বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০০২।

১৮। চৌধুরী, সত্যজিৎ ও সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর, ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ প্রমুখ সম্পাদিত — হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ (তৃতীয় খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ৬ এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-১৩, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৮৪।

১৯। চৌধুরী কামিল্যা, মিহির — আঞ্চলিক দেবতা : লোকসংস্কৃতি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৫ ডিসেম্বর, ২০০০।

২০। জগদীশ্বরানন্দ, স্বামী — শ্রীশ্রীচণ্ডী, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৩, ৫০ তম পুনর্মুদ্রণ, ফাল্গুন, ১৪১৮।

২১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ — রবীন্দ্র-রচনাবলী (চতুর্বিংশ ও অষ্টম খণ্ড), বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড,

কলকাতা-১৭, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪৪, পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৩৯৩।

২২। নস্কর, সনৎকুমার — মুঘল যুগের বাংলা সাহিত্য : আর্থ-সামাজিক পটভূমি ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, রত্নাবলী, ১১ এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ১৯৯৫।

২৩। ন্যায়রত্ন, রামগতি — বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বুক কোম্পানি প্রাঃ লিঃ, ৪/৩ বি, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা - ১২, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৪২।

২৪। দাশ, নির্মল — চর্যাগীতি পরিক্রমা, দে'জ পাবলিকেশন, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৫।

২৫। দাস, ক্ষুদিরাম সম্পাদিত — কবিকঙ্কণ চণ্ডী (প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিকেশন, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট , কলকাতা-৭৩, নব সংস্করণ ও মুদ্রণ, অক্টোবর, ১৯৯৩।

২৬। দাস, অপু — বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ : নারীবাদী পাঠ, বাণীশিল্প, ১৪ এ টেমার লেন, কলকাতা - ৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৬।

২৭। দাশগুপ্ত, শশিভূষণ — বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা (বাঙলা-সাহিত্যে গুহ্য সাধনার ধারা), ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১ বৈশাখ, ১৪১৮।

২৮। দাশগুপ্ত, শশিভূষণ — ভারতীয় সাধনার ঐক্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ, ফাল্গুন, ১৪০৭।

২৯। দাশগুপ্ত, শশিভূষণ — বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২,

ষষ্ঠ সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৭১।

৩০। দাশগুপ্ত, শশিভূষণ — ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৩৬৭, অষ্টম মুদ্রণ, কার্তিক, ১৪১৬।

৩১। দাশগুপ্ত, তমোনাশচন্দ্র — প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৮, হাজরা রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৮।

৩২। দে, আশিসকুমার — মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য : ভাষাপট ও ভাবকথা (প্রথম খণ্ড), শৈলী, সি ১/৭৬, দক্ষিণী সমবায় আবাসন, কলকাতা-১৮, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭।

৩৩। দে, আশিসকুমার ও রায়, বিশ্বনাথ সম্পাদিত — কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল আলোচনা ও পর্যালোচনা, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ, ১৪০৩।

৩৪। পাণ্ডা, বিষ্ণুপদ — মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নতুন দিগন্ত, মঞ্জুষা, ২ জগদীশনাথ রায় লেন, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩।

৩৫। পোদ্দার, অরবিন্দ — মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত), অক্টোবর, ১৯৫৮, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯।

৩৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড : চৈতন্যযুগ (খ্রীস্ট্রীয় ১৪৯৩-১৬০৫ অব্দ), মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০৮-০৯।

৩৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি সম্পাদিত — কবিকঙ্কণ চণ্ডী মুকুন্দ বিরচিত (প্রথম ভাগ),

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৮ হাজরা রোড, কলকাতা-১৩, নতুন সংস্করণ, আগষ্ট, ১৯৫২, পুনর্মুদ্রিত, অক্টোবর, ১৯৯৬।

৩৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার — বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (প্রথম খণ্ড : আদি ও মধ্যযুগ), ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭, পরিবর্ধিত নব সংস্করণ, ১৯৯৯।

৩৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র — কবিকঙ্কণ চণ্ডী : চণ্ডীমঙ্গল বোধিণী (প্রথম ভাগ),তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা-৬, সাহিত্যলোক (প্রণীত) সংস্করণ, অক্টোবর, ২০০০।

৪০। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার — বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ১০ বঙ্গিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩, চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৩৬৯।

৪১। বাগল, যোগেশচন্দ্র সম্পাদিত — বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা - ৯, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬১, সংশোধিত দ্বাদশ মুদ্রণ, আশ্বিন, ১৪০১।

৪২। বিশ্বাস, রতন সম্পাদিত — উত্তরবঙ্গের লোকগান, বইওয়ালা, ১৪৯, ক্যানাল স্ট্রীট, শ্রীভূমি, কলকাতা-৪৮, প্রথম প্রকাশ, ১ বৈশাখ, ১৪১৬।

৪৩। বিদ্যাভূষণ, অমূল্যচরণ — সরস্বতী, সতীশচন্দ্র শীল কর্তৃক প্রকাশিত, ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনসটিটিউট, ১৭০ মানিকতলা স্ট্রীট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪৫।

৪৪। ব্রহ্মচারী, মহানামব্রত — সপ্তশতী সমন্বিত চণ্ডী চিন্তা, শ্রী মহানামব্রত পাবলিকেশন ট্রাস্ট, ২৪ বি, স্যার গুরুদাস রোড, কলকাতা-৫৪, পঞ্চম সংস্করণ, চৈতন্য পূর্ণিমা, ১৩৮৮।

৪৫। ভট্টাচার্য, শিবপ্রসাদ — ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৯।
৪৬। ভট্টাচার্য, সুশীলকুমার — উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, ভারতী বুক স্টল, ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭০।
৪৭। ভট্টাচার্য, আশুতোষ — বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯।
৪৮। ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ — বৌদ্ধদের দেবদেবী, শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী সম্পাদিত, চিরায়ত প্রকাশনা প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম পরিবর্ধিত চিরায়ত সংস্করণ, ২০০৫।
৪৯। ভট্টাচার্য, সুখময় সম্পাদিত — অভিনব গুপ্ত প্রণীত তন্ত্রালোক (প্রথম আহ্নিক হইতে দ্বাদশ আহ্নিক পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ), দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১ পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা-১৬, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২।
৫০। ভট্টাচার্য, গুরুদাস — বাংলা কাব্যে শিব, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ৯৩, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা-৭, প্রথম প্রকাশ, ১৮৮২।
৫১। ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রনাথ — উপন্যাসের তত্ত্ব ও বঙ্কিমচন্দ্র, জি. এ. এন্টারপ্রাইজ, ১৫/১/১ সেন্টার সিথি রোড, কলকাতা-৫০, প্রথম প্রকাশ, ১৫ এপ্রিল, ১৯৭৯।
৫২। ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ — হিন্দুদের দেব-দেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় পর্ব, তৃতীয় পর্ব), ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫৭/বি, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৪।
৫৩। ভৌমিক, নির্মলেন্দু — বিহঙ্গচারণা, বর্ণালী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৮৫।

৫৪। মজুমদার, রমেশচন্দ্র — বাংলা দেশের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড-প্রাচীন যুগ ও দ্বিতীয় খণ্ড-মধ্যযুগ), জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১১৯, লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৪।

৫৫। মজুমদার, অভিজিৎ — চণ্ডীমঙ্গল (আখেটিক খণ্ড) সংগঠন ও শৈলী বিচার, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৫।

৫৬। মণ্ডল, পঞ্চানন সম্পাদিত — চণ্ডীমঙ্গল মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৩৯৮, পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৩৯৯।

৫৭। মণ্ডল, ইন্দুভূষণ — বাংলা মঙ্গলকাব্যে লৌকিক উপাদান, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন ষ্ট্রীট, কলকাতা - ৬, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৯৯।

৫৮। মল্লিক, দীপঙ্কর — মধ্যযুগ : ফিরে দেখা, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৪।

৫৯। মান্না, শিবেন্দু — বাংলার লোকমাতা দেবী চণ্ডী, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নবদ্বীপ, নদীয়া-২, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ২০০৭।

৬০। মিত্র, সুবলচন্দ্র সংকলিত — সরল বাঙ্গালা অভিধান, নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ, ৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২, অষ্টম সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৭১।

৬১। মুখোপাধ্যায়, সুখময় — বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রী:), ভারতী বুক স্টল, ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯, আদ্যন্ত সংশোধিত ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৮৮।

৬২। মুখোপাধ্যায়, সুখময় — মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, ভারতী বুক স্টল, ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯, ১৯৮৮।

৬৩। মুখোপাধ্যায়, সুশোভন — প্রাক্ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্ত্যজ জীবন, করুণা প্রকাশনি, ১৮ এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, ১৪৩৩।

৬৪। মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ — গৌড়বঙ্গ-সংস্কৃতি, বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, পরিবর্ধিত পুস্তক বিপণি সংস্করণ, ৯ মে, ১৯৯৯।

৬৫। মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার — বাংলায় ধর্ম সাহিত্য (লৌকিক), ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, বিধান সরণী, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৮৮।

৬৬। মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দগোপাল — বৈদিক সাহিত্য সংকলন (প্রথম খণ্ড), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যায়, প্রথম প্রকাশ, শ্রীপঞ্চমী, ১৩৭১।

৬৭। মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার — গৌড়ের কথা, সাহিত্যলোক, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ, ১৩৯০।

৬৮। রানা, সুমঙ্গল — ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা সমাজ ও সাহিত্য (পুঁথি তথ্যের আলোচনা), পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৮।

৬৯। রায়, বাসুদেব — চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ, উৎস প্রকাশনা, ৪৮, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০০৫।

৭০। রায়, অলোক সম্পাদিত — সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, সাহিত্যলোক, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা-৬, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ, আগষ্ট, ২০০৬।

৭১। রায়, নীহাররঞ্জন — বাঙ্গলীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ষষ্ঠ সংস্করণ, মাঘ, ১৪১৪।

৭২। রায়, কবিশেখর কালিদাস — প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য (অখণ্ড সংস্করণ), অপর্ণা বুক ডিষ্ট্রিবিউটার্স, ৭৩, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা-৯, অপর্ণা সংস্করণ, ২০০৮।

৭৩। লাহিড়ী, শিবচন্দ্র — বাঙলা কাব্যে উপমালোক (প্রথম খণ্ড), ইষ্টলাইট বুক হাউস, ২০, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলকাতা-১, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৬৫।

৭৪। লালা, আদিত্যকুমার — আলোচনার দর্পনে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, কল্যাণী পাবলিকেশন, মালদহ-৭৩২১২৩, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০০৯।

৭৫। শাস্ত্রী, মহামোহপাধ্যায় হরপ্রসাদ সম্পাদিত — হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ, ১৩২৩।

৭৬। সরকার, সুধীরচন্দ্র সংকলিত — পৌরাণিক অভিধান, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা - ১২, প্রথম সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৬৫, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৬৯।

৭৭। সেনগুপ্ত, পল্লব — লোক সংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, পরিশীলিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০২।

৭৮। সেন, সুকুমার — বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯১, অষ্টম মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৭।

৭৯। সেন, সুকুমার — বাংলা স্থান-নাম, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ, ১৪০০।

৮০। সেন, সুকুমার — প্রবন্ধাবলী (বিচিত্র দেবতা — ১ম খণ্ড), এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং, ১/১ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জন্মাষ্টমী,১৩৯১।

৮১। সেন, সুকুমার — ব্যুৎপত্তি সিদ্ধার্থ (বাংলা কোষ), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-২০, প্রথম প্রকাশ, ২০ মে, ২০০৩।

৮২। সেন, সুকুমার — মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, বিশ্বভারতী , ৫ দ্বারোকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৩৫২, পুনর্মুদ্রণ, ভাদ্র, ১৩৬৯।

৮৩। সেন, সুকুমার — প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা - ৭, প্রথম প্রকাশ, পৌষ, ১৩৫০, পুনর্মুদ্রণ, আষাঢ়, ১৩৬৯।

৮৪। সেন, সুকুমার — বঙ্গভূমিকা (খ্রীষ্ট পূর্ব ৩০০ - ১২৫০ খ্রীষ্টপর), ইষ্টার্ন পাবলিশার্স, ৮-সি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা - ৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪।

৮৫। সেন, দীনেশচন্দ্র — বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-১৩, পর্ষদ কর্তৃক দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৯১।

৮৬। সেন মজুমদার, জহর — মধ্যযুগের স্বর ও সংকট, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২, রামানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ২০০৯।

৮৭। সুর, অতুল — বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা-৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৪।

৮৮। হালদার, গোপাল — সংস্কৃতির রূপান্তর, মুক্তধারা, ২২ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০, চতুর্থ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৮।

৮৯। হালদার, গোপাল — বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপ-রেখা (প্রথম খণ্ড : প্রাচীন ও মধ্যযুগ), অরুণা প্রকাশনী, ৭, যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা-৬, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৪১২।

৯০। লাহিড়ী, রণবীর — আখ্যান তত্ত্বের আখ্যান, চর্চাপদ, ১৩ বি, রাধানাথ

মল্লিক লেন, কলকাতা-১২, প্রকাশকাল, ডিসেম্বর, ২০১১।

৯১। লাহিড়ী কালীপদ — গৌড় ও পাণ্ডুয়া, মালদহ সমবায় মুদ্রণী লিঃ, মালদহ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬১, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৬৮।

ইংরেজী বই :

1. Bandyopadhyay; Pranab --- The Goddess of Tantra, Punthi Pustak, 136/4B, Bidhan Sarani, Calcutta-4, First Published,1988, Revised Eblarged Second Edition, 1990.

2. Bhattacharyya; N.N. --- Tantrabhidhana (A Tantric Lexicon), Manohar, 4753/23 Ansari Road, Daryagang,New Delhi - 110002, First Edition, 2002.

3. Bhattacharyya; Narendra Nath --- The Indian Mother Goddess, Manohar, 2 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi-64, First Published, 1970, Second Edition Thoroughly Revised and Enlarged, 1977.

4. Bhattasali; Nalini Kanta --- Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in The Dacca Museum, indological Book House, Delhi-6, 1972.

5. Butcher; S. H (Adition) --- Aristolte's Poetics, Aristoles Theory of Poetry and Fine Art, Kalyani Publisheers, 1/1, Rajinder Nagar, New Delhi-2, Reprinted, 2001.

6. Das; Kumar Sisir --- History of India Literature (500-1399), Sahitya Akademi, Rabindra Bhavan, 35, Ferozeshah Road, New Delhi-1, First Published 2005.

7. Dasgupta; Shashibhusan --- Obscure Religious Cults, Firms KLM Private Limited, 257/B, B.B. Ganguly Street, Calcutta-12, First edt. 1946, Reprinted, 1995.

8. Forster; E. M. --- Aspects of Novel, Penguin Books, New Delhi, First Published by Edward Arnold, 1927, Reprinted, 1964.

9. Getty; Alige --- Ganesa (A Monograph on the Elephant-Faced God), Munshiram Monoharlal, New Delhi-7, First Published, 1936, Second Edition, December, 1971.

10. Hunter, W.W. --- A Statistical Account of Bengal, Vol. VII, District of Maldha, Rangpur and Dinajpur, Trubner & Co., London, 1876.

11. Khan; Khan Sahib M. Abid Ali--- Memoirs of Gaur and Pandua, Edited and Revised by H. E. Stepleton, Bengal Secreteriat Book Depot, Calcutta, 25 Oct, 1924.

12. Sen; Dinesh Chandra --- History of Bengali Language and Literature, Gian Publishing House, 29/6 Shakti Nagar, Delhi-7, First Reprint, 1986.

13. Sen; Sukumar --- The Great Goddness in Indic Tradition, Papyrus, 2 Ganendra Mitra Lane, Culcutta - 4, August, 1983.

14. Woodroffe; John --- Sakti and Sakta (Essays and Addrenes on the Sakta Tantra Sastra), Ganesh & co. (Madras) Private Ltd., Madrass-17, Fifth Edition, 1959.

পত্রপত্রিকা :

১। ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর পত্রিকাধ্যক্ষ — সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, নবম ভাগ, প্রথম সংখ্যা, ১৩০৯।

২। চট্টোপাধ্যায়, কেদারনাথ সম্পাদিত — রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত প্রবাসী, ৫৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ২ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৬২।

৩। বন্দ্যোপাধ্যায় , অরুণ সম্পাদিত — এবং এই সময়, শরৎ সংখ্যা, ১৪১৪।

৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ পত্রিকাধ্যক্ষ — সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ৪৫ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪৫।

৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার সম্পাদিত — বাংলা সাহিত্য পত্রিকা (রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও কাউন্টলিও টলস্টয় স্মরণ সংখ্যা), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ষষ্ঠ বর্ষ, ১১৭৯-৮১।

৬। বসু, নগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত — সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা, একাদশ ভাগ, ১৩১১।

৭। বসু, নগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত — সাহিত্য পরিষদ-পত্রিকা (ত্রৈমাসিক), ১৭ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ১৩১৭।

৮। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার সম্পাদিত — বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, নব-সংস্করণ, ১৯৮৮।

৯। মজুমদার, অবিনাশচন্দ্র সম্পাদিত — প্রতিভা, ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ, তৃতীয় বর্ষ, অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যা, ১৩২০।

১০। মল্লিক, রমেন্দ্রনাথ সম্পাদিত — রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ, মাঘ, ১৩৭৪।

১১। মিত্র, খগেন্দ্রনাথ পত্রিকাধ্যক্ষ — সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ২৬ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩২৬।

১২। সেন, পুলিনবিহারী সম্পাদিত — সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ৬৫ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৬৫।

১৩। সেন, জলধর সম্পাদিত — ভারতবর্ষ, ৭ম বর্ষ, ১ম ও ২য় খণ্ড, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩২৬।

১৪। লাহা, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ ও রায়, ত্রিদিবনাথ পত্রিকাধ্যক্ষ — সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ৬০ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৬০।

Census Report & Gezetter :

1. B. Roy (Edit) --- District Census Hand Book, Malda, Published by the Superintandent, Government of West Bengal, Art Union Printing Works P. Ltd., 80/15, Arobindo Sarani, Calcutta-6, 1961.

2. Ghosh, Bhaskar (Edit) --- District Census Hand Book, Murshidabad, Government of West Bengal, Art Union Printing Works P. Ltd., 80/15, Arobindo Sarani, Calcutta-6, 1971.

3. Malley, L. S. S. O' --- Bengal District Gazetteers, Murshibadad, Government of West Bengal, K. R. Biswas, State Editor, Higher Education Department, Bikash Bhawan : North Block, Salt Lake City, First Reprint, May, 1997.

——oo——